অনুস্মৃতি

অনুবাদ :

ডাক্তার ভবানীপ্রসাদ দত্ত

প্রথম সংস্করণ
: অক্টোবর ১৯৫৯

প্রকাশক :
ডি. মেহ্‌রা
রূপা অ্যান্ড কোম্পানী
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট : কলকাতা ৭০০ ০৭৩
সাউথ মালাকা : এলাহাবাদ ২১১ ০০১
১০২ প্রসাদ চেম্বার্স : অপেরা হাউস : বোম্বাই ৪০০ ০০৪
৩৮৩১ পাতৌদি হাউস রোড : দরিয়াগঞ্জ : নতুন দিল্লী ১১০ ০০২

প্রচ্ছদশিল্পী :
রঘুনাথ গোস্বামী

মুদ্রক :
বংশীধর সিংহ
বাণী মুদ্রণ
১২ নরেন সেন স্কোয়ার
কলকাতা ৭০০ ০০৯

উৎসর্গ

যে তিনজনের কাছে পৌঁছে একদিন
আমায় অনেক কৈফিয়ত দিতে
হবে তাঁদের পুণ্য-স্মৃতির উদ্দেশে :

জীবনবন্ধু দত্ত
বারিদকান্তি বসু
ও
বনলেখা (ভবানী) বসু

প্রাসঙ্গিক :

বর্তমান যুগ চলেছে এক অজানা শংকার মধ্য দিয়ে। একদিকে যেমন ক্ষয়িষ্ণু ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা তার প্রতিক্রিয়াশীল চরম প্রগতি-বিমুখ উগ্র জাতীয়তাবোধ ও নয়া ফ্যাসীবাদের এক বীভৎস আর ভয়ংকর রূপ নিয়ে উপস্থিত, অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার চরম দুঃখজনক মত ও পথের তাত্ত্বিক বিরোধ আজ শোষিত, অবহেলিত এবং সংগ্রামরত মানুষকে আশাহত করেছে। ঘন হয়ে আসছে মানব-সভ্যতা-বিধ্বংসী পারমাণবিক যুদ্ধের ছায়া।

এরই মধ্যে শান্তির বাণী আর মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এক গভীর বিশ্বাস নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন কবি পাবলো নেরুদা। এই বিশ্ব ও তার প্রতিটি অধিবাসীর প্রতি এক গভীর মমত্ববোধ, প্রাকৃতিক ও অতিপ্রাকৃতিক প্রতিটি বস্তুর সম্বন্ধে তাঁর স্বর্গীয় উপলব্ধি এবং সর্বপ্রকারের শোষণ, অবিচার ও অসাম্যের বিরুদ্ধে তাঁর আমৃত্যু সংগ্রাম, এরই প্রতিশ্রুতি নিয়ে তিনি এসেছিলেন সম্প্রতিকালের পৃথিবীতে। এই ভয়ংকর যুগের মধ্যে বাস করেও তিনি ঘোষণা করেছিলেন 'বিশ্বমানবের কল্যাণ মুহূর্ত আসন্ন'।

অরণ্যের ম ম করা সুবাসে আমোদিত, প্রস্ফুটিত নবপল্লবের স্নিগ্ধ কোমলতায় পূর্ণ, জ্বলন্ত সূর্যের উত্তাপে তপ্ত তাঁর কবিতার প্রতিটি ছত্রে রয়েছে ভবিষ্যৎ মানুষের জন্য এক দ্বিধাহীন আশা। এ যুগের বিস্ময় কবি পাবলো নেরুদা 'কমিটেড' হয়েও ছিলেন সেই শিল্পী যাঁকে কোনো 'কমিটমেন্টে'র আওতায় বাঁধা যায় না। এর একটিই কারণ মানুষের কল্যাণ সম্বন্ধে তাঁর পূর্ণমনস্কতা। স্বাধীনতার প্রশ্নে কোনো ক্ষেত্রেই তিনি আপোষ করেন নি। সম্প্রতিকালের কবিগণের মধ্যে নেরুদা অনন্য।

সাহিত্য, সংস্কৃতি আর ভালোবাসার দেশ লাতিন আমেরিকা। সুপ্রাচীন রহস্যময় মাপুচে ও মায়া সভ্যতার স্বপ্নকে বুকে নিয়ে বিশেষ এক সংস্কৃতিসম্পন্ন পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্ধের এই শেষ অংশটি ভারতবর্ষের মতই বারে বারে লুণ্ঠিত, ধর্ষিত ও অপশাসিত হয়েছে। ছোট্ট এই ভূখণ্ডের বহু সাহিত্যিক আর কবি পৃথিবীর নানা অঞ্চল থেকে সম্মানিত হয়েছেন, এমন কি নোবেল পুরস্কারও লাভ করেছেন অনেকে। লাতিন আমেরিকার সংগ্রামী অথচ প্রেম-বিহ্বল আশার

আলোকে দীপ্ত সাহিত্য রোমাঞ্চময়। আর্জেন্টিনার এনরিক মলিন, জুয়ান গেলমেন, বলিভিয়ার পেদ্রো সিমোসে, চিলির এনরিখ লিন্, গাব্রিয়েলা মিস্ত্রাল, কিউবার নিকোলাস গিল্যেন, রিতামার; এল্. সালভাদোরের রোক্ ডাল্টন, গুয়াতেমালার ক্যাসটিলো, নিকারাগুয়ার আরনেস্টো কার্ডিনাল, উরুগুয়ের মেরিয়ো বেনেডিটি, ভেনেজুয়েলার এড্মান্ডো প্রভৃতি বহু কবি স্প্যানিশ সাহিত্যকে বর্ণাঢ্য অলঙ্কার ও তীক্ষ্ন বর্শাফলকে সুসজ্জিত করেছেন।

শেষ জীবনে পৌঁছে পাব্লো পেয়েছিলেন 'নোবেল পুরস্কার'। যদিও এই পুরস্কারের প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র মোহ ছিলো না এবং এই পুরস্কারপ্রাপ্তি তাঁকে তাঁর আদর্শ থেকে এতটুকুও বিচ্যুত করতে পারেনি। 'নোবেল পুরস্কার' লাভের জন্য তাঁর প্রতি নির্যাতন বা অসম্মানের মাত্রাও কিছু কম হয়নি!

পাব্লো নেরুদার এই 'অনুস্মৃতি' তাঁর আত্মজীবনী নয়। এই অস্থির-যুগের মহত্তম এক কবি-জীবনের স্মৃতিচারণ মাত্র। এই স্মৃতিচারণ, নেরুদা ও লাতিন আমেরিকা এবং য়ুরোপের কিছু সাহিত্যিকের কবিতা আর বিভিন্ন রচনার বঙ্গানুবাদ পাঠকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার বাসনা বহুদিন থেকেই পোষণ করছিলাম। অগ্রজপ্রতিম প্রিয় কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় পাব্লো নেরুদার বহু কবিতাই অনুবাদ করেছেন। এছাড়া প্রথমদিকে যুবনাশ্ব এবং আরো অনেকেই কবির রচনার বঙ্গানুবাদ করেছেন।

এক্ষেত্রে আমার মতো অজ্ঞাতকুলশীল একজন অনুবাদকের এই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা কতটুকু সফল হয়েছে তা বিচারের দায় পাঠকের। শুধু এটুকুই বলা যায় মূলকে যথাসাধ্য অনুসরণ করতে সচেষ্ট থেকেছি। প্রসঙ্গতঃ জানানো দরকার যে, ক্ষেত্রবিশেষে বিদেশী নামোচ্চারণে অসঙ্গতি এবং মুদ্রণ প্রমাদ থাকা অসম্ভব নয়।

যাঁদের আন্তরিক সহযোগিতা, উৎসাহ ও সহানুভূতি ছাড়া এই কাজ আমার পক্ষে সম্ভব হতো না, তাঁদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ না করলে অকৃতজ্ঞতার অপরাধ আমাকে দুঃখ দেবে। প্রথমে উল্লেখ্য রূপা অ্যান্ড কোম্পানী'র সত্ত্বাধিকারী মেহরাজীদের কথা, যাঁরা এই অনুবাদ-কর্মের অধিকার দান করে আপনাদের কাছে আমাকে পরিচিত করার গুরুদায়িত্ব নিয়েছেন, এঁদের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। এই অনুস্মৃতি প্রকাশে নানাভাবে সহযোগিতা করার জন্য ওই প্রতিষ্ঠানেরই কর্মী রামচন্দ্র ঘোষ আমার ধন্যবাদভাজন। এরপরেই মনে আসে বন্ধুবর রঘুনাথ গোস্বামীর কথা, স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্ব ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এই মানুষটি শুধুমাত্র যে গ্রন্থখানির প্রচ্ছদপট রচনা করেছেন তাই নয়, শুরু থেকে তিনি সক্রিয় সহানুভূতি ও উৎসাহদানে আমায় উদ্দীপিত করেছেন—আমি তাঁর কাছেও কৃতজ্ঞ। অন্যতম সুহৃদ্ শ্রীঅংশুমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে পেয়েছি দ্বিধাহীন উৎসাহ ও উদ্দীপনা, অগ্রজপ্রতিম কবি শ্রীসুভাষ মুখোপাধ্যায়ের স্বভাব সুলভ

ভালোবাসা আর উৎসাহ যুগিয়েছে প্রেরণা। অনুজপ্রতিম বাঙলাদেশের কবি দাউদ হায়দার এবং আবৃত্তিকার ও কবি শ্রীপ্রদীপ ঘোষের কাছেও পেয়েছি অকৃত্রিম উৎসাহ। এই সঙ্গে আরো কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন, কারণ পাবলোর মতো আমারও বলতে ইচ্ছে করে—"বহুজনের জীবন নিয়েই তো একটা জীবন"। আমার আরও একটা জীবন ও জগৎ রয়েছে ত হচ্ছে পেশাদারী চিকিৎসকের জীবন। সেই জীবন ও জগৎ থেকে সময় করে নিয়ে এই কাজে আর যারা আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেছেন তাঁরা হলেন ডঃ মুরলী মিত্র, ডঃ অরবিন্দ বসু, ডঃ শিবপ্রসাদ বক্সী, ডঃ তরুণদেব মৌলিক এবং আমার শ্রদ্ধেয় দাদা ডঃ উমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায় ও পামেলা বৌদি। আমার কনিষ্ঠ ভগ্নীদ্বয় শ্রীমতী শিখা রায়, অধ্যাপিকা বেবী দত্ত আমার এই লেখাতে অনেক সাহায্য করেছে।

'অনুস্মৃতি'র সমাপ্তিতে কবির করুণ মৃত্যু বর্ণনার সঙ্গে তাঁর একটি কবিতার তর্জমা যুক্ত করেছি, আশা করছি পাঠককুল আমার এই ধৃষ্টতাকে মার্জনা করবেন।

সবশেষে সপ্রেম কৃতজ্ঞতা জানাই সেই শান্ত, নিবিড় ছায়াটিকে যে শুরু থেকে শেষ অবধি আমায় ঘিরে রেখেছে—শ্রীমতী ইরানীকে।

সৌমিত্র দত্ত

স্চী :

স্মৃতিকথা বা অনুস্মৃতির মাঝে মাঝে অনেকই ফাঁকা জায়গা থেকে যায়। যে বিস্মৃতি জীবনেরই একটা অঙ্গ, সেই বিস্মৃতিই তো এর জন্য দায়ী। স্বপ্ন দেখার অবসর মুহূর্ত যখন আসে, তখনই তো সোজা হয়ে দাঁড়াই জীবনের বাকী কাজটুকু সেরে ফেলার জন্য। অনেক পুরোনো স্মৃতিকে মনে করার চেষ্টা করি, কিন্তু ধুলোর মতই ঝাপ্‌সা হয়ে তা মিলিয়ে যায়। এ যেন টুক্‌রো হয়ে ভেঙে যাওয়া কাচের বাসন যা আর কোনদিনও জোড়া লাগবে না।

যাঁরা চিন্তা করে, মনে করে আত্মজীবনী লেখেন অর্থাৎ যাঁরা জীবনীকার, তাঁদের চিন্তাধারার সাথে একজন কবির চিন্তার অনেকই তফাৎ। তাঁদের মধ্যে অনেকেই হয়তো স্বল্পায়ু, কিন্তু তাঁদের আত্মকাহিনী ছবির মতই স্পষ্ট আর ব্যাপক। তবে কবির অনুস্মৃতি বা তাঁর চিন্তা যেন দরদালানে সারি সারি দাঁড়ানো প্রেতাত্মার ভীড়, যা তাঁর সময়ের অন্ধকার আর আগুনের শিখায় বার বার শিহরিত ও প্রজ্বলিত হয়ে উঠেছে।

হয়তো আমি শুধুমাত্র আমার জীবনের পরিধির মধ্যে বেঁচে থাকতে চাইনি, আমি বেঁচে থাকতে চেয়েছি আরো হাজারো জীবনের সাথে ।

এই যে পাতাগুলো ভরে লিখে গেলাম, একদিন এরা শরতের তরুবীথিকায় পাতা ঝরার মতো ঝরে পড়বে, অথবা পাবে এক নবজন্ম, যেমন নবজন্মের আস্বাদ পায় আঙুর তার পবিত্র সুরায়—দ্রাক্ষাকুঞ্জ কাটা হলে যেমন হলুদ পাতার ঝরার সময় আসে।

এই সকল জীবনগুলিকে জড়ো করেই তো আমার জীবন, কবির জীবন।

১

একটি গ্রাম্য ছেলে

চিলির অরণ্য

আগ্নেয়গিরির সানুদেশে, তুষারমৌলি পর্বতের পাশে, বিশাল বিশাল হ্রদের রাজ্যে, সৌরভময়, শব্দহীন, শাখাপ্রশাখার জালে সমাচ্ছন্ন চিলির অরণ্যভূমি। ঝরাপাতার স্তূপে পা ডুবে যায়, মড় মড় করে ওঠে একটি ভঙ্গুর বৃক্ষশাখা। দৈত্যের মতো রাউলি' গাছগুলি তাদের কণ্টকিত দৈর্ঘ্য মেলে দাঁড়ায়, শীতল বনস্থলী থেকে উড়ে আসে একটি পাখি, ডানা ঝাপটায়, রৌদ্রহীন বৃক্ষশাখে থমকে থামে। তারপর, সেই নিরালা থেকে শানাইয়ের মতো ছড়িয়ে পড়ে তার গান···লরেলের বুনো গন্ধ, বলদো ওষধির গন্ধ আমার নাসাপথে প্রবেশ ক'রে প্লাবিত করে দেয় সমস্ত সত্তা। গুয়াইতেকার সাইপ্রেস আমার পথ রোধ করে। উল্লম্ব রাজ্য এক। পাখির রাজ্য, পুঞ্জ পুঞ্জ পত্রে ভরা, ঠোক্কর খাই পাথরে···উন্মুক্ত গর্ত খুঁড়ে চলি···রক্তরোমে ভরা কাঁকড়ার মতো স্থিরদেহ, বিশাল এক মাকড়শা নিস্পন্দ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে আমার দিকে। সোনালি রং ক্যারাবাস গুবরে আমার দিকে তার বিষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে, তার অত্যাশ্চর্য রামধনু রং বিদ্যুতের মতো অদৃশ্য হয়ে যায় নিমেষে।

যেতে যেতে পার হয়ে যাই নিজের চেয়েও দীর্ঘ, দীর্ঘতর ফার্নের জঙ্গল, তাদের শীতল হরিৎ চোখ বেয়ে আমার মুখের ওপর ঝরে পড়ে জলের ফোঁটা, পেছনে পক্ষদল কাঁপতে থাকে বহুক্ষণ···ক্ষয়িষ্ণু গাছের গুঁড়ি—কি সম্পদ তাদের অঙ্গে অঙ্গে! নীল ও কৃষ্ণ ছত্রাক তাদের কর্ণভূষা, রক্তবর্ণ পরগাছা পথরাগে ভরে দিয়েছে দেহ, অলস আরও কতো গাছগাছড়া তাদের শ্মশ্রু ধার দিয়েছে। তার ক্ষয়ে-যাওয়া শরীর থেকে সহসা নিঃশ্বাস-পাতের মতো লাফিয়ে ওঠে একটি সাপ, মৃত বৃক্ষের আত্মা যেন পিছলে পালিয়ে যাচ্ছে···আরও কিছু দূরে প্রতিটি বনস্পতি দাঁড়িয়ে আছে প্রতিবেশী থেকে স্বতন্ত্র, নির্জনতালোভী অরণ্যের গালিচার ওপর দাঁড়িয়ে আছে খাড়া·· প্রত্যেকের পত্রালিতে স্বকীয়তার স্বাক্ষর।···একটি গিরিখাত, নীচে গ্র্যানাইট ও জ্যাসপার পাথরের ওপর স্ফটিকস্বচ্ছ জল পিছলোয়। উড়ে যায় একটি প্রজাপতি, পাতিলেবুর মতো উজ্জ্বল, জল আর সূর্যালোকের মাঝখান দিয়ে নাচতে নাচতে উড়ে যায়। কাছাকাছি সংখ্যাহীন ক্যালসিওলেরিয়া তাদের হলুদ পুঁতি দুলিয়ে অভ্যর্থনা জানায়, উঁচুতে লাল কোপিহিউ এই জাদু অরণ্যের ধমনি হতে ঝরা বিন্দুর মতো দুলতে থাকে। লাল কোপিহিউ রক্তের ফুল, সাদা কোপিহিউ বরফের ফুল। একটা শেয়াল নিস্তব্ধতার বুক চিরে বিদ্যুতের মতো চলে যায়, পাতায় পাতায় নিমেষের জন্য হরখিলা। কিন্তু এই গাছের রাজ্যে নীরবতাই আইন। বহুদূরে হতচকিত কোনও জানোয়ারের অর্ধস্ফুট আর্তনাদ···লুকোনো পাখির তীক্ষ্ণ ডাকের ক্ষণবিরতি। উদ্ভিদ-জগতে মন্ত্র মর্মর চলতে থাকে, যতক্ষণ না ঝড় এসে পৃথিবীর যতেক সঙ্গীত মথিত করে তোলে।

চিলির অরণ্যভূমি যে দেখেনি সে চেনে না এই গ্রহ।

এই নিসর্গ থেকে···এই মাটি, এই নৈঃশব্দ থেকে আমি আগন্তুক···ভ্রাম্যমাণ, গান গাইতে গাইতে হেঁটে যাব বলে ধরণীর বুকের ওপর দিয়ে······

কবিতা ও শৈশব

ছোটবেলাকার দিনগুলোর কথা এই বলে আরম্ভ করি: আমার স্মৃতি জুড়ে আছে শুধু বৃষ্টি, বৃষ্টি আর বৃষ্টি। মেরু অঞ্চল থেকে, হর্ন অন্তরীপের আকাশ থেকে ফ্রন্টিয়ারে ঝেঁপে আসা প্রপাতের মতো সেই দারুণ দখিনা বৃষ্টি। এই ফ্রন্টিয়ারে, আমার দেশের বন্য পশ্চিমে প্রথম চোখ মেলে তাকিয়ে চিনেছিলাম মাটি, কবিতা, বৃষ্টি।

অনেক ঘুরেছি। মনে হয় আমার স্বদেশ আরাউকেনিয়ার দামাল অথচ সুক্ষ্ম-শক্তিশাসিত সেই বৃষ্টির শিল্প বুঝি হারিয়ে গেছে। কখনও কখনও সারা মাস, সারা বছর ধরে বৃষ্টি হত। বৃষ্টির সুতোগুলো, কাচের লম্বা লম্বা সুঁচের মতো ছাদের ওপর, জানালার ওপর স্বচ্ছ ঢেউয়ে ভেঙে পড়ত। প্রতিটি বাড়ি তখন শীতের সমুদ্রে বন্দর-অন্বেষু এক একটি পোত।

সহসা চাবুকের মতো এক পশলা গরম বৃষ্টি—পরক্ষণেই নীল আকাশ—দক্ষিণ আমেরিকার এই ঠাণ্ডা বৃষ্টি এ জাতের নয়। দক্ষিণী বাদল বড় ধৈর্যশীল, ধূসর আকাশ থেকে নিরবচ্ছিন্ন ধারায় ঝরতে থাকে।

আমার বাড়ির সামনের রাস্তাটা কাদার সমুদ্র। জানলার বাইরে রাস্তার মাঝখানে গরুর গাড়ির চাকা আটকে গেছে। কালো পশমের ভারি জামা গায়ে এক কৃষক বলদগুলোকে মারছে। সেই ঠান্ডা আর বৃষ্টির মধ্যেই স্কুলে যেতাম কাঁচা ফুটপাথের ওপর দিয়ে পাথরগুলো টপকাতে টপকাতে। হাওয়ায় উড়ে যেত ছাতা, বর্ষাতির বড় দাম, দস্তানা দেখতে পারতুম না, জুতোগুলো হয়ে যেত ভিজে জবজবে। ভেজা মোজা আর কাদামাখা জুতো-জামা নিয়ে ফিরতাম। চিরকাল মনে থাকবে চুল্লির পাশে শুকোচ্ছে মোজা, শুকোচ্ছে জুতো। মনে হতো জুতোগুলো খেলনা রেল-ইঞ্জিন, সেগুলো থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে।

তারপর আসত বন্যা। নদীর ধারের বস্তিগুলো ভেসে যেতো, কেঁপে কেঁপে শিউরে উঠতো মাটি। এক এক সময়ে দূরের পাহাড়ে ঝলসে উঠতো একটা ভয়ংকর তীব্র হলুদ আলোর মুকুট। আগ্নেয়গিরি মাউন্ট লায়মা পাশ ফিরলো।

টেমুকো এমন শহর যার কোন অতীত নেই। অথচ এই শহরের বুক জুড়ে রাজ্যের লোহা-লক্কড়ের দোকান। দোকানগুলোর কোন নাম নেই, আদিবাসীরা পড়তে পারে না বলে দোকানগুলোর সামনে কোথাও ঝোলে একটা বিরাট পাত্র, কোথাও বা মরচে ধরা দানবীয় তালা, আবার কোথাও বা লোহার চামচ। আবার আর একটু এগিয়ে গেলে দেখতে পাওয়া যায় জুতোর দোকানের সামনে বিশালাকার বুট জুতো।

টেমুকো শহর দক্ষিণ চিলির শেষতম বিন্দু। তার গোটা ইতিহাসটাই রক্তাক্ত। স্পেন থেকে আক্রমণকারী ইস্পাহানীদের সঙ্গে তিনশো বছরের যুদ্ধের পর আরাউ-কেনিয়ার আদিবাসীরা পিছু হটতে হটতে এসে পৌঁছলো এই শীতের দেশে। কিন্তু চিলির মানুষ তবু ছাড়লো না—লড়াই চলতে থাকলো। তাদের মতে আরাউকেনিয়ায় তারা শান্তি আনছে। তারপর চললো নানান উৎপীড়ন, আক্রমণ আর বোমা, গ্রামের পর গ্রামে আগুন। পরে আরও পিতৃসুলভ নীতি—ধর্ম। আইন বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠলো উকিলেরা। জমি কেড়ে নেবার ব্যাপারে প্রতিবাদ জানালে বিচারক তাদের জেলে পুরতো, আর ধর্মযাজকরা অনন্ত নরকের ভয় দেখাতেন। নিষ্ঠুর শক্তি অবশেষে সম্পূর্ণ করলো এই মহাজাতির ধ্বংস। এরাকিলার মহাকাব্যে, প্রতিটি পাতায় লেখা রয়েছে আরাউকেনিয়ার এই মহাজাতির কীর্তি, বীরত্ব এবং সৌন্দর্যের কাহিনী।

আমার বাবা মা থাকতেন প্যারেলে, সেখানেই আমার জন্ম। মধ্য চিলির প্যারেলেতে ছিলো সুন্দর সুন্দর দ্রাক্ষাকুঞ্জ। আর ছিল প্রচুর সুরা। সংসারে চোখ খুলতেই তাঁকে দেখেছিলাম, একথা জানার আগেই আমার মা ডোনা রোজা চিরদিনের মতো বিদায় নেন। ১২ই জুলাই ১৯০৪ সালে আমি এলাম পৃথিবীতে। তার মাত্র একমাস পরে আগস্ট মাসে যক্ষ্মারোগে ক্ষয়ে ক্ষয়ে মায়ের মৃত্যু হলো।

ছোট চাষী-পরিবারের পক্ষে মধ্যচিলির এই জায়গাটা ছিলো খুবই কষ্টকর। আমার বাবা জোসে দ্যেল কারমেন আমার ঠাকুরদার জমি ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন ভাগ্যান্বেষণে, তারপর ডকের চাকরি ইত্যাদি করতে করতে শেষে টেমুকো শহরে এসে রেলের কাজ নেন।

বাবা ছিলেন পাথরবাহী ট্রেনের পথ-প্রদর্শক। আশপাশের খনি থেকে পাথর এনে ঢালা হতো ট্রেন-লাইনের মাঝে। চল্লিশ বছর আগে এই ট্রেনের কর্মীদের লোহার

মতো শক্ত হতে হতো। কেউ হতো দাগী আসামী, কেউবা হতো শক্তপোক্ত চাষার ছেলে। বেতন নামমাত্র। কখনও কখনও বাবার সঙ্গে ট্রেনে যেতাম। সীমান্তের ধারে বোরোয়া খনি থেকে তোলা হতো পাথর; সে সব খনির চারপাশে ইস্পাহানীদের সঙ্গে আরাউকেনিয়ার রক্তাক্ত সংগ্রামের চিহ্ন ছড়ানো। সেখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য আমায় পাগল করে তুলতো। মুগ্ধ হয়ে দেখতাম সেখানকার পাখি-পোকামাকড় আর তিতির পাখির ডিম। ছোট ছোট চকচকে নীলচে রঙের ডিমগুলো নদীর ধারে পাহাড়ের খাদে বন্দুকের নলের মতো পড়ে থাকতো।

আমার অভিযান সেখানে অন্যান্য কর্মীদের মধ্যে কৌতূহল জাগিয়ে তুলছিলো। তাই বাবা পিছন ফিরলেই তারা আমার জন্য নানান জিনিস সংগ্রহ করতে বেরিয়ে পড়তো ওই জঙ্গলে। তাদের মধ্যে একজনের নাম ছিল 'মঙ্গে'। বাবা বলতেন ছুরি-হাতে মঙ্গে নাকি ভয়ঙ্কর। মুখে তার দুটি দাগ—একটি দাগ লম্বা ছুরির আর একটা ছিল চওড়া সাদা দাগ—এই দুটো দাগের জন্য ওকে দেখাতো শয়তানের মতই ভয়ঙ্কর সুন্দর। এই মঙ্গেই আনতো সবচেয়ে সুন্দর জিনিসগুলো।—যেমন, পাখি, বিরাট লোমওলা মাকড়সা, বন-ঘুঘু ইত্যাদি। একদিন নিয়ে এলো চিলির বিখ্যাত গুবরে পোকা, তার শরীরটা বিদ্যুৎ চমকানো রামধনুর মতো। লাল-বেগুনী-সবুজ আর হলুদ মেশানো। বিদ্যুৎ চমকের মতোই পোকাটা আমার হাত থেকে উড়ে গিয়ে জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে গেল। মঙ্গে তাকে আর ধরে আনতে পারেনি। কিন্তু মঙ্গেকে আমি ভুলিনি।

একদিন বাবা এসে মঙ্গের মৃত্যুর খবর দিলেন। বললেন—ট্রেনটা যখন পাহাড়ের চূড়ো ঘেঁষে এগোচ্ছিল তখন সে পড়ে গেল। ট্রেন থামানো হলো, পাওয়া গেল মঙ্গের থ্যাৎলানো দেহটা—কয়েকটা শুধু হাড়ের টুকরো।

ষাট বছর আগেকার আমাদের সেই বাড়িগুলোর বর্ণনা করা বড় কঠিন। বাড়িগুলো পরস্পর যুক্ত। যেন একটা বিরাট সংসার। সমস্ত গ্রামটা সারাক্ষণ সেই সংসারের গুঞ্জনে ভরে থাকতো।

এমারসনের মতো সাদা দাড়িভরা মুখে উত্তর আমেরিকার ডন কারলস্ ম্যাসন ছিলেন এই সংসারের কুলপতি, তাঁর ছেলেরা ছিলেন সহজাত আমেরিকান। বাইবেল আর আইন—এই ছিল ম্যাসনের একমাত্র ধর্ম। এই কুলপতি ম্যাসন কিন্তু গ্রামের সাম্রাজ্য গড়েন নি, তিনি ছিলেন এই গ্রামের প্রথম অধিবাসী। একদিন এই গ্রামে সবই ছিল। এমন কি একটা খবরের কাগজও বেরুত। কিন্তু কেমন করে জানি না এঁরা সবাই আস্তে আস্তে দরিদ্র হয়ে গেলেন। আমাদের গ্রামে সেই বাড়িটা দেখাত নতুন উপনিবেশের মতো। বাড়ি তৈরির শেষ ছিল না, কিন্তু কোনটাই সম্পূর্ণ হতে পারেনি। এরই মধ্যে বাবা মা-রা ছেলেমেয়েদের জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় বানানোর স্বপ্ন দেখতেন।

জন্মদিনের ছুটি ছিল মজার। সেদিন রান্না হত মাংস—ভেড়ার ঝলসানো মাংস, আর তৈরি হত নানান্ মিষ্টি। সেই সব দিনগুলোর মতোই মিলিয়ে গেছে সেই মিষ্টির স্বাদ। টেবিলের ধারে মাথাভরা সাদা চুল নিয়ে কুলপতি বসতেন—পাশে তাঁর স্ত্রী ডনা মাইকেলা। দেওয়ালে ঝুলত চিলির পতাকা—তার একপ্রান্তে আমেরিকার পতাকা।

যেন সারা চিলির রক্তের মাঝে এক বিন্দু আমেরিকার রক্ত। ম্যাসনের বাড়ীর অনেক ঘরেই আমাদের ছোটদের যাওয়া ছিলো মানা। কি রঙের আসবাব সে ঘরে আছে জানতামও না। একদিন আগুনে পুড়ে শেষ হতে তার ছাই রঙ আমরা দেখেছিলাম। দেওয়ালে ঝোলানো থাকত অনেক ছবি, অনেকের ছবি। তারই মধ্যে একটা ছিলো আমার মা-র। কালো পোশাকে ঢাকা রুগ্ন শরীর, চোখের দৃষ্টি ছাপিয়ে আছে দূরে অনন্তে। মা নাকি কবিতা লিখতেন—কিন্তু আমি কোনদিনও সে কবিতা দেখিনি—তবে দেখেছি সেই দেওয়ালে টাঙ্গানো আমার মা'র মন ভোলানো ছবিটা।

বাবা আবার বিয়ে করেছিলেন। সৎমা'র নাম ছিলো ডনা কেনডিভা মারভিয়া। সৎমার দিকে তাকিয়ে ভাবতাম স্বর্গ থেকে পরীমা নেমে এসেছেন আমার ভার নিতে। কি সুন্দর কি ভালবাসায় ভরা ছিল তাঁর মন, ছিলেন গ্রাম্য মেয়ের মতোই সরল ও দয়ালু। বাবা ঘরে ফিরলে একটা শান্ত ছায়ার মতো সরে দাঁড়াতেন—যেমন দাঁড়াত তখনকার দিনের বাড়ীর বৌ-রা আর মায়েরা। শান্ত সেই ছায়ারা যখন ঘরে ঘুরে বেড়াতো আমার মনে হতো মাজুরকা আর কোয়াড্রিলের নাচের তালে ঘর ভরে উঠছে।

আমাদের ঘরের একটা বড় তোরঙ্গ নানান্ আকর্ষণীয় জিনিসে ভরা ছিল। আমি যখন একটু বড় হলাম মাঝে মাঝে সবার চোখ এড়িয়ে ওই তোরঙ্গটা খুলে তার জিনিসগুলো দেখতাম। একটা টিয়াপাখির ছবি, কিছু সুন্দর সুন্দর কাগজের পাখা।

সেই তোরঙ্গের মধ্যে পেয়েছিলাম আমার জীবনের প্রথম প্রেমের গল্প। আমার মা'র সেই তোরঙ্গের মধ্যে কয়েক'শ পোস্টকার্ডের মধ্যে লেখা প্রেমের চিঠি। কখনও 'এনরিক' কখনও বা 'এলবার্গে' এই চিঠিগুলি লিখছেন মারিয়াকে। পোস্টকার্ডগুলো রঙ্গীন, নানান্ ছবিতে ভরা—কোনটাতে তখনকার দিনের কোন সুন্দরী অভিনেত্রীর ছবি, মাথার চুলের সঙ্গে সত্যিকারের চুল আঠা দিয়ে আটকানো—কোনটা বা আবার সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি। অবাক হয়ে ছবিগুলো দেখতাম কিন্তু বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রেমের চিঠিগুলো গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়লাম। কি সুন্দর স্পষ্ট হাতে লেখা চিঠি। সারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লেখা সেই চিঠিতে কি অপরূপ আসক্তি আর প্রেম নিবেদন—যেন মনের মধ্যে ঝড়ো হাওয়ার একটা বিবরণ। কখন জানিনা সেই চিঠির প্রেমিকা মারিয়ার সঙ্গে প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম। মনে হতো মণি মুক্তোয় মোড়া এক সুন্দরী অভিনেত্রীর প্রেমে আমি আবদ্ধ হয়ে পড়েছি। কিন্তু এই প্রেমপত্রগুলো ওখানে কেমন করে এসেছিল সেটা আমার কোনদিনও জানা হয়নি।

টেমুকোর ১৯১০ সালটা আমার মনে থাকবে চিরকাল। প্রায়ান্ধকার ঘর, কয়েকটা মাত্র টেবিল চেয়ার আর প্রায় অর্ধভগ্ন একটা বাড়ী, তারই মধ্যে আমার স্কুল-জীবন শুরু হল। জানলার ধারে বসে দেখতাম কাউতিন নদী এঁকেবেঁকে স্কুল বাড়ির পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে—তার দু'পাশে আপেল গাছের সারি। ক্লাশ পালিয়ে আমরা কজন প্রায়ই নদীতে পা ডুবিয়ে বসে থাকতাম।

ছ বছরের জীবনে এই স্কুলটা জীবনের অনেক দরজাই খুলে দিয়েছিলো। অবাক বিস্ময়ে ফিজিক্স ল্যাবরেটরীর চকমকে নানান্ যন্ত্রপাতি দূরে থেকে দেখতাম—কারণ ও ঘরে যাওয়া আমাদের বারণ ছিলো। লাইব্রেরীর দরজা ছিলো বন্ধ। নয়া

উপনিবেশের ছেলেমেয়েদের বই পড়ার কোনও আগ্রহই ছিলো না—তবু সেই বন্ধ ঘর স্যাঁতসেঁতে দেওয়ালের গন্ধ—বড় বড় থাম—এক নতুন জগতের বিস্ময় আর রোমাঞ্চে আমার মন ভরে দিয়েছিলো। যেখানে বসে আমরা যুদ্ধ যুদ্ধ খেলতাম—সেই বড় বড় থামের সোঁদা গন্ধ—ভেঙ্গে পড়া গম্বুজ—আঁকাবাঁকা লুকোনো জায়গার অন্ধকার আজও আমার স্মৃতিতে সেদিনের মতোই উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।

বড় হয়ে উঠছি—চোখে তখন 'বাফেলো বিল' আর 'সালগিরির সমুদ্রযাত্রার স্বপ্ন।

কামারের মেয়ে ছিলো ব্লাংকা—তার সঙ্গে প্রেমে পড়ল আমার এক বন্ধু। বন্ধুর হয়ে লিখতে হতো প্রেমের চিঠি। চিঠির ভাষা—চিঠি লেখার রোমাঞ্চ আমার প্রথম পবিত্র প্রেমের অনুভূতি। চিঠিগুলো কেমন লেখা হতো জানিনা কিন্তু একদিন স্কুলে এই মেয়েটি হঠাৎ আমায় প্রশ্ন করেছিলো—চিঠিগুলো আমি লিখে দিই কি-না! অস্বীকার করতে পারিনি, অপরাধীর মতো বলতে হয়েছিলো—"হ্যাঁ"। উত্তরে সে আমায় একটা শুকনো ফল দিয়েছিলো—যা আমি খেতে পারিনি—সযত্নে বাক্সে তুলে রেখেছিলাম। তারপর থেকে পাগলের মতো হাজারো চিঠি ওকে লিখেছিলাম—আর জড় করেছিলাম ওর কাছ হতে হাজারো শুকনো ফল। কখন জানিনা আচমকা আমার সেই বন্ধুর বদলে ব্লাংকার মনে আমিই জায়গা পেয়ে গিয়েছিলাম।

ক্লাশের ছেলেরা জানতো না আমি কবি—তাহলে আমার আর অস্তিত্ব থাকতো না। গোটা ক্লাশ জুড়ে ছিলো বুনো পশ্চিমের হাওয়া—সেখানকার নামে চেহারায় ভাষায় ব্যবহারে ছিলো কেমন যেন টেক্সাস আর দুর্দান্ত পশ্চিমের ছড়াছড়ি। আরাউ কেনিয়ার কাব্যে ভরা নাম কটাই বা ছিলো যেমন মেলিভিলা বা কারাতিলো অন্য সবাই —ওরে বাবা—স্কেলার স্মিথ্ হুজার ইত্যাদি।

ওক গাছের কাঁটাওলা ফল নিয়ে কখনও মারামারি করেছ? যদি করে থাকো তবে নিশ্চয়ই জানো কি তীক্ষ্ন তার আঘাত। মাঝে মাঝে ক্লাসে বসে আমরা তাই করতাম। আর আমি মার খেতাম সবচেয়ে বেশি কারণ আমি যখন সেই সুন্দর সবুজ ফলের ছাই রঙ-এর কাঁটায় ভরা টোপরটা অবাক হয়ে দেখতাম—ততক্ষণে পকেট ভর্তি ওক ফল দিয়ে আমার বন্ধুরা আমায় মেরে হারিয়ে দিত। আমার বাবার লাল সবুজ টুপি, তার রঙের বাহার ছিল আমার অতিপ্রিয়, সেটি পরে যেদিন গিয়েছিলাম সেদিন সেই কয়েক শ ছেলে আমার মাথার টুপিটা কেড়ে নিয়ে লোফালুফি করে যে কোথায় ফেলে দিল ভয় পেয়ে তা আর কোনদিনই খুঁজে বার করিনি।

স্মৃতিকথা লিখতে বসে সব কিছু ঠিক ঠিক সময় ধরে মনে পড়ে না। কিছু মনে আসে কিছু ভুলে যাই—কিছু কিছু ঘটনা অর্থহীনও মনে হয়। এখন যে ঘটনাটা মনে করে লিখতে যাচ্ছি আমার জীবনে এটাই বোধ হয় প্রথম যৌন অভিজ্ঞতা। এ ঘটনার কতটুকু মূল্য আছে আমি জানি না তবে এটা তো ঠিক প্রেম আর প্রকৃতিই আমার কাব্যের উৎস।

আমার বাড়ীর উল্টোদিকে থাকতো দুটি মেয়ে। তাদের চাউনিতে আমার মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠতো। আমি নিজে যতখানি গোবেচারা আর শান্ত ছিলাম ওরা ছিল ঠিক ততখানিই অকালপক্ব আর শয়তান। সেদিন আমি বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে দেখি

ওদের হাতে একটা পাখির বাসা। খড় আর পালকে বোনা সুন্দর একটা পাখির বাসা, মধ্যে বেশ কয়েকটা সুন্দর নীলাভ পাখির ডিম। সেটা চাইতে ওরা বলল—তার আগে আমার কাপড়ের ওপর দিয়ে ওরা আমায় স্পর্শ করবে। লজ্জা ও ভয়ে আমি যখন পিছু হঠতে আরম্ভ করেছি পাখির বাসাটা মাথায় ধরে ওরা আমার দিকে এগিয়ে এলো। আমি ছুটে পালিয়ে একটা ফাঁকা জায়গায় এসে দাঁড়ালাম। ওরা এর মধ্যে ছুটে এসে আমায় ধরে ফেলে আমার জামাকাপড়গুলো একে একে খুলতে আরম্ভ করল, এমন সময় দূরে শুনলাম আমার বাবার পায়ের শব্দ। পাখির বাসা পাওয়ার নেশা সেখানেই শেষ হয়ে গেল—ডিমগুলো পড়ে ভেঙ্গে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল—আর রুদ্ধ নিঃশ্বাসে কয়েক সেকেণ্ড কাটিয়ে আমরা ছুটে পালালাম।

আরেকটা দিনের কথা মনে পড়ে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছোটখাটো জিনিস পাওয়ার জন্য এখান ওখান ঘুরতে ঘুরতে একটা বেড়ার ধারে গিয়ে দেখলাম বিরাট এক গর্ত। গর্তে চোখ লাগিয়ে দেখি সামনে সুন্দর বড় বড় ঘাসে ভরা বুনো জমি। কিন্তু হঠাৎ আমার কি হল—চোখটা সরিয়ে নিলাম, কেমন যেন মনে হল—কিছু একটা ঘটতে চলেছে। হঠাৎ দেখি ওপাশ থেকে গর্তের মধ্যে দিয়ে একটা হাত বেরিয়ে এসেছে—আমার বয়সেরই কোন একটা ছোট্ট ছেলের হাত। একটু যখন এগিয়ে গেলাম—দেখি হাতটা আর নেই, তার বদলে কি সুন্দর ছোট সাদা উল দিয়ে বানানো একটা সাদা ভেড়া, রঙটা ফিকে হয়ে এসেছে। অমন সুন্দর খেলনা আমি জীবনে দেখিনি। বাড়ি ফিরে এসে আমার সবচেয়ে প্রিয় পাইন গাছের রসাল একটা ফল নিয়ে সেই গর্তে রেখে এসেছিলাম।

তারপর আর কোনদিনও সেই হাতটা দেখিনি। দেখিনি অমন সুন্দর সাদা উলে বোনা ভেড়া। কতদিনই তো কত খেলনার দোকানের পাশ দিয়ে যেতে যেতে ওই রকম একটা ভেড়া খুঁজেছি কিন্তু কই আর তো দেখিনি—বোধহয় অমন সুন্দর সাদা উলের বোনা ফিকে হয়ে যাওয়া ভেড়া আর কেউ তৈরি করে না।

শিল্পকলা আর বর্ষণ

দক্ষিণ আমেরিকার ঠাণ্ডা হাওয়া আর বৃষ্টি যেমন অসহ্য ঠিক তেমনই অসহ্য ছিল রোদ ঝলসানো গুমোট গরম। চারপাশে শুধু পাহাড়—পাহাড় আর পাহাড়। সমুদ্র দেখার জন্য মনটা আমার পাগল হয়ে উঠেছিল। সৌভাগ্যবশতঃ বাবা একদিন রাজী হয়ে গেলেন; ওঁর রেলের এক বন্ধু সমুদ্রের ধারে একটা বাড়িতে আমাদের ছুটি কাটাতে দিলেন।

ওঃ—যাওয়ার দিনটা ভুলবো না। কেন যে লোকে সকাল ৪টা বলে বুঝি না—মিশমিশে কালো অন্ধকার আকাশ—ওটাকে রাত্রি ৪টা বলাই ভাল। সেই ঠাণ্ডার রাত ৪টায় বাবা কনডাকটরের বাঁশি বাজিয়ে গোটা বাড়িকে জাগালেন। আমি, আমার মা ভাই রুডলফো আর বোন লরা—তাছাড়া চাকর, ঝি, রান্নার লোক—সব হৈ চৈ করে ওঠানো হল—বিছানাপত্তর রান্নার বাসন সব জড় হল। একেই তো আমি ছিলাম রুগ্ন, তার ওপর চোখে তন্দ্রা আর হাড়কাঁপানো শীত। গরীব মানুষের ছুটি কাটানো,

কাজেই সব কিছু সঙ্গে নিয়ে বেরুতে হয়—রান্না করার স্টোভ মায় তার সলতেটাও। সব কিছু গরুর গাড়িতে চাপিয়ে পেঁছিলাম রেল স্টেশনে।

ট্রেন ছুটে চললো টেমুকো আর কারাহউর বিরাট প্রান্তর দিয়ে, কনকনে ঠাণ্ডা কত না অজানা অচেনা জনমানবহীন ভূখণ্ডের ওপর দিয়ে—কত অদেখা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে—সদর্পে ঃ মনে হচ্ছিল চলমান এক ভূমিকম্প। আপেল গাছ আর লজ্জাবতী লতার সারি ভেদ করে মাঝে মাঝে একটা স্টেশনে থামে। আরাউকেনিয়ার সেই আদিবাসী যাঁরা সত্যিকারের চিলির মানুষ তাঁরা স্টেশনে-স্টেশনে কেউ ভেড়া কেউ ছোলা কেউ মুরগী বিক্রি করছেন। তাঁদের সঙ্গে একমাথা সাদা চুল নিয়ে আমার বাবা কি দর দস্তুরই না করতেন। অবশেষে কিনলেনও কিছু অবশ্য, একটা পয়সাও দাম কমাতে পারলেন না।

আমার সবচেয়ে ভালো লাগতো স্টেশনের নামগুলো। স্পেনীয়াদের আক্রমণে আরাউকেনিয়ার্র পরাজয় হলেও স্টেশনের নাম, গ্রামের নাম—চিলির সেই সুন্দর নামগুলো তাদের মর্যাদা হারায় নি। ল্যাব্রানুজা, ররওআ, রানকুইলকো নামগুলো কানে এলে বুনোফুলের গন্ধে আমার মন ভরে যেত, মনে হতো প্রতিটি শব্দ যেন একটি সঙ্গীতের স্বর। কোথাও কোন মধুভাণ্ড লুকিয়ে আছে। নয়তো ভাবতাম হয়তো বা কোন অজানা পাখির নাম।

এমনি করেই পেঁছিলাম নদীর ধারের শহরে। কালো ধোঁয়া ছেড়ে ঘণ্টা বাজিয়ে ট্রেনটা এসে থামলো। আকাশী নীল ইম্পিরিয়াল নদীর দিকে তাকিয়ে আমি সমুদ্রের ঘ্রাণ পেলাম—এই নদীই তো গিয়ে মিশেছে সমুদ্রে। সব জিনিসপত্তর গুছিয়ে লোকজনদের সব একসঙ্গে করে নৌকার পাশে গিয়ে পেঁছিলাম। বাবার তত্ত্বাবধান আর ট্রেনের বাঁশীর আওয়াজে মনে হল বাবার পরিচালনায় একটা চলচ্চিত্র শুরু হল। কোনরকমে গুড়িসুড়ি মেরে ছোট্ট নৌকাটায় জায়গা করে নিয়ে আমরা বসলাম নামমাত্র জায়গায়। নৌকার আসবাবপত্র আর সব কণ্টকে ছাপিয়ে আমার সামনে এসে বারবার উঁকি মারছিল আমার সেই কল্পনার সমুদ্র। সেই নৌকার মধ্যে মাঝে মাঝে একটা একরডিয়ানের সুর—কি অব্যক্ত রোমাঞ্চতেই না আমাকে ভরে তুলেছিল—মনে হচ্ছিল যেন কোন আবিষ্কারে বেরিয়েছি—এই আকাশী নীল নদী পেরিয়ে—এই দুপাশের অজানা ঘাট পেরিয়ে এক রহস্যময় সমুদ্রের সন্ধানে চলেছি।

ইম্পিরিয়াল নদীর শেষপ্রান্তে গুটি কয়েক বাড়ি নিয়ে ছোট্ট জায়গা তারই মধ্যে আমার বাবার বন্ধুর বাড়ি যেখানে আমরা গিয়ে উঠলাম। নদীর প্রান্তদেশে দাঁড়িয়ে দূরে শুনছিলাম সমুদ্রের গর্জন। মনে হচ্ছিল জীবনটা আমার ফুলে উঠে ডাঙ্গায় এসে আছড়ে ছড়িয়ে পড়ছে।

যে বাড়িটায় উঠেছিলাম তার মালিক ছিলেন কৃষক ডন হোরাসিও পেচিকো। তাঁর দিকে তাকিয়ে আমি কর্মঠ জীবনের প্রতিচ্ছবি দেখেছিলাম। সকাল থেকে মাঠে কাটিয়ে মাঝে মাঝে হাজির হতেন আমাদের তদারকি করতে। কি অসীম ক্ষমতার অধিকারী আর প্রাণবন্তই না ছিলেন মানুষটা।

গোটা বাড়িটাই আমার কাছে রহস্যময় মনে হতো। চারপাশে ছড়ানো আইভিলতা, বিরাট মাঠ বাগান জঙ্গল—দূর থেকে ভেসে-আসা সমুদ্রের গর্জন আর সমুদ্র থেকে উড়ে-

আসা এক একটা পাখি—এদেরই মধ্যে আমার কবিতা তার ভাষাকে খুঁজে ফিরেছে বারবার। আরেকটি জিনিস একটা লাইফবোট আমাকে মুগ্ধ করেছিল। কোন জাহাজ ভেঙে তীরে এসে সেই লাইফ বোটটা আটকেছিল—তার মধ্যে ছিল ছোট ছোট কুকুরের ছানা।

সেই অযত্নে বেড়ে ওঠা বাগানের মধ্যে হাজারো রঙের পপি গাছ। কোনটা শ্বেত ঘুঘুর মতো, কোনটা এক ফোঁটা রক্তের মতোই লাল, কোনটা আবার কালো পোশাক পরা বিধবার মতোই কালো। এমন পপির রূপ আমি আর কখনও দেখিনি। মাঝে মাঝে মনে হতো আমি বোধহয় কোন এক বিশাল প্রজাপতির দিকে তাকিয়ে আছি।

জীবনে যেদিন প্রথম সমুদ্র দেখলাম অভিভূত ও আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম। যেখান থেকে দাঁড়িয়ে সমুদ্রকে দেখলাম সেখানে কোন ঢেউ এসে আমার মাথার ওপর দিয়ে বয়ে যায়নি। কিন্তু সফেন সমুদ্রের সেই ঢেউ, সেই আছড়ে পড়া প্রতিবাদ ধ্বনি শুনে সেদিন আমার মনে হয়েছিলো আমি ধরিত্রীর হৃদস্পন্দন শুনছি।

সমুদ্রের ধারে বসে খাবার সময় যখন কিছু বালিও খেলাম তখন ভয় পাইনি। ভয় পেলাম যখন বাবা বললেন "চল এবার সমুদ্রে স্নান করতে যাই।" নামলাম সমুদ্রে, ছোটবোন লরার হাত ধরে সমুদ্রে নেমে মনে হল শত সহস্র হাত দিয়ে সমুদ্র আমাদের এবার শেষ করবে। শহীদ হয়ে মৃত্যু বরণের আগেই বাবা বাঁশী বাজিয়ে জানালেন—"আজকের মতো সমুদ্র স্নান শেষ।"

আরো একটি জিনিস আমাকে বিস্ময়াবিষ্ট করেছিল—ঘোড়া। অমন সুন্দর প্রকাণ্ড ঘোড়া আমি আর কোথাও দেখিনি। লাল সাদা মেশানো, অবর্ণনীয় ক্ষমতার অধিকারী। ওরা যখন হ্রেষারব তুলে ছুটে যেত মনে হতো সমুদ্রের আওয়াজ তুলে ভূমিকম্প এগিয়ে চলেছে। এরপর বহুবছর বাদে চীনদেশে গিয়ে পাথরে খোদাই করা অনেক সুন্দর সুন্দর ঘোড়া আমি দেখেছি। কিন্তু আমার শৈশবের স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে যেদিন সে ঘোড়াগুলো ইম্পিরিয়াল নদীর ধারে হ্রেষারব তুলে ছুটে গিয়েছিল আজও মনে হয় তার জোড়া আর কোথাও কোনদিনও দেখি নি। ওই ঘোড়াগুলো ছিল চিলির জীবনের সবকিছু। ওরা বয়ে নিয়ে যেত মানুষ, নিয়ে আসতো খাদ্য—অগম্য স্থান পেরিয়ে কখনও উপরে কখনও বা নীচে নেমে আসত—মাঝে মাঝে অসমতল গিরি গহ্বর পেরোবার সময় মনে হতো হয়তো বা তারা অথবা তাদের সওয়ার আর ফিরবে না— তারপর দিনের আলো মিলিয়ে যাওয়ার আগেই দেখতাম সওয়ার নিয়ে দুলতে দুলতে ফিরে আসছে তারা।

এরপর ফিরে গেছি শীতের শেষে—আবারো এসেছি গরমের শুরুতে। টেমুকোর এই হাড়কাঁপানো শীতে আর গরমে সমুদ্রের ধারে আচমকা কখন বড় হয়ে উঠেছি। এই সন্ধিক্ষণে প্রেমে পড়েছি কবিতা লিখেছি। আবার ঘোড়ায় চড়াও শিখেছি। ঘোড়ার পিঠে চড়ে যেতে যেতে অজানা পৃথিবীকে বার বার আবিষ্কার করেছি। অজানা বুনো ফুলের গন্ধ, নাম-না-জানা পাখির ডানার ঝটপটানি বনের মধ্যে থেকে পাহাড়ের ধার ঘেঁষে হঠাৎ বেরিয়ে আসা ফুলের গুচ্ছে ভরা ডাল—আমার সমস্ত শরীর আর মনে রোমাঞ্চ তুলেছে। এমনি করেই এই নিরন্তর জঙ্গল আর ফুলের গাছে ঢাকা পাহাড়ের মধ্যে আমার কবিতা কখন জানি না জন্ম নিয়ে আমার আত্মার

সঙ্গে মিশে গিয়েছে। সে তো, অনেক অনেক বছর আগের কথা কিন্তু তবু আজও মনে হয় সেই নির্জন প্রান্তর আর আমার আত্মা দুজনে মিলে আমার জীবন রহস্য উন্মোচন করেছে—আর আমার কবিতার বন্ধ দুয়ারকে খুলে দিয়েছে।

আমার প্রথম কবিতা

এখন আমি শোনাব পাখির গল্প। বুধি হ্রদে অত্যন্ত নির্মমভাবে রাজহাঁস মারা হতো। সমুদ্রের পাখি এ্যালবাট্রস যেমন আস্তে আস্তে ডানা মেলে সমুদ্রে বসে আবার আস্তে আস্তে ডানা মেলে উড়ে যায় রাজহাঁসের দলও তেমনি এই হ্রদেরধারে বসে, আবার ডানা তুলে উড়ে যাবার জন্যে যখন তৈরি হতো তখন ওদের ডানাদুটো ধরে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে মারা হতো।

একদিন একজন আমায় একটা অর্ধমৃত রাজহাঁস উপহার দিলেন। এমন চমৎকার পাখি আমি পৃথিবীর আর কোথাও দেখিনি—কালো লম্বা গ্রীবাওলা একটি রাজহাঁস, পিঠটা সাদা তুষার স্তূপের মতো। দেখে মনে হলো একটা সিল্কের মোজা দিয়ে ওর গলাটা টিপে ধরা হয়েছে—কমলা রঙের চঞ্চুর ওপরে লাল দুটি চোখ। প্রায় মৃত অবস্থায় ওকে আমি পেয়েছিলাম। কিছু রুটি আর মাছ চেষ্টা করেছিলাম ওকে খাওয়াতে। কিন্তু সবটুকুই ও উগরে বার করে দিল।

কয়েকটা দিন বাদে ও একটু সেরে উঠলো। মনে হলো ও যেন নদীর ধারে, হ্রদের পাড়ে ওর ঘরে ফেরার ইচ্ছায় অধীর হয়ে উঠেছে। একদিন কোলে তুলে ওকে নিয়ে নদীর ধারে এনে ছেড়ে দিলাম—দেখালাম নদীর ধারে ধারে মাছ আর নুড়ির সারি—যদি ও নিজেই তুলে এনে আবার খেতে পারে কিন্তু কি এক বিষন্ন দৃষ্টি নিয়ে ও তাকিয়ে রইলো নদীর মাঝখানটিতে। কুড়ি দিন ধরে প্রায় আমারই সমান লম্বা সেই হাঁসটিকে একবার বয়ে নিয়ে আসতাম বাড়িতে, আবার বাড়ি থেকে নদীর ধারে, তারপর ফিরে যেতাম বাড়িতে। এক অপরাহ্নে ওর চোখের দিকে তাকিয়ে মনে হল কি এক স্বপ্নে বিভোর আবিষ্ট ওর দৃষ্টি—সেদিন ও আমার কোন কথাই শুনলো না, একটা মাছও মুখে তুললো না। ওকে আমি তুলে নিলাম আমার বুকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্যে। কিন্তু যখন ওর গলাটা আমার কাঁধে রেখে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম মনে হলো জড়ানো একটা সিল্কের ফিতে হঠাৎ খুলে পড়লো আর মনে হলো একটা সুন্দর কালো হাত আমার গলাটায় একটু আদর করে নেমে গেল। দেখলাম সেই কালো সুন্দর লম্বা গ্রীবাটা লুটিয়ে পড়লো ওর প্রাণহীন দেহটার ওপর। সেইদিন জানলাম মৃত্যুর পর মরাল আর গান গায় না।

কত নিঃসঙ্গই না ছিল এই ছোট্ট বালক কবিটি। গরমের সময় আগুনের মতো হলকা উঠে আসত। জঙ্গলের মধ্যে ঘুরে বেড়াতাম, একলা, শুনতাম পাখির গান পকেটে ভর্তি করে রাখতাম পোকামাকড়, মুখে থাকত শুকনো খেজুরের টুকরো, কোন কোন সময়ে ছোট গাছের ডালে বসে অঙ্ক-খাতার পাতায় লিখতাম কবিতা। আস্তে আস্তে আমার ছোট্ট জীবনের দর্শন আর কবি সালাগিরি ও আরো অনেক বই আমায় দিয়েছিলো অসীম জীবন রহস্যের সন্ধান। গতরাত্রে যা যা পড়েছি তা ভুলতে

পারবো না—কত লক্ষ মাইল দূরে মালয়েশিয়ায় স্যান্ডোকান শুধু ফল খেয়ে রয়েছেন বা সেই 'বাফেলো বিল', যদিও তার রেডইণ্ডিয়ানদের মারাটা আমার মোটেই পছন্দ ছিল না—তবু সেই লাল ত্রিকোণ টুপি পরা লাল চামড়ার মানুষগুলো—তারা যে আমায় ডাকতো।

কবে কোনদিন কোথায় আমার প্রথম কবিতা লিখলাম, কবে জন্ম নিলো আমার মধ্যে কাব্যবোধ মনে করার চেষ্টা করি।

বহু ছোট বয়সে একদিন কয়েকটা শব্দ সাজিয়ে লিখে তাতে শুনতে চেয়েছিলাম কোন ছন্দের ধ্বনি। একটা কেমন যেন দুর্ভাবনা, একটা দুঃখ ভরা মানসিক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে সেই কটা কথা লিখেছিলাম একটি পরিষ্কার কাগজের টুকরোয়, যে কটি কথার ভাষা প্রতিদিনের লেখার ভাষা থেকে স্বতন্ত্র। এই কবিতাটি ছিলো সেই দেবদূতীসম আমার সৎমার উদ্দেশে লেখা। কিন্তু লেখাটা কেমন হল বলবে কে? ভাবলাম নিয়ে যাই বাবার কাছে। বাবা-মা তখন খাবার ঘরে কথাবার্তায় ব্যস্ত।

একটা উত্তেজনা নিয়ে ঢুকলাম সে ঘরে, মেলে ধরলাম আমার কবিতার টুকরোটুকু বাবার কাছে। বাবা অন্যমনস্কভাবে সেটা পড়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"কার কবিতা নকল করে লিখে এনেছ। এটুকু বলেই মার সঙ্গে কথা বলতে তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। সেই আমার প্রথম কবিতার জন্ম হল, কি হৃদয়হীন সমালোচনাই না সেদিন তাকে পেতে হয়েছিল।

তারপর থেকে আমি উটপাখির মতো মাটিতে মুখ রেখে শুধু পড়েছি। যা পেয়েছি তাই-ই পড়েছি। কি দিন কি রাত্রি শুধু বই বই আর বই। ইবসেন, ডন অগাস্টো কিছুই বাকি রাখিনি—ছোট আমার শহরে ছোট একটা লাইব্রেরী—তার যা কিছু সম্পদ আমি বয়ে নিয়ে এসেছি আমার মনে।

ঠিক এই সময়েই একজন লম্বা ভদ্রমহিলা যিনি আরো লম্বা জামা কাপড়ে ঢাকতেন দেহ আর উদ্ভট একটা জুতো পরতেন—নাম ছিল তাঁর গ্র্যাব্রিয়েলা মিস্ত্রাল—টেমুকোর মেয়েদের স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা হয়ে এলেন। আমি তাঁকে দেখতাম আমার বাড়ির সামনে দিয়ে স্কুলে যেতেন, ভয়ে কাঁপত আমার বুক। কিন্তু যেদিন তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হল—দেখলাম কি সুন্দর তিনি, আরাউকেনিয়ার আদিবাসীদের মতোই তাঁর দেহ। হাসলে সাদা দাঁতগুলো ঘরের সব অন্ধকার ঘুচিয়ে দিত। আমার বয়সানুযায়ী না ছিলেন তিনি আমার বন্ধু—তাছাড়া ছিল আমার লজ্জা, ছিলো ভয় যার জন্যে তাঁর কাছে আমি কোনদিনও পেঁছিতে পারিনি। যে কয়বার তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিলো তিনি আমায় যে কয়েকখানা বই পড়ার জন্যে দিয়েছিলেন তা সবই রাশিয়ার সাহিত্যিকদের। তিনিই আমায় দেখালেন তলস্তয়, ডস্টয়ভস্কি ও শেকভের পৃথিবী—সেই অন্ধকার বিষাদময় ভয়ংকর সত্য পৃথিবী যা আমার অন্তস্থলে গিয়ে পেঁছেছিল, যা আজও আমার সঙ্গেই রয়েছে।

তিন বিধবার গল্প

একবার আমার নিমন্ত্রণ এলো ধান মাড়াই দেখতে যাওয়ার। অনেক উঁচু পাহাড়ের একধারে একটা গ্রামে। ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে পড়লাম নিমন্ত্রণ রাখতে। সেই বুদি হ্রদের ধার ঘেঁষে চলেছি। মাঝে মাঝে ক্ষয়ে যাওয়া পাড়ের পাশে পাশে ঘোড়াটা প্রায় জলে ডোবে ডোবে এই উত্তেজনার মধ্যেই চলেছি। জলের রাস্তা পেরিয়ে মাটির রাস্তায় পড়লাম। এগিয়ে চলেছি, মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে চিলি ছাড়িয়ে চলেছি দক্ষিণ মেরুর দিকে। দক্ষিণ চিলির ফার্ণ গাছগুলি এতই লম্বা যে আমি যখন ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিলাম তখন তার পাতাগুলোও আমার গালে লাগছিল না। যখনই কোন পাতা আমার মুখ ছুঁয়েছে তখনই শিশিরের বিন্দু এসে পড়েছে আমার গালে। এমনি করেই এক সময় পথের প্রান্তে এসে পড়লাম। সামনেই চিলির সেই সমুদ্রের ধার গোটা চিলিকে ঘিরে রয়েছে—দেখলেই মনে হয় শনিগ্রহের অঙ্গুরীয় চিলির অঙ্গুলিতে। ঘন জঙ্গল একধারে, আরেক ধারে বিস্তৃত সমুদ্রের পাড়। একধারে উদ্বেলিত ফেনিল তরঙ্গমালা আরেক ধারে ঘন নীল, ভয় লাগান, লম্বা, ফার্ণগাছ ঢাকা জঙ্গল। এই জনমানবহীন প্রান্তরে এসে যখন পেঁছিলাম তখন সন্ধ্যা প্রায় সমাগত। লাল লম্বা লেজওলা শিয়ালের দল জঙ্গলের মধ্যে দৌড়ে পালাচ্ছে, মাঝে মাঝে একটা পাখি মাথার ওপর দিয়ে তীব্র আওয়াজ করে উড়ে যাচ্ছে—তাকালে দেখতে পাই বিরাট ঈগলের ঝাঁক।

হঠাৎ দূরে চোখে পড়ল কিছু মাছ ধরা জেলে সমুদ্রে মাছ ধরছে। এক একটা বিরাট সাদা মাছ খানিকক্ষণ ছটফট করে তারপর ওদের জালেই মারা পড়ছে। এইবার বুঝলাম আমি পথ হারিয়েছি। যে জঙ্গল—যে পথ এতক্ষণ আমায় মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছিল—তারা এখন আমার সামনে ভীতিপ্রদ হয়ে উঠল। হঠাৎ জঙ্গল থেকে আরেকজন ঘোড়সওয়ার আমার পাশ দিয়েই বেরিয়ে এসে আমার সঙ্গে চলতে লাগলেন, বুঝলাম ওঁরা সেইসব কৃষক যাঁরা জঙ্গলে কাজ করেন। ওঁকে বললাম আমার পথ হারানোর এবং ধান মাড়াই-এর নিমন্ত্রণের কথা।

উনি আমায় জানালেন—আমি সত্যিই পথ হারিয়েছি—এবং ধান মাড়াই-এর নিমন্ত্রণে আজ আর পেঁছিতে পারবো না। ভয় পেয়ে বললাম—"রাতটা কোথাও কাটাবার কি কোন ব্যবস্থা হতে পারে।" উনি বললেন—"এখান থেকে আরো দু'ক্রোশ এগুলে দুতলা একটা বাড়ি দেখা যাবে, আলো জানালা দিয়ে দেখা যায়।" জিজ্ঞাসা করলাম—"ওটা কি পান্থনিবাস—" উনি বললেন—"না না ওখানে তিনজন ফরাসী ভদ্রমহিলা আজ তিরিশ বছর ধরে রয়েছেন—কাঠের ব্যবসা করেন। ওঁরা খুবই অতিথিবৎসল—এবং গিয়ে জানালেই ওঁরা থাকা খাওয়ার সুন্দর ব্যবস্থা করে দেবেন।" ওঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি রওনা হলাম। আকাশে তখন কুমারী চাঁদ একটুকরো কাটা নখের মতো দেখা দিয়েছে।

ওই বাড়ির সামনে গিয়ে যখন পেঁছিলাম—তখন রাত প্রায় ন'টা বাজে। ঘোড়াটাকে বেড়ার ধারে বেঁধে সাদা থামওলা গেটটা পেরিয়ে—দরজায় গিয়ে আস্তে আস্তে টোকা দিলাম। অনেকক্ষণ কেটে গেল—তারপর মাথাভর্তি সাদাচুল নিয়ে একজন শীর্ণকায়া ভদ্রমহিলা দরজার কপাট খুলে ভৌতিক স্বরে আমায় জিজ্ঞাসা করলেন—

"কে তুমি ? কি চাও ?"

ভয়ে ভয়ে বললাম—"আমি একজন ছাত্র—হারনানদেজের খামারে ধান মাড়াই-এর নিমন্ত্রণ রাখতে গিয়ে পথ হারিয়ে ফেলেছি। একজন আমায় বললেন—আপনি ও আপনার বোনেরা নাকি অতিথিবৎসল—তাই রাত্রির আশ্রয়টুকু চাইছি, কাল ভোরেই আমি চলে যাবো।",

জবাব এলো—"নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই—এসো ভেতরে এসো। মনে কর এটা তোমারই বাড়ি।"

এগিয়ে চললাম বাড়ির ভেতরে। কেমন ভেজা স্যাঁতসেঁতে গন্ধ চারপাশে। ভদ্রমহিলা যেতে যেতে কয়েকটি সুন্দর মোমবাতি জ্বালাতে জ্বালাতে চললেন। সেগুলোর শিল্পনৈপুণ্য দেখার মতো। কালো পোশাকে সারা শরীরটা তাঁর ঢাকা—হালকা দেহ, আঙুলগুলোও দেখা যায় না—দেখা যায়না পায়ের পাতাটাও। সবকিছু মিলে আমার মনে হচ্ছিল—বুঝি হ্রদের তলায় ডুবে গিয়ে স্বপ্ন দেখছি।

ঠিক এই সময়েই আরো দু'জন মহিলা ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন—তিনজনকেই দেখতে প্রায় একরকম—তাঁরা আমায় ঘিরে বসলেন। প্রথমজন যিনি দরজা খুলে ছিলেন—তাঁর মতোই বিষাদাচ্ছন্ন একজনের দৃষ্টি—আরেকজনের দৃষ্টিতে মৃদু লাস্য।

ঘন অন্ধকার ভরা জঙ্গল—শেয়ালের ডাক ব্যাঙের ডাক রাতের পাখির গান। ওঁদের যখন বললাম আমি ছাত্র, পড়াশোনা করি এবং যখন ওঁদেরকে কিছুটা খুশী করার জন্যই জানালাম—আমি ব্যোদলেয়ারের কবিতার অনুবাদ করছি—তখনই কেমন হঠাৎ সব চুপ হয়ে গেল। তিনজন মহিলাই বিদ্যুৎগতিতে উঠে দাঁড়ালেন—তিনজনেরই সেই প্রাণহীন দৃষ্টি আর শক্ত চেহারাটার মধ্যে কি এক পরিবর্তন ঘটে গেল, মনে হল প্রাক্-ইতিহাস যুগের একটা মুখোশ খুলে আজকের যুগের একটা মানুষ বেরিয়ে এলো।

"ব্যোদলেয়ার"—আনন্দোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ওঁরা চীৎকার করে উঠলেন—। এই প্রথম এই জনমানবহীন জায়গায় তোমার গলায় ব্যোদলেয়ারের নাম শুনলাম—"মনে হচ্ছে আমাদের এই পৃথিবীতে এ নাম আর কেউ জানতো না। আমাদের কাছে 'ফ্ল্যর দ্যু মাল' বইটি রয়েছে। এই পাঁচশো কিলোমিটারের মধ্যে আর কেউ নেই যে এই বই পড়েছে বা পড়তে পারে—কারণ এরা তো ফরাসী ভাষা জানেনা।"

দুই বোন ফ্রান্সেই জন্মেছিলেন—আর একজন এই চিলিতে। বহুদিন আগেই ওঁদের বাবা-মা-ঠাকুর্দা-ঠাকুমা সবারই মৃত্যু হয়েছে। একবার মনে করেছিলেন ফ্রান্সে ফিরে যাবেন—কিন্তু চিলির এই জঙ্গল এই বৃষ্টি আর এই বাতাস—এদেরকে ছেড়ে আর যেতে পারেন নি। এই নির্জন, গহনবন ঘেরা পর্বতের সানুদেশই ওঁদের স্বদেশ হল।

খাবার ডাক এলো—খাবার ঘরে ঢুকেই চমকে গেলাম। কালো আবলুষ কাঠের

গোল টেবিলটার ওপরে সাদা ধবধবে চাদর ঢাকা। তার ওপরে রুপো আর দামী কাঁচের ঝাড়ের ভিতরে আর টেবিলের চারধার ঘিরে সারি সারি মোমবাতি জ্বলছে—মনে হলো কোন স্বপ্নপুরীতে এসেছি। সলজ্জ ভীরুতায় আমি আড়ষ্ট হয়ে গেলাম—মনে হলো মহারানী ভিক্টোরিয়া বুঝি আজ রাত্রে আমায় নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন। যে টেবিলে রাজকুমার বসে খাবেন—সেখানে এই পরিশ্রান্ত ধূলিধূসরিত লোকটি বসবে কি করে? ওঁদের কাছে আমি তো ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ান।

এমন খাবার আমি জীবনে খাইনি। প্রতিটি খাবার স্বাদে গন্ধে ভরা—এমন পেট ভরেও কখনও খাইনি। ওঁদের কথায় জানলাম প্রতিটি খাবার ফ্রান্সের নাম করা খাবার—এবং এই খাবার তৈরি করাই ওঁদের আনন্দ। সারাটা দিন ধরে এই তিন বোন ফ্রান্সের নানান খাবার আর মদ তৈরি করেন। আর এই খাবার ঘরের টেবিলটিও তাঁদের গর্বের বস্তু। ফ্রান্স থেকে আনা এই টেবিল তাঁদের বংশমর্যাদার কথা মনে করিয়ে দেয়। এমনি করেই চিলির এই জঙ্গলে—ওঁরা ফ্রান্সকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। একটা বহু পুরনো মদের পাত্র আমার টেবিলে ওঁরা এনে দিলেন।

হাসতে হাসতে ওঁরা আমায় অদ্ভুত একটা কাঠের বাক্স দেখালেন। তার ভেতরে অনেকগুলো কাগজের কার্ড—যার মধ্যে অনেকের নাম ঠিকানা সই করে লেখা রয়েছে। গত ত্রিশ বছর ধরে যারা এই বাড়িতে এসে আতিথ্য গ্রহণ করেছেন এটা তাঁদেরই একটা নামের তালিকা। কেউ এসেছেন পথ হারিয়ে—কেউ এসেছেন এমনিই—আবার কেউ এসেছেন এঁদের নাম শুনে।

আমরা তিনবোনই পাগল—বললেন ছোট বোন।

প্রতিটি কার্ডে নাম ধাম, কে কবে কোন সময়ে এসেছেন—এবং সেদিন টেবিলে কি কি পদ রান্না হয়েছিল—সব লেখা আছে।

আমরা খাবার মেনু লিখে রেখেছি—কারণ যদি কোনদিন এঁদের মধ্যে কেউ আবার আসেন—তাহলে তাঁদের যেন আবার একই রান্না খেতে না হয়।

পরের দিন ভোর না হতেই ওঁদের ঘুম থেকে না জাগিয়েই রওনা হলাম। একবার মনে হয়েছিল বিদায় সম্ভাষণটা জানিয়ে যাই। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হলো—গত রাত্রের যে যাদুকরী স্বপ্নে মনটা আমার এখনও আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে সে স্বপ্নটুকু নিয়েই চলে যাই।

আজ থেকে পঁয়তাল্লিশ বছর আগে—যখন সবে যৌবরাজ্যে প্রবেশ করেছি সেদিনের সেই ঘটনা—সেই তিন অতিথিবৎসল, নিঃসঙ্গ বৃদ্ধা আজও আমায় ঘিরে রয়েছেন। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে সেই বাড়ি—সেই চমৎকার খাবার টেবিল ঘিরে মোমবাতির সারি—সে সব কি এখন তেমনিই রয়েছে? কি হল তাদের?

হয়ত মৃত্যুর বিস্মৃতির মধ্যেই তাঁদের অবলুপ্তি ঘটেছে। হয়ত সেই আগ্রাসী ঘন জঙ্গল এতদিনে তাঁদের গ্রাস করেছে—সেখানকার একটি রাত আমার স্মৃতিতে আজও সমুজ্জ্বল। তিনজন উদারহৃদয় অতিথিপরায়ণ বৃদ্ধা ফরাসী মহিলা সেই পর্বতঘেরা ঘন জঙ্গলের একটি কোণে নিঃসঙ্গ জীবনের মধ্যেও তাঁদের ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন।

দুপুরের আগেই হারানানদেজের খামারে পেঁছে গেলাম। রাত্রের বিশ্রাম আর খাদ্য আমাকে উজ্জ্বল, সজীব রেখেছিল।

গম-বার্লি-যব সবই তখন ঘোটকীরাই মাড়াই করত—যখন সওয়ারের চীৎকারে ঘোটকীরা ঘুরে ঘুরে মাড়াই করে তখনকার মতো আনন্দঘন মুহূর্ত খুবই কম দেখা যায়! সূর্যের আলোয়—হীরের মতো চমকানো পাহাড়ের ধারে এই গম-ধান-মাড়াই দেখার মতো জিনিস। হলুদ খড়ের স্তূপ সোনার পাহাড়ের মতো চারধারে জমছে চারপাশে মানুষের ছোটাছুটি—ছোট বাচচাদের চীৎকার আর কান্না—রান্নাঘরে মেয়েরা ভোজসভার আয়োজনে ব্যস্ত—মাঝে মাঝে একজন ছুটে এসে ঘোটকীর প্রায় পায়ের তলা থেকে দুরন্ত ছোট্ট বাচচাটিকে তুলে নেয়—এ যেন এক মহোৎসবের আয়োজন চলেছে গ্রামের চারপাশ জুড়ে।

হারনানদেজরা এক অপূর্ব জাত। মুখভর্তি দাড়ি আর গোঁফ—মাথাভর্তি চুল—সারা গায়ে তেল—কালি আর ধুলো—কোমরে বাঁধা পিস্তল—বাপ ছেলে আত্মীয় স্বজন সবাইকেই প্রায় একরকম দেখতে—মাড়াই মেসিনের ওপর বসে সবাই-ই প্রায় নিশ্চুপ। ওরা কথা কয়—আমোদে মত্ত হয়ে গালি-গালাজ-খিস্তি সবই তখন চলে—একমাত্র মাতাল অবস্থায়, শুরু হয় নিজেদের মধ্যে লড়াই—সমুদ্রের ঘূর্ণিঝড়ের মতোই ওদের রাগ—সামনে যা পায় তাই ভেঙে গুঁড়িয়ে চলে যায়। মাংস সেঁকা হলে ওরা দৌড়ে যায় আগে কে কোন্ ভাগটা নেবে, তখন কোমরের পিস্তল সরিয়ে রাখে—খেতে খেতে হাতে তুলে নেয় গীটার। সীমান্তের লোক এরা—অপরূপ মাংসল শক্ত—শরীরের মধ্যে অসম্ভব এদের ক্ষমতা। কেন জানিনা সেদিনের নিমন্ত্রণে এরা আমায় কি যত্ন —কি ভালোবাসাই না দেখিয়েছিল।

নাচ গান আর খাওয়ার পর এলো শোবার সময়। তখন সবাই সারাদিনের খাটুনির শেষে ক্লান্ত। বিবাহিত ও কুমারী মেয়েরা শুলেন তাঁবুর মধ্যে. বড় বড় মোটা কাগজের টুকরো দিয়ে বানানো তাঁবু—আর ছেলেরা শুতে গেলেন পাহাড়প্রমাণ খড়ের পাশে, মাড়াই করা মাটিতে।

এই নতুন অনভ্যস্ত শোয়ার ব্যবস্থায় আমি ছিলাম অপ্রস্তুত। জড় করা একটা বিরাট খড়ের শেষে কিছু খড় দিয়ে জুতোটাকে ঢেকে করলাম আমার মাথার বালিশ—জামা কাপড় খুলে পরে নিলাম একটা পঞ্চো—তারপর কোনরকমে পা-টা একটু ছড়িয়ে শুয়ে পড়লাম—খোলা আকাশের নিচে খড়ের পর্বতের পাশে। চোখে আমার ঘুম আসছিলো না—ততক্ষণে আর সবাই ঘুমে অসাড়—নাক ডাকার আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছিল—একই সঙ্গে যেন সবাই তাদের নাক একই সুরে ডাকিয়ে চলেছেন।

পা ছড়িয়ে সারা শরীর খড়ে ঢেকে চোখ খুলে শুয়েছিলাম। পরিষ্কার কালো আকাশ—চাঁদ নেই, যেন বৃষ্টির জলে ধোওয়া পরিষ্কার তারার দল, কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম—হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল—কে যেন আস্তে আস্তে আমার বিছানার দিকে

এগিয়ে আসছে। ভয় পেলাম। আস্তে আস্তে সে আরো কাছে সরে এলো। খড়ের মধ্যে মাঝে মাঝে একটা খসখসে আওয়াজ তুলে—একটা মানুষের ছায়া খুব সন্তর্পনে আমার বিছানার দিকে এগিয়ে আসছে। আমার সমস্ত শরীরটা ভয়-উত্তেজনায় কাঠের মত শক্ত হয়ে উঠেছিলো—মনে হ'ল চীৎকার করে উঠি—গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোলো না—চুপ করে পড়ে রইলাম—ততক্ষণে একটা ভারী নিঃশ্বাস আমার কপালে এসে পড়েছে।

হঠাৎ একটা শক্ত কর্কশ হাত আমার শরীরটাকে ছুঁলো—। মুখ-গলা-পেট দিয়ে নেমে এসে আমার শরীরটায় তার আঙ্গুলগুলো খেলা শুরু করে দিল। বুঝলাম একটি নারীদেহ আমায় জড়িয়ে ধরেছে—আমার মুখের ওপর তার মুখ নেমে এসে আমার দুটো ঠোঁটকেই গ্রাস করেছে ; সারা শরীরটা দিয়ে আমার শরীরটা জড়িয়ে ধরে পায়ের মধ্যে পা দুটো ঢুকিয়ে দিয়েছে।

আস্তে আস্তে ভয়ের বদলে গভীর উত্তেজনা আর একটি অবর্ণনীয় আনন্দানুভবে আমি ডুবে গেলাম। আমার আঙুল দিয়ে ওর গাল-গ্রীবা স্পর্শ করলাম। ছোট্ট কুকুর ছানার মতো নরম তুলতুলে ওর বোজা চোখের পাপড়িটা আমার আঙুলে ঠেকলো।

ওর জামা কাপড়ের তলায় হাত ঢুকিয়ে সুন্দর সুদৃঢ় স্তনে হাত দিলাম—ভরাট নিতম্বটি স্পর্শ করলাম—যে পা দুটো দিয়ে ও আমায় চেপে রেখেছিল—তারই মধ্য দিয়ে আঙুল বাড়িয়ে স্পর্শ করলাম—পর্বতের মতোই ঘন ওর যৌন কেশ। সেই অপরিচিতার মুখ থেকে শুধু ঘন নিঃশ্বাস ছাড়া আর কোন আওয়াজই আমি সেদিন শুনি নি।

পর্বতপ্রমাণ খড়ের গাদার চারপাশ ঘিরে শুয়ে থাকা মানুষের মধ্যে কোন শব্দ না করে সম্ভোগের আনন্দ পাওয়া কি যে কঠিন—তা বোঝানো শক্ত। এই বুঝি কেউ জেগে উঠলো—এই বুঝি কেউ শুনে ফেললো—তবু তারই মধ্যে অতি সন্তর্পনে অতি যত্নে আমরা আমাদের আনন্দঘন রতিলীলা শেষ করলাম। পরক্ষণেই ও আমার পাশে ঘুমিয়ে পড়লো। ভয় হ'ল যদি সকালে উঠে কেউ আমার পাশে শুয়ে থাকা এই নগ্ন নারীদেহটিকে দেখে ফেলে। রাত তো প্রায় শেষ হয়ে এলো। এক ভয়ংকর ভয় আর চরম উত্তেজনায় কখন যে আমিও ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বুঝতে পারিনি। পাখির ডাকে ঘুম ভাঙতেই পাশের উষ্ণ খালি জায়গাটা হাতে ঠেকলো। এদিকে ভোরের আলো আর আওয়াজে সবাই তখন জেগে উঠে কাজে নেমেছে—আর একটা ধান মাড়াই এর দিনের জন্যে। দুপুরে খাওয়ার সময় সবাই আবার একসঙ্গে জড় হলেন। ভাঙ্গা কাঠের একটা লম্বা টেবিলের চারপাশে আমরা বসলাম খেতে। আমার দৃষ্টি তখন খুঁজে বেড়াচ্ছে গতরাত্রের সেই অপরিচিতা অভিসারিকাকে। কিন্তু কোন মেয়েকেই দেখে সে বলে মনে হচ্ছিল না—কেউ বৃদ্ধা—কেউ কেউ খুবই ছোট—কেউ বা আবার সার্ডিন মাছের মতই কৃশকায়া। একটি সুঠাম তরুণীকে ভালো করে দেখছি, ঠিক এই সময়েই হঠাৎ আর একটি তরুণী এসে তার স্বামীর প্লেটে একটুকরো মাংস দিয়ে গেলেন। যাবার সময় তাকাতেই আমার চোখে তাঁর চোখ পড়লো। সুন্দরী সুঠাম সেই তরুণীর চোখে দেখলাম গতরাত্রের আকুলতা—এই তো তাকে তো দেখতে পেয়েছি—এই কথাটি মনে আসতেই স্মিত একটা হাসি তার ঠোঁটের কোণেমিলিয়ে গেল—। মনে হল সেই হাসিটুকু বাড়তে বাড়তে গভীর হয়ে আমার সমস্ত সত্তা ভেদ করে শরীরের মধ্যে বিলীন হয়ে গেল।

শহরে নিরুদ্দেশ

অবসর কক্ষ

বেশ কয়েকটা বছর স্কুলে অংকের সঙ্গে সংগ্রাম চালিয়ে বাহ্যিকভাবে মনে হলো এবার আমি সন্তাগিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবার যোগ্যতা অর্জন করেছি। বাহ্যিকভাবে বললাম—এইজন্য যে আমার ভিতরের সাহিত্য-স্বপ্ন আর কবিতা মৌমাছি-গুঞ্জনের মতোই মত্ত।

একদিন সকালে ট্রাংকে জামাকাপড় বইপত্তর ভর্তি করে উঠে বসলাম সান্তাগিয়োর ট্রেনে। কবিদের মতো কালো কোট গায়ে—ছুরির মতো শীর্ণ দেহ নিয়ে উঠে বসলাম তৃতীয় শ্রেণীর কামরায়—সারা দিন রাত ধরে ট্রেন ছুটে চললো। তৃতীয় শ্রেণীর কামরা ভর্তি মানুষের দল আমায় বিস্ময়ে অভিভূত করে রেখেছিল। ঝুড়ি ভর্তি মুরগী হাতে—ভিজে পঞ্চো গায়ে কৃষকের দল—মুখ চাপা আদিবাসীদের দল—একটি গোটা জীবনকে মেলে ধরল তৃতীয় শ্রেণীর কামরাটার মধ্যে। বিনা টিকিটের যাত্রীর অভাব ছিল না—তারা সবাই আসনের নীচে লুকিয়ে ছিলো; যেমনি টিকিট চেকার কামরায় ঢুকছে অমনি হৈ হৈ পড়ে যাচ্ছিল। কেউ এখানে কেউ ওখানে

পালাতে ব্যস্ত, কেউ বা আবার লম্বা পণ্ডোটা মাথার ওপর তুলে ধরছে আর তাকে ঘিরে দুজন তাস খেলতে বসে যাচ্ছে টিকিট চেকারের দৃষ্টি এড়াতে।

আশপাশের গ্রাম জঙ্গল ছাড়িয়ে ওক গাছের সারির মধ্য দিয়ে ট্রেনটি যখন ধীরে ধীরে শহরের প্রান্তে ধুলোয় ঢাকা বাড়িগুলোর কাছ দিয়ে এগুচ্ছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে মনে হল আমি আমার জগৎটা ছেড়ে এলাম। এরপর অনেকবারই শহর আর গ্রাম জঙ্গলের মধ্যে ট্রেনে যাওয়া আসা করেছি কিন্তু জঙ্গল আর সারি বন্ধ গাছের সারি মা-এর মতো আমায় ঈশারা করে তার কাছে ফিরে যেতে বলেছে—। শহরের বড় বাড়ি আর তার ইতিহাস আমার কাছে সব সময়ই মনে হয়েছে—মাকড়সার জালের মতো কেমন যেন নিঃসঙ্গ ও বিচ্ছিন্ন। আজও আমি সেই জঙ্গলেরই কবি—সেই গ্রামের কবি যে গ্রামকে সেদিন ছেড়ে এসেছিলাম।

৫১৩ নং মারুবী স্ট্রীটের বাড়িটার ৫১৩ নম্বর আজও আমার মনে গেঁথে বসে রয়েছে। ওই নম্বর আমি কোনদিনও ভুলতে পারবো না। বিরাট শহরের নানান্ গলি খুঁজি আর উত্তেজনার মধ্যে পাছে কোনদিন আমি বাড়িটা হারিয়ে ফেলি তাই ৫১৩ নং টা মনের মধ্যে এঁকে রেখেছিলাম। সবুজ আর লাল আভায় আচ্ছন্ন মেঘের ফাঁকে জ্বলন্ত আকাশের নীচে দূরে দাঁড়ানো সারিবন্ধ বাড়ির নিঃসঙ্গ ছাদগুলোর ফাঁক দিয়ে আমি শহরে অপরাহ্নের মৃত্যু দেখতাম বাড়িটার বারান্দায় বসে।

তখনকার দিনে একটি ছাত্রের পক্ষে বাড়ি ভাড়া করে পড়াশোনা করা এবং কবিতা লেখার মানে ছিলো অনশন। কাজেই যতটা খাওয়া জুটতো তার চেয়েও লিখতাম অনেক অনেক বেশি। কয়েকজন কবিকে দেখেছিলাম দারিদ্র্য আর অনশনে ভেঙে পড়তো। এদেরই মধ্যে একজন ছিলেন রোমি ও মুর্গা। আমার চেয়েও লাজুক কবি যার ছন্দোবন্ধ কবিতা যেখানেই শোনা যেত মনে আসত একটা ঐশ্বরিক অনুভূতি।

একবার আমি ও রোমিও মুর্গা গিয়েছিলাম সেণ্ট বার্নাড শহরে কবিতা পড়তে। আমরা স্টেজে ওঠার আগে দেখলাম সমস্ত দর্শকের মাতামাতি শুরু হ'ল, ব্যাণ্ড বাদ্য আর তারই মধ্যে ফুলপরীর মুকুট পরানো হল এক সুন্দরীর মাথায়—শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা ছোটালেন বক্তৃতার আতশবাজি। তারপর এল আমাদের কবিতা পড়ার পালা। আমি উঠে আমার কর্কশ গলায় সুরু করলাম কবিতা পড়তে। নিমেষেই সব বদলে গেল। শুরু হল দর্শকের সোচ্চার সমালোচনা আর কাশি—আমার দুঃখ ভরা কবিতায় ওঁরা হেসে উঠলেন। বর্বরদের এই ব্যবহারে আমি কোনরকমে তাড়াতাড়ি আমার কবিতা পাঠ শেষ করে স্টেজ থেকে নেমে এলাম। রোমিও মুর্গা এসে দাঁড়ালেন স্টেজে। ৬ ফিট লম্বা মানুষটা—ছিন্ন বেশভূষা—আমার চেয়েও কর্কশস্বরে শুরু করলেন তাঁর কবিতা পড়তে। শ্রোতারা ও দর্শকেরা এবার ফেটে পড়লেন রাগে আর ঘৃণায়। চেঁচিয়ে উঠলেন—"নেমে যাও স্টেজ থেকে নেমে যাও—যতসব ভিখিরি কবির দল—আমাদের আনন্দ উৎসব নষ্ট করার কোন অধিকার নেই তোমাদের।

শম্বুক যেমন খোলস ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে তেমনি করে একদিন আমি মারুবী স্ট্রীটের বাড়িটা ছেড়ে বেরিয়ে এলাম—যে রাস্তাটা প্রতিদিন শুধু বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া আর কোন রাস্তাই আমায় চিনতে দেয় নি তাকে ছাড়লাম। জানতাম আমার এই

দুঃসাহসিক অভিযান হয়তো আমার অন্নসমস্যা বাড়িয়ে দেবে। এতদিন যে বাড়িটায় ছিলাম তার গৃহকর্ত্রী আমারই গ্রামের লোক। খিদের সময় মাঝে মাঝে তবু একটা আলু একটা পেঁয়াজ কৃপা করে দিতেন। কিন্তু পারলাম না—জীবন সম্মান প্রেম আর স্বাধীনতা আমায় ডাক দিলো।

এবার যেখানে এসে ঘর ভাড়া করে উঠলাম সেই রাস্তাটার নাম আরন্তয়েলি স্ট্রীট। রাস্তা দিয়ে গেলেই দেখা যেত একটা বোর্ডে "ঘরভাড়া" লেখাটি ঝুলছে। সামনের দিকে থাকতেন বাড়িওলা, কাঁচাপাকা চুলে মাথাটি ভর্তি, কিন্তু চোখের দৃষ্টিটা আমার কাছে কেমন অদ্ভুত ঠেকতো। আগে কাজ করতেন মেয়েদের কেশবিন্যাসের দোকানে ছেড়ে দিয়েছেন। এখন তাঁর কৌতূহল পৃথিবীর বাইরে কি আছে জানার জন্য।

টেমুকো থেকে আনা বাক্স থেকে বইপত্তর জামাকাপড় বার করে খাটে পা মেলে শুয়ে অনুভব করলাম স্বাধীনতার জন্য গর্ব।

বাড়িটাতে কোন খোলা বারান্দা বা ছাদ ছিল না, ছিল শুধু একটা লম্বা বারান্দা ভর্তি সারি সারি ঘর। পরের দিন সকালে বাড়িটার আনাচ কানাচ দেখা শুরু করলাম। কিন্তু যে জিনিসটা আমায় চিন্তিত করে তুললো সেটা হচ্ছে বাড়ি ঘর এমনকি স্নান ঘরের প্রতিটি দেওয়ালে লেখা—"সব ছেড়ে দাও—আমাদের তুমি স্পর্শ করতে পারবে না—তুমি মৃত।" ভয় পাওয়ানো এই কথায় প্রতিটি ঘর খাবার ঘর এমনকি ছোট্ট বসার ঘরও ভর্তি।

এই সময়ই এলো সান্তাগিয়োর সেই রূঢ় কর্কশ শীতকাল। স্পেনীয় উপনিবেশের সময় থেকেই আমার দেশ কঠোরা—এই প্রকৃতির আঘাত হয় সহ্য করেছে নয়তো গায়ে মাখেনি। (হঠাৎ মনে পড়লো প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে ইলিয়া আইরেন বার্গ যিনি সদ্য তুষার ঢাকা মস্কোর রাস্তা থেকে ফিরেছেন আমায় বলেছিলেন "চিলির এই শীত এই ঠাণ্ডা মস্কোকেও হার মানায়। শীতেসাদা কাঁচের জানালাগুলো নীলাভ রাস্তার ধারের গাছগুলো তীব্র শীতে কাঁপছে। ঘোড়ায়টানা গাড়ির ঘোড়াগুলো নাক মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আস্তে আস্তে চলেছে। এইরকম আবহাওয়ায় ভুতুড়ে বাড়িটার মধ্যে বসে থাকা যে কি কষ্টকর তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিলাম।

কফির টেবিলে বসে কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে বাড়িওলা বলতে লাগলেন "জান—কেন সারা বাড়ি জুড়ে আমি এইসব বিজ্ঞপ্তি লিখে রেখেছি। আজ চার মাস হলো আমার স্ত্রী 'চেরিত্যো' মারা গেছে। আমরা তাকে না দেখলেও সে আমাদের দেখছে।? আমি ওকে জানাতে চাই আমিও ওকে দেখতে পাচ্ছি—বোঝাতে চাই যে আজ ও মৃত তাই চারপাশের দেওয়ালে এই লেখা।

বাড়িওলা বুঝতে পেরেছিলেন যে আমি ওঁর চেয়েও চালাক। কাজেই ভৌতিক রহস্যবাদ বিশ্বাসী এই ভদ্রলোক সবসময় নজরে রাখতেন আমার ঘরে কারা কারা আসা যাওয়া করছে বিশেষ করে মহিলা অতিথিরা। আমি না থাকলে আমার ঘরে ঢুকে আমার সামান্য কটা আসবাব ট্রাংক, চিঠি ইত্যাদি নিয়ে নাড়াচাড়া করে আমার গোপন জীবন সম্বন্ধে কৌতূহল দেখাতেন।

বুঝতে পারলাম এখানে আর থাকা যাবে না। আমার অতি প্রিয় স্বাধীনতা এখানে বিপন্ন। তীব্র শীতের মধ্যেই বেরিয়ে পড়লাম বাসাবাড়ির খোঁজে।

একটা ধোপাখানার ওপরে একটা ঘর পেলাম। বড় উঁচু ছাদওলা ঘর—মাঝখান দিয়ে নেমে এসেছে একটা বিরাট বরগা। আশেপাশে একটু ক্ষয়িষ্ণু বাগান—তার মাঝখানে হাজামজা প্রায় শুকনোঝর্ণাটার নীচে শ্যাওলা জমে সবুজ ছোট্টএকটি গালিচা পেতেছে। এই ঘরেই বাসা বাঁধলাম।

আমাদের ছাত্র কবিদের জীবন ছিল বড় উদ্দাম। সারাদিন ধরে নিজেই ঘন ঘন চা তৈরি করছি—তারই মধ্যে কবিতা লেখা, কিন্তু এর বাইরে সরাইখানায় যখন সাহিত্যিকরা জড় হতেন মদের গ্লাস হাতে—তখন মনে হত জীবনটা কি প্রচণ্ড আলোড়নে ভরা—সেই জীবন আমাকে মোহগ্রস্ত করে রেখেছিল। আমার পড়াশোনার খুবই ক্ষতি হতে লাগলো।

রেল থেকে মাথায় পরার জন্যে বাবাকে ধূসর রঙের একটা ফেল্টের হাতাহীন কোট বা কেপ দিয়েছিলো। বাবা পরতেন না দেখে আমি সেটা নিয়ে এসেছিলাম। প্রায়ই আমাদের আড্ডায় এই কেপ পরে যেতাম। আমার দেখাদেখি অনেক কবিই তখন ফেল্টের কেপ পরতে আরম্ভ করেছিলেন।

চিলিতে তখন "ট্যাঙ্গো" নাচের আমদানি হয়েছে। এ্যাকর্ডিয়ান আর গীটার হাতে উদ্দাম তালে চিলির যুবক যুবতীরা সরাইখানায় ট্যাঙ্গো নাচে ব্যস্ত। এদের মধ্যে অনেকেই ছিলো মস্তান, আমাদের এই জীবন, কবিতা ও দৃষ্টিভঙ্গি পছন্দ করতো না—পছন্দ করতো না আমাদের ফেল্টের কেপ। প্রায়ই তারা নানান্ অছিলায় আমাদের পিছনে লাগতো। আমরা ক'জন কবি কোনরকমে ওদের সঙ্গে লড়াই করে বাঁচার চেষ্টা করতাম।

ঠিক এই সময়েই এক বিধবা ভদ্রমহিলার সঙ্গে আমার আলাপ হল—চিরকালের জন্যে তিনি আমার মনে স্থান পেয়েছিলেন। ইনি একজন মৃত ঔপন্যাসিকের স্ত্রী। স্বামী যক্ষ্মায় মারা যান। শোনা যেত তিনিও ছিলেন তাঁর স্ত্রীর মতোই সুন্দর সুঠাম। ভদ্রমহিলার চুলগুলো সোনালী গমের মতো আর সমুদ্রের মতো নীল তাঁর চোখ। লম্বা শরীরটা ভরাট। অদ্ভুত ভালবাসতেন স্বামীকে এবং বোঝাই যেত দু'জনে ছিলেন খুবই নিবিড় ও সুখী দম্পতি। কোনমতেই মৃত স্বামীর কথা ভুলতে পারতেন না।

অনেকদিন আলাপের পরেও ভদ্রমহিলার কালো পোশাকটিকে আমি একটুও আলগা করতে পারিনি—শোকার্ত অঙ্গুরীয়ের মতো তাঁর আপেলসদৃশ দেহটাকে ঘিরে রেখেছিল পোশাকটা। তারপর একদিন সময় এল—আমার ঘরে ধোলাইখানার পিছনে ওই আপেল ফলের খোলসটা ছাড়িয়ে শরীরটাকে স্পর্শ করার যখন চরম মুহূর্ত এলো হঠাৎ দেখি ওঁর চোখ দুটো বোজা, অশ্রুভরা, অস্ফুট স্বরে দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে বলে চলেছেন—"ওঃ ওঃ রবার্তো রবার্তো।" সেদিন ওঁকে দেখে আমার মনে হয়েছিল অক্ষতযোনি চিরকুমারী এক সন্ন্যাসিনী আত্মসমর্পণের আগে বিদেহী ঈশ্বরকে মিনতি জানাচ্ছেন।

আমার যৌবন, আমার ক্ষুধা সত্ত্বেও এই বিধবা ভদ্রমহিলা আমায় পরিশ্রান্ত করে ফেলেছিলেন। তাঁর সাহস ও মিনতি ভরা আহ্বান আস্তে আস্তে আমায় অকাল বিনাশের দিকে ঠেলে দিচ্ছিল। অত্যধিক প্রেম অপুষ্টির পক্ষে ভাল নয়। অপুষ্টি আমার সারা শরীরে নাটকীয়ভাবে আত্ম প্রকাশ করছিল।

লজ্জা

আমার জীবনের প্রথমটা কেটেছে একটা বোবা কালা মানুষের মতো। বিগত শতাব্দীর কবিদের মতো কালো পোশাক গায়ে চাপিয়ে যখন রাস্তায় বেরুতাম—খুব খারাপ আমায় দেখাতো না। কিন্তু কেন জানিনা মেয়েদের দেখলেই আমি কেমন লজ্জা পেতাম—কথা বলতে গেলে আরক্ত হয়ে উঠতো আমার গাল, কণ্ঠস্বর যেত ভেঙে। কাজেই সব সময় ওদের এড়িয়ে চলতাম। ওদের সম্বন্ধে একটা অজানা রহস্যবোধে আমার মন ভরে থাকতো। মনে হত সেই গোপন অগ্নিতে পুড়ে যাই, দুর্জ্ঞেয় কূপের গভীর জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ি। সে সাহস নেই তাই মন্ত্রমুগ্ধের মতো আশেপাশে ঘোরাফেরা করতাম কিন্তু চোখ তুলে তাকানো বা একটু স্মিত হাসির ক্ষমতাও আমার হত না।

আমার চেয়ে বয়সে বড় হলেও এই লজ্জা আমায় ঘিরে রাখত। বড়রা তাঁদের স্ত্রীদের সম্বোধন করতেন 'মনোরা' বলে কারণ মধ্যবিত্তরা 'সুজের'—সম্বোধনে (যেটা ছিল নিম্ন সমাজের স্ত্রীদের জন্যে) আপত্তি করতেন। আগের দিন রাত্রে হয়ত এঁদের সঙ্গে খাওয়া দাওয়া করেছি কিন্তু পরদিন সকালে দেখলে আমি পাশ কাটিয়ে চলে যেতাম।

লজ্জা হচ্ছে আত্মায় একটা বিশেষ শ্রেণীর মোচড়ের মতো যা একাকীত্বের মাপ বাড়িয়ে দেয়। তাছাড়া এ হচ্ছে জন্মগত এক ধরনের যন্ত্রণা। শরীরের ওপর যেন দুটো ত্বক—যে ত্বকটা তলায় রয়েছে সে বিদ্রোহ ঘোষণা করে জীবনের কাছে পরাজিত, সংকুচিত। যে সব গুণের সংমিশ্রণে মানুষ তৈরি হয় তার মধ্যে লজ্জা হচ্ছে একটা নিম্নশ্রেণীর খাদ—যার ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে জীবনের অনন্তকাল।

আমার এই স্যাঁতস্যাঁতে ধীর গতি—নিজের মধ্যে নিজেকে পিছিয়ে আনা বহুকালই আমার মধ্যে ছিলো। পরে যখন শহরে গিয়েছি অনেক মহিলা ও পুরুষের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। যাঁরা আমাকে পাত্তা দিতেন না তাঁদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা বরং আমার পক্ষে সহজ ছিলো। মানুষের সম্বন্ধে খুব একটা কৌতূহল আমার ছিল না। কারণ, জানতাম পৃথিবীর সব মানুষকে চেনা তো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। মাঝে মাঝে অনেকেই এই ষোল বছরের একলা স্বভাবের তরুণ কবিকে দেখে এগিয়ে আসতেন কিন্তু একটা 'শুভ সন্ধ্যা' বা 'শুভ রাত্রি'র সম্ভাষণও আমার মুখ থেকে বেরোত না। স্প্যানিশ কেপ পরা আমার চেহারাটা একটা অদ্ভুত মূর্তির মতো দেখাতো। কিন্তু কেউই জানতেন না আমার এই স্বভাব এই বেশভূষা সবই আমার দারিদ্র্য ঢাকার জন্য।

যে সব মানুষ আমার সঙ্গ চাইতেন তাঁদের মধ্যে একটি ধনী দম্পতির সঙ্গে আমার আলাপ হয়। এই দম্পতি পিলো ইনেজ ও তাঁর স্ত্রী মিনা—স্বপ্নের মতো অলস সুন্দর ছিল এঁদের জীবন এঁদের সংসার। কতবারই না আমি এই জীবন কামনা করেছি। ঘরে জ্বলছে ঘর গরম করার আগুন, সুন্দর কাঠের আসবাব—দেয়াল জোড়া কাঠ আর কাঁচ দিয়ে তৈরি বই রাখার ব্যবস্থা, রাশি রাশি বই সাজানো যা আমার নাগালের বাইরে।

যখনই এঁরা আমায় বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করতেন—একটা অজানা সুখ আর পরিতৃপ্তিতে দেহমন ভরে উঠত। ওঁরা বোধহয় সেটা অনুমান করেই আমায় আবার যাবার জন্য বলতেন।

কিউবিজ্‌ম শিল্প অর্থাৎ জ্যামিতিক রেখার মতো আধুনিক চিত্রাংকন বিদ্যা সম্বন্ধে আমার পরিচয় এঁদের বাড়ীতেই প্রথম ঘটলো। জুয়্যান গ্রিস'র আঁকা একটা কিউবিস্ট চিত্র এঁদের বাড়ীর দেয়ালে দেখলাম। কথায় কথায় ওঁরা জানালেন জুয়্যান গ্রিস্‌ ওঁদের বন্ধু। কিন্তু যে জিনিসটা আমায় সবচেয়ে বিস্ময়াবিষ্ট করে রাখতো সেটা হচ্ছে বিলিয়ার্ড টেবিলের ওপরের ঘন উলের ঢাকার মতো পিলো ঈনেজের পায়জামাটা —সমুদ্রের মতো ঘন নীল—সে সময় জেল-খানার কয়েদীর মতো—ডোরাকাটা পাতলা ফ্যানেলের পায়জামা পরা ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারতাম না—তাই প্রায়ই আড়চোখে সুন্দর ভারী পায়জামাটার দিকে নিবিষ্টমনে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতাম। তার রঙ তার দামী ভারী সুন্দর কাপড়টা এই গরীব কবির মনে ঈর্ষা জাগাতো। এই পঞ্চাশ বছরের মধ্যে আমি অমন সুন্দর পায়জামা আর দেখিনি।

এরপর অনেক বছরই আর কোন খবর পাইনি। শুনেছিলাম পিলো'র স্ত্রী মিনা—সেই স্বপ্নালু বসবার ঘর—আরাম কেদারা আর স্বচ্ছ স্বপ্নালোক ছেড়ে রাশিয়ান সার্কাসের একজন বাজিকরের সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে তাঁকেই বিয়ে করেছেন। পরে শুনেছি অস্ট্রেলিয়া থেকে ইংল্যাণ্ড পর্যন্ত সেই সার্কাসের সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়ে টিকিট বিক্রি করতেন, সেই এ্যাক্রোবেটের জন্য, তারপর একদিন খবর পেলাম ফ্রান্সের কোন এক গীর্জায় তিনি সন্ন্যাসিনী হয়ে অতীন্দ্রিয়বাদের সাধনায় মত্ত। পিলো ইনেজ্‌ নাম বদলে হলেন জুয়্যান এমার। লেখা শুরু করলেন এবং একজন শক্তিমান অথচ অপরিচিত লেখক হিসাবে অপ্রকাশিত রয়ে গেলেন। আমরা দুজনে ছিলাম ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাঁর মৃত্যু হয় বড় করুণভাবে, তাঁর অনেক বই-ই এখনও প্রকাশের অপেক্ষায়—কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই বইগুলো একদিন চিলির মাটিতে শিকড় ছড়িয়ে ফুলে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠবে।

পিলো আমায় পরিচয় করে দিয়েছিলেন তাঁর পিতার সঙ্গে। তখনকার দিনের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং সিনেটর। তাঁর বাড়িটা ছিলো প্রেসিডেণ্টের বাড়ির কাছাকাছি। যে রাস্তায় বড় বড় লোকেরা তাঁদের বিশ্রী রকমের বড় বড় বাড়িতে থাকতেন সেইখানে। আলাপ করবার সময় পিলো বলেছিলেন—ওঁর পিতা আমাকে ইউরোপ যেতে নিশ্চয়ই সাহায্য করবেন। সেই সময় লাতিন আমেরিকার সমস্ত সাহিত্যিক আর কবিদের দৃষ্টি পড়ে থাকতো প্যারিস শহরের ওপর—প্যারিস ছিল আমাদের স্বপ্ন।

যেদিন পিলোর বাবার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম সেদিনের কথাটা আমার স্পষ্ট মনে আছে। চকচকে মারবেল পাথরের মেজে—বিরাট একটা সাজানো ঘর—তার এক-কোণে খবরের কাগজে মুখ ঢেকে সেনেটর বসে রয়েছেন একটি চমৎকার আরাম কেদারায়। কোনরকমে পা টিপে টিপে যখন তাঁর প্রায় পায়ের কাছে এসে দাঁড়ালাম তখনও মুখটা তাঁর কাগজে ঢাকা—শুধু একবার চোখ তুলে আমায় দেখে ঈশারায় বসতে বললেন। পতঙ্গবিশারদের কাছে একটা সাধারণ মাকড়সা নিয়ে গেলে তিনি যেমন বিরক্তির সঙ্গে তাকিয়ে দেখেন ঠিক তেমনিভাবেই সিনেটর আমার দিকে তাকালেন।

জিজ্ঞাসা করলেন আমার উদ্দেশ্য। আমি ভীরুস্বরে তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিলাম। মনে নেই কি বলেছিলাম। কুড়ি মিনিট বাদেই আবার ঈশারায় আমায় চলে যেতে বললেন। যেরকম সন্তর্পণে সেই চকচকে পিচ্ছিল মারবল পাথরের মেজে দিয়ে হেঁটে গিয়েছিলাম তার চেয়েও ধীরে নিজেকে বাঁচিয়ে চলে এলাম। আসার সময় মৃদুস্বরে তিনি আমায় বলেছিলেন—একটা খবর আমি পাবো। অবশ্য কোন খবরই আমি তাঁর কাছ থেকে কোনদিনও পাইনি। কিছুদিন পরে পেলাম সৈন্যদের বিদ্রোহ ও শাসক পরিবর্তনের খবর—তার সঙ্গে আরও শুনলাম সিনেটর অর্থাৎ আমার বন্ধুর পিতার আসনও সরে গেছে। সেদিন কেন জানি না অকারণ একটা পুলক অনুভব করেছিলাম।

ছাত্র ফেডারেশন

তেমুকোতে ছাত্র ফেডারেশনের "ক্ল্যারিদাদ" নামে একটি পত্রিকা বেরুতো। আমি সেই পত্রিকার একজন সাংবাদিক ছিলাম, প্রায় ২০।৩০টি কপি আমি নিজেই আমার সহপাঠীদের বিক্রি করতাম। ১৯২০ সালে তেমুকো শহরের একটি ঘটনা আমার এবং আমার সমসাময়িক সকলের মনেই এক রক্তাক্ত দাগ রেখে গেল। "সোনালি যুব সম্প্রদায়" বলে ধনিক শ্রেণীর ছেলেদের নিয়ে একটি সংস্থা গড়ে উঠেছিলো। তারা একদিন হঠাৎ এসে ছাত্র ফেডারেশনের অফিস ঘর তছনছ করে ভেঙে দিয়ে ছাত্রদের প্রচণ্ড মারধোর করল। শাসকবর্গ যাঁরা সেই উপনিবেশের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত শুধুমাত্র ধনিকশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার জন্যই গড়ে উঠেছিলেন তাঁরা এসে ছাত্র ফেডারেশনের সেই মার-খাওয়া ছেলেদেরই ধরে নিয়ে গেলেন। অর্থাৎ যারা আসামী তাদের কিছুই হল না যারা উৎপীড়িত তারাই ধরা পড়লে শাসকদের হাতে। ডমিঙ্গ গোমেজ ছিলেন তখন তরুণ কবিদের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক, তাঁকে ধরা হল। শাসকের অকথ্য অত্যাচারে কিছুদিনের মধ্যেই তিনি এক অন্ধকার কারাকক্ষে উন্মাদ হয়ে মারা যান। আমাদের এই ছোট দেশের রাষ্ট্র-ব্যবস্থার এই অবর্ণনীয় অপরাধ সেদিন সকলের মনে শুধু যে দাগ কেটেছিল তাই নয়—ভবিষ্যৎ মানুষের কাছেও এর আবেদন ততখানিই ছিল যতখানি ছিলো পরবর্তী সময়ের ফেদ্‌রিকো গার্সিয়া লোরকা হত্যা।

১৯২১ সালের মার্চ মাসে যখন প্রথম চিলির রাজধানী সান্‌তিয়াগো যাই তখন মাত্র পাঁচ লক্ষ লোক ছিল সমগ্র শহরে। সারা শহর জ্বালানি গ্যাসের ধোঁয়া আর কফির গন্ধে ভরে থাকতো। বাড়িতে বাড়িতে আগন্তুকের দল আর ছারপোকার ভিড়। সাধারণের যাতায়াতের জন্য ছিল ভাঙাচোরা কতকগুলি শীর্ণকায় গাড়ি, তার ঝনঝনে আওয়াজে আর প্যাঁকপ্যাঁকে হর্ণে রাস্তা কেঁপে উঠত। শহরের যে কোন প্রান্ত থেকে ষ্টেশনে যেতে গেলে মনে হত রাস্তা আর ফুরোবে না।

ছাত্র ফেডারেশনের অফিসে তখন ছিল নামকরা বিপ্লবী ছাত্রনেতাদের ভিড়। আলফ্রেদো দিমারিয়া, দ্যানিয়েল সোয়েৎজার, সান্‌তিয়াগো লাবারকা, জুয়্যান গ্যান দুলফো এঁরা ছিলেন অগ্রসারীদের মধ্যে কয়েকজন। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে

দুর্দান্ত নেতা ছিলেন জুয়্যান গানদুলিফো। রাজনীতিতে তিনি ছিলেন স্পষ্টবক্তা আর অসাধারণ সাহসী। বয়স হিসেবে আমি তাঁর কাছে খুবই ছেলেমানুষ। একদিন ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য তাঁর অফিসে আমার যাওয়ার কথা ছিল। যেতে দেরি হয়ে গিয়েছিল—গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করেছিলেন—"কিসের জন্যে এত দেরি হয়েছে ? জানো-না কতজন রুগীকে সময় দেওয়া রয়েছে!" আমি বললাম—"সময়টা ঠিক বুঝতে পারিনি—" নিজের জামার বুক-পকেট থেকে একটি ঘড়ি নিয়ে আমায় দিয়ে বলেছিলেন—"এইটে রাখো—যাতে ভবিষ্যতে সময়টা বুঝতে পারো।"

জুয়্যান গানদুলফো ছিলেন ছোটখাটো মানুষ—মাথা ভর্তি অল্প বয়সের টাক। যেখানেই যেতেন বোঝা যেত তিনি রয়েছেন। একবার একজন বদ্‌মেজাজী সৈনিক তাঁকে বলেছিলো—এস তরবারি যুদ্ধে দেখা যাক্ কে জেতে? দু'সপ্তাহের মধ্যে জুয়্যান তলোয়ার খেলা শিখে সেই সৈনিককে কয়েক মিনিটের মধ্যেই ধরাশায়ী করে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করেছিলেন। ঠিক এই সময়েই আমার প্রথম বই "ক্রিপ্যাসকুল্যারিয়ো' প্রকাশের সময় এল—জুয়্যান আমার সেই বই-এর প্রচ্ছদ্‌পটটা সম্পূর্ণ কাঠের ওপর খোদাই করে চিত্রাঙ্কন করে দিয়েছিলেন এবং প্রতিটি ছবি নিজে হাতে এঁকে দিয়েছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় জুয়্যান শিল্পী ছিলেন না, শিল্পের সঙ্গে তাঁর কোন যোগাযোগও ছিল না।

সেদিনকার বিপ্লবী সাহিত্যে সবচেয়ে নামকরা ছিলেন রবারত্যো মেজা ফুয়েনত্যেম্। 'জুৎভ্যেনতাদ' বলে ছাত্রফেডারেশনের আরো একটি পত্রিকা ছিলো—যেটিতে অনেক নামকরা সাহিত্যিকই লেখা দিতেন। এঁদের মধ্যে অসাধারণ লেখক ছিলেন গনজ্যালেজ ভেরা এবং আরজেন্‌টিনা ফেরত সাহিত্যিক ম্যানুয়েল রোজাস্। ম্যানুয়েল রোজাসের লেখার মধ্যে ছিল একটা মহৎ স্পর্ধা আর সোজা আঘাত করা শব্দ। বয়সে এঁরা সবাই ছিলেন আমার চেয়ে বড়। গনজ্যালেজ ভেরার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়—আমার বাড়িতে। ছাত্র ফেডারেশনের অফিসের ওপর আক্রমণের পরেই উনি পালিয়ে আসেন তেমুকোতে এবং রেল স্টেশন থেকে সোজা আমার বাড়িতে আসেন। অমন একটা পাথরে খোদাই মূর্তির মতো মানুষ আমার ষোল বছরের কবি জীবনে আমি দেখিনি। সারা শরীর কালো পোশাকে ঢাকা। প্রথম থেকেই তাঁর স্পষ্ট এবং ব্যঙ্গাত্মক কথা বলার ভঙ্গী আমাকে মুগ্ধ করেছিল। সেদিন বর্ষার রাত্রে গনজ্যালেজ ভেরার সঙ্গে কথা বলতে বলতে আঁদ্রেয়িভের উপন্যাসের নায়ক 'ইয়েগুলেভ'কে মনে পড়েছিল। ইয়েগুলেভও রাশিয়ান বিপ্লবীর সঙ্গে প্রথম দেখার সময়ে এমনই রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিলেন। সারা ল্যাতিন আমেরিকায় তখন আঁদ্রেয়িভের "ইয়েগুলেভ" ছিলেন আদর্শ।

এলবার্ত্রো্যা রোজ্যাস গিমেনেজ

ছাত্র ফেডারেশনের "ক্লারিদ্যাদ্" পত্রিকাটি এলবার্ত্র্যো রোজ্যাস গিমেনেজ প্রায় একাই চালাতেন। আমার সমসাময়িক বন্ধুদের মধ্যে ইনিই ছিলেন আমার ঘনিষ্ঠতম। মাথায় টুপি—নাকের নীচে কালো বড় একজোড়া গোঁফ—হাসিখুশি সহজ-সরল—অথচ

অতি আধুনিক—এমন মানুষ আর দেখিনি। সবেতেই ছিলো তাঁর আসক্তি আবার সবকিছুতেই নিরাসক্তি। যেখানেই যেতেন রেখে আসতেন কবিতা-গল্প-ভালোবাসা—নিজের গলার নেকটাই—আর বন্ধুত্ব। কেউ এসে কিছু চাইলেই নিজের-জুতো-জামা-টুপি সবই দিয়ে দিতেন। যখন দেবার মতো আর কিছু থাকতো না—তখন ছোট কাগজের টুকরোয় নিজের ছোট একটি কবিতা বা ব্যঙ্গ রচনা হাতে ধরিয়ে দিতেন আর চেয়ে থাকতেন গ্রহীতার দিকে—প্রশান্তিতে মুখ ভরে থাকতো।

অত্যন্ত আধুনিক পদ্ধতিতে তিনি কবিতা লিখতেন—আদর্শ ছিল এ্যাপোলোনেয়ার ও স্পেনের চরমপন্থী কবিদের লেখা। একটা নতুন ধারার কবিতা এ্যালবাত্রো চালু করেছিলেন নাম—"আগু" অর্থাৎ মানুষের প্রথম কান্না—অথবা নবজাতকের প্রথম কবিতা।

রোজ্যাস্ গিমেনেজ জামাকাপড়—ধূমপান মদ্যপান এমনকি হাতের লেখার ব্যাপারে পর্যন্ত নতুনত্বে বিশ্বাস করতেন। ব্যঙ্গচ্ছলে আমার কবিতার বিষণ্ণ সুর যদিও দূর করেছিলেন তিনি কিন্তু তাঁর সংশয়বাদ আমাকে স্পর্শ করে নি, মোহাচ্ছন্ন হয়েছিলাম তাঁর সম্পর্কে। এখনও, যখনই তাঁর মুখটা মনে পড়ে তখনই মনে হয় সংসারের লুকোনো কোণগুলি থেকে প্রজাপতি ওড়ার মতো রঙীন সৌন্দর্য যেন ছড়িয়ে যাচ্ছে।

তাঁর সমস্ত কবিতাই তাঁর কোট ও জামার পকেটে মৃত্যু বরণ করেছিল—ওই দোমড়ানো-মোচড়ানো কাগজগুলো প্রকাশ পাবার সুযোগ আর পায়নি।

একদিন এক কাফেতে রোজ্যাস্ গিমেনেজ আড্ডা আলোচনায় মশগুল এমন সময় একজন অপরিচিত ভদ্রলোক টেবিল থেকে উঠে এসে বললেন—"আপনার কথাবার্তা আমি দূর থেকে বসে অনেকক্ষণ ধরে শুনছি—আপনাকে আমার খুবই ভালো লেগেছে। আপনাকে একটি অনুরোধ করতে পারি কি?" রোজ্যাস্ একটু আশ্চর্যের স্বরেই জিজ্ঞাসা করলেন—"কি বলুন তো?" আগন্তুক বললেন—"আমি আপনার ওপর দিয়ে লাফিয়ে চলে যেতে চাই—"। রোজ্যাস্ জবাব দিলেন—"আপনার গায়ে এত শক্তি আছে যে আমি এখানে বসে রয়েছি—আপনি আমার ওপর দিয়ে লাফিয়ে যাবেন—" খুব আস্তে আস্তে আগন্তুক বললেন—"না-না আমি এখনই লাফাতে চাইনা—! আপনি যেদিন মারা যাবেন—সেদিন আপনার কফিনের ওপর দিয়ে লাফিয়ে যেতে চাই। আমি এমনি করেই সমস্ত নামকরা লোকেদের আমার শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করি। অবশ্য যদি তাঁরা অনুমতি দেন। এইতেই আমার আনন্দ।" বলেই ভদ্রলোক পকেট থেকে একটা ছোট খাতা বের করে সেই সব নামকরা মৃত লোকেদের নামগুলো পড়তে লাগলেন। শুনে আনন্দ ও বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে রোজ্যাস্ সেই আগন্তুককে সম্মতি দান করেছিলেন। কয়েক বছর পরে এক ভয়ানক শীতের রাত্রে রোজ্যাস্ গিয়েছিলেন তাঁর বোনের সঙ্গে দেখা করতে। মনে হয়, ওঁর যেমন স্বভাব—হয়তো সানতিয়াগোর কোন সরাইখানায় নিজের গরম কোটটা কাউকে দান করেই বেরিয়ে পড়েছিলেন। ঠাণ্ডাটা সইলো না। দু'সপ্তাহের মধ্যেই নিউমোনিয়া রোগ—পৃথিবীর সবচেয়ে আকর্ষণীয় চরিত্রটিকে নিয়ে চলে গেল। এক কবি তাঁর পকেট-ভর্তি টুকরো কাগজের কবিতায় ভর করে আকাশে উড়ে গেলেন—বর্ষণকে উপেক্ষা করে।

যে ক'জন বন্ধু সেদিনের সেই তীব্র শীত আর বৃষ্টির মধ্যে তাঁর পাশে উপস্থিত ছিলেন, মাঝরাতে তাঁরা অবাক হয়ে, বৃষ্টিতে ভিজে সপসপে এক অগন্তুককে ঘরে আসতে দেখলেন—তিনি এসেই রোজ্যাসের কফিনের ওপর দিয়ে লাফিয়ে পার হয়ে গেলেন—আকাশে তখন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। যেমন নীরবে এসেছিলেন—তেমনি নীরবে বেরিয়ে গেলেন ভদ্রলোকটি। এ্যালবাত্রো রোজ্যাসের নাটকীয় জীবনের এই রহস্যজনক শেষ অধ্যায় আর তার চেয়েও রহস্যময় সেই আগন্তুকের ব্যাখ্যা আজও আমি জানি না। স্পেনের বার্সেলোনা শহরে পেঁছে রোজ্যাসের মৃত্যুর খবর পেয়ে আমি তাঁর উদ্দেশে একটি কবিতা লিখেছিলাম। কবিতাটির নাম—"আকাশে ভর দিয়ে উড়ে আসছেন আলবাত্রো রোজ্যাস্ গিমেনেজ"।

কিন্তু রোজ্যাসের মৃত্যু আমায় যে শোকে ডুবিয়েছিলো—তাতে শুধু কবিতা লেখাটাই যথেষ্ট মনে হয়নি। তাই ভেবেছিলাম আরো কিছু করে মনের দুঃখ লাঘব করার চেষ্টা করি। সমুদ্রের নাবিকদের দেবী সান্তা মেরিয়া দ্যা মার'র একটি সুন্দর গীর্জা ছিলো। আমি আর আমার এক শিল্পী বন্ধু ইজায়াজ কেবিজন্—দুজনে মিলে সেদিন সন্ধ্যায় দুটো বড় মোমবাতি কিনে সেই গীর্জার বড় ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। ঘরটার চারপাশ ঘিরে ছোট ছোট নৌকা জাহাজ ইত্যাদির ছবি ও মডেল। মনে হয়েছিল—এই ঘর, এই গীর্জাই রোজ্যাসের জন্য শোক প্রকাশের একমাত্র জায়গা। আমাদের তীব্র অজ্ঞেয়বাদ সত্ত্বেও সেদিন আমরা দু'জনে সেই শূন্য গীর্জার মধ্যে মোমবাতি জ্বালিয়ে মদ খেলাম। মনে হয়েছিল রোজ্যাসের আনন্দময় আত্মা যেন আমার অতি নিকটে এসে দাঁড়িয়েছে—জ্বলন্ত দুটি মোমবাতির দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল—সেই পাগল কবির দুটি চোখ—ছায়ার মধ্যে আমাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

শীতের দিনের উন্মাদের দল

রোজ্যাস্ গিমেনেজের কথা মনে হলেই মনে হয়—কবিরা বোধহয় সবাই উন্মাদ। একধরনের পাগলামির সঙ্গে কবিতার একটা বন্ধুত্ব আছে। যুক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে কবি হওয়া যেমন শক্ত—কবিদের পক্ষে ততোধিক কঠিন যুক্তিসম্পন্ন মানুষ হওয়া। পুরোনো দিনের এমনই এক পাগল কবি ছিলেন এলবার্তো ভালদিভিয়া। শীর্ণকায় ফ্যাকাশে চেহারা, মাথাভরা সাদা চুল আর মোটা কাঁচের চশমার মধ্য দিয়ে শূন্যে আবদ্ধ দৃষ্টি। আমরা নাম দিয়েছিলাম—"শবদেহী ভালদিভিয়া"—।

একগোছা খবরের কাগজ বগলে নিয়ে কখনও সরাইখানায়—কখনও খাবার টেবিলে আবার কখনও নাচের আসরে ছিল তাঁর যাওয়া আসা। এক টুকরো হাওয়াকে আলিঙ্গন করার মতো তাঁকে আলিঙ্গন করে বন্ধুরা বলে উঠতো—"এসো এসো প্রিয় শবদেহ—" নিগূঢ় তীব্র মিষ্টতায় ভরা ছিল তাঁর কবিতা। যেমন এই কয়েকটি পঙক্তি—

"একদিন সব শূন্য হবে
এই সন্ধ্যা—এই সূর্য—এই জীবন—
কিন্তু যা কিছু মন্দ অশুভ—

অসম্পূর্ণ রইলো যাদের প্রকাশ
তারা থাকবে চিরকাল
আর থাকবে তুমি—
আমার অপরাহ্ন জীবনের নক্ষত্র—”

ভালদিভিয়া ছিলেন সত্যিকারের কবি। ওঁকে নিয়ে আমাদের এই হাসাহাসি, “শবদেহ” বলে ডাকা—এতে উনি কিছুই মনে করতেন না। আমরাও এটাকে কোনদিনও নিষ্ঠুর প্রাণহীন আমোদ বলে মনে করতাম না। ১লা নভেম্বর এলেই আমরা ক'জন সাহিত্যিক আর কবি মিলে যা টাকা পয়সা জুটতো তাই নিয়ে ভালদিভিয়াকে খাবার টেবিলের সবচেয়ে মর্যাদার আসনটিতে বসিয়ে একটা ছোটখাটো ভোজের আয়োজন করতাম তারপর ও'কে নিয়ে যেতাম কোন একটা কবরখানায়। সেখানে ওঁকে একলা বসিয়ে কিছু পয়সা দিয়ে আসতাম—স্যান্ডুউইচ্ কিনে খাবার জন্য। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার কবরখানায় ওঁর উদ্দেশে বেশ কিছু বক্তৃতা করতেন। এটা নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছিল—ভালদিভিয়া নিজেও এতে একটা বড় অংশ গ্রহণ করতেন এবং আমরা সবাই মিলে এটা উপভোগ করতাম। কয়েকটা দিন বাদেই আবার ভালদিভিয়া এসে যোগ দিতেন আমাদের আড্ডায়। সবই চলছিল—যদি না আসতো সেই ১লা নভেম্বর, যেদিন ভালদিভিয়া আর ফিরে এলেন না।

হাতে ছাতা—অতিকায় দীর্ঘদেহী—আর্জেন্টিনার সাহিত্যিক ওমার ভিগনোল ছিলেন আর একজন পাগল। একবার এক রেস্তোরাঁয় আমায় রাত্রে খেতে ডাকলেন। আমাকে চেয়ারে বসিয়ে গম্ভীর চীৎকারে সবাইকে শুনিয়ে বললেন—“ওমার ভিগ্‌নোল —বস।” আমি অবাক হয়ে বললাম—“আমি তো পাবলো নেরুদা”। উনি বললেন —“হ্যাঁ, তা জানি—কিন্তু এই রেঁস্তোরার অনেক লোকই আমায় শুধু নামে চেনে। কিছু কিছু লোক আমার সামনে থেকে পৃথিবীর আলো সরিয়ে দিতে চায়—আমি চাই —আমার নয়—তোমার চোখের আলোটা ওরা নিয়ে নিক—।”

ব্যক্তিগত জীবনে ওমার ভিগনোল ছিলেন একজন কৃষিবিদ্। আর্জেন্টিনা থেকে চলে আসার সময় সঙ্গে এনেছিলেন একটা গরু—তাঁর জীবনের একমাত্র সঙ্গী যেখানেই যেতেন গরুটিকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন। এইসময় কয়েকটি বইও তিনি লিখেছিলেন—যার নাম ছিল—“আমি ও আমার গরু—”, “গরুটি আমার কি চিন্তায় বিভোর” ইত্যাদি। সেবার পি. ই. এন.-এর বিশ্বসাহিত্য সভা বসেছে বুয়েনস্ এ্যায়ারস্-এ, সভাপতিত্ব করছেন ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো। আমরা সবাই ভয়ে কাঠ হয়ে রয়েছি—এই সভায় ওমার ভিগনোল তাঁর গরুটিকে না সঙ্গে নিয়ে হাজির হন! কর্তৃপক্ষকে আমাদের ভয়ের কথা জানানো হল—যেখানে সভা বসেছিল, তার চারপাশ ঘিরে কড়া পুলিস প্রহরার ব্যবস্থা হল। সভা যখন পূর্ণ, প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যের সঙ্গে বর্তমান যুগের ব্যবধান সম্পর্কিত আলোচনায় সবাই বিভোর—এমন সময় ওমার ভিগনোল তাঁর গরুটিকে নিয়ে সভায় ঢুকলেন—গরুটি তখন হাম্বা রবে ঘর ভরে তুলেছে—যেন আলোচনায় সেও অংশ নিতে চায়। একটা ঢাকা গাড়িতে কখন ওমার আর তার গরু সভাকক্ষে ঢুকলো পুলিস তা টেরও পায়নি।

এখানেই আমার বন্ধুর পাগলামির শেষ নয়। হঠাৎ শুনি এক বিখ্যাত কুস্তিগীরকে

ওমার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান জানিয়েছেন। লড়াই-এর দিন যখন সেই কুস্তিগীর—দড়ির ফেন্সিং-এর কাছে টেনে নিয়ে তাঁর গলার ওপর পা রেখে দাঁড়ালো এবং চারদিক থেকে উত্তেজনা আর চীৎকার শুরু হল—আমি ভেবেছিলাম ওমারের সাহিত্যিক জীবনের পরিসমাপ্তি হতে চলেছে।

এর কয়েকদিন পরেই ওমারের একটি বই "গরুর সাথে আমার কথোপকথন" নামে প্রকাশিত হল। বইটির উৎসর্গপত্রে তিনি লিখেছিলেন—"যে ৪০ হাজার কুত্তার বাচ্চা ২৪ শে ফেব্রুয়ারীর লড়াই-এর রাত্রে আমার মৃত্যু কামনা করেছিলেন—তাঁদের উদ্দেশে এই বই উৎসর্গ করা হল।"

গত বিশ্বযুদ্ধের কিছুদিন আগে প্যারিসে আমার সঙ্গে শিল্পী আলভারো গুয়েভারার পরিচয় হয়—তখন সবাই তাঁকে চিলির গুয়েভারা বলে ডাকতেন। হঠাৎ একদিন সন্ধ্যায় আমায় টেলিফোন করে বললেন—"পাবলো, তোমার সঙ্গে আমার খুব জরুরী প্রয়োজন—তুমি শীঘ্র আমার সঙ্গে দেখা কর—।"

আমি তখন স্পেনে ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে লড়াইএ নেমেছি। এযুগের নিকসনের মতো তখন হিটলার আমাদের আতঙ্কের বস্তু। মাদ্রিদে যে বাড়ীটায় আমি ছিলাম তার ওপর বোমা পড়ে সে বাড়ি বিধ্বস্ত—চোখের সামনে ছেলে, মেয়ে, বৃদ্ধদের মৃতদেহের স্তূপ দেখেছি। বিশ্বযুদ্ধ এগিয়ে আসছে—আমরা কয়েকজন সাহিত্যিক মিলে ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন করার সংগ্রামে মত্ত।

আলভারো ছিলেন আপনভোলা একাগ্র শিল্পী। সেদিন যখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলাম তখন বারুদের স্তূপ চারপাশে জমছে—স্পেনের গৃহযুদ্ধের জন্য। আমরা তখন অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করতে ব্যস্ত। সেই সময়েই স্পেনের গৃহদ্বার খুলে নাৎসী সেনাবাহিনী স্পেনে প্রবেশ করতে শুরু করছে। বিশ্বযুদ্ধ সমাগত।

"কি ব্যাপার বলুন তো, জরুরী তলব কেন ?"

"শোন, সময় বয়ে যাচ্ছে—এতটুকুও সময় আর নেই বাজে কাজে নষ্ট করার—। তোমার এইসব ফ্যাসীবাদ বিরোধী কথাবার্তা লেখা বন্ধ কর। তুমি যে বিশ্বফ্যাসীবাদ-বিরোধী সভা করতে চলেছ তাও বন্ধ কর। এস, কিছু কাজের কাজ করা যাক।"

"কিন্তু আমায় বলুন কি করতে হবে—সময় খুবই অল্প।"

"পাবলো—আমার সমস্ত কথাই আমি এই তিন অঙ্কের একটি নাটকে বলেছি।" মোটা ভ্রু জোড়া ওপর দিকে তুলে আমার প্রশ্নের জবাব দিয়ে টেবিলের তলা থেকে ইয়া মোটা একটি পাণ্ডুলিপি বার করে আমার সামনে তিনি মেলে ধরলেন।

ভয়ার্ত আমি মিনতি করে আলভারোকে আমার সময়ের অভাব জানিয়ে অনুরোধ করলাম যাতে গোটাকয়েক কথায় মানুষের বাঁচার উপায় উনি আমায় বলে দেন।

"কলম্বাসের ডিম—দেখলে যা মনে হয় তা নয়—অতি সহজেই ভাঙা যায়।" আলভারো বলে চললেন—"ধর, তুমি আজ যদি একটা আলুর চারা লাগাও তা থেকে অন্তত ৪।৫টা আলু হবে। তেমনিভাবেই যদি আজ হাজারটা মানুষ হাজারটা আলুগাছের চারা লাগায় তাহলে ৪।৫ হাজার আলু হবে—অর্থাৎ বিশ্বের লক্ষকোটি লোক যদি লক্ষকোটি আলুর চারা লাগায় তাহলে তার ৪।৫ গুণ আলু তৈরি হবে! তাহলে মানুষের ক্ষুধা বা অভাব কোথায় রইলো ?"

যেদিন নাৎসীবাহিনী প্যারিস শহরে এসে ঢুকলো সেদিন ওরা কলম্বাসের ডিমের খোঁজ করেনি। আলভারোকে সেই শীতের রাত্রে নাৎসীরা বন্দী করে বন্দীশিবিরে পাঠালো—ওঁর শরীরে নানান্ জায়গায় উলকি দিয়ে ওঁর বন্দী-নম্বর লেখা হল। যুদ্ধশেষে শীর্ণকায় মৃতপ্রায় আলভারো বন্দীশিবির থেকে বেরিয়ে শেষবারের মতো একবার চিলিতে এসেছিলেন। তারপর স্বদেশকে শেষ অক্ষম চুম্বন জানিয়ে যেদিন ফ্রান্সে ফিরে এলেন তার কয়েকদিন পরই তাঁর মৃত্যু হল।

হে প্রিয় বন্ধু চিলির গুয়েভারা—তোমার জোট-নিরপেক্ষ আলুর রাজনীতি নাৎসী-শিবিরের বন্দীদশা বা মৃত্যু থেকে তোমায় বাঁচাতে পারলো না। বহুকাল পরে লণ্ডনের চিত্রশালায় তোমার আঁকা "এডিথ সিট্ওয়েলের" একটি তৈল চিত্র দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম, গর্বিত হয়েছিলাম এই কথা ভেবে যে, লণ্ডনের মিউজিয়ামে তুমিই একমাত্র ল্যাতিন আমেরিকান শিল্পী যার ছবি স্থান পেয়েছে। কিন্তু বন্ধু—তোমার খ্যাতি তোমার শিল্প সবই আমার কাছে মূল্যহীন মনে হয়েছিলো। কি এক আলুর জোট নিরপেক্ষ রাজনীতি সেদিন আমাদের চিরতরে আলাদা করে দিয়েছিল।

আমি সত্যিই সরল মানুষ ছিলাম—এই সরলতাই আমায় লজ্জা ও খ্যাতি দুই-ই এনে দিয়েছিল। না হলে কেমন করে এই সব অর্ধ উন্মাদ মানুষগুলোর সঙ্গে সখ্য গড়ে উঠেছিল—কারুর কবিতা পকেটের কাগজে—কেউ বা গরুর সাহিত্যে বিভোর—কোন শিল্পীর আলুর রাজনীতি—আমার মনে হত সাহিত্যের সঙ্গে এই সব অদ্ভুত খামখেয়ালিপনার কোথাও একটা যোগাযোগ আছে। আমার জন্ম হয়েছিল ভালবাসার জন্যই, বিচারের জন্য নয়। আমার কবিতা পড়ে উপভোগ করার পর কত ভেদবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষ আমার চোখ উপড়ে ফেলতে চেয়েছেন, তাঁদের কাছে সম্পূর্ণ নীরবতাই ছিল আমার উত্তর। কোনদিনও আমার মনে হয়নি যে, শত্রুদের মধ্য থেকে আমিও হয়তো সংক্রামক ব্যাধির মতো শত্রুতাই জীবনে বেছে নেবো, কিন্তু একমাত্র যারা মানুষের শত্রু তাদের ছাড়া আর কাউকেই আমার শত্রু মনে হয়নি। আজ এই অনুস্মৃতি লিখতে বসে অদ্ভুত খেয়ালে ভরা এই সববন্ধুদের কথা বলতে গিয়ে এপোলিনেয়্যারের মতো বলতে ইচ্ছে হয়—"যারা অবাস্তবকে জানার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছেন প্রভু যেন তাঁদের ক্ষমা করেন।"

বড় ব্যবসা

আমরা কবিরা মাঝে মাঝে ভাবতাম যদি ব্যবসায় নামি তাহলে নিশ্চয়ই খুব বড়লোক হতে পারবো। মনে আছে—১৯২৪ সালে—একজন বড় প্রকাশক পাঁচশো পেসো (অর্থাৎ ৫ ডলার দিয়ে আমার বই "ক্রিপাসকু লারিও" চিরদিনের জন্য কিনে নেন। যেদিন সেই টাকাটা পাই সেদিন আমার যে সব বন্ধু বাইরে অপেক্ষা করছিলো, যেমন—"রোজ্যাস্ গিমেনেজ, আলৎকারো হিনোজসা, হোমিরো আরকে প্রভৃতি সকলকে নিয়ে সবচেয়ে ভালো রেস্তোরাঁ "লা ব্যাহিয়া"তে খেতে গেলাম। খাওয়ার আগে রেস্তোরাঁতে বসে জুতোগুলি আয়নার মতো করে পালিশ করানো হল। তারপর এলো সবচেয়ে ভালো খাবার, মদ আর চুরুট। অর্থাৎ আমার টাকাটার সিংহভাগটুকু পেল প্রকাশক

রেস্তোরাঁর মালিক আর জুতো পালিশ করার ছেলেগুলো। আমার বৈষয়িক সমৃদ্ধি দরজার আড়ালে রুদ্ধ থাকল।

আমার এই বন্ধু আলভারো হিনোজমা—নিউইয়র্কের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন—ভালো ইংরাজী বলেন—মুখে সব সময়েই ভার্জিনিয়া বিলাতী সিগারেট, ব্যবসায় বুদ্ধিতে অসম্ভব রকমের চতুর—আমাদের কাছে একটি ঈর্ষার বস্তু।

একদিন আমায় আড়ালে আলাদা ডেকে বললেন—যদি আমি আর তিনি দুজনে অর্ধেক অর্ধেক টাকা যোগাড় করতে পারি তাহলে ওঁর মাথায় এমন একটা ব্যবসার ফন্দী আছে যাতে আমরা অতি অল্প সময়েই বড়লোক হতে পারবো। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"কিসের ব্যবসা?"

চোখ বুজে মুখ থেকে দামী ভার্জিনিয়া সিগারেটের একরাশ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আলভারো বললেন—একরঙের সীল মাছের লোমওলা চামড়ার—"।

চকমকে রুপোলি সীল মাছের কোন লোম আছে বা তাদের রঙ আলাদা—এ আমি জানতাম না।

বাড়ি ভাড়া দিলাম না, জুতো বানানোর পয়সাও দিলাম না, দরজীর টাকাটাও বাকী রাখলাম, পয়সাকড়ি যা ছিল উজাড় করে দিয়ে দিলাম আলভারোর হাতে—সামনে একটাই স্বপ্ন, আমরা বড়লোক হতে চলেছি।

আলভারো তাঁর এক কাকীর কাছ থেকে সীল মাছের চামড়া কিনে নিয়ে এসে জড়ো করলেন। গুদামঘরে বিরাট সেই সীল মাছের লোমওলা এক রঙের চামড়ার স্তূপ জমে উঠলো।

"এত কি হবে?"

"আরে, অপেক্ষা কর—দেখতে পাবে।"

একটা ব্যাগের মধ্যে কিছু নমুনা নিয়ে আলভারো বাজারে বেরুলেন। সামান্য যে ক'টা পয়সা ছিল বিজ্ঞাপনে খরচ করা হল। ইতিমধ্যে ব্যবসালব্ধ টাকার হিসাব নিকাশ শুরু হল। আলভারোর কল্পনায় তখন ভালো কাপড়ের দামী সুট্ আর আমি ভাবছি—একটা নতুন দাড়ি কামানোর বুরুশের কথা কারণ পুরানো বুরুশটার চুলে টাক পড়ে গেছে।

অবশেষে একজন ক্রেতা এলেন। তাঁকে খুব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলা হল তিনদিন বাদে আসতে। এই তিনদিনের মধ্যে সবচেয়ে ভালো চামড়াগুলো মেঝেতে সাজিয়ে রাখা হল। তিনি আসার দিন আলভারো সবচেয়ে ভালো ভার্জিনিয়া সিগারেট ঠোঁটে চেপে বুক পকেটে হাভানার সবচেয়ে ভালো চুরুট রেখে অপেক্ষা করতে লাগলেন। যথাসময় ক্রেতা আসতেই—আলভারো তাঁর বুক পকেট থেকে একটা দামী হাভানা চুরুট তাঁকে দিতেই তিনি সঙ্গে সঙ্গে সেটা আগুনে ধরিয়ে নিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে মেজেতে বিছানো সবচেয়ে সুন্দর চামড়াগুলো ভালো করে না দেখে—এখানে ওখানে রাখা কর্কশ চামড়াগুলো একের পর এক খুলে দেখে—নাক সিঁটকে বললেন, "যাচ্ছেতাই এর একটাও আমার চলবে না।" চলে যাওয়ার সময় একটা বিদায় সম্ভাষণও জানালেন না। শুধু আলভারোর দেওয়া দামী চুরুটের একরাশ ধোঁয়ার সঙ্গে আমাদের লক্ষপতি হওয়ার আশা উড়িয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

আমার প্রথম বই

লাজুকের মতো আমি কবিতার জগতে আশ্রয় নিলাম। তখন নবযুগের সাহিত্য আন্দোলনে সানতিয়াগো বিভোর। ৫১৩নং মারুরী স্ট্রীটের সেই বাড়িটায় আমার প্রথম কবিতার বইটি শেষ করলাম। এক এক দিনে তিন-চার-পাঁচটি পর্যন্ত কবিতা লিখেছি। অপরাহ্নের শেষে গোধূলি লগ্নে বারান্দায় বসে দেখতাম মেঘের চারপাশে অস্তগামী সূর্যের কমলা আর টকটকে লাল রঙের খেলা আর তার সুধা আকণ্ঠ পান করে যখন "মারুরীর গোধূলি" কবিতা লিখেছিলাম সেদিন কেউ জানতে চায়নি মারুরী শব্দের অর্থ। কিছু কাছের লোক জেনেছিল মারুরীর গোধূলি আর কোথাও দেখা যায় না।

আমার সমস্ত আসবাবপত্র বিক্রি করলাম। বাবার দেওয়া মিনে করা দুটো পতাকা-ওয়ালা ঘড়িটাও বিক্রী করলাম। তবু শয়তানেরমতো তাকিয়ে প্রকাশক বললেন—"আরো টাকা চাই, তবেই বই প্রকাশ হবে—"। সমালোচক এ্যালোনের কাছ থেকে ধার করা পয়সা নিয়ে প্রকাশকের কাছে দিতে তবেই আমি আমার ছাপানো বই কাঁধে নিয়ে—ছেঁড়া ফুটো জুতো পায়ে দিয়ে—এক অদ্ভুত আনন্দ বুকে নিয়ে রাস্তায় নেমেছিলাম।

আমার প্রথম ছাপানো বই। কি রহস্য কি যাদু একজন লেখকের প্রথম বইয়ে! এক টুকরো রুটি, একটা কাজ করা কাঁচের প্লেট অথবা অপটু হাতে আদরের সঙ্গে কাঠে খোদাই এক অসম্পূর্ণ মূর্তি—একজন কবির কবিতা তো তাই-ই। কিন্তু তা সমস্ত মানুষের জন্য। এক কবি তাঁর প্রথম কবিতার বই হাতে রাস্তায় নেমেছে এ এক অভাবনীয় আনন্দ—সকলের জন্য নয়, শুধু কবিরই। এরপর হয়তো আরো সংস্করণ বেরুবে হয়তো আরো বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে বিভিন্ন স্বাদের সুরার মতো বিভিন্ন পাত্রে স্থান পাবে—কিন্তু সেদিনের সেই প্রথম সংস্করণের বইটি যার কালি তখনও শুকায়নি, যে বই-এর পাতা তখনও তাজা—আমার মনে হচ্ছিল তা যেন একটা প্রজাপতির পাখায় সেদিন প্রথম কম্পন জাগাল। মনে হয়েছিল একটা ফুল ফোটার আগে তার পাপড়িগুলো মেলে ধরেছে স্বীকৃতির আশায়।

আমার প্রথম কবিতার বই-এর কবিতা গুচ্ছের মধ্য থেকে একটি কবিতা—"বিদায়" কেমন করে জানি না খসে পড়ে জনসাধারণের মধ্যে পেঁছে গিয়েছিল। আমি যখনই যেখানে গিয়েছি, কেউ না কেউ সেই কবিতাটি আবৃত্তি করে আমায় শুনিয়েছে। অনেক সময় আমাকেও আবৃত্তি করে শোনাতে হয়েছে। যখন বিরক্ত বোধ করেছি তখন জটলার মধ্য থেকে কোন একটি সুন্দর নারীকণ্ঠ চীৎকার করে কবিতার প্রথম পঙ্‌ক্তিটি আমায় ধরিয়ে দিয়েছে। সরকারী আমন্ত্রণে যখন গিয়েছি তখন সামরিকবাহিনীর একজন অফিসার আমায় স্যালুট করার সময় আমার সেই কবিতাটি আবৃত্তি করেছিলেন।

কয়েকবছর বাদে স্পেনে গারসিয়া লোরকার সঙ্গে দেখা হতে তিনিও আমায় তাঁর জীবনের এই অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। "বিশ্বাসঘাতিনী পত্নী" বলে তাঁর প্রথম জীবনের একটি কবিতা ঠিক এই রকমই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। লোরকা বলতেন

—মিত্রতা লাভের উপায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল স্বকণ্ঠে এই কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনানো। কিন্তু কোন একটি কবিতার জনপ্রিয়তা আমাদের দু'জনকেই ব্যথিত করে তুলেছিল। কারণ কবির সৃষ্টি স্থির নয়—গতিশীল। কবির আত্মবিশ্বাস ও জীবনবোধ গতিশীল সেই চাকাকে সব সময়েই ঘুরিয়ে চলেছে—

আমার প্রথম কবিতার বই প্রকাশ হবার পর চিন্তায় ছিলাম এবার কি লিখি? ইতিমধ্যে একটি ঘটনা ঘটলো। তেমুকোতে অর্থাৎ আমার স্বগৃহে প্রায় মাঝরাত্রে পৌঁছে শুতে যাওয়ার আগে বিছানার ধারের জানালাটা খুলে আকাশের দিকে তাকাতেই নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়লাম। গোটা আকাশটা জুড়ে ঝক্‌মকে তারার দল আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। মনে হল সমস্ত তারাগুলো আমার মাথার মধ্যে এসে ঢুকে পড়লো। এক অদ্ভুত নৈসর্গিক আনন্দে, মহাকাশচারীর উত্তেজনায় আমার মন ভরে উঠলো।

সঙ্গে সঙ্গে কাগজ কলম নিয়ে সেই অনুভূতির ব্যথায় কবিতা লিখতে শুরু করলাম। মনে হল আকাশ আর তারার রাজত্ব থেকে আমার কাছে শব্দ সংযোজনের নির্দেশ আসছে—আমি শুধুমাত্র তাই লিখে চলেছি। নিজের সমুদ্রে আমি নিজেই ডুব দিয়েছি। লেখা শেষ হতে কবিতাগুচ্ছের নাম রাখলাম—"প্রদীপ্ত শিকারী"।

পরের দিন সান্‌তিয়াগো পৌঁছে আলিরো ওয়্যারজুনকে আমার সেই কবিতা শোনালাম—উনি শুনে বললেন—"তুমি ঠিক জানো উরুগুয়ের কবি—সাবাত-এর প্রভাব তোমার এই কবিতায় পড়েনি—?"

আমি উত্তর দিয়েছিলাম—"কখনোই না—এ আমার নিজের অনুপ্রেরণায় লেখা।"

উরুগুয়ের এই কবি সাবাত এরকাস্‌টি অবহেলিত কবির পর্যায়ে পড়েছিলেন যদিও তাঁর মহাকাব্য এই বিশ্বলোক, এই মহাকাশের সৌন্দর্য বর্ণনা করতে গিয়ে মহাবিশ্বের সঙ্গে এক অনিন্দ্য সুন্দর যোগসূত্র স্থাপন করেছিল। তাঁর কবিতা পড়তে গিয়ে আমি শিখেছিলাম—শুধু মানুষ নয়—প্রকৃতিরও এক সৌন্দর্য আছে। আমি ঠিক করলাম—"প্রদীপ্ত শিকারী" বইটি আমি তাঁর কাছে পাঠাবো এবং তাঁর মতামত জানবো। এই বিষয়ে ওঁর সঙ্গে চিঠি পত্রের আদান প্রদানও শুরু করলাম। কিছুদিন বাদে উত্তর পেলাম তোমার লেখা "প্রদীপ্ত শিকারী" পড়লাম। অপূর্ব, চমৎকার তোমার কবিতা, কিন্তু বলতে দুঃখ লাগছে সাবাত এরকাস্‌টির কণ্ঠস্বর তোমার কবিতায় রয়েছে।

মনে হল—অন্ধকারে এক বিদ্যুৎ চমকে সব কিছু আমার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে গেল। ভাবলাম সেই রাত্রের আকাশ সেই ঝক্‌মকে তারার দল আমায় বৃথা অনুপ্রেরণা দিয়েছিল। কোথাও নিশ্চয়ই আমার ভুল হয়েছে, যুক্তিকে মাঝে মাঝে আমায় গ্রাহ্য করতেই হবে—আমায় আরো—আরো অনেক বেশি নম্র হতে হবে। সেদিনই অনেক পাণ্ডুলিপি ছিঁড়ে ফেললাম, অনেক লেখা ইচ্ছে করে হারিয়ে ফেললাম। সেদিনই ঘরের দরজা বন্ধ করে কবিতার অলংকার সজ্জায় নেমে পড়লাম। আমার নিজের পৃথিবী—আমার নিজস্বগুণের কবিতা রচনায় ব্রতী হলাম। কবিতা গুচ্ছের নাম দিলাম—"একটি হতাশার গান আর কুড়িটি প্রেমের কবিতা"। এই কবিতাগুলো দক্ষিণ আমেরিকার সর্বনাশা অবস্থার সম্পর্কে রচিত হল। কবিতাগুলি প্রথম পড়লে মনে হতো বেদনার কবিতা, কিন্তু তার মধ্যে ছিল বাঁচার আর বেঁচে থাকার

আশ্বাসও। এই কবিতাগুলি ছিল সান্তিয়াগো শহরের সঙ্গে আমার প্রেমোপাখ্যান। ছাত্র জনতার ভিড়ে ভর্তি রাস্তা আর তারই পাশে পুষ্পলতার গন্ধে বিভোর অবহেলিত প্রেম।

ইম্পিরিয়াল নদীর ধারে পরিত্যক্ত নৌকোর মধ্যে শুয়ে তখন রম্যা রঁলার 'জঁ্যা ক্রিস্তোফ' পড়ছি। চোখের সামনে খোলা আকাশ, নাকে এসে লাগছে নদীর জলের গন্ধ—তারই মধ্যে জন্মলাভ করেছিলো আমার ওই কবিতাগুলি—একটা বন্য পাখীর আর্তনাদের মতো।

এই কবিতাগুলি সম্পর্কে পরে অনেকে আমায় প্রশ্ন করেছিলেন—কে এই দুজন মহিলা যাঁদের নিয়ে আমার এই কবিতা। আমার পক্ষে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বেশ দুরূহ ছিল। আচ্ছা ধরা যাক তাদের নাম দিলাম 'ম্যারিসল ও ম্যারি সোমব্রা'—সূর্য ও সমুদ্র, সমুদ্র ও প্রতিবিম্ব। ম্যারিসল তেমুকোর ভিজে কালো আকাশের দুটো চোখ—ঝলমলে তারার রাজ্য; নিরিবিলি পল্লী অঞ্চলের প্রেমে সে বিভোর। আমার কবিতার প্রতিটি পঙ্ক্তিতে ঝলমলে তার প্রেমের প্রকাশ। আর ম্যারি সোমব্রা শহরের গলিপথে হারিয়ে যাওয়া সেই ছাত্রী, যার মাথায় ছাই রঙের টুপি, সহজ সরল যার দৃষ্টি, মুক্ত জীবনের সোনালী গন্ধে যার সারা শরীর মন ভরপুর, শহরের চোরাপথে জীবনের সঙ্গে তার প্রথম প্রণয়।

এদিকে তখন চিলির জীবন বদলাতে শুরু করেছে।

ছাত্র সাহিত্যিক কবি এঁদের সঙ্গে চিলির প্রতিটি মানুষ ধনতন্ত্রবাদী ও অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলনে নেমেছে। এরই মধ্যে প্রগতিবাদী জনপ্রিয় রাজনীতিবিদ্ মধ্যবিত্ত আরতুরো আলেসান্দ্রি পামা তাঁর জ্বালাময়ী অগ্নিগর্ভ বক্তৃতা দিয়ে চিলিকে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এলেন। তুরো আলেসান্দ্রি পামা প্রজাতন্ত্রী চিলির প্রথম রাষ্ট্রপতি হলেন। কিন্তু চরম ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ হয়েও, রাজতন্ত্রের শাসকগোষ্ঠী তাদের হিংস্র থাবা দিয়ে তাঁকে শীঘ্র কাবু করে তাদের কব্জার মধ্যে নিয়ে এলো। এর ফলে চিলিতে আবার নেমে এলো তিক্ততা আর অশান্তি।

এই সময়েই শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন লুই এ্যামিলো রিকাবারেন। সমস্ত সর্বহারা মানুষদের একত্রীভূত করে সুসংবদ্ধ যুক্ত সমিতি তৈরি করলেন রিকাবারেন। সারা দেশ জুড়ে অন্ততঃ দশ-বারোখানি শ্রমিকশ্রেণীর সংবাদপত্র প্রকাশ করলেন তিনি। চিলিতে তখন প্রচণ্ড বেকার সমস্যা। আমি তখনও ছাত্র ফেডারেশনের মুখপত্র ক্ল্যারিদাদ-এ নিয়মিত লিখে চলেছি। আমরা এই সর্বহারা নিপীড়িত মানুষ ও বেকার যুবকদের সমর্থনে আন্দোলন শুরু করেছি। সান্তিয়াগোর রাস্তায় পুলিস তখন মারধোর শুরু করে দিয়েছে আমাদের ওপর। ন্যায়সঙ্গত প্রতিবাদ আন্দোলন ও তার অবর্ণনীয় নিষ্ঠুর দমনে সমস্ত চিলি তখন বেদনায় জর্জরিত।

সেই সময় থেকেই রাজনীতি আমার কবিতা ও আমার জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গেল। কবিতায় যেমন আমি পারিনি রাস্তার দিকের দরজা বন্ধ করে দিতে, তেমনি সম্ভব হয়নি প্রেম আনন্দ ও জীবনের দরজাগুলি বন্ধ করে কবিতা লিখতে।

শব্দ বাক্‌ ব্রহ্ম

বলুন আপনাদের যা ইচ্ছে হয়, কিন্তু মনে রাখবেন শব্দই গান গেয়ে ওঠে—কখনো অনেক উর্ধ্বে ওঠে আবার কখনও বা নেমে আসে নীচে।—এই শব্দরাশির কাছে আমি আমার প্রণতি রাখছি। শব্দকে আমি ভালোবাসি, কখনও তাকে আঁকড়ে ধরি—কখনো তার পিছনে ছুটি আবার কখনও বা দাঁত দিয়ে চেপে ধরি শব্দটিকে।—কখনও বা শব্দের মধ্যেই বিলীন হয়ে যাই। আবার সময় সময় থমকে দাঁড়াই, যদি আকাঙ্ক্ষিত কোনো শব্দ তারার মতো খসে পড়ে আমার সামনে। স্বরবর্ণ আমি ভালোবাসি। কখনও চকমকি পাথরের মতো ঝলসে ওঠে কখনো আবার রুপোলীগাছের মতো লাফিয়ে মিলিয়ে যায় অতলে।—ওরা ফেনা…সুতো, গলিত ধাতুর ফোঁটা।—

শব্দ! কি অপূর্ব।—শব্দকে আমি আমার কবিতার মধ্যে ধরে রাখতে চাই।—আমার পাশ দিয়ে গুন্‌গুন্‌ ধ্বনি তুলে সেই শব্দ যখন চলে যায় তখন তাকে আমি আমার জালে ধরে ফেলি।—তারপর খোসা ছাড়িয়ে পরিষ্কার করে কাচের পাত্রে মেলে ধরি, দেখি স্ফটিকের মতো তার অঙ্গবিন্যাস—স্পন্দিত…গজদন্তের মতো শুভ্র, তৈলাক্ত ফলের মতো—শ্যাওলার মতো—মহামূল্য মণির মতো। তারপর আমি তাদের নাড়তে থাকি।—ঝাঁকানি দিই, তাদের পান করি।—এরপর একসময় কাচের পাত্রের চারপাশে সাজাই, নিরীক্ষণ করি, তারপর হঠাৎ তাদের ছেড়ে দিই আমার কবিতায়—দেখতে ছোট জলার মতো—কখনও পালিশকরা কাঠের ওপর রুপোর মতো, কখনও কয়লার টুকরোর মতো। আবার ভাঙা জাহাজের টুকরো বা সমুদ্রের ঢেউয়ের মতোও দেখায়।

শব্দের মধ্যে সব কিছুই থাকে। একটা কল্পনা—তার সবটাই বদলানো যায়। যদি কোনো শব্দকে সরিয়ে অন্য কোথাও দিই অথবা কোনো একটা শব্দবিন্যাসের মধ্যে যদি ময়লা জলের মতো অন্য একটা শব্দকে এনে জুড়ে দিই, যে শব্দকে আশা করা যায়নি—তাহলেও তার আদেশ সেই শব্দবিন্যাস শুনতে বাধ্য হয়। নদীর ধার দিয়ে গ্রামের পর গ্রামের মেঠো রাস্তা ধরে…শেকড় থেকে লম্বা গাছের ওপর দিয়ে শব্দ যখন গড়িয়ে চলে আসে…তখন তার চারপাশে সে জড়ো করে ছায়া…স্বচ্ছতা…ওজন…পালক আর কেশগুচ্ছ। কত না অনাদিকালের প্রাচীন এই শব্দ আবার কত না নবীনত্ব তার সারা অঙ্গে। কখনও সে লুকোয় নীলামে বিকিয়ে যাওয়া শবযানের মধ্যে আবার কখনও লুকোয় ফুটন্ত ফুলের পাপড়ির মধ্যে। কি অপূর্ব এই ভাষা যা আমি বংশানুক্রমে পেয়েছিলাম, যা দুর্দান্ত বিজেতার কাছ থেকে আমার দেশে এসেছিল—যারা একদিন সোনা তামা আলু ভুট্টা আর ডিমের খোঁজে দড়ি-টানা যানে বা অশ্বপৃষ্ঠে চড়ে শ্রমসাধ্য অসমতল আমেরিকার মাটি মাড়িয়ে ঢুকেছিল আমার দেশে।—কি লোভী আর কি ক্ষুধার্ত ছিল ওরা!—সামনে যা পেলো তাই গ্রাস করলো।—ধর্ম-ভক্তি-স্মৃতিস্তম্ভ-জাতি। যে পথ দিয়েই ওরা গিয়েছিলো সেখানকার মাটিকেই ধ্বংসস্তূপে

Spaniards

পরিণত করেছিল ওরা। কিন্তু ঐ সব বর্বর বিজেতার পায়ের তলা থেকে, তাদের দাড়ি থেকে, শিরস্ত্রাণের ভেতর থেকে চকমকে নুড়ি পাথরের মতো শব্দগুলো ঝরে পড়েছিলো, ঝলমল করে উঠেছিলো রাস্তার ধারে—সেই শব্দই হলো একদিন আমার ভাষা। আমরা হেরেছি আবার জিতেওছি। ওরা লুঠ করে নিয়ে গেল সোনা—আবার ফেলে রেখেও গেল সোনা—ওরা আমাদের সর্বস্ব লুঠ করে নিয়ে গেল, আবার রেখে গেল ওদের সব কিছুই। আমাদের জন্য সেদিন ওরা ফেলে গিয়েছিলো শব্দরাজি—যা দিয়ে তৈরি আমার অপূর্ব সুন্দর ভাষা।

৩

পৃথিবীর রাজপথে

ভালপারাইসোর রাস্তায়

সান্‌তিয়াগোর খুব কাছেই এই শহর ভালপারাইসো—কিন্তু দুটিতে কতো তফাত! 'সান্‌তিয়াগো' তুষার স্তূপে বন্দী আর ভালপারাইসোর রাস্তা সমুদ্রের ধার ঘেঁষে—শহরের চেঁচামেচি আর শিশুদের আনন্দোচ্ছল দৃষ্টির সম্মুখে উন্মুক্ত। এই দুটি শহরের মাঝখানে এক বিরাট অমসৃণ পর্বত—কাঁটায় ভরা, লম্বা, পুষ্পিত ক্যাকটাসে ভরা।

আমাদের অর্থাৎ কবি সাহিত্যিক ও শিল্পীদের কুড়ি বছর বয়সের যৌবনের এক বন্য উন্মাদনাময় মুহূর্তে অনিদ্র—অভুক্ত—পকেটে নেই পয়সা—ভোর হলেই ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় বসতাম—ভালপারাইসো তার চুম্বকময় হৃৎপিণ্ডের ধ্বনি শুনিয়ে আকর্ষণ করতো আমাদের।

অনেক বছর আগে মাদ্রিদে থাকার সময় ঠিক এই অবর্ণনীয় আকর্ষণ অনুভব করেছিলাম। সরাইখানা থেকে বেরিয়ে থিয়েটার দেখে রাত্রে ফিরছি অথবা এমনিই হেঁটে চলেছি হয়তো—হঠাৎ মনে হতো ভালপারাইসো ভৌতিক স্বরে এই

নীরবতার মধ্যে আমায় ডাকছে। সেই রাতেই আমার মতো পাগল একদল বন্ধু নিয়ে—নড়বড়ে ফ্যাকাশে সেই নগর-দুর্গের দিকে রওনা হয়েছি—জামা-কাপড় পরে পাথরের সেতুর নীচে বালির ওপর শুয়ে রাত কাটিয়েছি।

কতবারই তো ভালপারাইসোতে গেছি কিন্তু কেন জানিনা একটা দিনের কথা আমি কখনও ভুলতে পারবো না। একবার একজন শিল্পী ও কবিকে বিদায় সম্ভাষণ জানানোর জন্য ফ্রান্সে যেতে হয়েছিল। তৃতীয় শ্রেণীতে গিয়েও আমাদের কাছে এমন পয়সা ছিলো না যাতে সেখানকার সবচেয়ে নীচু মানের হোটেলে থাকা যায়। তাই সকলে মিলে ঠিক করলাম রাত্রিটা অপরূপ এই ভালপারাইসোয় আমাদের উন্মাদ বন্ধু ন্যোভয়্যার কাছেই কাটাবো। উঁচু-নীচু পাহাড় পেরিয়ে ন্যোভয়্যা নিয়ে গেল তার বাড়িতে।

সেন্ট ক্রিস্টোফারের মতো লম্বা মানুষ ন্যোভয়্যা, সে তার দাড়ি আর ইয়া বড় গোঁফ নিয়ে বিশ্বাস করতো প্রকৃতি আর প্রাকৃতিক চিকিৎসায়। তার বিশ্বাস ছিলো শরীর আর মাটি এক—মাটির মধ্যেই লুকিয়ে আছে স্বাস্থ্য আর অমরত্ব। নিরামিষাশী শাকাহারে বিশ্বাসী আমাদের এই বন্ধুটি ছিলো ভালপারাইসোর প্রকৃতির সন্তান। তার বিরাট দেহ আর তার গম্ভীর গলার আওয়াজ শুনলে মনে হতো আমরা যেন ওর শিষ্য।

সে রাতে ন্যোভয়্যার দু'কামরার ছোট্ট বাড়িটায় শোবার ঘরে আরাম কেদারায় শুলাম, আমার বন্ধুরা শুলেন মেঝেয় খবরের কাগজ বিছিয়ে। তবে ভিক্টোরিয়ান যুগের প্রশস্ত আরাম কেদারায় শুয়েও ঘুম আসছিলো না আমার, কিন্তু বন্ধুরা এর মধ্যেই নাক ডাকাতে আরম্ভ করেছে।

মাঝে মাঝে জাহাজের বাঁশির শব্দ আর খোলা আকাশের মাঝে ধ্রুব নক্ষত্র—ভালপারাইসোর সেই রজনীকে আমার খুব কাছে এনেছিল। এমন সময় হঠাৎ একটা চেনা অপ্রতিরোধ্য গন্ধে আমার ঘ্রাণশক্তি আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। মনে হলো শহরের শোরগোলে যে জীবনটা হারিয়ে ফেলেছি সেই শৈশব আর কৈশোর-জীবন আজ হঠাৎই ফিরে এলো আবার! পাহাড়ী সেই গন্ধ সেই সব অজানা ফল-ফুল আর গাছের সৌরভ আমার ইন্দ্রিয়গুলোকে মোহাচ্ছন্ন করে তুললো। মনে হলো মাটি আর মাটির সোঁদা গন্ধ আমার শৈশব আর কৈশোর ছাড়িয়ে আজ যেন যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হতে চলেছে।

অন্ধকারের মাঝেই আঙুল বাড়িয়ে সামনের আলমারির দেরাজ খুলতে হাতে ঠেকলো অনেকগুলো গাছের পাতা, শুকনো ফুল আর ফল। বুঝলাম—গন্ধটা ওখান থেকেই আসছে। আমার এই প্রকৃতিবাদী বন্ধু ন্যোভয়্যা বন-জঙ্গল আর পাহাড়-পর্বত ঘুরে এসব এনে জড়ো করেছে—স্বাস্থ্য আর অমরত্বের লোভে! চোখের সামনে ভেসে উঠলো বিশালদেহী বন্ধু ন্যোভয়্যা—সে যেন হাঁটু মুড়ে মাটিতে নুয়ে জঙ্গল আর পাহাড়ের মাঝে খুঁজে চলেছে প্রকৃতিকে। তার প্রশস্ত হাত দিয়ে কুড়িয়ে চলেছে প্রকৃতির সম্পদ। পর মুহূর্তেই আমার সমস্ত ঘোর কেটে গেল, সেই সব বন-সম্পদের গন্ধে আচ্ছন্ন হয়ে তাদেরই নিরাপদ ছায়ার মধ্যেই কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম মনে নেই।

আঁকাবাঁকা রসসিক্ত হাওয়ায় উত্তাল ভালপারাইসো। ঝরণার মতো দারিদ্র্য পাহাড়ের ওপর দিয়ে গড়িয়ে আসে। প্রতিটি মানুষ জানে এখানকার কতো মানুষ খেতে পায় আর কতো মানুষ খেতে পায় না।—কি জামা-কাপড় তারা পরে আর কি পরতে পায় না। অতৃপ্ত ভালোবাসার ওপর দিয়ে কত লক্ষ মানুষের নগ্ন পদ দুটি চলে যায় ভাবাই যায় না! সমুদ্রতটের রাস্তার ধারে কিছু কিছু বড় বারান্দাওলা বাড়ি দেখা যায় যাদের জানালাগুলো কখনও খোলে না। ঠিক এমনই একটি বাড়ি ছিলো এক পর্যটকের। তাঁর দরজায় গিয়ে একদিন পেতলের কড়াটা নাড়তে দরজাটা একটু ফাঁক করে একজন আয়া এসে মুখ বার করতে আমি ওঁকে জানালাম আবিষ্কারককে দেখার ইচ্ছার কথা।

পর্যটক ভদ্রলোকটি এক বৃদ্ধ ভৃত্য আর আয়াদের নিয়ে এই বিরাট বাড়িটির জানালা-দরজা বন্ধ করে বসবাস করেন। ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হতে তাঁকে বললাম—আপনার সংগ্রহশালা দেখবো। তিনি রাজী হলেন। দেখলাম বাড়িটির দরদালান আর দেওয়ালভরা তীব্র লাল রঙের নানান্ প্রাণী—নানান্ রঙের মুখোস আর সমুদ্র দেবতার রঙীন রঙীন সব শিলামূর্তি। আর দেখলাম পলিনেশিয়ান পরচুলা, নেকড়ের চামড়া দিয়ে তৈরি বিরাট ঢাল।—হাঙরের দাঁতের মালা—বড় বড় দাঁত যা হয়ত সমুদ্রের বুকে ঢেউ তুলে ঘুরে বেড়াতো। আরও দেখলাম—অন্ধকার কক্ষে ঝিকমিকিয়ে ওঠা রুপোলী তলোয়ার আর ছুরির শীর্ষদেশ। নজরে পড়লো কাঠের তৈরি কয়েকটি পুরুষ-মূর্তি—যাদের উত্থিত পুরুষাঙ্গগুলো কেটে কাপড়ে ঢেকে সরিয়ে রাখা হয়েছে। কাপড়টি দেখে মনে হলো তাঁর ভৃত্য বা আয়াদের মধ্যে কারোর অঙ্গবাস সেটি।

বৃদ্ধ পর্যটক ঘরের পর ঘর একের পর এক ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাঁর সংগ্রহশালা দেখাবার সময় কিছুটা চরম, আবার কিছুটা ব্যঙ্গাত্মক যুক্তিতে বোঝাতে চাইলেন নিজের ভাবমূর্তির ঔজ্জ্বল্য, দেখালেন আগ্নেয়াস্ত্র—যা দিয়ে এক সময় তিনি শত্রুকে বশীভূত করতেন এবং হিংস্রপ্রাণী ও হরিণ শিকার করেছিলেন। সারাক্ষণই তিনি সেই চাপা ও গম্ভীর গলায় কথা বলে গেলেন।

এক সময় দেখলাম ঘরের অন্ধকার ভেদ করে যেন একটুখানি সূর্যরশ্মি কিম্বা ক্ষুদ্র একটি প্রজাপতি দেবমূর্তিগুলোর আশপাশ দিয়ে উড়ে গেল।

সব কিছু দেখার পর বেরিয়ে আসার সময় যখন বললাম—সামনের দ্বীপগুলোতে যাবার ইচ্ছে আছে তখন আমার কানের কাছে মুখ এগিয়ে এনে উনি চুপি চুপি বললেন—দেখো, সে যেন দেখতে না পায়!—তাকে যেন জানতে দিয়ো না যে আমিও প্রস্তুত হচ্ছি একটা অভিযানের জন্য। এরপর মুখে একটা আঙুল রেখে চুপ করে রইলেন। দেখে মনে হলো জঙ্গলের মধ্যে যেন কোন এক বাঘিনীর পায়ের শব্দ তিনি শুনতে পেয়েছেন। তারপর দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। আফ্রিকার জঙ্গলে যেন রাত্রি নেমে এলো।

পর্যটকের বাড়ি ছেড়ে এগোলাম, প্রতিবেশীদের জিজ্ঞাসা করে জানতে চাইলাম —এখানে এমনি ধরনের আর কোনো ছিটগ্রস্ত ব্যক্তি আছেন কিনা। ভালপারাইসোতে তাহলে আরো কিছুদিন থাকা যাবে। শুনে প্রতিবেশীরা বললেন—আর তো কাউকে

মনে পড়ছে না। তবে রাস্তার দিকে নামলে হয়তো ডন বারতোলেমির সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে।

—কি করে তাঁকে চিনবো? জিজ্ঞেস করলাম।

—ভুল হবার কোনো উপায় নেই। দেখবেন সুন্দর একটা ফিটন গাড়ি চড়ে তিনি আসছেন।

কয়েক ঘণ্টা পরে একটা দোকানে আপেল কিনছি এমন সময় দেখলাম সেই দোকানের সামনে একটি ফিটন গাড়ি এসে থামলো। একজন লম্বা-চওড়া নির্লিপ্ত চেহারার মানুষ সেই গাড়ি থেকে নামলেন। তাঁর কাঁধের ওপর থেকে সুন্দর সবুজ রঙের একটি টিয়াপাখি উড়ে এসে বসলো আমার মাথায়। ওড়বার সময় লোকটি তাকিয়েও দেখলেন না যে তাঁর পাখিটি কোথায় গিয়ে বসছে! তিনি তখন আপেলের দাম জানতে ব্যস্ত।

জিজ্ঞেস করলাম—আপনিই কি ডন্ বারতোলেমি?

—ঠিকই বলেছ, আমিই। জবাব দিয়েই তিনি গোলাপ ফুলের মতো হাতলওলা তরবারিটি কারুকার্য করা পুরোনো খাপ থেকে বের করে আমার হাতে দিয়ে খালি খাপটার মধ্যে আঙুর আর আপেল কিনে ভরলেন।

কোনওদিন যাঁকে দেখিনি, যাঁর সঙ্গে কোন সূত্রেই জানাশোনা নেই, মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাঁকে অনুসরণ করে শ্রদ্ধাবনত হাতে তাঁর গাড়ির দরজা খুলে ধরলাম। তিনি গাড়িতে বসতে তলোয়ার আর পাখিটি তুলে দিলাম তাঁর হাতে। গাড়ি চলে গেল। আমিও নিজের পথ ধরলাম। পথ চলতে চলতে ভাবতে লাগলাম—সরকারী গুদাম ঘরে পড়ে থাকা আসবাবপত্রের মতোই ছিল ভালপারাইসোর পৃথিবী।—কার জিনিস, কোথা থেকে এলো—কোথায় কার কাছে তারা যাবে—কেমনভাবেই বা এলো—কেউই জানতো না। এই অন্ধকার জগতের মধ্যেই ভালপারাইসোর আত্মায় মিশেছিল সমুদ্রের লোনা জল, জলের ফেনা আর তার দুরন্ত গুঞ্জনধ্বনি। উত্তাল ভয়ংকর সমুদ্র আর তার সীমাহীন গতির মধ্যে রচিত হয়েছে ভালপারাইসোর স্বপ্ন।

আশ্চর্য লাগতো—বাতিকগ্রস্ত এই সব মানুষগুলো ভগ্ন হৃদয় ভালপারাইসোর সঙ্গে একসাথে মিশে রয়েছেন কেমন করে! পাহাড়ের চূড়োয় দারিদ্র্যের মধ্যে মিশতো আলকাতরা আর আনন্দ। উপকূলের ধারে স্তূপাকৃতি এক কোমর সমান কাজের চিহ্ন—যা শ্রমিকদের দীর্ঘ পরিশ্রমে জড়ো হয়েছে। মনে হবে ওটা একটা মুখোস—যার মধ্যে আসা-যাওয়া করছে ওদের মুখ। প্রতিটি মানুষ তার জীবনের অভ্যন্তরে লুকিয়ে রাখতো নিজের পাওয়া সমুদ্রের সম্পদ। যতক্ষণ না জীবনের সেই চরম মুহূর্ত আসতো—ওঁরা যক্ষের মতো আগলে রাখতেন, তাকিয়ে থাকতেন অভ্যন্তরে—সযত্নে রক্ষিত সেই সম্পদের দিকে।

মাঝে মাঝে ভালপারাইসো আহত তিমি মাছের মতো শিউরে উঠতো, যন্ত্রণায় লাফ দিয়ে উঠে ক্ষণিকের জন্য সে প্রাণ হারাতো, আবার ফিরে আসতো তার প্রাণ।

শহরের প্রতিটি স্থানীয় মানুষের স্মৃতিতে ভালপারাইসোর ভূমিকম্প অনেকখানি জুড়ে থাকতো। ভীত পাপড়ির মতো শহরের প্রাণটিকে সে জড়িয়ে ধরে রাখতো। প্রতিটি মানুষ জন্মের আগেই বীরপুরুষ হয়ে জন্মাতেন। কারণ এই বন্দরের

স্মৃতিতে পরাজয়ের দিনও রয়েছে।—যখন সে ভয়ংকর আর্তনাদ করে কেঁপে কেঁপে উঠতো—তখন মাটির নীচের গুড়-গুড় আওয়াজ শুনে মনে হতো—মাটির তলায় সমুদ্রের নীচে কোথাও যেন একটা ঘণ্টা বাজিয়ে মানুষকে বলা হচ্ছে—তৈরি হও, তোমরা সব তৈরি হও তোমাদের শেষের দিন সমাগত।

মাঝে মাঝে দেওয়াল ছাদ সব যখন ধুলোর ঝড়ে পরিণত হতো, যখন তীব্র আর্তনাদের পরেই আসতো নির্বাক হওয়ার সময়—মনে হতো সব কিছুকেই চিরকালের মতো মৃত্যু নিথর আর নিরুত্তর করে দিয়েছে। সেই সময়ে সমুদ্রের ওপর থেকে শেষ আবির্ভাবের মতো বিরাট সবুজ হাত মেলে জীবন্ত সব কিছুকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য ধেয়ে আসতো পর্বতপ্রমাণ ঢেউ।

ভালপারাইসোর মতো সিঁড়ি দিয়ে গড়া শহর ইতিহাসে আর কোথাও নেই। পৃথিবীতে আর কোনো শহরের মুখে এমন গভীর ক্ষতের দাগ আর নেই,—যা দেখে মনে হতে পারে জীবন স্বর্গের খোঁজে এই পথ দিয়ে বা নরকের খোঁজে এই পথ দিয়ে যাওয়া-আসা করেছে। সিঁড়ির মাঝপথে ঘন কাঁটাগাছের ওপর রক্তবর্ণের ফুল। এশিয়া থেকে জাহাজে ফিরে নাবিক যে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসে হয়তো বা পায় শুভাগমনের স্মিত-হাসির অভ্যর্থনা—নয়তো দেখে অসহ্য যন্ত্রণাময় শূন্য ঘর।—অথবা রাতের আঁধারে মদ্যপ যে সিঁড়ি দিয়ে উল্কার মতো গড়িয়ে পড়ে যায়—ভালপারাইসোর সেই সিঁড়ি দিয়েই ঊষাকালে সূর্য আসে পাহাড়কে তার প্রেম নিবেদন করতে। এই সিঁড়ি বেয়ে যদি সবাই ওঠা-নামা করতে পারি তবে আমরাও পৃথিবী পরিক্রমণ করতে পারবো।—ও আমার দুঃখী ভালপারাইসো—কেন তুমি দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের এই নিঃসঙ্গতার মধ্যে জন্মালে—কেন এই চলমান নক্ষত্র আর উজ্জ্বল তারকামণ্ডলীর সংগ্রামকে সাথী করে বেঁচে রইলে? রাতের জোনাকির আলোয় ভরা পর্বতমালা—একটি ছোট্ট উপগ্রহের মতো তুমি জ্বলতে থাকো।—মনে হয় যেন ক্যাসিয়োপিয়া তার চুলের গুচ্ছ স্বর্গের জানালা খুলে ছড়িয়ে দিয়েছে আর দক্ষিণের তারা কক্ষপথ রচনা করেছে—আলোর আভা ছড়িয়ে। হঠাৎ মনে হয় লোমশ স্যাজিটেরাস তার লোমের ভেতর থেকে একটা পোকা অথবা তার পায়ের তলা থেকে এক খণ্ড হীরের টুকরো ফেলে দিয়ে গেল। ভালপারাইসোর জন্ম হয়েছিল আলোর রাজ্যে—তার চকমকে তীর জুড়ে ফেনার রাজত্ব।

জাহাজগুলো যেতো সমুদ্র-দানব হাঙরের খোঁজে বা কালিফোর্নিয়া থেকে স্বর্ণ আহরণ করতে। সব শেষে সপ্ত-সমুদ্র পেরিয়ে চিলির মরুভূমি থেকে নিয়ে আসতো সেইসব রাসায়নিক পদার্থ যা পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায় না।

এই ছিলো তার দুঃসাহসিক অভিযান।

অভিযান শেষে সরু গলিগুলো ভর্তি হয়ে যেতো কতো না দেশের কতো না জাতের নাবিকের দলে। জলে ভেজা আমার ভালপারাইসোর মানুষগুলোর সঙ্গে চলতো মদের তুফান আর রাতভোর নাচ—তারপর এক সময় বিছানার চাদরে ডাক পড়তো ওদের সর্বনাশের।

কোনো জাহাজে আসতো একটা বিরাট আর সুন্দর পিয়ানো, কোনোটাতে গগ্যাঁর পেরুভিয়ান দিদিমা 'ফ্লোরা ত্রিসতানে'র ছবি। আবার কোনোটায় আসতো রবিনসন

কুশোর ব্যবহৃত কিছু সামগ্রী। কোনোটায় বা আসতো আনারস, কালো কফি, গুয়াকুইএল-র কলা, আসামের চা অথবা স্পেনের মোজা।

কোনও রাস্তা ভরে থাকতো দারুচিনির গন্ধে, কোনোটা বা চা-কফির সুবাসে—কোথাও বা আপেলের গন্ধে। সব কিছু ছাপিয়ে চিলির সমুদ্র থেকে ভেসে আসতো সামুদ্রিক উদ্ভিদের সোঁদা সোঁদা গন্ধ।

ভালপারাইসো তারপর জেগে উঠতো কমলালেবুর গাছের মতো, পাতাভরা গাছের তলায় থাকতো ছায়া আর গাছভরা উজ্জ্বল কমলালেবুর সারি। ভালপারাইসো চেয়েছিল তার চূড়া থেকে সানুদেশ পর্যন্ত সমস্ত প্রাণেরই বিনাশ ঘটবে। কিন্তু মৃত্যু-বিমুখ এক পরম আকাঙ্ক্ষা ভালপারাইসোর বাড়ি-ঘর-মানুষ আর ফুলে ফলে ভরা জঙ্গলকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে রয়েছে। কোথাও সবুজ, কোথাও বা লাল, কোথাও আবার বেগুনী-লাল, গেরুয়া—এমনিতর সারা অঙ্গে নানান্ রঙ মেখে ভালপারাইসোর বাড়ি-ঘর গাছপালা—সবই এক অজানা আতঙ্কে জেগে রয়েছে।

সুবাসভরা ভালপারাইসোর আহত পাহাড়ের কোলে আমি জীবনের অনেকটা সময়ই কাটিয়েছি। রাস্তা ধরে নেমে এসে ছেলেদের ছোট্ট সাজানো খেলার মাঠের ধারে কাটা তরমুজে মুখ ডুবিয়ে একটা মেয়েকে আকণ্ঠ রস পান করতে দেখেছি। কখনও বা কোন নাবিক তার প্রেমিকার গায়ের গন্ধে-ভরা সুবাস আমার নাকে ছুঁইয়ে বেরিয়ে গেছে। কখনও চোখে পড়েছে গাধার পিঠে চড়ে পেঁয়াজের পাহাড় চলেছে। আবার কখনও দেখেছি দোকানের আলমারিতে সাজানো জীবন আর মৃত্যুর রসে ভরা সারি সারি বোতল দাঁড়িয়ে রয়েছে।

না, আমি পারবো না—।

ভালপারাইসোকে জানতে হলে তাকে নিবিড়ভাবে পেতে হলে আমায় কোনো অষ্টবাহুযুক্ত অস্বাভাবিক প্রাণী হতে হবে—যাতে করে সব ক'টি বাহু মেলে আপনজনের মতো তার বিরাট হৃদয়টিকে জড়িয়ে ধরতে পারি—নানান্ রঙের সমারোহে ভরা যার উজ্জ্বল কটিদেশ থেকে উঠে এসেছে সুতীক্ষ্ন মাথার চূড়া, যার পাশে রয়েছে অতল গহ্বরের আলোকহীন অন্ধকার।

গর্তের মধ্যে বাণিজ্যদূত

স্কুলে পাওয়া সাহিত্য-পুরস্কার—আমার নতুন বইয়ের কিছুটা জনপ্রিয়তা—আর আমার মাথার সেই টুপি—তখনকার শিল্পীমহলে আমায় কিছুটা সম্মান এনে দিয়েছিলো। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে সাংস্কৃতিক জগতে প্রবেশ করার ছাড়পত্র ছিলো প্যারি—য়ুরোপের সমস্ত সংস্কৃতির যেখানে জন্ম। অবশ্য অতি বিরল কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া। পৃথিবীর প্রতিটি গণতান্ত্রিক দেশেই কিছু সেরা মানুষ থাকেন, যাঁরা শাসকগোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষক। সাহিত্যেও তার ব্যতিক্রম অবশ্য নেই। আমাদের দেশেও তার ব্যতিক্রম ছিলো না। এবং সেই সকল সাহিত্য-শিল্পরসিকরা বেশিরভাগ সময়েই প্যারিসে

কাটাতেন। আমাদের মধ্যে সেই রকমই একজন সেরা কবি 'ভিনসেণ্ট হ্যুউদোব্রো', শুধু যে তিনি প্যারিসেই থাকতেন তাই নয়, কবিতাও লিখতেন তিনি ফরাসী ভাষায়, নিজের নামও বদলে ফরাসীতেই লিখতেন।

রাস্তায় কোনো কোনো লোক আমায় দেখলেই বলতেন—একি পাব্লো, তুমি এখনও এখানে পচে মরছো! প্যারিতে যাও, আজই যাও। এরপর আমারই এক বন্ধু বিদেশদপ্তরে গিয়ে আমার প্যারিস যাওয়ার জন্য এক উচ্চপদস্থ কর্মীর সঙ্গে কথা বললেন। সেই কর্মীটি আমার কবিতার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তার কিছু উদ্ধৃত করছি:

—বসো, বসো; ঐ আরাম কেদারায় বসো। আরাম করে বসো। ওই জানালা দিয়ে নীচে রাস্তায় তাকিয়ে দেখ—সামনের মাঠে ক্যার্নিভ্যাল হচ্ছে, রাস্তায় মানুষ হেঁটে যাচ্ছে। কত রঙ-বেরঙের নানান্ রকম গাড়ি সদর্পে ছুটে চলেছে।—এসবই আমার দম্ভ।—বুঝেছ হে!—এসবই আমার দম্ভ। ছোক্রা কবি, তুমি তো ভাগ্যবান। সামনের ওই বড় বাড়িটা দেখেছ?—ওটা আমাদেরই বাড়ি। কিন্তু দেখ আমায়, এই ছোট্ট একটা ঘরে আমলাতন্ত্রের ফাঁসে আমি বন্দী হয়ে রয়েছি।—যেখানে মূল্যবোধের প্রয়োজন সেখানে আমি নিঃস্ব। তোমার চায়কোভস্কির সিমফনি ভালো লাগে?…

প্রায় একটি ঘণ্টা তাঁর সঙ্গে শিল্পালোচনা করে ওঠার সময় আমার কাঁধটা চাপড়ে উনি বলেছিলেন, এই বাণিজ্যদূতের দপ্তরে আমিই সর্বেসর্বা।—তুমি চিন্তা ক'রো না। ধরে নিতে পারো বিদেশে কোনো এক জায়গায় তোমার চাক্রি হয়ে গেছে।

তারপর দুটি বছর চলে গেছে। এর মধ্যে যখনই তাঁর দপ্তরে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেছি, তিনি ঘণ্টা বাজিয়ে কোনো কর্মচারীকে ডেকে আমায় দেখিয়ে বলতেন: আর নয়, আর ক'টা দিন—এর পরেই তো এই কবি আমাদের মায়া ত্যাগ করবেন।

হয়তো আমার প্রতি সত্যিই তাঁর মমতা ছিলো। নৃবিদ্যা থেকে আত্মবাদ—বীরধর্ম থেকে কুলুজিতত্ত্ব—সব বিষয়েই তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা করতেন। কখনও বা তারই মাঝে আসতো ইংরাজী উপন্যাসের ধারা। আলোচনা শেষে ওঠার সময় কানের কাছে মুখ এনে বলতে ভুলতেন না যে, আমার বিদেশে চাকরি বাঁধা। ওঁর সঙ্গে কথা বলে উঠে আসার পরই কেমন যেন মনে হতো আমার—আমি একজন বিদেশী দূত! এর ফলে আমার জাঁকালো ভাব দেখে বন্ধুরা আশ্চর্যান্বিত হতো, তাদের সেই ভাব কাটাবার জন্য আরও জরুরী ব্যস্ততার ভাব দেখিয়ে বলতাম—য়ুরোপে যাবার প্রস্তুতি চালাচ্ছি।

এই রকমই চলতে লাগল। এর মধ্যে আমার বন্ধু বিয়ানচি সমস্ত ঘটনা জানতে পারলেন। চিলির সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলে বিয়ানচি যাঁর আত্মীয়স্বজনের মধ্যে কেউ নামকরা গায়ক, কেউ জনপ্রিয় পিয়ানোবাদক, কেউবা এ্যান্ডিস শৃঙ্গ বিজেতা। এই বন্ধুটি ছিলেন রাষ্ট্রদূত, বিদেশ দপ্তরের সব কিছুই তাঁর নখদর্পণে। তিনি আমায় একদিন প্রশ্ন করলেন, কি হে, তোমার নিয়োগপত্র এখনও পাওনি? চলো, বিদেশ-মন্ত্রীর কাছে নিয়ে যাই তোমাকে।

সেদিন আর্দালী আর কর্মচারীদের সেলাম নিতে নিতে মার্বেল পাথরের সিঁড়ি দিয়ে বিয়ানচির হাত ধরে উঠে বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে যাবার কথা কল্পনায়ও আনতে পারিনি। বিদেশমন্ত্রী মানে মন্ত্রীদপ্তরের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তির সঙ্গে দেখা

করা—একথা ভাবতে গিয়েই হতচেতন হয়েছিলাম। বেঁটেখাটো মানুষ এই মন্ত্রীটি নিজের খর্বতা ঢাকার জন্য একটি ছোট চেয়ারে লম্বা হয়ে বসে আমার বন্ধুর প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন। বিয়ানচি তাঁকে বোঝাতে চাইলেন চিলি ছেড়ে যাবার জন্য আমি কতখানি উদ্‌গ্রীব।

মন্ত্রী মহাশয় ঘণ্টা বাজালেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমার আত্মার রক্ষক এসে হাজির হলেন। মন্ত্রী প্রশ্ন করলেন—কোন্ কোন্ দেশে আমাদের বাণিজ্যদূতের পদ খালি আছে?

মার্জিত উচ্চপদস্থ সেই ব্যক্তিটি আজ আর চায়কোভস্কির সিম্‌ফনির আলোচনায় বসতে পারলেন না, আমতা আমতা করে অনেক দেশেরই নাম বললেন তার মধ্যে একটা হচ্ছে রেঙ্গুন। আমার কানে সুরের মতো বাজলো নামটা।

মন্ত্রী মহোদয় জিজ্ঞেস করলেন, পাব্‌লো, কোথায় যেতে চাও বল।

বিনা দ্বিধায় আপনা হতেই আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো—রেঙ্গুন।

—এখনি ওর নিয়োগপত্র দিয়ে দাও। আদেশ দিলেন মন্ত্রী মহোদয়। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই নিয়োগপত্রটি হাতে পেলাম।

বিদেশদপ্তর থেকে ফিরে যখন আমার দরিদ্র বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হলাম আমার নতুন খ্যাতির অনুষ্ঠানে, দেখলাম নতুন দেশের নামটা ভুলে গেছি। আনন্দের আতিশয্যে সেদিন ওদের বলেছিলাম, পৃথিবীর মানচিত্রের পূর্বদিকে যে একটা বিরাট গহ্বর—সেই পূর্ব দেশের যাত্রী আমি।

মঁ্যপারনাসে

১৯২৭, জুন মাসের একটি দিনে সেই সুদূরের যাত্রী হলাম। প্রথম শ্রেণীর টিকিটটা তৃতীয় শ্রেণীতে বদল করে বাদেন নামক একটা জার্মান জাহাজে চড়ে বসলাম। দু'রকমের খাবার ব্যবস্থা ছিলো সেই জাহাজে। খাবারের মধ্যে ছিলো একটি পর্তুগীজ আর স্প্যানিশ ইমিগ্রেন্টস্‌দের জন্য। এটি সকাল সকাল খেতে হবে। আর একটি অন্যান্য যাত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট, যাঁদের মধ্যে বেশির ভাগই হচ্ছে জার্মান অথবা লাতিন আমেরিকান—অর্থাৎ যাঁরা ছুটি-শেষে ফিরে চলেছেন নিজ নিজ কর্মস্থলে।

আমার সহযাত্রী বন্ধু আলভারোর পেশা হচ্ছে মেয়ে শিকার। জাহাজে উঠেই সে আগে যাত্রীদের মধ্যে মেয়ে বাছাই করে নিল। যখনই কোনো মেয়ে যাত্রী আমাদের সামনের ডেক দিয়ে যেতো আলভারো তখনই আমার হাতটা নিজের চোখের সামনে তুলে নিতো—যেন একজন বিজ্ঞ হস্তরেখা বিশারদ!—আমার ভূত-ভবিষ্যৎ চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে শুরু করে দিতো। প্রেমঘটিত কথাবার্তা বলতো বেশি। মেয়েদের বশ করার সব তীরই ওর তূণে ছিলো! আমাদের পাশ দিয়ে যাতায়াতের সময় অনেক মেয়েই আলভারোর গলার আওয়াজে থমকে দাঁড়াতো, কেউ কেউ বাড়িয়ে দিতো হাত—পরম কৌতূহলে। তাদের ভাগ্য পরিবর্তিত হতো আলভারের বিছানায়।

সঙ্গীদের একঘেয়ে গল্পগুজব আর সীমাহীন নীলসমুদ্রের দিকে চেয়ে থাকা যখন আমায় ক্লান্ত করে তুলছিলো তখনই চোখ ফেরাবার অবসর মুহূর্তে আমার দৃষ্টি গিয়ে পড়লো একটি ব্রাজিলিয়ান্ তরুণীর কালো চোখের ওপর। জাহাজযাত্রার একঘেয়েমি কমে গেল।

'সালজার তখন সিংহাসনে নেই। রাস্তায় চলাফেরা মানুষের তখন অনেকখানি নিরাপদ। লিসবন শহরের এই শান্ত জীবনযাত্রা বিস্ময়ে অভিভূত করেছিলো আমাকে। আমাদের হোটেলটার খাবারও ছিলো পরম সুস্বাদু। একটা পাত্রে নানান্ ফল সব সময়েই খাবার টেবিলে রাখা থাকতো। নানান্ রঙের বাড়ি, পুরোনো প্রাসাদের প্রধান ফটক, সুউচ্চ গীর্জার মাথায় অস্বাভাবিক ধরনের বিশ্রী ছাদ—যার মধ্য থেকে ভগবান অনেক—অনেক শতাব্দী আগেই পালিয়ে অন্য কোথাও আশ্রয় নিয়েছেন। জুয়াখেলার আড্ডাখানায় বড় রাস্তার ধারে একরাশ কৌতূহল নিয়ে একদল ছোট্ট ছেলে-মেয়ের ভিড় আর রাস্তায় ভিড় করা ভিখারীদের বিস্ময়াহত দৃষ্টির সামনে দিয়ে 'ব্রাগেঞ্জার কোনো বড় ভূস্বামীর কর্ত্রীর পাথরে ঢাকা রাস্তায় সদর্প পদধ্বনির মধ্য দিয়ে এই প্রথম য়ুরোপের জগতে প্রবেশ করেছিলাম। তারপরে 'মাদ্রিদ শহর। আনন্দোচ্ছল মানুষে ভরা এই শহরের কাফেগুলোয় কি পীড়ন আর নিষ্ঠুরতার দিনগুলোর জন্য প্রস্তুতি চলেছে। 'মর্তের অধিবাসী'র প্রথম কবিতাগুলো যদিও আমি তখন শুরু করেছিলাম কিন্তু স্পেনের মানুষ তখনও তার কোনো স্বাদই পায়নি। পৃথিবীর যাত্রাপথে আমার জীবনে সেদিন স্পেন ছিলো ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীর কামরা।

ঝাঁক ঝাঁক মানুষের ভিড়ে ম'্যাপারনাসের রাস্তায় আমরা হারিয়ে গেলাম। সেই প্রথম 'গেরুয়া পোশাক পরা হিন্দুকে দেখলাম। আমার পাশের টেবিলের মেয়েটি ছোট্ট একটা সোনালী সাপ গলায় বেঁধে বিষণ্নভাবে ক্রীম-কফি পান করছে। ওদিকে দক্ষিণ আমেরিকার কলোনীর আগন্তুকেরা ব্র্যাণ্ডি হাতে ট্যাঙ্গো-নাচে ব্যস্ত। আর তারা কথায় কথায় প্রায়ই লাগাচ্ছে 'ঝগড়া-গণ্ডগোল, বোঝাতে চাইছে—যেন অর্ধেক পৃথিবীর মালিকানা ওদেরই।

প্যারিস, ফ্রান্স, য়ুরোপ আর তার রাস্তাগুলো—ম'্যপাসে-ল'্যারোতন্ত ল'্যা সোদ-ল'্যা কুপোল—ধারে ধারে কফির আড্ডা, ছোট ছোট নাইট ক্লাবের নিগ্রো গায়কেরা যাঁরা সবে জনপ্রিয় হয়ে উঠছেন তাদের সরব গান—এমন একটি আবহাওয়ায় অস্বস্তি বোধ করছিলাম আমরা দক্ষিণ আমেরিকার ছন্নছাড়া ক'জন মানুষ। লাতিন আমেরিকার 'আর্জেন্টিনা থেকে আসা লোকদের ভিড় সবচেয়ে বেশি, ওরাই ছিল পয়সাওলা। কথায় কথায় ঝগড়াঝাটি করাটাই ওদের পেশা। প্রায়ই দেখা যেতো রেস্তরার চার-পাঁচজন বেয়ারা মিলে কোনো একজন আর্জেন্টিনিয়ান্ বীরপুঙ্গবকে পাঁজাকোলা করে তুলে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি জামা-কাপড় ঝাড়তে ঝাড়তে উঠে দাঁড়িয়ে 'আচ্ছা—দেখে নেবো' বলে সদর্পে চলে যাচ্ছেন! আর্জেন্টিনিয়ান সংস্কৃতির এটাও একটা অঙ্গ।

প্যারিসে থাকার প্রথম দিকে আমার সঙ্গে কোনো ফরাসী বা য়ুরোপীয়ান কিম্বা এশিয়ান—এমন কি কোনো আফ্রিকানেরও চেনা পরিচয় হয়নি। রাস্তা, কাফে আর ছোট নাইটক্লাবগুলোতে দেখেছি কোনো গুয়েতেমালান ছেলের সঙ্গে অলস গল্পে

সময় কাটিয়ে দিচ্ছে পেরুগুয়ের কোনো মেয়ে।

এই সময়েই কবি সিজার ভেল্লিজোর সঙ্গে আমার আলাপ হলো। জানোয়ারের কর্কশ চামড়ার মতো রুক্ষতায় ভরা তাঁর কবিতার মধ্যে ছিলো একটা অসাধারণ শক্তি।

আমাদের আলাপটা শুরু হয় ঝগড়া দিয়ে। ল্যা রেঁস্ত্যোরাঁতে বসে আছি, একজন আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন কবি সিজার ভেল্লিজোর সঙ্গে। কবি তাঁর পেরুভিয়ান ভাষায় আমায় স্বাগত জানিয়ে বললেন—তুমি এ যুগের শ্রেষ্ঠতম কবি।—একমাত্র রুবেন দ্যারিওর সঙ্গে তোমার তুলনা করা যেতে পারে।

কবি ভেল্লিজোর কথায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলাম। বললাম, আপনি যদি বন্ধুত্ব চান তাহলে এ ধরনের সম্বোধন আমাকে কখনো করবেন না। আমরা নিজেদের 'বড় সাহিত্যিক' মনে করে আলাপ করলে সে আলাপ সত্বরই বিলাপে পরিণত হবে।

আমার এই কথা ক'টি ওঁকে দেখলাম বেকায়দায় ফেলে দিলো। উনি যে পথ দিয়ে সাহিত্য-জগতে এসেছেন সেটা রাজকীয় সৌজন্যের পথ। কাজেই আমার এই অসাহিত্যিকসুলভ ব্যবহার ওঁর জানার কথা নয়। ওঁর আহত মুখের দিকে তাকিয়ে তখন নিজেকে কেমন যেন বর্বর মনে হয়েছিলো। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই মেঘ কেটে গেল। পরিবেশ স্বাভাবিক হয়ে উঠল।

প্যারিতে থাকার সময় প্রায় প্রতিদিনই কবি ভেল্লিজোর সঙ্গে দেখা হতো। ক্রমে আমাদের দু'জনের মধ্যে সখ্যতা গড়ে উঠেছিল। অস্থিসার ছোটখাটো চেহারায় লম্বা গম্বুজের মতো মানুষ ভেল্লিজোর কপালের নীচে ঘন কালো একজোড়া চোখ, রেড-ইন্ডিয়ানের নিভুল রাজকীয় মুখের ওপর বিষণ্ণ একটা ছাপ। ভেল্লিজোর খুব ভালো লাগতো যখন তাঁকে রেড-ইন্ডিয়ানদের ইনকাদের সঙ্গে তুলনা করা হতো। জন্মের এই ব্যর্থতা আমাদের সব কবির মনেই ছিলো। আমার চোখের সামনে মাথাটা উঁচু করে তুলে উনি বলতেন, দেখ তো—গর্ব করার মতো একটা কিছু রয়েছে কিনা এই চেহারাটায়। বলে নিজের মনেই হেসে উঠতেন।

কবি ভিনসেন্ট হুইদোব্রোর সঙ্গে ভেল্লিজোর তুলনা করলে দেখা যায় দু'জনে একেবারে বিপরীত!—কি কবিতায়, কি ব্যবহারে। হুইদোব্রো আঙুল দিয়ে নিজের কপালের ওপর থেকে অবিন্যস্ত কতকগুলো চুলকে সরিয়ে দিয়ে কোটের পকেটে হাত রেখে বুকটা টান টান করে বাড়িয়ে দিয়ে বলতেন, আচ্ছা—দেখ তো আমাকে ঠিক নেপোলিয়নের মতো দেখাচ্ছে কিনা?

ভেল্লিজোকে বাইরে থেকে একজন বিষণ্ণ আর খেয়ালী মানুষ বলেই মনে হতো। মনে হতো বহুযুগের পুরোনো কোনো এক ছায়ার আশ্রয়ে উনি নিজেকে গুটিয়ে রেখেছেন। ওঁর স্বভাবগম্ভীর মুখের দিকে তাকালে বোঝা যেতো ওই সুদৃঢ় মুখাবয়বের মধ্যে কোথাও যেন এক দেবদূতের ছাপ লেগে রয়েছে। কিন্তু ভিতরের মানুষটি ছিলো সম্পূর্ণ অন্য জাতের! যখনই উনি কর্তৃত্বময়ী, অত্যাচারী আর দাম্ভিক ফরাসী স্ত্রীর কাছ থেকে সরে আমাদের কাছে আসতেন তখন বাচ্চা ছেলের মতো লাফালাফি আর নাচ গান শুরু হয়ে যেতো! আবার কিছুক্ষণের মধ্যে বদলে যেতেন, ডুবে যেতেন নিজের বিষণ্ণতার মধ্যে!

যে মহাজনের অপেক্ষায় আমরা বসেছিলাম, প্যারিসের ছায়ালোক থেকে তিনি

বেরিয়ে এসে যোগ দিলেন আমাদের সঙ্গে। তিনি চিলির এক ধনী জাহাজীর ছেলে—সাহিত্যিক এবং ফরাসী সাহিত্যিক রাফেল আলবার্তির বন্ধু। প্রচুর টাকা, খরচও করতেন অকাতরে।

আকাশ থেকে খসে-পড়া এই ত্রাণকর্তার হঠাৎ একদিন ইচ্ছে হলো আমাকে খাওয়াবার। একটা 'রাশিয়ান' নাইটক্লাবে তিনি হাজির হলেন আমাদের নিয়ে। সমস্ত দেওয়াল জুড়ে ককেশিয়ান পোশাক আর ভূচিত্র। অল্পক্ষণের মধ্যেই রাশিয়ান আর আধা-রাশিয়ান মেয়েরা আমাদের ঘিরে ধরলেন। আমাদের ত্রাণকর্তা বন্ধুটিকে অনেকটা রাশিয়ান সম্রাটের ভগ্নাবশেষের মতো দেখাচ্ছিল। বোতলের পর বোতল শ্যাম্পেন আসছিল। এরই মাঝে বন্ধুটি প্রায়ই লাফিয়ে উঠে দেখতে চাইছিলেন ককেশিয়ান নৃত্য-ভঙ্গিমা—জীবনে যা হয়তো উনি নিজেই দেখেন নি! 'নিয়ে এসো শ্যাম্পেন—আরো আরও' এই বলতে বলতে হঠাৎ এক সময়ে দেখলাম সুরারসে উনি ধরাশায়ী, টেবিলের নীচে গভীর ঘুমে অচেতন! মনে হলো সাদা ভল্লুকের আক্রমণে একজন ককেশিয়ান আহত, চেতনাহীন।

ভয়ে শিউরে উঠলাম আমরা। বরফ-জলের ঝাপটা আর আমাদের নানান্ চেষ্টাতেও তাঁর ঘুম ভাঙানো গেল না। আমাদের এই অসহায় অবস্থা দেখেও একজন ছাড়া আর সব মেয়ে আমাদের ছেড়ে চলে গেল! বন্ধুটির পকেট হাতড়ে একটা চেক-বই পাওয়া গেল, কিন্তু তাতে সই করার ক্ষমতা তাঁর ছিলো না। নাইটক্লাবের মালিক বেরোবার রাস্তা বন্ধ করে আমাদের আটকে দিলেন, দাম না মেটালে ছাড়বেন না।

শেষে আমার "রাজদূত' পদের নিয়োগপত্র জমা রেখে সে রাত্রে আমরা মুক্তি পেলাম। লক্ষপতি বন্ধুর অচেতন দেহটি কোনরকমে কয়েকজনে কাঁধে তুলে বাইরে এসে ট্যাক্সি ধরলাম। যে মেয়েটি আমাদের সঙ্গে ছিলো তাকে দেখলাম কাছে তখনও দাঁড়িয়ে। মেয়েটি খুব একটা সুন্দরী নয় বটে তবে একটা ঘরোয়া ভাব ছিলো তার মধ্যে। লক্ষ্য করতে দেখতে পেলাম—হঠাৎ তীক্ষ্ন হয়ে ওঠা তার নাকটি মুখাবয়বে এনে দিয়েছিলো ফরাসী ছাপ, এতে ওকে আরও সুন্দর দেখাচ্ছিলো। সে রাতে মেয়েটির সাহায্যকারী ভূমিকা ভোলা যায় না। জিজ্ঞাসা করলাম—এই ভোর রাতে পেঁয়াজের স্যুপ খেতে আমাদের সঙ্গে হোটেলে যেতে সে রাজি কিনা। এ প্রস্তাবে সহজেই রাজী হলো সে। যাবার পথে একগুচ্ছ গোলাপ হাতে দিয়ে চিবুকে গালে চুম্বন করাতে দেখলাম বেশ সরলভাবেই মুখটা এগিয়ে দিলো মেয়েটি। এবার জিজ্ঞেস করলাম—আমাদের সঙ্গে রাত কাটাতে রাজী কিনা, এতেও কোনো আপত্তি জানালো না সে!

আলভারোর সঙ্গে ঘরে ঢুকলো মেয়েটি।

প্রসঙ্গত জানাচ্ছি সেই রাতে দ্বিতীয় দফায় হোটেলে আসার আগে আমরা অচেতন বন্ধুটিকে তাঁর বাড়িতে পেঁাছে দিয়েছিলাম।

পরিশ্রান্ত আমি বিছানায় শুয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ আলভারোর ঝাঁকানিতে ঘুমটা ভেঙে গেল। পাগলের মতো মুখটা আমার কানের কাছে এনে সে বললো, পাবলো, শোনো—পাবে না, এমন মেয়ে আর পাবে না—অসাধারণ পাগলকরা মেয়ে এ। তুমি যাও, ওর কাছে শুয়ে দেখ— কি অস্বাভাবিক যৌন ক্ষমতা!

কয়েক মুহূর্ত পরেই মেয়েটি এসে আমার পাশে শুয়ে পড়লো। রহস্যময় জগতের একদিকের দরজা খুলে দিয়ে সে রাতে আমার সঙ্গে প্রেমের খেলায় বিভোর হয়ে উঠলো মেয়েটি। এ এক এমন অভিজ্ঞতা যা ভাষা দিয়ে বোঝানো যাবে না! মনে হয়েছিলো ওর দেহের গভীরতম স্তর থেকে কোনো এক অজানা বস্তু বেরিয়ে এসে আনন্দের জন্ম লগ্নে সমাধিস্থ হচ্ছে! মনে হয়েছিলো কামদেবের গুপ্ত তট থেকে সমুদ্রের ঢেউ উঠে এসে উভয়ের শরীরে আছড়ে পড়ছে!

আলভারো ভুল বলেনি।

পরদিন প্রাতরাশের সময় আলভারো বললো, মেয়েটিকে না সরালে কিন্তু আমাদের বিদেশযাত্রার ইতি ঘটবে।

শেষে উপায় ঠিক হয়ে গেল। প্রচুর চকোলেট, ফুল আর কিছু টাকা হাতে দিয়ে মেয়েটিকে নিয়ে ট্যাক্সিতে বসলাম। যাবার সময় মেয়েটি জানালে—এই প্রথম সে ওই নাইটক্লাবে এসেছিলো।

কিছুক্ষণ পরে এক অজানা রাস্তার মোড়ে ট্যাক্সি ছেড়ে নেমে ওকে বিদায় জানালাম। চুম্বনে বিহ্বল হয়ে মেয়েটি সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। আমরা চলে এলাম।

ভ্রমণকালে ভূমধ্যসাগরের কার্পেটের মতো নীল জল, আর তার আশপাশের বহুবর্ণ বন্দর আমাকে যেমন মুগ্ধ করেছিলো তেমনি মুগ্ধ করেছিলো তার 'জীবাত্তিত' বন্দরটিও। আর্থার র‍্যাবোর পদস্পর্শবাহী সাদা বালির স্তূপ, পাথরে খোদাই মূর্তির মতো নিগ্রো-রমণী—যার কাঁধে ঝুলছে ফলের ঝুড়ি।—আরও রয়েছে দরিদ্র গ্রামবাসীদের ভেঙে-পড়া জীর্ণ কুঁড়েঘর, আর আলোকমালায় উদ্ভাসিত কাফেটেরিয়া—যেখানে লেবু আর বরফে তৈরি চা পাওয়া যায়।

একটাই কাজ ছিলো—সাংহাই-এ রাত্রি-জীবন দেখা। কামার্ত রমণীর মতো বদনামে ভরা এই শহর মানুষকে আকর্ষণ করে। আমরা দুই বন্ধু সেদিন রাতে নৌকায় চড়ে সাংহাইয়ের নিদ্রাহীন চোখের দৃষ্টি-গহ্বরে ঢুকে পড়লাম। ঢুকলাম আনন্দহীন তৃতীয় শ্রেণীর কৌতূহল বুকে নিয়ে।

কাজের দিন ছিলো সেটা। একের পর এক নাইটক্লাবে ঘুরেও কোথাও মানুষের ভিড় চোখে পড়লো না। যেখানে কয়েকশো হাতি নাচতে পারে সে রকম সুপ্রশস্ত নাচের জায়গা একেবারে খাঁ খাঁ করছে! মাঝে মাঝে জায়গায় জায়গায় শুকনো হাড়-জিরজিরে গোটাকয়েক বিতাড়িত জাল-রাশিয়ান তরুণী ভিড় করছিলো আমাদের ঘিরে।—শ্যাম্পেন খাবার লোভে।

প্রাণহীন এই পাপের গলিগুলোতে ঘুরতে ঘুরতে শুধু যে সময় নষ্ট হচ্ছিল তাই নয়, আমাদের আত্মাটিকে খুইয়ে বসছিলাম আমরা!

জাহাজ ছেড়ে ছোটোখাটো গলিঘুঁজি পেরিয়ে কখন যে অনেক দূরে এসে পড়েছি খেয়াল নেই। শেষ পর্যন্ত দুজনে রিক্সায় চড়ে বসলাম। মানুষ-ঘোড়ায় টানা গাড়ি এর আগে আমরা কখনও দেখিনি। ১৯২৭ সালে সারা শহর জুড়ে এই মানুষ-ঘোড়ায় টানা গাড়ি সারাটি সময় রাস্তায় লাফিয়ে লাফিয়ে চলতো।—তাদের বিশ্রামের অবকাশও

জুটতো না।

বৃষ্টি শুরু হলো। ফোঁটাগুলো ক্রমশঃ বড় হতে লাগলো। রিক্সাওলা সামনের দিকের ত্রিপলের ঢাকা টেনে দিলো। ওদের এই আন্তরিক ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে ভাবতে লাগলাম—দু'হাজার বছরের সভ্যতা ও সংস্কৃতি আজও ওদের স্বভাব থেকে মুছে যায়নি! কিন্তু কেন জানি না এক অজানা দুর্ভাবনায় মনটা ভরে উঠেছিলো আমার। বাইরের কিছুই দেখা যাচ্ছিলো না তখন। রিক্সাওলা তার গাড়ি টানতে টানতে মুখ দিয়ে একটা অদ্ভুত আওয়াজ করছিলো মাঝে মাঝে। কিছুক্ষণ বাদে বেশ কিছু পায়ের শব্দ রিক্সাওলার পায়ের শব্দের তালে তাল মিলিয়ে চলতে শুনলাম। এর মাঝে কিছু কিছু অস্ফুট আলাপের আওয়াজও কানে আসছিলো। এক সময় দেখলাম শহরের শেষের দিকে একটা খোলা জায়গা দিয়ে চলেছি আমরা। এরপর হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো রিক্সা। ত্রিপলের ঢাকা খুলে রিক্সাওলা পাশে সরে দাঁড়ালো। আশেপাশে কোথাও জাহাজের চিহ্ন দেখা গেল না। আমরা নামলাম।

এমন সময় কয়েকজন চীনা ছেলে 'টাকা-টাকা-টাকা চাই' বলে আমাদের ঘিরে ধরলো!

আলভারো তার পকেটে হাত ঢোকালো, অস্ত্র বের করার ভান করতেই কয়েকটা কিল-ঘুষি-চড় এসে আমাদের ওপর পড়লো। আমি পড়ে গেলাম। চীনাদের মধ্যে একজন আমার মাথাটা চেপে ধরে কাদামাটির ওপরে গুঁজে ধরলো! বিদ্যুৎগতিতে তারা আমাদের সমস্ত পোশাক আর জুতোগুলো খুলে নিয়ে টাকা-পয়সা খুঁজতে লাগলো। কিন্তু একটা পয়সাও জুটলো না তাদের কপালে। তবে আশ্চর্যের বিষয় যে, আমাদের পরিচয়পত্র বা পাশপোর্টের ক্ষতি তারা করলো না।

কিছুক্ষণ পর তাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে আমরা হাঁটা শুরু করলাম।

সেখানকার রাস্তাঘাট জানা নেই, স্থানীয় ভাষাও জানি না। বেশ কিছুক্ষণ পরে দেখলাম হাজার হাজার মানুষ চলছে। স্বম্ভবত নিজের নিজের কাজকর্মে যাচ্ছে। তাদের মধ্যে কিছু মানুষ এগিয়ে এলেন আমাদের সাহায্যে। ভাবে ভঙ্গিতে জাহাজে ফেরার রাস্তার সন্ধান জানতে চাইলাম আমরা। তারপর একসময় এসে জাহাজে উঠেছিলাম।

এরপর জাপানে পেঁছিলাম।

চিলি থেকে যে টাকা আসার কথা, তা দূতাবাসেই আসবে।

ইতিমধ্যে ইয়কোহামায় জাহাজী নাবিকদের এক আশ্রয়স্থলে থাকার ব্যবস্থা হয়েছিলো আমাদের। মেঝেয় শুতাম। ঘরের ভাঙা জানালা দিয়ে বরফগলা ঠাণ্ডা হাওয়া হু-হু করে ঢুকে আমাদের হাড় কাঁপিয়ে দিতো।

এক সকালে তৈলবাহী একটি জাহাজ ডুবে গেল। সেই ডোবা জাহাজের নাবিকদের ভিড়ে আমাদের ঘরটা ভরে গেল। এদের মধ্যে একজনের মাতৃভাষা স্প্যানিশ। তিনি জানালেন কেমন করে চার দিন চার রাত কাঠের একটা ভাঙা টুকরো আঁকড়ে সমুদ্রের ঢেউ আর চারপাশের জ্বলন্ত আগুন থেকে নিজেকে বাঁচিয়েছিলেন। দুঃসাহসী এই নাবিকটি পরে অনেক উপকার করেছিলেন আমাদের।

চিলির প্রধান বাণিজ্য দূত আমাদের সঙ্গে অত্যন্ত অভদ্র ব্যবহার করলেন। বার বার প্রতিটি কথায় তিনি বোঝাতে চাইছিলেন—দূত বংশে আমরা অতি নিকৃষ্ট

স্তরের !...সেদিন সন্ধ্যায় তাঁকে যেতে হবে কাউণ্টেস্ য়ুফুসানের ভোজসভায়, পরদিন আবার জাপ-সম্রাটের চা-চক্রে ! বাক্যালাপের সময় পাবেন কেন তিনি !...দেখলাম জাপানের বর্তমান রাজবংশের ইতিহাস পড়তে তিনি ব্যস্ত। বললেন, বুঝলে না —সম্রাট অতি সুন্দর ব্যক্তি ! ইত্যাদি ইত্যাদি আরো কত কি !

টেলিফোন ওঁর বাড়িতে নেই। ইয়কোহামার মতো জাপানী শহরে ওঁর টেলিফোনের প্রয়োজন কি ? চিলি থেকে আমাদের টাকা যে ব্যাঙ্কে আসবে সেই ব্যাঙ্কের ম্যানেজার তো ওঁর ব্যক্তিগত বন্ধু, তবুও তো কিছুই তিনি জানান নি ওঁকে।...'খুবই দুঃখিত... চলি...কাল হয়তো দেখা হতে পারে !' এমনিভাবে প্রতিদিন একই গল্প একই কথা।

শীতের রাতে কাঁপতে কাঁপতে আমরা দূতাবাস থেকে ফিরে আসতাম। কারণ মাঝে চুরি যাবার পর ছেঁড়া দু'খানা পুরোনো সোয়েটার ছাড়া গায়ে পরে বেরোবার মতো গরম পোশাক আর কিছুই ছিলো না আমাদের।

শেষ দিনে জানতে পারলাম যে, ইয়কোহামা পেঁছিবার অনেক আগেই চিলি থেকে আমাদের টাকাগুলো ব্যাঙ্কে এসে পড়ে রয়েছে ! ব্যাঙ্কের ম্যানেজার তিনবার চিঠি লিখে সে কথা দূতাবাসকে জানিয়েও দিয়েছিলেন। এর পরেও স্পর্ধিত অহংকারী স্বার্থপর আর ক্ষমতাপরায়ণ দূতের সময় হয়নি সেই সব চিঠি পড়ার !

সেই রাতে টোকিওর সবচেয়ে ভালো কাফে 'কোরাকু'তে গেলাম আমরা। দীর্ঘদিনের অর্ধাহারের ফলে সে রাতের খাবারগুলো আমাদের কাছে অমৃত মনে হলো। সুন্দরী জাপানী মেয়েদের মাঝে বসে খেতে খেতে পৃথিবীর সেই সব মানুষের জন্য মঙ্গল কামনা করেছিলাম—যারা তাদের দেশের হৃদয়হীন রাজদূতদের কাছে প্রতিনিয়ত নিগৃহীত হচ্ছে।

সিঙ্গাপুর ! সিঙ্গাপুর ! মনে হলো রেঙ্গুনের দরজায় এসে দাঁড়ালাম।

কিন্তু একি ! মানচিত্রের গায়ে যা মাত্র ছোট্ট একটি দাঁড়ি তার এমনি হাঁ-করা অতল গহ্বরের রূপ !

যে জাহাজটি প্রতি সপ্তাহে রেঙ্গুন যায় সেই জাহাজ গতকালই চলে গেছে। আমাদের টাকা-পয়সাও ফুরিয়ে গেছে। এবার যে টাকা আসবে সেটা রেঙ্গুনেই আসবে। এখন হোটেলে যাবারও পয়সা নেই আমাদের কাছে।—এ খবর পেয়ে আমার সহকর্মী, সিঙ্গাপুরে চিলির বাণিজ্যদূত, সিনর মানসিলা এসে হাজির হলেন। আমাদের কাহিনী শুনতে শুনতে তাঁর মুখের হাসি উবে গেল ! রাগতস্বরে তিনি বললেন—এ বিষয়ে কিছুই করার নেই আমার।—এসব কথা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে জানাও।

বললাম, আমরা—অর্থাৎ বাণিজ্যদূতেরা যদি এক হতে পারি তবে এই অসুবিধেটুকু দূর করতে পারবো।

জেলের হৃদয়হীন অধ্যক্ষের মতই ছিলো সিনরের স্বভাব। আমার কথায় তিনি সন্তুষ্ট না হয়ে চলে যেতে উদ্যত হলেন। তখন আমি মেকিয়াভেলির কথা স্মরণ করে ওঁকে বললাম, ঠিক আছে। আপনি একটা বক্তৃতা দেবার ব্যবস্থা করে দিন এখানে

আমাকে। চিলির জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতি নিয়ে কিছু বলবো আমি। পয়সা দিয়ে সে বক্তৃতা শুনতে আসবে সবাই এবং সেই বিক্রয়লব্ধ অর্থের কিছুটা আমরা পাবো।—অর্থ সমস্যার সাময়িক সমাধান হবে আমাদের।—দয়া করে আপনি এর একটা ব্যবস্থা করে দিন আমাদের জন্যে।

আমার কথা শুনে আশ্চর্য হলেন তিনি। বললেন, চিলি সম্বন্ধে ভাষণ! তাও এই সিঙ্গাপুরে!—না, এ আমি কিছুতেই হতে দেব না। আর যদি ব্যবস্থা করতেই হয় তবে আমি নিজেই সেই ভাষণ দেব।

—শান্ত হোন, মানসিলা মহাশয় শান্ত হোন। চিলি সম্পর্কে আমরা যত বলতে পারবো ততই ভালো।—বুঝতে পারছি না আপনি এত উত্তেজিত হচ্ছেন কেন!

অবশেষে আমার এই অদ্ভুত প্রস্তাবটি যখন রাজনৈতিক ব্ল্যাকমেলিং-এ এসে পেঁছালো তখন এলো আপোসের প্রস্তাব। একটু রফা হলো। রাগে কাঁপতে কাঁপতে কিছু টাকা আমাদের হাতে তুলে দিয়ে একটা কাগজে সই করতে বললেন তিনি। সই করার পর গুণে দেখলাম চুক্তি অনুযায়ী পুরো টাকা এ নয়, জিজ্ঞেস করায় বললেন—ওটা সুদ। বলেই উনি চলে গেলেন।

দশদিন পরে সেই টাকা চেকে লিখে রেঙ্গুন থেকে ফেরত পাঠাবার সময় সুদটা বাদ দিয়েই পাঠিয়েছিলাম ওঁকে।

আমাদের জাহাজটি যখন রেঙ্গুনের মধ্যে ঢুকছে তখন ডেকের উপর দাঁড়িয়ে সামনে তাকালাম, দেখলাম বিখ্যাত স্যু দ্যাগণ প্যাগোডার স্বর্ণচূড়া, আর জেটির ধারে নানান রঙের বিচিত্র সব পোশাক পরা মানুষের ভিড়। একটা নোংরা নদীর বিরাট মুখ এসে মিলেছে মারতাবান উপসাগরে।—সেই যে সেই সুন্দর আর অপরূপ নাম, যে নাম পৃথিবীর আর কোনো নদীরই নেই—সেই নামটি ছিল এই নদীর—'ইরাবতী'। এই নদীর জলের ধারে শুরু হলো আমার নতুন জীবন।

আলভারো

অপূর্ব—অদ্ভুত এই মানুষটি—ন্যু ইয়র্ক শহরে পেঁছে এখন তার নাম হয়েছে 'আলভারো-দ্য-সিলভা'। ন্যু ইয়র্ক শহরের জঙ্গলেই এখন তার বেশি সময় কাটে। দেখা যাবে অসময়ে একগাদা কমলালেবু খাচ্ছে অথবা সিগারেট তৈরির কাগজগুলো দেশলাই জেবলে পোড়াচ্ছে, নয়ত পাশের কোনো লোককে বিরক্তিকর একগাদা প্রশ্ন করে চলেছে। সব সময়েই ও ছিলো সৃষ্টিছাড়া একজন শিক্ষক।—কি অসাধারণ বুদ্ধি, কি দৃপ্ত কৌতূহলী মন—যা তাকে টেনে নিয়ে গিয়েছে ন্যু ইয়র্কের জঙ্গলে।

সেটা ছিল ১৯২৫ সাল।

একগুচ্ছ ফুল নিয়ে নাম-না-জানা—অচেনা মেয়েদের হাতে সেই পুষ্পগুচ্ছ তুলে দিয়ে, বিছানায় আমন্ত্রণ অথবা জয়েসের উপর একটি সারগর্ভ বক্তৃতা—আমাদের মতো আরো দু-পাঁচজনের কাছে ও উন্মুক্ত করে তুলেছিলো নিজের দ্বিধাহীন স্বভাব। ওর সহজ খোলামেলা যুক্তি—শহরের মানুষ সম্পর্কে ওর মনোভাব আর উক্তি—সর্বাধুনিক

গান-বাজনা আর সাহিত্য সম্পর্কিত অনুসন্ধিৎসা। কমলালেবু কিম্বা আপেলটা নিজের হাতে ছাড়িয়ে খাবার নেশা ছিলো ওর অসম্ভব। আরও আছে—কোথাও কোনো কিছু একটা ঘটলে আগে সেখানে হাজিরা দেওয়া—এটাও ওর অন্যতম নেশা বলা চলে। সব কিছু মিলে ও ছিলো আমাদের কাছে শহুরে জীবনের স্বপ্নের মতো। অর্থাৎ আমাদের ভেতরটা উন্মুখ থাকতো শহরের আদব-কায়দা—সন্ধ্যায় কাফে—তুষারস্তূপে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চূড়ো ইত্যাদির জন্য। ওর ছিলো একটা বুনো আনন্দ থেকে আরো একটা বুনো আনন্দে লাফিয়ে পড়ার উৎকট স্বভাব। হয়তো কোনো ছবিতে আমরা নতুন কোনো কাজ শুরু করছি—আলভারো সেই ছবির নায়কের বেশভূষা পরে স্টুডিওতে এসে হাজির হলো! মনে পড়ে যাচ্ছে—কোথায় যেন বাঙালীর বেশভূষায় সেজে আমার একটা ছবি রয়েছে।

একবার এক সিগারেটের দোকানে সিগারেট কেনার সময় আমার মুখে কোনো কথা না শুনে দোকানদারটি ভেবেছিলেন আমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবারেরই কেউ হয়তো হব।

টাকা না দেবার অপরাধে ওয়াই. এম. সি. এ. থেকে আমরা বিতাড়িত। দমদমে স্টুডিওতে গিয়ে জানতে চাইলাম—কেউ আমাদের ভাড়া চায় কি না। আলভারো তখন বিরাট ব্যবসায়ের স্বপ্নে বিভোর। 'আসাম থেকে চা, কাশ্মীর থেকে গালিচা—পৌরাণিক যুগের ধন সম্পদ পাচার ইত্যাদি কত কি! কিছুক্ষণের মধ্যেই স্বপ্ন শেষ! কাশ্মীরে ফেলে গেল সে গালিচার নমুনা, বিছানার ওপর পড়ে রইলো আসামের চায়ের নমুনা—ততক্ষণে হাতে হাতে একটা স্যুটকেশ নিয়ে সে হয় মিউনিখ নয়তো ন্যু ইয়র্কের রাস্তায় হারিয়ে গেছে।

জীবনে সাহিত্যিক কবি অনেক দেখেছি, কিন্তু আলভারো হচ্ছে তাঁদের মধ্যে সর্বোত্তম। সাহিত্যিক কবিরা কলমে যা ধরতে চেয়েছেন আলভারো তা তার সমস্ত জীবন সমস্ত অনুভূতি দিয়ে ধরেছে। তার কাছে সকলে যা চেয়েছে তা হয়তো দিতে পারেনি, কাকে কি দিতে হবে ও নিজেই তা জানতো না। কিন্তু ও নিজের চোখ দুটি মেলে পৃথিবীর এপার ওপার দেখতে পেতো, আঙুলের ফাঁক দিয়ে সময়ের বালিকে বেরিয়ে যেতে দেয়নি আলভারো।

৪

উজ্জ্বল একাকীত্ব

জঙ্গলের ছায়ারা

আমি যে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকতাম আজ সেই সমুদ্র লক্ষ কোটি ফেনিল চোখ তুলে ঝড়ো হাওয়ার মধ্য দিয়ে আমার দিকেই তাকিয়ে রয়েছে! ভালপারাইসোর কাছে 'ইস্‌লানেগ্রা'র তীরে বসে আমার এই 'অনুস্মৃতি'র মধ্যে আমি ডুবে রয়েছি।

কতো বছর চলে গেছে। এখন যখনই তাদের সাজাতে চাই একটা ক্লান্তি আমাকে আচ্ছন্ন করে তোলে! তারপর তরবারি-ঝলকের মতো মুহূর্তগুলো ফিরে আসে। কোনো ধারাবাহিকতার যুক্তি না বুঝে যেমন আসে ঢেউয়ের পর ঢেউ।

১৯২৯ সাল।

রাত্রি! অনেক—অনেক মানুষের ভিড় রাস্তায়। সেদিনটা ছিলো এক পর্বের দিন। মুসলমান সম্প্রদায়ের পরব। মুসলমান ভায়েরা অনেকে মিলে রাস্তার মাঝখানে একটি সরু আর লম্বা পাত্রের মধ্যে জ্বলন্ত কয়লা সাজিয়ে রেখেছেন। জিনিসটা দেখবার জন্য এগিয়ে গেলাম। লাল ফিতের মতো পাতলা ছাই ঢাকা আগুনের উত্তাপে মুখটা বেশ গরম হয়ে গেল আমার। সারা মুখে লাল-সাদা রঙ মেখে আর লাল-কোর্তা

গায়ে দেওয়া চার-পাঁচজন মানুষের কাঁধে চড়ে একজন এসে নামলেন। তারপর ওই জ্বলন্ত আগুনের উপর দিয়ে হেঁটে গেলেন, হাঁটার সময় চীৎকার করে উঠলেন—আল্লাহ! আল্লাহ!! আল্লাহ!!!

বিরাট ভিড় স্থানুর মতো সেই দৃশ্য দেখছিলো। শরীরের কোথাও এতটুকু পুড়লো না তাঁর, মানুষটি দিব্যি আগুনের উপর দিয়ে খালি পায়ে পার হয়ে গেলেন! তার পরেই ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন লোক এগিয়ে এসে নিজের জুতো ফেলে দিয়ে সেই আগুনের উপর দিয়ে হেঁটে গেলেন। এর পরেই শুরু হয়ে গেল ঐ খেলা—একের পর এক আগুনের উপর দিয়ে চলতে শুরু করে দিলে! আগুনের উপরে চলতে চলতেই ওরা মাঝে মাঝে চীৎকার করতে লাগলো—আল্লাহ, আল্লাহ। লোমহর্ষক সেই চীৎকারের সঙ্গে ওদের দৃষ্টি ছিলো স্বর্গের দিকে। কেউ কেউ আবার বাচ্চা কোলে নিয়ে আগুনের উপর হাঁটা দিলো!

পবিত্র সেই নদীর ধারেই ছিলো কালীমন্দির, কালী, মৃত্যু ও ধ্বংসের দেবী। লক্ষ লক্ষ ভক্ত হিন্দু নর-নারী পুণ্য সঞ্চয়ের আশায় দূর-দূরান্ত থেকে এসেছেন, তাঁদের সঙ্গে মিশে আমিও মন্দিরে প্রবেশ করলাম। স্বল্পবিত্ত মানুষের দল প্রতি পদেই পূজারী ব্রাহ্মণদের দাবির কাছে নতিস্বীকার করে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছেন। মাঝে মাঝে পূজারীরা দেবীর মুখের সাতটি ঘোমটার একটিকে তুলে ধরে দেবী-মুখ দেখাবার সঙ্গে সঙ্গে বিরাট ঘণ্টাধ্বনিতে মন্দির কেঁপে উঠছে, মনে হচ্ছে—যমপুরীতে ঘণ্টা বাজলো! মাটির উপর মানুষগুলো হাত জোড় করে জানু পেতে বসে দেবীর ঘোমটার একটা অংশ ছুঁয়ে মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে আত্মসমর্পণের ভঙ্গিমায় স্থাণুবৎ! দেখলাম—পুরোহিতগণ ভক্তদলের কিছু কিছু মানুষকে মন্দিরের বাইরে এনে দাঁড় করাচ্ছে। তারপরেই দেখলাম এক ঘাতক তার খাঁড়ার এক ঘায়ে একটা ছাগলের মুণ্ড কেটে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলে। আহত জানোয়ারের তীক্ষ্ন আর্তনাদ মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনিতে মিলিয়ে গেল! পাথর প্রতিমার কৃষ্ণকায় মুখের বাইরে ঝুলন্ত লালায়িত জিহ্বা, তাঁর ত্রিনয়ন ধীর স্থির। মাতৃমূর্তির গলার নরমুণ্ডের মালা যেন মৃত্যুর দূত! সবই স্তব্ধ। এরপর কপর্দকশূন্য ভক্তেরা মন্দিরচত্বর ছেড়ে নিজ নিজ গন্তব্যস্থলের দিকে যাত্রা শুরু করলো।

কবি বন্ধুরা আমাকে ঘিরে প্রায়ই তাঁদের রচনা—কবিতা, গান শোনাতেন। লম্বা লম্বা আলখাল্লা গায়ে চড়িয়ে হাতে একতারা নিয়ে ভাঙা গলায় তীক্ষ্ন সুরে যখন তাঁরা গান গাইতেন তখন মনে হতো হাজার হাজার বছর আগের কোনো কান্নার সাথে বুঝিবা এই সঙ্গীতের কোনো যোগ রয়েছে। সঙ্গীতের ভাষাটা হয়তো বদলেছে, আত্মসমর্পণের জায়গায় এসেছে জীবনের জয়গান—ক্ষুধার বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে—বন্দীদশার বিরুদ্ধে।—এই রকম হাজারো তরুণ কবি আর গায়কের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে ভারতে। স্বপ্নালু দৃষ্টি আজও মন জুড়ে রয়েছে আমার। তাঁদের মধ্যে কেউ হয়তো সদ্য জেল থেকে বেরিয়ে আবার জেলে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন! তাঁদের অপরাধ—তাঁরা দুর্দশার বিরুদ্ধে, কেউ কেউ বা আবার অক্ষম ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কবিতা, গান

শোনাতে চেয়েছিলেন দেশবাসীকে। এই সময়ের মধ্যেই বাঁচতে হবে, মনে রাখতে হবে এখনই হচ্ছে কবিতার স্বর্ণযুগ—এটাই মনে করতেন তাঁরা।

আমি যখন নতুন সঙ্গীত খুঁজে বেড়াচ্ছি তখন হয়তো লক্ষ লক্ষ মানুষ রাস্তার ধারে—বম্বে শহরের অলিগলিতে নগ্নগায়ে রাত কাটাচ্ছে কঠিন পাথর বা আলকাতরার রাস্তায় শুয়ে। ওরা জন্মায়—ঘুমোয় আর মরে যায়। ওদের জন্য আশ্রয় নেই, ওষুধ নেই, নেই শিক্ষা—এমন কি এক টুকরো রুটিও নেই!

স্পর্ধিত সুসভ্য ইংলণ্ড তার ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যকে এই অবস্থায়ই রেখে চলে গেছে। কোনো বিদ্যালয়, কোনো শিল্প, কোনো ঘর-বাড়ি বা কোনো হাসপাতাল সে রেখে যায়নি—রেখে গেছে শুধু জেলখানা আর পর্বতপ্রমাণ খালি মদের বোতল!

ঢেউয়ের মতো স্মৃতিতে ফিরে আসে আরো একটা দরদী ছায়া—সে হচ্ছে 'রাঙ্গে', অতি স্নেহাতুর একটি ওরাং ওটাং অর্থাৎ এক বনমানুষ। সুমাত্রা দ্বীপে মেদান শহরের চিড়িয়াখানায় গিয়ে যখনই দরজায় কড়া নেড়েছি, সে এসে দরজা খুলে ভিতরে নিয়ে গেছে আমাকে। অবাক বিস্ময়ে আমি তার দিকে তাকিয়ে থেকেছি। তার সাথে একই টেবিলে মুখোমুখি বসেছি। সশব্দে সে নিজের হাত আর পা দিয়ে টেবিলে আওয়াজ করেছে। ওই আওয়াজে হোটেলের ম্যানেজার নিজে এসে বিয়ারের বোতল দিয়ে যেতেন আমাদের জন্য। দু'জনে পান করতাম।

সিঙ্গাপুরের চিড়িয়াখানায় দেখেছিলাম বীণাযন্ত্রের মতো পুচ্ছওলা একটি অস্ট্রেলিয়ান পাখী। খাঁচায় আবদ্ধ। বোধহয় সেই কারণেই রাগে তার সারা দেহ জ্বল জ্বল করতো, সেই উজ্জ্বলতা দেখে মনে হতো ইডেনের উদ্যান থেকে এনে সবেমাত্র যেন তাকে এখানে বন্দী করা হয়েছে। একটু দূরে একটা খাঁচায় এক কালো চিতাকে অস্থিরভাবে পায়চারী করতে দেখলাম। তার গা থেকে জঙ্গলের আগাছার গন্ধ তখনও মুছে যায়নি। তারায় ভরা আকাশের নীচে যেন একটা কালো ছায়া—সুপ্ত সত্বাকে জাগ্রত করে পৃথিবীকে ধ্বংস করার চিন্তায় মগ্ন। মনে হলো ছুরির তীক্ষ্ন ফলকের মতো উজ্জ্বল দৃষ্টি যেন জানতে চায়, চিনতে চায় মানুষ নামক প্রাণীকে।

ইন্দোচীনের পেনাঙ দ্বীপের সর্পমন্দির ছিল অতি বিস্ময়কর। বহু সাংবাদিক আর পরিব্রাজকের গ্রন্থে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। বহু শতাব্দীর বহু ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যেও মন্দিরটি এখনও অক্ষত।

স্যাঁতসেঁতে শ্যাওলাভরা ঘন কলাবনের ভিতর দিয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে গিয়ে আশ্রয় নিলাম প্রায় মুছে যাওয়া কালো রঙের এক মন্দিরে। ধূপের গন্ধ নাকে এসে লাগলো। আলো-আঁধারির মধ্যে কানে এসে লাগলো 'হিস্ হিস্' আওয়াজ। চমকে উঠে তাকাতেই নজরে পড়লো একটা সাপ। অন্ধকারটা কিছু কমতে আরো ভালোভাবে তাকালাম, দেখলাম চারদিকেই সাপ!—শুয়ে শুয়ে সাপ। দৃষ্টি তাদের প্রায় সবারই আমাদের দিকে। কাচের পাত্রে তাদের জন্য কোনোটায় রয়েছে দুধ, কোনোটায় বা ডিম। কোনো সাপের গায়ের রং কালো, কোনোটার বা তামাটে; আবার কারো কারো রং বিচিত্র। মন্দিরের দিকে এগোবার সময় এদের মধ্যে কারো কারো দেহ আমাদের দেহের সঙ্গে লেগে গেল। কোনোটা মন্দিরের ছাদে ঝুলছে, কোনোটা বা কুণ্ডলীকৃত। সামনেই দেখলাম ভয়ানক জাতের ভাইপার সাপ। সাপটা

একটা ডিম গিলে খাবার জন্য মুখে পুরেছে। তার পাশেই বিষাক্ত এক কেউটে। মৃত্যুর নীরবতায় ভরা মন্দিরের মধ্যে মাঝে মাঝে গেরুয়াধারী পুরোহিতরা ছায়ার মতো ডিম বা দুধভরা পাত্র এগিয়ে দিচ্ছেন। গেরুয়াধারী পুরোহিতদের হঠাৎ দেখলে মনে হবে এঁরাও যেন এক একটা বৃহৎ সর্প বিশেষ।

কেমন করে আর কোথা থেকে এত সাপ এলো এখানে—এই প্রশ্নের উত্তর পেলাম একটা অদ্ভুত স্মিত হাসির মধ্য দিয়ে। নিজেরাই এসেছে আবার নিজেরাই চলে যাবে হয়তো। সত্যিই তো মন্দিরের দরজা সব সময়েই তো খোলা। কেউই তো জোর করে আটকে রাখেনি ওদের।

যে বাসে আমরা পেনাঙে এসেছিলাম, সেই বাস পেনাঙের গভীর জঙ্গল পেরিয়ে যাবে সায়গনে। বাসের কেউই আমার ভাষা বোঝে না। আমিও বুঝি না তাদের ভাষা। লাওস থেকে কম্বোডিয়ায় প্রবেশের পথে আমার দৃষ্টি পড়ল সহযাত্রীদের উপর, মনে হলো ওরা সব দস্যু। ছোটবেলায় পড়া গল্পের দস্যুদের দুর্ধর্ষ চেহারাগুলো আমার চোখে ভেসে উঠল। এক অজানা আতঙ্ক আমায় পেয়ে বসলো। সহযাত্রীদের দৃষ্টি বিনিময় আর হাসিঠাট্টা অস্থির করে তুললো আমাকে। ঠিক সেই সময়েই গভীর জঙ্গলের এক জায়গায় বাসটা এক ঝাঁকানি দিয়ে হঠাৎ থেমে গেল। আমি আমার অনাগত মৃত্যুর জায়গাটা বেছে নিলাম। রাশিকৃত মুরগীর ডিমের ও মুরগীর ঝুড়ি আর শাকসব্জীর মাঝে সরু বেঞ্চিটাই আমার কাম্য।—মরতে হয়তো এর মধ্যেই মরবো, তবু ওরা কিছুতেই জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে আমাকে মারতে পারবে না। দস্যু-ভাবনায় ভয় পেয়ে দিশেহারা হয়েছিলাম সাময়িক, পরে মনে বল ফিরে পেয়ে তাকিয়ে দেখলাম, দেখলাম আমার নৃশংস হত্যাকারীদের দিকে, কিন্তু কই—সহযাত্রী সবাই তো নেমে গেছে!

সেই রাত্রে আমার চূর্ণ-বিচূর্ণ আত্মাকে একমাত্র সঙ্গী করে বসে রইলাম অনেকক্ষণ, মনে হলো—আমার এই মৃত্যুর খবর সংসারে কেউই তো জানবে না। আমার বইয়ের জগৎ—সবই এখন এই পরভূমি থেকে অনেক—অনেক দূরে।

দূরে একটা আলো চোখে পড়লো, তারপর অনেক আলো। ক্রমে ক্রমে সমস্ত রাস্তা আলোয় ঝলমল করে উঠলো। ঢাক মাদল আর ম্যাণ্ডোলিনের তালে তাল মিলিয়ে কম্বোডিয়ান নাচ আর গানে সারা অঞ্চলটায় হঠাৎ একটা আনন্দের বন্যা নেমে এলো। এমন সময় একজন বাসে উঠে পরিষ্কার ইংরেজীতে বললেন, বাসটা খারাপ হয়েছে, ভোরের আগে ঠিক হবে না। তাই আমরা গিয়ে পাশের গ্রাম থেকে ছেলে-মেয়েদের এনেছি আপনার মনোরঞ্জনের জন্য।

খুশি হয়ে সেই উৎসবে আমিও সামিল হলাম, উপভোগ করলাম শতাব্দীর সভ্যতা ও সংস্কৃতিময় অপরূপ নাচ-গান। ভোরের আকাশ সেই আনন্দের রেশ নিয়ে জেগে উঠতে লাগলো।

জীবন সেদিন এক নতুন শিক্ষালাভ করলো—বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধের শিক্ষা। জঙ্গলের অন্ধকার জগৎ থেকে সুন্দরকে খুঁজে পাবার শিক্ষা—অনন্ত জীবনের আহ্বান।

ভারতীয় মহাসভা

আজ এক গৌরবময় দিন। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে আমরাও এসেছি। হাজার হাজার প্রতিনিধির ভীড়ে সমস্ত আসন পূর্ণ। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে দেখা হলো। দেখা হলো স্বাধীনতা সংগ্রামের আর একজন পুরোধা—পণ্ডিত মতিলালের সঙ্গেও। মতিলালের ছেলে সদ্য বিলেত ফেরৎ বিশিষ্ট যুবক জওহরলাল সেখানে উপস্থিত। নেহরু পূর্ণ স্বাধীনতা চান। আর মহাত্মা চেয়েছিলেন প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে স্বায়ত্তশাসন। গান্ধীজির মুখ ধূর্ত শেয়ালের মতো। তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ, অক্লান্ত কৌশলী মহাত্মা গান্ধী ঠিক আমাদের দেশের প্রথম যুগের স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের মতো। লক্ষ লক্ষ মানুষ যখন 'গান্ধীজী' 'গান্ধীজী' বলে আনত হয়ে হয়ে তাঁর সাদা ধুতির প্রান্তদেশ মাথায় ঠেকাচ্ছিলেন তখন তিনি তাঁর শান্ত মুখে হাসির রেখা টেনে ভক্তদের নমস্কার জানাচ্ছিলেন।

গান্ধীজী নিজে সব চিঠি সব সংবাদ পড়তেন, নিজের হাতে লিখে চিঠির জবাব দিতেন। নিষ্ঠাবান সন্ন্যাসীর মতই ছিলো তাঁর চরিত্র। জীবনযাত্রা আর রাজনীতিবোধ ছিলো তাঁর অতি কঠোর। আর বুদ্ধিমান নেহরু ছিলেন স্বাধীনতা-বিপ্লবের ঘোষক মাত্র। জাতীয় কংগ্রেসের এই সব নেতাদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। এই অতি প্রিয় নেতার মধ্যে ছিলো সহিংস সাম্রাজ্যবিরোধী মনোভাব। ১৯৩৯-এর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সুভাষচন্দ্র আত্মগোপন করে স্বদেশ ছেড়ে গিয়ে বর্মা, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দেশে ভারতীয় মুক্তিবাহিনী গঠন করেছিলেন। বহু বছর পরে ভারতবর্ষে নেতাজীর এক সহযোদ্ধার সঙ্গে আলাপ প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছিলেন—সিঙ্গাপুরে যখন লড়াই চলছিল সেই সময়ে জাপানীদের উপর পরীক্ষিত বহু অস্ত্র স্পর্ধিত বৃটিশ সৈন্যদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছিলেন তিনি। সুভাষচন্দ্রের মনে এই চিন্তা ছিল যে, জাপানীরা চলে যাবেই, কিন্তু বৃটিশ ?—এরা তো দুঃস্বপ্ন হয়ে দেশমাতৃকার বুকে চেপে বসে থাকবে!

সুভাষচন্দ্রের আজাদহিন্দ ফৌজ শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়েছিল। সেই ফৌজের নেতারা গ্রেপ্তার হয়ে বিচারের সম্মুখীন হবার সময় জওহরলাল এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের রক্ষা করতে, মুক্ত করতে। ঠিক তখন থেকেই জওহরলাল ভারতের জনপ্রিয় স্বাধীনতা-যোদ্ধা হিসাবে স্বীকৃতিলাভ করলেন।

শায়িত দেবতার দল

ভগবান বুদ্ধের মূর্তি সর্বত্র। কোথাও তিনি দণ্ডায়মান কোথাও বা বসা, কোথাও আবার অর্ধশায়িত তন্দ্রাচ্ছন্ন। তাঁর গায়ের রঙটি কোথাও পালিশ করা চামড়ার মতো —আবার কোথাও হাওয়া ও জলে ম্লান কনুই-মুখ-নাক-গাল আর স্মিত হাসি ভরা ঠোঁট, কোথাও জমেছে শ্যাওলা আর জঙ্গলের কাদা-ময়লা। হঠাৎ জঙ্গলের এক কোণ

থেকে বেরিয়ে আসা আশি ফুট মাপের অর্ধশায়িত তন্দ্রাচ্ছন্ন বুদ্ধ—ঝিরঝিরে শব্দের মধ্যে—এই শতাব্দী···কত শত শতাব্দী···এই ক'টা বছর—না কয়েক হাজার বছর ধরে জাগ্রত না সুপ্ত না অর্ধজাগ্রত ! তবু, তবু কোথায় যেন এক শূন্য জগতের কোমলতা পাথরের মূর্তির সর্বাঙ্গে—যা দেবতাকে যেতে যেতেও যেতে দেয়নি ! সেই শক্ত পাথরের মূর্তির মুখের হাসিটিতে কি অনির্ণেয় মহিমা !—রক্তাক্ত কোন্ গ্রহের দিকে তাকিয়ে তাঁর এই স্মিত হাসি ? চাষী রমণীরা হেঁটে চলে যান, আগুনের পাহাড় থেকে মানুষ নেমে আসে। কোথাও বা দেখা যায় শিরস্ত্রাণধারী যোদ্ধা বা মিথ্যার ভূষণে ভূষিত পুরোহিত। কোথাও আবার পর্যটকের সন্ধানী দৃষ্টি। তবু পাথরের সেই মূর্তি সব স্থানে সমাহিত, বিরাজিত।—তাঁর দৃষ্টি সুদূরপ্রসারী। কিন্তু এখানেই মানব, না অতিমানব—দেবতা—না—মাটি—অস্বীকারের মাঝে কালো পাখীর তীক্ষ্ন চীৎকার—লাল ডানাওলা পাখীর ডানার শব্দ—আর বুনো পাখীর কাকলির মধ্যে স্বস্থানে সমাহিত তিনি।

মনে পড়ে সেইসব স্পেনীয় খ্রীষ্টমূর্তির কথা, যাদের সারা শরীর আর মুখে বংশগত ক্ষতের দাগ ! ফোড়া—উৎকট গন্ধ—যে গন্ধ এসেছে গীর্জাগুলোর স্যাঁতসেঁতে বন্ধ অন্ধকার ঘরগুলো থেকে ! এই সব খ্রীষ্টের দল···দ্বিতীয়বার ভেবেছিলেন, তাঁরা মানুষ না দেবতা ! তাঁদেরকে মানুষ হতে হলে এগিয়ে আসতে হবে দুঃখী-যন্ত্রণাতুর মানুষের কাছে। সেই দাইমা বা কবন্ধ বিকলাঙ্গ অথবা লোভাতুর মানুষদের কাছে ! গীর্জার ভিতরের চত্তরটায় অথবা গীর্জার বাইরে তাদের মানুষ করতে বসে ভাস্কর ভয়ংকর এক ক্ষতের সৃষ্টি করলেন, যা শেষ হলো যন্ত্রণার ধর্মে ! পাপ করলে যন্ত্রণা, পাপ না করলেও যন্ত্রণা—বেঁচে থাকলেও যন্ত্রণা, মৃত্যুর পরেও নরকযন্ত্রণা ! —বাঁচার, বেঁচে থাকার বা বাঁচিয়ে রাখার জন্য কোনো ধর্মই নেই ! কিন্তু এখানে, প্রকৃতির সৌন্দর্যভরা বাইরের জগতের এই মাটিতে বসে ভাস্কর এক দীর্ঘ পদধারী, এই বিরাট পাথরের তৈরি ভগবৎ মূর্তি গড়েছিলেন, তাঁর ঠোঁটে কি অনির্বচনীয় স্মিতহাসি, যা দেখে মনে হয় সংসারের সমস্ত পাপের ভার তিনি নিজে ধারণ করে আনন্দে মত্ত, মনে হয় তিনি তো দেবতা নন্—কি অসাধারণভাবে তিনি মানুষ !— এঁরা কোনো মাকড়সার জালে ভরা মৃত বন্ধঘরের সোঁদা বাতাসকে ভারাক্রান্ত করে তোলেন না।—এখানে হঠাৎ দমকা বাতাসের সঙ্গে বুনো ফুলের গন্ধে ম ম করে ওঠে মন, পাখীর পালক—ঝরাপাতা আর ফুলরেণুতে ভরে যায় এর প্রান্তর।

অভাগা মানুষের সংসার

আমার কবিতা, বিশেষ করে ''মর্তের অধিবাসী' কবিতাগুচ্ছের উপরে লেখা প্রবন্ধগুলিতে বলা হয়েছে 'প্রাচ্যের প্রভাব আমার এই সব কবিতাতে খুব বেশি। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ ভুল। প্রাচ্যের সমস্ত গুহ্যদর্শন—যখনই বাস্তবজীবনের সম্মুখীন হয়েছে তখনই পাশ্চাত্যের উদ্বেগ, স্নায়বিক পীড়া, বিশৃংখলা এবং সুযোগসন্ধানীদের প্রভাবে এক বর্জিত বস্তুর দর্শনে পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ ধনতন্ত্রবাদের

প্রয়োগে যখনই কোনো বিপদ এসেছিল তখনই এটা ঘটেছে। সে সময় ভারতবর্ষের গভীর বিবেচনার সময় নয়। তখনকার এক ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে—যেখানে ক্ষুধা মনুষ্যত্বের চরম অপমান, সামন্তরাজাদের রাজ্যগুলোর মধ্যে বসন্ত-কলেরা ও কালাজ্বরে হাজারো মানুষের বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু ঘটছে, বিশাল দেশের জনসমুদ্রের শিল্পজগতে হাহাকার—এমনই এক সংকটময় সময়ের মধ্য দিয়ে প্রাচ্যের ঘটনাবলী প্রবাহিত হচ্ছিল, যেখানে রহস্যবাদী দর্শনের কোনো স্থানই জনজীবনে ছিলো না।—তখন শুধু নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার সমস্যাই ছিলো জীবন-দর্শন।

তখনকার ভারতবর্ষে অধ্যাত্মবাদের কেন্দ্রগুলি চালাতেন পাশ্চাত্য—বিশেষ করে ইংলণ্ড আর উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার লোকেরা। অবশ্য তাঁদের মধ্যে কারুর কারুর সদিচ্ছা যে ছিলো না এমন নয়, কিন্তু বেশীরভাগই অন্ধভক্তির সুযোগ নিয়ে তথাকথিত অধিবিদ্যা শিক্ষার আবরণযুক্ত মন্ত্রপূতঃ কবচ হাতে দুঃখী, অশিক্ষিত আর দরিদ্র ভারতবাসীদের শোষণ করতেন—যেন পাইকারী দোকানের ক্রেতা! এই লোকগুলি ধর্ম আর যোগের ফাঁকা আওয়াজ করে সার্কাসের খেলা দেখাতেন, যাতে করে এই দুঃখী মানুষগুলো আকৃষ্ট হতে পারেন।

এই একটা মাত্র কারণে প্রাচ্যের মানুষদের দেখে আমার মনে হয়েছিল—এ একটা অভাগা মানুষের সংসার, সেখানকার ধর্ম আর ধর্মীয় আচরণ আমার বিবেককে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করতে পারেনি। সুতরাং আমি বিশ্বাস করি না যে, তখনকার সময়ে লেখা আমার কবিতার মধ্যে প্রাচ্যের ধর্মীয় দর্শনের প্রভাব পড়েছে। বরং আমি বলবো—এই দেশে এক বিদেশী কবির অক্ষম একাকীত্বই প্রকাশ পেয়েছে।

তিন মাসের সরকারী কাজটা আমার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই শেষ হতে পারতো, তা হয়নি। কলকাতা থেকে আসা চা আর মোমের পেটির উপর আমার নামের মোহর, সই আর ছাপ লাগাতে হতো,—এ কাজটা সারা হলেই আবার বিশ্রাম, তিন মাসের। আর এই দীর্ঘ সময় আমার কাটতো একা একা চিন্তা করে আর নানান্ স্থানে ঘুরে বেড়িয়ে।—কবি জীবনের এই সময়টুকু ছিলো খুবই যন্ত্রণাদায়ক।

রাস্তাই আমার সর্বস্ব।

বর্মার রাস্তায় রাস্তায় চীনাদের সুন্দর সুন্দর বাড়ী, বাড়িগুলোর গায়ে লাগানো রয়েছে কাগজে তৈরী বহুবর্ণের ড্রাগনের ছবি, আর রয়েছে মুক্ত অঙ্গনে নাটক, জলসার আসর।

হিন্দু অধ্যুষিত রাস্তায় অবনমিত হতমান একদল মানুষ মন্দিরে বসে ধর্ম বিক্রী করছে। পাশে কাদার মধ্যে গড়াগড়ি দিচ্ছে গরীবঘরের শিশুরা, কিছু না খেয়েও বড় হচ্ছে তারা! বাজারে দেখতাম পানের বোঝা—যেন সবুজ একটা পর্বত। তার আশেপাশে বুনো জন্তু জানোয়ার আর পাখীর বেসাতি। রঙীন লুঙ্গি আর চাপকান পরা মুখে চুরুট নিয়ে বার্মিজ সুন্দরীদের ভীড় দেখতাম রাস্তায়। তন্ময় হয়ে এই সব দেখতে দেখতে কখন এক সময় বাস্তব জীবনের ভিড়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলতাম।

ভারতীয়দের জাতিভেদটা ছিলো গ্রীক থিয়েটারের সিঁড়ি পার হয়ে স্তম্ভে ওঠার

মতো—যার মাথায় বসেন ভগবান নিজে। ইংরেজরাও তাদের ভিত্‌ মজবুত করতে জাতিভেদের জন্ম দিয়েছিলেন। একজন কেরানী থেকে শুরু করে সিভিল সার্ভিস অর্থাৎ আই. সি. এস—এবং শেষ পর্যন্ত সবার উপরে থাকতেন মহান ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীশ্বর—ইংলণ্ডের মহানুভব রাজা বা রাণী।

এই দুটি জগৎ কিন্তু কোনোদিনও মিশ খেতো না। দেশী লোকেরা ইংরেজদের আসনের ধারে-কাছেও আসতে পারতো না। ইংরেজরাও দেশী মানুষের ধমনীর স্পন্দন কোনোদিন শোনার চেষ্টাও করেনি! এই দুই জগতের মাঝখানে আমার চলাফেরাটা ছিল বেশ মুস্কিলের। আমার ইংরেজ বন্ধুরা ঘোড়ায় টানা আমার ছোটো গাড়িটি দেখে মুখ বেঁকিয়ে বলতেন—রাষ্ট্রদূতের এটা শোভা পায় না। তাঁরা আরো বোঝাতে চাইতেন—এই যে আমার যখন তখন বেড়াতে যাওয়া বা বার্মিজ কাফেতে বসে পৃথিবীর সব সেরা চা খাওয়া—এও শোভনীয় নয়। আমাকে ওরা শেষবারের মতো সতর্কও করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত আমায় দেখে সামান্য একটি অভিবাদন জানানোটুকুও বন্ধ করে দিলেন।

ওঁদের জগৎ থেকে এই নির্বাসন আমার ভালোই লেগেছিল। ওই সব দাম্ভিক য়ুরোপীয়ানদের জন্য তো আর এখানে আমি আসিনি, আমি এসেছি প্রাচ্যের আত্মা আর এই দুর্ভাগা মানুষদের সংসারের একজন শরিক হিসাবে। নিজেকে এমনভাবে এদের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেছিলাম যে শেষ পর্যন্ত সেখানকার একটি মেয়ের কাছে আত্ম-সমর্পণ করতে হয়। ইংরেজ রমণীর সাজে সজ্জিতা হয়ে বার্মার পথে প্রায় বেড়াতেন যিনি—সেই বার্মিজ-ললনাটিকেই মন দিতে হয়েছিল।

মৃতদার পুরুষের নৃত্য

গৃহী-জীবন শুরু হয় আমার বেশ অশান্তির মধ্যেই। মিষ্টি মেয়ে জোসি ব্লিস্‌ ক্রমে ক্রমে আমার প্রতি এমনই আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন যে আমি যেন তাঁর একটা সম্পত্তিতে পরিণত হলাম। আমার প্রতি মোহভাব, সন্দেহাতুর বদমেজাজ শেষ পর্যন্ত প্রায় অর্ধোন্মাদ করে তুলেছিলো মেয়েটিকে। জোসির নগ্নপদের সৌন্দর্য, কালো চুলে ভরা মাথায় রজনীগন্ধার সাদা গুচ্ছ হয়তো অনন্তকাল তাঁর পাশে রেখে দিতো আমাকে, কিন্তু সন্দেহ, হিংসা, মালিকানা ভাব আর বদমেজাজ বা ততোধিক তীব্র গালিগালাজ তাঁর কাছ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে দিয়েছিল আমাকে। আমার বাড়ি থেকে আসা টেলিগ্রামগুলো পর্যন্ত আমাকে খুলতে দিতেন না! নিজে খুলতেন, নিজেই পড়তেন তারপর আমার কাছে পেঁছাতো—হয়তো সব পেঁছাতো না!

মাঝে মাঝে রাত্রে ঘুম ভেঙে গেলে দেখতাম—সাদা পোশাক সর্বাঙ্গে জড়িয়ে তীক্ষ্ন বড় একটি ছুরি হাতে আমার মশারীর ধারে বিড়বিড় করে বকছেন আর ঘুরে বেড়াচ্ছেন!—আমাকে মারবে কি মারবে না এই দ্বন্দ্বের দোলায় দুলছেন জোসি। পরদিন সকালেই দেখতাম এক রহস্যময় মন্ত্রোচ্চারণের দ্বারা আমাকে বশীভূত করে রাখার চেষ্টা।

হয়তো উনি আমাকে হত্যা করতেন যদি না হঠাৎ সিংহলে বদলী হবার খবরটা পৌঁছাতো। চুপি চুপি যাবার ব্যবস্থা করে জাহাজে উঠে বসলাম একদিন।

বর্মার জঙ্গলের চিতা 'জোসি ব্রিস্'কে ছেড়ে চললাম। দুঃখে সেদিন মন আমার ভেঙে গিয়েছিল।

জাহাজ বাংলার উপসাগর ছেড়ে বেশ দুলতে দুলতে চলতে শুরু করেছে। কেবিনে প্রবেশ করে কবিতা লেখা শুরু করলাম। 'মৃতদারেরর ট্যাঙ্গো-নাচ' কবিতাটি লেখা শেষ হলো, উৎসর্গ করলাম 'জোসি'কে, যিনি নিজের আগুনে জ্বলে আমাকে পেয়েও হারালেন্।

রাত্রির আকাশ কি বিরাট! পৃথিবী কত নিঃসঙ্গ!

আফিম্

জায়গায় জায়গায় কাঠের বড় বড় বেঞ্চি, রাস্তার পাশে পাশে আফিমের দোকান। বেঞ্চিতে নেই কোনো ফরাস পাতা, নেই কোনো রঙীন ঝলমলে বোনা তাকিয়া। আছে চীনামাটির নল আর সেই নল মুখে লাগিয়ে সারি সারি মানুষ কাঠের সেই বেঞ্চিগুলোতে সটান হয়ে শুয়ে বুঁদ হয়ে আছে নেশায়।

অনাড়ম্বর এক বাতাস সারা জায়গাটাকে ভরে তুলতো—যা মন্দিরগুলোতেও কখনো অনুভব করিনি। প্রথমে একবার নল মুখে গুঁজে টানলাম, কিছুই বুঝলাম না স্বাদ, শুধু দুধের মতো সাদা একরাশ ধোঁয়ায় চারপাশ ভরে উঠেছিলো। এরপর একসঙ্গে চার-চারটি নল মুখে পুরে টেনেছিলাম, ফলে বিছানা ছেড়ে উঠতে পারিনি পাঁচদিন! বমি বমি ভাব মেরুদণ্ড বেয়ে ওঠার সময় মাথার উপর থেকে নেমে আসা আর এক অনুভূতির ধাক্কা খেয়ে থমকে গেল। আফিমের প্রতিশোধ! ভাবলাম, এই কি সেই—যার জন্য শুল্ক বিভাগের কর্মীরা তল্লাসী চালায়, এই কি সেই সুবিখ্যাত পবিত্র বিষ?—না, হতেই পারে না! এর ভিতরে নিশ্চয়ই আরো কিছু হয়তো আছে।—এ বিষ আমাকে আরও পান করতে হবে, আরও অনেক নল চেখে ধোঁয়া ছেড়ে তবেই আমি এ সম্বন্ধে রায় দিতে পারবো।

পরীক্ষা করেছিলাম। অনেক—অনেক নল মুখে নিয়ে পরীক্ষা করে সমস্ত সংসারকে ধোঁয়ায় ভরে দিয়েছিলাম। কিন্তু কোথায় স্বপ্ন, কোথায় আমার হারিয়ে-যাওয়া ছায়ামূর্তিরা—কোথায়ইবা আমার বেদনাহত এই শরীরে আনন্দের আবেগ সঞ্চরণ!—এতে দেখা যাচ্ছে শরীরে যেটুকু বা শক্তি ছিলো তারও অপমৃত্যু ঘটেছে! মনে হচ্ছে সমস্ত আবহাওয়াটাই এক অনাহতধ্বনিতে ভরে গেছে। সব কিছু কালো হয়ে গেল, ভিতরটা মনে হলো শূন্য, সামান্য নড়াচড়া, কনুই একটু সরানো—দূরে থেকে ভেসে আসা গাড়ীর শব্দ বা একটা কান্না—সবই একাকার!—কেমন যেন অনুভূতিহীন আনন্দময় এক ঘনঘোর নিদ্রার কোলে ঢলে পড়লাম! সেদিন বুঝেছিলাম, চা-বাগানের কুলি-মজুর বা অন্য সব শ্রমিকশ্রেণী অথবা রিক্সাটানা মানুষেরা কেন ওই আফিমের নেশার কাছে নিজেদের সঁপে দেয়, সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চায়।

অনেক কিছু পরিষ্কার হলো এতদিনে। আফিম তাহলে প্রাচ্যের কোনো এক অপার্থিব বা অদ্ভুত কোনো বস্তু নয়, আফিম হচ্ছে শোষকের শোষণ করার অস্ত্র আর শোষিতদের জীবন থেকে পালানোর সহজতর উপায়।—এতে এছাড়া আর কিছুই নেই, আছে শুধু শ্মশানের শান্তি।—কি বিশ্রী আর চিত্তাকর্ষক এর গন্ধ—একবার কাছে টানে আবার দূরে ঠেলে দেয়। ধ্বংসের এমন সুন্দর রাস্তা বোধহয় আর নেই। সাম্রাজ্যবাদীরা উপনিবেশকে আঁকড়ে রাখতে এই মারণাস্ত্রটাই প্রজাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে!

অনেকের অনেক স্বপ্নই চুরমার হয়ে গেছে। আফিমের নেশায় বুঁদ হয়ে স্বপ্নের পাহাড় সৃষ্টি করে তারই মধ্যে হারিয়ে ফেলেছে নিজের সত্তাকে। বিশাল এক সাদা ধোঁয়ার রাজত্বে অনেক কল্পনা ভেসে গেছে অনেকেরই। সমুদ্র-তলের স্বাদে, পাহাড়ের চূড়ায়, মেঘের রাজ্যে উদ্দেশ্যহীন শান্তির মধ্যে সমাধিস্থ হয়েছে অনেকের মানবতা বিকাশের পথ।

এরপর আর আফিমের আড্ডায় যাইনি। যা জানতে চেয়েছিলাম, যে অস্পৃশ্য বস্তুর স্বাদ-গ্রহণে ছুটেছিলাম তার গভীরে গিয়ে শেষে নিজেকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিলাম।

সিংহল

১৯২৯ সালে সিংহল ছিলো পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর দ্বীপ। বর্মা ও ভারতের মতোই বৃটিশ রাজ্যের কলোনি বা উপনিবেশ। বৃটিশরা সিংহলী সমাজ-জীবন থেকে নিজেদের সরিয়ে নিয়ে ক্লাবঘর খানাপিনা আর আমোদ প্রমোদে দিন কাটাতে থাকলো। সাহেব আর হিন্দুদের মাঝখানে পড়ে আমার জীবন হয়ে উঠলো দুঃসহ। না পারতাম প্রতি সন্ধ্যায় 'ডিনার-জ্যাকেট চড়িয়ে ক্লাব আর নাচের আসরে যোগ দিতে, না সইতো হিন্দুদের জাতিভেদের নিয়ম-কানুন। ভয়ানক একাকীত্ব তখন গ্রাস করেছে আমাকে! তবু এর উজ্জ্বলতাকে অস্বীকার করতে পারিনি। মনে হয়েছিলো আকাশ থেকে হঠাৎ আসা এক ঝলক বিদ্যুতের আলো আমার ভিতর-বার সব কিছুকে উজ্জ্বল আলোয় ভরে দিয়ে গেল।

শহরের সীমান্তে সমুদ্রতীরে ওয়েলাওয়াতি।—এখানেই ছোট্ট একটা বাঙলো নিলাম। এ জায়গায় খুব বেশি লোকজন নেই, এখানে সমুদ্রের ঢেউ এসে খান খান হয়ে ভেঙে পড়ে অভূতপূর্ব এক সঙ্গীত সৃষ্টি করতো—যা শুনে যৌবনভরা সমুদ্র ফুলে-ফেঁপে উঠতো, তীরে এসে মেলে ধরতো নিজেকে।

প্রভাতের সমুদ্র-ধৌত সৌন্দর্য অভিভূত করতো আমাকে। বিরাট সামুদ্রিক মাকড়সার মতো জেলেদের পাল-তোলা ছোটো ছোটো নৌকার ভিড় দেখতাম আর দেখতাম তাদের মাছ ধরা। কত রং-বেরঙের মাছ ওরা সমুদ্র থেকে তুলে আনতো—কোনোটা ঘন-নীল যার চকমকে ঝলকানি দেখে মনে হবে গভীর জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসা ঘন-বেগুনী রঙের এক-একটি পাখী সমুদ্রে ডুব দিয়ে জেলেদের হাতে নিজেকে

সমর্পণ করছে। আবার কোনো কোনোটা ফোলা-বেগুনের মতো, চুপসে গেলে তার সর্বাঙ্গে কাঁটাগুলো বেরিয়ে আসতো—দেখে মনে হতো যেন এক-একটা কাঁটার বস্তা।

পরম বিতৃষ্ণায় দেখতাম সমুদ্রের এই সব হীরা-মাণিকের হত্যালীলা। বড় বড় ছুরি দিয়ে ঈশ্বর সৃষ্টপ্রাণীগুলোকে টুকরো টুকরো করে তা বিক্রী করা হচ্ছে মানুষেরই কাছে।

সমুদ্রের ধারে ঘুরতে ঘুরতে দেখতে পেতাম হাতির আস্তানা। সঙ্গী কুকুরটি আমাকে রাস্তা দেখাতো। প্রথমে নজরে পড়তো ভুঁইফোঁড় ছত্রাক, তারপরেই মোটা সাপের মতো শুঁড়—তারপরে তাদের ধবধপে সাদা দাঁত, তার পরে বেরিয়ে আসতো তাদের বিরাট দেহগুলো। এত হাতি এর আগে দেখিনি। কোনো সার্কাসে বা চিড়িয়াখানাতেও এত হাতি নেই। বাঁশের বড় বড় গোছা, কাঠের বিরাট টুকরোগুলো শুড়ে ঝুলিয়ে হাতির দলগুলি যখন যেতো—তাদের দিকে তাকিয়ে তখন মনে হতো এক একজন শ্রমজীবি মানুষ যেন তার সমস্ত জীবনের ক্লান্তির বোঝা বয়ে নিয়ে চলেছে—কোনো সুদূরের উদ্দেশে।

একটি কুকুর আর একটি বেজি এরাই ছিলো আমার সঙ্গী, আমার বন্ধু। জঙ্গল থেকে কুড়িয়ে এনেছিলাম বেজিটিকে, নাম রেখেছিলাম কিরিয়া। উপলব্ধি করেছিলাম বেজীর চেয়ে স্নেহাতুর বন্ধু মানুষের নেই। আমার আদরের এই বেজিটি আমার সমস্ত অনুভূতিই উপলব্ধি করতে পারতো। খাওয়া-দাওয়ার পর যখন ঘুমোতে যেতাম ও আমার কাঁধের উপর মাথা রেখে ঘুমুতো, অথচ যে কোনো বন্যজন্তুর মতোই সদা-সতর্ক ছিলো ওর ঘুম। বিষাক্ত সাপের সঙ্গে যুদ্ধ করে সাপকে মেরে ফেলার মধ্যে ছিলো বেজির পৌরাণিক মাহাত্ম্য, যুদ্ধ শেষে জঙ্গলে ঢুকে জংলী গাছের রস পান করে বেজি হয়ে উঠতো চাঙ্গা—সব বিষই তার কেটে যেতো।

আমার কিরিয়ার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিলো সমস্ত গ্রামে। এক অপরাহ্নে দেখি পাড়ার সমস্ত ছেলে-মেয়ে আমার বাঙলোর সামনে দাঁড়িয়ে। ওরা রাস্তায় একটি ভীষণ বিষাক্ত সাপ দেখতে পেয়েছে, তাই ওরা এসেছে 'কিরিয়া'কে নিয়ে যেতে কারণ ওদের দৃঢ় ধারণা—একমাত্র কিরিয়াই পারবে এই সাপটিকে পরাভূত করতে এবং কিরিয়া জয়ী হলে সুরু হবে ভোজ ও বিজয়োৎসব। একগাদা তামিল আর সিংহলী ছেলে-মেয়ের সঙ্গে কিরিয়াকে সাথে করে রওনা হলাম রণভূমির উদ্দেশে।

পৌঁছেই দেখতে পেলাম সাদা তুষার স্তূপের মধ্যে কালো লিকলিকে একটা বেতের মতো একটি সাদা জলের পাইপের মাথায় ভয়ানক বিষাক্ত রাসেল ভাইপার সাপটি সূর্য-স্নানে মগ্ন। নিঃশব্দ—নিশ্চুপ স্থাণুর মতো আমারা সবাই দাঁড়িয়ে রইলাম—কিরিয়াকে ছেড়ে দিলাম পাইপটার উপরে। বিপদের গন্ধ পেয়ে কিরিয়া সাপটির মুখোমুখি দাঁড়াতেই আমরা রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। হঠাৎ জটা ছাড়িয়ে—বিষাক্ত ফণা বিস্তার করে সাপটি যখন তার মুখ-গহ্বর মেলে ধরলো—তীব্র ভয়ার্ত চীৎকার করে আমার বেজিটি সোজা পিছন ফিরে এক দৌড়ে আমার বাঙলোয় ঢুকে শোবার ঘরে লুকিয়ে পড়লো।

আজ থেকে তিরিশ বছর আগে ওয়েলাওয়াতির শহরাঞ্চলের ধারে সেদিন আমি আমার জাত হারিয়েছিলাম।

১৯১৮-১৯ সালে লেখা কবিতাগুলো পড়তে গিয়ে আমার হাসি পেয়েছিলো। কবিতাগুলোর মধ্যে কোথায় যেন একটা পূর্ণতার অভাব আমি লক্ষ্য করেছি। মানুষ ও তার পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে ভালোভাবে না জানলে বা উপলব্ধি করতে না পারলে পূর্ণতা আসে না—সমস্ত চিন্তাকেই শুধুমাত্র কল্পনার উপর দাঁড় করানো যায় না।

একাকীত্বের যে কি অসহনীয় যন্ত্রণা—ওয়েলাওয়াতির ওই ক'টা বছরের জীবনেই আমি তা উপলব্ধি করেছিলাম। সঙ্গী বলতে ছিলো—একটি খাট, একটা টেবিল, দুটি চেয়ার—আর আমার কুকুর ও বেজিটি। আর ছিলো একজন ভৃত্য—যার নাম ছিলো ভ্রাম্পি। সারাদিনের কাজ শেষ হলেই সে চলে যেতো তার নিজের গ্রামে—আবার ভোর হলেই হাজির হতো। প্রাচ্যের দাসত্ববোধ ওকে করেছিলো একটি নীরব প্রাণহীন ছায়ামাত্র। আমার দৈনন্দিন জীবনের যা কিছু চাহিদা ও সম্পন্ন করে রাখতো নীরবে—কাজেই কথা বলা বা আদেশ করার কোনো অবসরই ও আমায় দিতো না। আমাকে সন্তুষ্ট রাখাই যেন ছিলো ওর ব্রত। মাঝে মাঝে এক ঝলক হাসির ফাঁকে দেখতে পেতাম সাদা একজোড়া ওর দাঁত, নইলে মনে হতো—কথা বলতে বোধহয় ও ভুলে গেছে।

এই নিঃসঙ্গতা কিন্তু আমায় কবিতা লেখার কোনো উপাদানই দেয়নি—বরং দিয়েছে বন্দীশালার অসহ্য যন্ত্রণা। মাঝে মাঝে মনে হতো কারাগারসম এই ঘরের দেওয়ালে নিজের মাথাটা ঠুকে ঠুকে গুঁড়িয়ে ফেলি, কিন্তু বাইরের জগৎ তো জানবে না শুনবে না আমার একাকীত্বের এই দুঃখ, আমার এই নিষ্ফল কান্না বা আর্ত চীৎকার।

সামনের ওই নীল আকাশ, ওই হলুদ-বালির স্তূপ পেরিয়ে ওই প্রাচীন প্রাগৈ-তিহাসিক জঙ্গলের সীমানা পেরিয়ে বিষাক্ত সাপ ও বন্য হাতির ভিড় ঠেলে—দূরে—বহুদূরে রয়েছে মানুষের রাজ্য—যারা কাজ করে কাজের শেষে ঘরে ফিরে গান গায়—বন আর মাটি কেটে যারা তৈরী করেছে নিজেদের বসতি গ্রাম। জলের ঘড়া কাঁখে নিয়ে অর্ধনগ্ন নারীদেহ যৌবনের জোয়ার তুলে ফেরে তাদের গৃহে, তাদের আকর্ষণে অস্থির আশ্চর্য এক মাদকতা। কিন্তু কেমন করে পৌঁছবো প্রাণোচ্ছল ওই জীবনের কাছে—কেমন করে ওই সব মানুষকে আমি বোঝাবো যে, আমি ওদের শত্রু নই।

সিংহল দ্বীপকে আমি জেনেছিলাম ধীরে, অতি ধীরে—সিংহলী মানুষদের হৃদয়ের স্পন্দনও শুনতে পেয়েছিলাম—ধীরে, অতি ধীরে।

একদিন রাত্রে আমার বাংলো থেকে অনেকটা দূরে এক নৈশভোজের নিমন্ত্রণ এলো। অন্ধকারে রিক্সায় চড়ে যেতে যেতে হঠাৎ দূর থেকে সুমিষ্ট গানের সুর ভেসে এলো আমার কানে। মনে হলো—ছোট্ট কোনো একটি ছেলের মিষ্টি গলার আওয়াজ। রিক্সা দাঁড় করালাম। যুঁই ফুল, নারকেল আর বাদাম তেল মেশানো সিংহলের সেই চেনা গন্ধ নাকে এসে লাগলো। আমাকে দেখে ওই অন্ধকারের ভেতর থেকে কয়েকজন লোক বেরিয়ে এলো। অন্ধকারের মাঝে রিক্সায় বসে গান শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম। যে গান গাইছে তার গলাটা মাঝে মাঝে উচ্চ গ্রাম থেকে প্রায় লয়ে এসে যেন সমুদ্রের অতলে তলিয়ে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল ছায়াগুলো বাদাম গাছের গন্ধে বিভোর হয়ে হঠাৎ ওজন-শূন্য হয়ে পড়ছে অথবা যুঁই ফুলের মৃদু মন্দ গন্ধে তারা সব মিলিয়ে গিয়ে আবারো ফিরে আসছিল অশরীরী এক রূপ ধরে। মাটির ভিতর থেকে বেরিয়ে আসা সেই সুর, সঙ্গীত আর গন্ধের মধ্যে আমি

নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম। তন্ময়তা কাটতে সেই অন্ধকার পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে মনে হয়েছিলো মাটির চাপ থেকে এক সোগন্ধ উঠে আসছে আর তার সঙ্গে আমার চারপাশে ভিড় করেছে অশরীরী ছায়াদের দল।

ভোজসভায় পৌঁছে দেখলাম সাদা বুট আর কালো ডিনার-জ্যাকেট পরা বৃটিশ পুঙ্গবরা টেবিলে জড়ো হয়েছে। ওদের তীব্র ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টির সামনে দিয়ে এগিয়ে গিয়ে টেবিলে বসার আগে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বললাম, 'আমার এই অনিচ্ছাকৃত দেরি হওয়ার জন্য ক্ষমা চাইছি। আসার সময় স্থানীয় গান শুনতে গিয়ে সময়জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম।'

চোখ কপালে তুলে সাহেবরা আমাকে যা বললেন তার মর্মার্থ হচ্ছে—গান! এদেশীয় গান! সেটা আবার শোনবার জিনিস!—সেজন্য দেরী! তাদের কাছে আমার এই কৈফিয়ৎটা যেন মস্ত একটা খবর মনে হয়েছিলো।

বৃটিশ প্রভু আর তাঁদের দাসানুদাস প্রজাদের মধ্যেকার এই ভয়ংকর ফাঁক পূরণ করার চেষ্টা বৃটিশরা কোনও সময়ই করেন নি। আর এই অমানবিক বিচ্ছিন্নতার জন্যই প্রাচ্যের মানুষদের সমাজ-সংস্কৃতির কোনো মূল্যায়নই ওঁদের দ্বারা হয়নি।

ব্যতিক্রম যে ছিলো না এমন নয়। কোনো কোনো ইংরেজ গভীর জঙ্গলে পালিয়ে গিয়ে এই অসহনীয় নির্জনতা থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা করতেন। সেখানকার পরিবেশ প্রকৃতি আর মানুষদের জানবার আকাঙ্ক্ষায় হয়তো সেখানকার কোনো রমণীকে জীবন-সঙ্গিনী করতেন। খবরটা জানাজানি হলে ইংরেজরা তাঁকে সমাজচ্যুত করতো।

এই সময়েই একটা ঘটনা ঘটলো। একজন সিংহলী চাষী তাঁর জমির কর দিতে না পারার জন্য বৃটিশ সরকারের হুকুম হলো চাষীটির ঘরদোর জ্বালিয়ে দিয়ে জমি-জায়গা সব কেড়ে নেওয়া হোক। এই আদেশ কার্যকরী করার ভার পড়লো লিওনার্দো উলফ্ নামক এক ইংরেজ কর্মচারীর উপর। তিনি এ কাজ করতে অস্বীকার করায় তাঁকে চাকরী থেকে বরখাস্ত করে জাহাজে চাপিয়ে ইংলণ্ডে ফেরৎ পাঠানো হলো। উল্‌ফ দেশে ফিরে বৃটিশ ঔপনিবেশিকতার উপর অনেকগুলি বই লিখেছিলেন। তাঁর একখানি বইয়ের নাম 'জঙ্গলের মধ্যে একটি গ্রামের কাহিনী'। তখনকার দিনে সাহিত্য-সমাজে বইটি সমাদর পেয়েছিলো।—সেই সমাদর চিরকাল থাকতও যদি না তাঁর স্ত্রী ভার্জিনিয়া উলফের সাহিত্যিক-খ্যাতি বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়তো।

আস্তে আস্তে শক্ত খোলসটা সরিয়ে কিছু কিছু লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করেছিলাম। সেই সময় দেখেছিলাম যুবক-যুবতীদের মনে ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাব তাদের আচার ও আচরণে কি অসাধারণ পরিবর্তন এনেছিলো। দেখেছিলাম একাধারে পিয়ানোবাদক, আলোকচিত্রী আর সমালোচক লায়নেল ওয়েনড্‌টকে, তিনি তখনকার সিংহলী সমাজে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। সিংহলী সমাজ একদিকে তখন সাম্রাজ্যবাদী-মৃত্যু-শৃঙ্খলে জর্জরিত আর অন্যদিকে মানবতার মূল্যায়নে দ্বিধা বিভক্ত!

লায়নেল ওয়েনড্‌টের সুবিশাল গ্রন্থাগারে প্রায় প্রতিদিনই ইংলণ্ড থেকে প্রকাশিত সব বই-ই আসতো আর উনি একজন সাইকেলারোহীর মাধ্যমে প্রতি সপ্তাহেই এক গাদা করে বই পড়বার জন্য আমার কাছে পাঠাতেন। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই কয়েক

কিলোমিটারের মতো ইংরেজি সাহিত্য আমার পড়া হয়ে গিয়েছিলো। এর মধ্যে গোপনে ছাপা 'লেডি চ্যাটার্লি'র প্রেম', বইটির প্রথম সংস্করণটিও ছিলো।

লরেন্সের লেখা আমার ভালো লাগতো। ওঁর রচনার মধ্যে যেমন এক কাব্যিক ভাব ছিলো, তেমনি ছিলো প্রাণের চুম্বক শক্তি যা নর ও নারীর সম্বন্ধকে সহজভাবে মেলে ধরতো। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই লরেন্স সম্বন্ধে একটা জিনিস আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠলো। এত প্রতিভা সত্ত্বেও লরেন্স তাঁর রচনার শেষে পাঠককে কিছু উপদেশ বা শিক্ষা দিতে চাইতেন—যা বহু ইংরেজ সাহিত্যিকের মতো লরেন্সও যৌনবিদ্যা বা অভিজ্ঞতা বর্ণনায় মেতে উঠতেন—যেটা নিজের জীবন বা প্রেমালাপের মধ্যে সহজেই মানুষ উপলব্ধি করতে বা শিখতে পারে। তাই শেষের দিকে তাঁর রচনা যদিও বিরক্তিকর মনে হতো, তবু তাঁর আহত অতীন্দ্রিয় যৌনবাদ মন্দ লাগতো না এই ভেবে যে—এ যন্ত্রণা নিরর্থক, নিষ্প্রয়োজন।

সিংহলের হাতি ধরার কথা আজও আমার মনে আছে। কেমন করে কয়েকটা পোষা হাতিকে এগিয়ে দিয়ে বুনো হাতিগুলোকে খোঁয়াড়ের মধ্যে আনা হতো। তারপর সেই সব বুনো হাতির দলকে ঘেরাও করে মাহুতেরা অঙ্কুশ হাতে বুনো হাতিগুলোর পিঠে চড়ে বসতো! এরপর দুটি করে পোষা হাতি এক একটি বুনো হাতির দু'পাশে প্রহরা দিতে দিতে বুনো হাতিকে বন্দীশালায় এনে হাজির করলে তাকে শৃঙ্খলিত করা হতো। এর ফলে কিছুদিনের মধ্যেই দেখা যেতো বুনো হাতি পোষ মেনে প্রভুর নির্দেশ পালন করে চলেছে।

কলম্বোর জীবন

কলম্বোর শান্ত জীবনের কোথাও ভারতবর্ষের মতো ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কোনো ছায়াই দেখিনি। এক দুঃখদায়ক শান্তিতে সব কিছু ভরা ছিলো সিংহল-বাসীদের। সিংহলের সেরা চা পান করতো ইংরেজরা।

সিংহল দেশটাকে বহু ছোটো ছোটো অংশে বিভক্ত করা হয়েছিলো। এই ছিন্নভিন্ন দেশের উচ্চাসনে বসার স্থান দখল করেছিল বৃটিশ নাগরিকরা অর্থাৎ ইংরেজ জাতি। বিরাট বিরাট বাগানবাড়ি দখল করে পরম সুখে জীবন কাটাতো তারা। এর পরেই স্থান পেয়েছিলো মধ্যবিত্ত সমাজ অর্থাৎ দক্ষিণ আফ্রিকা ফেরৎ ডাচ উপনিবেশিকরা, যারা সিংহলে এসে বসবাস করতো দক্ষিণ আমেরিকানদের মতো। তারপরে স্থান হয়েছিলো বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ও মুসলমান সম্প্রদায়ের কয়েক লক্ষ মানুষের। আর সব শেষের স্থান নির্দিষ্ট হলো কয়েক লক্ষ ভারতীয় নাগরিকের—এরা সব দক্ষিণ ভারতের মানুষ; এদের মাতৃভাষা হচ্ছে তেলেগু বা তামিল, জাতিতে হিন্দু—এদের পেশা দিনমজুরী—দারিদ্র্যসীমার বহু নীচে ছিলো এদের জীবন।

তথাকথিত ভদ্রসমাজের মানুষ যারা সুন্দর সুন্দর পোশাক আর বহুমূল্য নানাবিধ অলঙ্কারে ভূষিত হয়ে পরমানন্দে কাল যাপন করতো তাদের মধ্যে নেতৃত্বের কোঁদল শুরু হয়ে গেল এক সময়ে। দু'জন প্রার্থী—একজন ফরাসী, নাম তাঁর 'কাউন্ত

দ্য মুন্‌ফ্যানি', যাঁর আশেপাশে বেশ কিছু গুণমুগ্ধের ভিড় ছিলো, আর অপরজন 'কোনো চিন্তা নেই' গোছের এক পোলিশ—এঁর নাম হচ্ছে 'উইনজার', ইনি আমার একজন বন্ধু—এঁর ভক্তরা ছিলেন আধুনিক সমাজের মানুষে। নিন্দুক-ব্যঙ্গপ্রিয় আর সব-জান্তা এই ব্যক্তিটির কাজ ছিলো ঐতিহ্য, ইতিহাস ও প্রত্নতাত্ত্বিক বস্তুকে বাঁচিয়ে রাখা। ইনি যখন প্রত্নতত্ত্বের সন্ধানে বেরোতেন তখন ওঁর সঙ্গী হওয়াটা ছিলো খুব আনন্দের।

'প্রত্নতত্ত্বের সন্ধানে বেরিয়ে উইনজার অতি অপূর্ব দুটি শহর আবিষ্কার করেছিলেন। শহর দুটির একটির নাম 'অনুরাধাপুর', অন্যটির নাম হচ্ছে 'পলোন্নারুওয়া'। বিশাল বিশাল স্তম্ভ আর বিরাট বিরাট অলিন্দগুলি সিংহল-সূর্যের স্পর্শে পুনর্বার ঝলসে উঠেছিলো। তবে তার মহামূল্য ঐশ্বর্য ও মূর্তি ইত্যাদি সবই জাহাজযোগে লণ্ডনের যাদুঘরে পাঠানো হয়েছিল।

বন্ধু উইনজার খুব কারিতকর্মা মানুষ ছিলেন। প্রায়ই দূরদূরান্তে গিয়ে সেখানকার মন্দিরাদির পুরোনো পুরোনো মূর্তি আর শিল্প-ভাস্কর্যের নিদর্শন তুলে এনে লণ্ডনের যাদুঘরে পাচার করতেন। মন্দিরের পূজারীরা হাসিমুখেই হস্তান্তরিত করতেন এ সমস্ত নিদর্শন! হাসিমুখেই তাঁরা সেলুলয়েডের তৈরী রঙীন মূর্তিগুলো গ্রহণ করতেন উইনজারের কাছ থেকে!—এই সব পলকা মূর্তিগুলো মহামূল্য পাথরে তৈরি মূর্তির শূন্যস্থানে বসার জায়গা পেতো।

বৃটিশ সাম্রাজ্যের বরণীয় ব্যক্তি এই উইনজার ছিলেন একজন মার্জিত এবং স্বল্পালোকের শিল্পী বিশেষ।

সূর্য-ঝলসানো দিনগুলির মাঝে হঠাৎ কখন যেন একটা কালো মেঘ এসে সব কিছুকে অন্ধকারে ভরিয়ে দিলো। দেখলাম আমাকে কিছু না জানিয়েই আমার সেই বার্মিজ প্রণয়ী জোসি ব্লিস আমারই বাড়ির সামনে তাঁবু খাটালেন। ভেবেছিলেন রেঙ্গুন ছাড়া অন্য কোথাও চাল পাওয়া যায় না, তাই চালের বস্তা পিঠে ঝুলিয়ে পল রবসনের গানের কয়েকটা রেকর্ড আর শোবার জন্য একটা মাদুর সঙ্গী করে এখানে এসেছেন।

'জোসি সব সময় আমার বাড়ির সামনেই দাঁড়িয়ে থাকতেন। যখনই কোনো অতিথি আসতেন আমার কাছে, জোসি তাঁর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে অকথ্য অপমানে জর্জরিত করতেন তাঁকে। হিংসার আগুনে জ্বলে তিনি আমার এই বাসগৃহকেও এক সময় জ্বালিয়ে দিতে এলেন এবং আমার এক মিষ্টি য়ুরোপীয়ান বান্ধবীর উপর একদিন ঝাঁপিয়েও পড়লেন।

ঔপনিবেশিক পুলিস এসে আমায় সতর্ক করে দিয়ে গেল—যদি আমি জোসি ব্লিসকে বাড়িতে স্থান দিই—সিংহলত্যাগে ওরা আমায় বাধ্য করবে। এমন শান্তিময় পরিবেশ অভব্য আচরণে দূষিত হোক্‌ এ তারা কোনমতেই বরদাস্ত করবে না।

এরপর কয়েকটা দিন আমাকে দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্যে কাটাতে হলো। মাঝে মাঝে আমার ভিতরের দরদী মনটা ব্লিসের কাছে আত্মসমর্পনের জন্য আকুল হয়ে উঠতো—পরমুহূর্তেই তাঁর এই অস্বাভাবিক আসক্তির কথা—যা আমাকে হত্যা করার জন্যও দ্বিধাগ্রস্থ হতো না—মনে এলেই ভয়ে পিছিয়ে আসতাম—। মনকে বোঝাতাম—এর জন্য ব্লিসই দায়ী।

কিছুদিন বাদে ক্লান্ত পরাজিত ব্রিস সিংহল দ্বীপ ছেড়ে জাহাজে উঠে বসলেন। জাহাজটি বন্দর ছেড়ে যাবার অনেক আগেই—যাত্রীদের ভীড় ঠেলে—আমি যখন ব্রিসের কাছে পৌঁছলাম—আমাকে জড়িয়ে ধরে চুম্বনে চুম্বনে আমার গাল ঠোঁট ভরিয়ে দিয়ে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বারবার আমায় অনুরোধ জানিয়েছিলেন—ওঁর সঙ্গে ফিরে যাবার জন্য। আমি যখন ওঁকে জানলাম যে, তা অসম্ভব তখন আমার হাত-বুক-পেট চুম্বন করতে করতে পায়ের জুতোর উপর মুখটা নামিয়ে যখন চুম্বন সুরু করলো তখন দুহাত দিয়ে ওকে টেনে তুলে দেখি আমার জুতোর সাদা রং চোখের জলে মিশে ব্রেসির মুখখানিকে আরও ফ্যাকাশে করে দিয়েছে। সেদিন না পেরেছিলাম ওঁর যাওয়ার পথ রুখে রাখতে—না পেরেছিলাম ওঁকে টেনে আমার কাছে আনতে। কোন্ এক সুচিন্তিত প্রতিবন্ধকতা আমাদের দুজনের মধ্যে একটি অভেদ্য প্রাচীরের সৃষ্টি করেছিলো—। কিন্তু সেদিনের সেই ক্ষত আজও আমার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়নি। বাঁধনহারা অশ্রুর বন্যা আমারই পায়ের জুতোর সাদা রঙ মাখানো মুখটা আর তাঁর আকুল মিনতি—বেদনাহত সেই মুখচ্ছবি—আজও আমার ব্যথাতুর হৃদয় থেকে মিলিয়ে যায়নি—।

'এই পৃথিবীর অধিবাসী' শীর্ষক কাব্যগ্রন্থের প্রথম ভাগটা যদিও আমি প্রায় শেষ করে এনেছিলাম—তবু আমার মনে হয়েছিলো—আমার লেখার গতি খুবই ধীর ও মন্থর হয়ে পড়েছে। এই দূরত্ব আর নীরব একাকীত্ব আমাকে পৃথিবী থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়েছিলো।—আমার চারপাশের এই বাক্‌হীন পরিবেশকে কিছুতেই আমি মানিয়ে নিতে পারছিলাম না।

একটি বন্ধ কোটোর ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে আমার জীবনের এই ঘটনাপঞ্জী লিখতে বসে মনে হচ্ছিল—কালি নয়, জীবনের রক্ত দিয়ে লেখা—যা হবে আরও নিবিড়। কিন্তু কবিতা লিখতে গেলে একটা নিজস্ব রীতি তো থাকা চাই। জীবনের যা সত্য, জীবনদর্শনের যা অনুভূতি—সবই তো মানুষকে দিতে হবে।—এতে থাকা চাই কবির নিজস্ব ভঙ্গিমা, নিজস্ব রীতি। তা না থাকলে সে কবিতা হবে মৃত। আর কবি?—কবি সেই কবিতার মধ্যেই তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবেন। কারণ নিজস্বতা না থাকলে ধার করা নিঃশ্বাসে কবি বাঁচতে পারেন না।

কলম্বো প্রবাসকালে একাকীত্বের মধ্যে একটা সুযোগ আমি পেয়েছিলাম—সেটা হচ্ছে পড়াশোনার সুযোগ, প্রচুর পড়াশোনা করতে পেরেছিলাম সেই সময়ে।—এ সুযোগ দ্বিতীয়বার আসেনি আমার জীবনে।

প্রায়ই আমি ফিরে আসতাম 'কুয়োভিদো' ও 'প্রুস্ত'র সাহিত্য রচনার মধ্যে। প্রুস্তর 'সোয়ান্‌সওয়ের' মধ্যে আমার কৈশোরের জ্বালা যন্ত্রণা ও প্রেমকে খুঁজে পেয়েছিলাম। প্রুস্ত তাঁর বইতে 'ভিনতেউইল'র সোনাটা সঙ্গীতের বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন 'নৈসর্গিক সুগন্ধে ভরা এই সঙ্গীত'। শুনে মনে হয়েছিলো আমি যেন সেই সঙ্গীতের রোমাঞ্চকর শব্দ শুনছি আর তাতে পাচ্ছি স্বর্গীয় সৌরভের আঘ্রাণ।

প্রুস্ত-র ভিনতেউইলের সোনাটার সন্ধান করতে গিয়ে জেনেছিলাম—ওটা সম্ভবতঃ 'স্যুবার্ট' ওয়াগনার এবং সেইন্ড সেনসর থেকে নিয়ে একটি সোনাটা। আমার কান গানের জন্য তৈরি ছিলো না, শুধু চরম দুঃখের গানই কষ্ট করে শুনতাম।

এইভাবে খ‍ুঁজতে খ‍ুঁজতে সিজার ফ্রানক-র বেহালা ও পিয়ানোর তিনটি রেকর্ডে সম্পূর্ণ সোনাটা কিনলাম এবং সেটি শ‍ুনে ব‍ুঝলাম—এইটাই হচ্ছে ভিন্‌তেউইলের সেই নৈসর্গিক সঙ্গীত।

সঙ্গীতের প্রতি আমার এই আকর্ষণটা নেহাৎই সাহিত্যের জন্য। একটি ভঙ্গ‍ুর সমাজের প্রেম-দ‍ুঃখ-বেদনা-হতাশা আর ঘৃণাকে বর্ণনা করতে গিয়ে প্র‍ুস্ত তাঁর সাহিত্যে শিল্প-চিত্রকলা-গীর্জা-নটী এবং সাহিত্য—কোনো কিছ‍ুই বাদ রাখেন নি। এক গভীর আসক্তিবোধ আর মমত্ব তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টির মাঝে ঘোরাফেরা করতো, আর এই গভীর উপলব্ধিকে ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি টেনে আনতেন সঙ্গীত—সোনাটা, যার মাধ‍ুর্য নৈসর্গিক আনন্দে ভরা, স‍ুরের রেশ ছড়িয়ে পড়তো তাঁর লেখনীতে। প্র‍ুস্ত-র রচনায় আমি আমার স‍ুপ্ত চেতনা আর জীবনের গোপনতম রহস্যকে উপলব্ধি করেছিলাম। তাঁর সাহিত্যকে উপলব্ধি করতে গিয়ে আমার মধ্যে সঙ্গীতের জন্ম হলো, সেই সঙ্গীতের পাখনায় ভর করে আমি উড়ে গিয়েছিলাম শ‍ূন্যে—মহাশ‍ূন্যে।

কখনও উঁচু কখনও নীচু গথিক শিল্পের এক-একটি থাম বেয়ে, তাদের মাথা ছ‍ুঁয়ে স‍ুরের রেশ ছড়িয়ে পড়তো।

বেদনার মধ্যে যে শব্দের জন্ম সে থাকে এক বোবা দ‍ুঃখের মাঝে মিশে—সেই শব্দ সঙ্গীত হয়ে নিঃশব্দে ছড়িয়ে পড়ে। বেহালা ছড়ির টানে তাকে ধরতে চায় আর পিয়ানো সেই শব্দকে জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে ধরে রাখে। হৃদয়বিদারক পিয়ানোর স‍ুরে জন্ম-স‍ুত্রের সন্ধান আমি পেয়েছিলাম, শ‍ুনেছিলাম মৃত্যু আর সৌন্দর্যের পদধ্বনি। এই সঙ্গীত শ‍ুনে আমার মনে আর কোনো সন্দেহই ছিলো না যে, এই সেই সঙ্গীত—প্র‍ুস্ত যার কথা বলেছেন।

ভয়ঙ্কর অন্ধকার যখন আমার ওয়েলাওয়াতির বাড়িতে নেমে আসতো, আমি তখন সোনাটার জগতে নিজেকে হারিয়ে ফেলতাম।

আমার লেখার যাঁরা সমালোচক, যাঁরা আমার লেখার গভীরতা জানতে উৎস‍ুক তাঁরা এখন নিশ্চয়ই জেনেছেন যে, ওয়েলাওয়াতির দিনগ‍ুলিতে বসে লেখার সময় আমার লেখনীর উপর প্র‍ুস্ত কতখানি প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। যদিও আমার লেখায় 'নৈসর্গিক স‍ুগন্ধে'র স্বাদ ছিলো না, যদিও আমার লেখা এই পৃথিবী, এই মাটি আর তার মান‍ুষদের নিয়েই, তব‍ু শোকের পোশাক পরিহিত আমার অন‍ুভ‍ূতিগ‍ুলো ছিলো সেই গভীর সোনাটা সঙ্গীতের মতোই।

বেশ কয়েক বছর পরে, ১৯৩২ সালে চিলিতে মার্তা ব্র‍ুনেটের বাড়িতে চিলিরই কয়েকজন খ্যাতনামা সঙ্গীতজ্ঞের সঙ্গে আলাপের সময় আমি তাঁদের বলেছিলাম 'সিজার ফ্রান্‌ক'এর সোনাটা আমার খ‍ুব ভালো লাগে। শ‍ুনে ওঁরা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে আমার কথাটা উড়িয়ে দিয়ে বলেছিলেন, 'সিজার ফ্রান্‌ক' নয়, আমি যেন 'ভার্দি'কে জানবার চেষ্টা করি। আমার সঙ্গীত-প্রীতির প্রতি তাঁদের সেই তাচ্ছিল্য আজও আমি ভুলতে পারিনি।

সিঙ্গাপুর

সিঙ্গাপুরের নির্জনতা শুধু যে নিষ্প্রভ তাই নয় অলসও। এখানে আমার কিছু বন্ধু-বান্ধবী জুটেছিলো। রঙ-বেরঙের মেয়েরা আসতো আমার শয্যা-সঙ্গী হওয়ার জন্য। এদের ব্যাপারে একমাত্র দৈহিক আনন্দ ছাড়া আর কোনো নথিপত্র রাখার প্রয়োজন হয়নি। আমার শরীরটা ছিলো একাকীত্বের বহ্নুৎসবে পূর্ণ—যা প্রখর গ্রীষ্মের উদগ্র কামনায় সমুদ্রতীরে দিনে বা রাত্রে সমানভাবেই জ্বলে উঠতো। এক বান্ধবী 'প্যাট্‌সী' প্রায়ই তার এক বান্ধবীকে সঙ্গে নিয়ে আমার কাছে আসতো। সোনালী রঙ-এর সঙ্গে মিশে তামাটে ছিলো তার শরীর যার রক্তে প্রবাহিত হতো ডাচ্‌-ইংরেজ আর দ্রাবিড়ের রক্ত। এরা কিন্তু আমার কাছে একমাত্র দৈহিক আনন্দটুকু ছাড়া অন্য কিছু প্রত্যাশা নিয়ে আসতো না। একমাত্র আনন্দলাভই ছিলো তাদের কাম্য। এদেরই একজন প্রায়ই যেতো ছেলেদের হোস্টেলে, যেখানে অবিবাহিত নিম্ন-রুজির ইংরেজ যুবকরা থাকতো। সে একদিন বিন্দুমাত্র দ্বিধা বা সংকোচের কোনো বালাই না করেই আমায় জানালো—এক রাতে ওই হোস্টেলে চোদ্দজন যুবক তার দেহ উপভোগ করেছে।

আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, এটা কি করে সম্ভব হয় ?

উত্তর দিয়েছিলো—সে রাতে হোস্টেলে খানাপিনা আর নাচের আসরে একমাত্র সে ছাড়া আর কোনো মেয়েই উপস্থিত ছিলো না। তাই পর পর এক একজনের সঙ্গে ওই স্বল্পালোকিত ঘরে নাচতে নাচতে—কখন যে এক এক করে প্রত্যেকেরই শোবার ঘরে ঢুকে ওর দেহকে মেলে ধরেছিল যৌন সুখের আশায় সেটা তার মনে নেই, শুধু নাচের আসর যখন ভাঙলো তখন ও দেখলো—আর একটি পুরুষও বাকী নেই। সব ক'জনকে খুশী করার আনন্দ আর জয়ের একটা প্রচ্ছন্ন গৌরব নিয়ে সেই রাতে ও বাড়ী ফিরেছিলো।

আসলে মেয়েটি কিন্তু বারবনিতা ছিলো না। ঔপনিবেশিক দাসত্বের জঠরজাত নিম্ন মানের সংস্কৃতির ও ছিলো একজন সহজ সরল সন্তান। জীবনের কোনো মূল্য-বোধই ওর ছিলো না—হয়তো মূল্যহীন এই জীবনের মূল্যায়ন করতে গিয়ে কখন জানি না এক অজানা দুর্বলতায় আমার মন ভরে গিয়েছিলো এই মেয়েটির প্রতি।

কোলাহলমুখর শহর থেকে অনেক দূরে ছিলো আমার বাঙলো। প্রথম দিন শৌচাগারটি খুঁজে পেলাম না। শেষে চোখে পড়লো বাঙলোটার পিছনে। অবাক হয়ে দেখি কাঠের বাক্সের মাঝখানে একটা গর্ত আর তার তলায় একটা বালতি। চিলিতে অবশ্য এই ধরনের শৌচাগার দেখেছি কিন্তু সেগুলি হয় কোনো নদীর স্রোতের মুখে বা একটা বিরাট গর্তের উপরে।

প্রতিদিন সকালে উঠে দেখতাম বালতিটা পরিষ্কার। বুঝতেই পারতাম না—কখন কে এসে কেমন করে বালতিটা পরিষ্কার করে। একদিন ভোর রাত্রে সেই রহস্য উদ্‌ঘাটন হলো। তন্ময় হয়ে তাকিয়ে রইলাম—কালো পাথরে খোদাই সৌন্দর্যময়ী এক তামিল

রমণী—যে সৌন্দর্য এর আগে কখনও দেখিনি—নৃত্যের ভঙ্গিমায় শৌচাগারের দিকে এগিয়ে চলেছে। লালচে সোনালী রঙের শাড়ীতে জড়ানো তার দেহলতা, অন্তর্বাসের কোনো বালাই নেই—পায়ের গোছে রুপোর তৈরী মোটা পায়েল, নাকের দু'পাশে গাঢ় লাল পাথরের ছোটো দু'টি নাকছবি। কাচের তৈরী ওই লাল-পাথরটি ওর নাকে যেন পদ্মরাগমণির মতো জ্বল জ্বল করছিলো।

যদিও আমি ওর দৃষ্টির আড়ালে ছিলাম না তবু ওর কাছ থেকে সেদিন আমি কোনো বাঁকা চোখের চাহনি বা খুশীর সামান্য ঝলকটুকুও দেখতে পাইনি। আমি যে রয়েছি তার বিন্দুমাত্র আভাস তার মধ্যে দেখিনি। গম্ভীরভাবে শৌচাগারে ঢুকে ময়লা ভরা বালতিটা নিয়ে এক দেবীমূর্তির মতোই ভোরবেলাকার আলো আঁধারে মিলিয়ে গেল সে। সংসারের সমস্ত নোংরা, ময়লার জমাট জঞ্জালকে ছাপিয়ে মেয়েটির সৌন্দর্য আমাকে সেদিন এমন করে বশীভূত করলো যে, কিছুতেই তাকে আমার মন থেকে সরাতে পারলাম না। কিন্তু জঙ্গলের ভীরু লাজুক প্রাণীর মতোই ও থাকতো ওর নিজস্ব জগৎটুকুর মধ্যে—যেখানে আমার কোনো ডাক বা প্রলোভন গিয়ে পৌঁছাতো না।

মাথায় একটা মতলব এলো। ওর যাওয়া আসার রাস্তার ধারে কখনো একটা শাড়ী, কখনো কিছু টাকা রাখতে সুরু করলাম। ওই সুঠাম কালো সুন্দরীকে পাওয়ার জন্য—তাকে প্রলুব্ধ করার জন্য আমার এই চেষ্টাগুলি দৈনন্দিন কার্যক্রমের পর্যায়ে এসে পৌঁছালো। কিন্তু কই—মেয়েটিকে তো কোনো কিছুতেই প্রলুব্ধ করতে পারলাম না! যে আবেগাতুর স্পর্শের আশায় আমার রেখে আসা শাড়ী বা অর্থ অপেক্ষা করে থাকতো—তারা তেমনিই পড়ে থাকে রাস্তায় ধারে অনাদৃত ও অবহেলিত অবস্থায়।

আর পারলাম না নিজেকে সংযত রাখতে।

একদিন সকালে মনস্থির করে ফেললাম। যে করে হোক ওকে পেতেই হবে। ওর সঙ্গে কথা বলার মতো ভাষা আমার জানা ছিলো না। তাই গায়ের জোরে জড়িয়ে ধরে বিছানায় এনে ওকে শোয়ালাম। এতটুকু স্মিতহাসির রেখাও ওর ঠোঁটে সেদিন দেখিনি। কেমন যেন এক উদাসীনতার সঙ্গে নিজেকে বিবস্ত্র করলো মেয়েটি। সরু কোমর ভরাট নিতম্ব আর পীনোন্নত বক্ষের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হয়েছিলো—দক্ষিণ ভারতের কোনো মন্দিরের নৃত্যরতা এক নিখুঁৎ ভাস্কর্যের প্রতিচ্ছবি তার সর্বাঙ্গে। মনে হলো—যেন মর্তের এক মানবী একটি দেবী মূর্তির সঙ্গে সমাহিত হলো এই শয্যায়!

কোনো রকম উত্তেজনা মেয়েটির মধ্যে ছিলো না। শুধু ওর ডাগর কালো চোখ দুটির দৃষ্টি ছিলো শূন্যে নিবদ্ধ। আমাকে ঘৃণা করার সবটুকু অধিকারই ও সেদিন অর্জন করেছিলো।

এরপর আর একটি দিনের জন্যও আমি আমার এই পূর্বার্জিত অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি করিনি।

কিছুদিন পরে আমি এক তারবার্তা পেলাম। প্রথম প্রথম বিশ্বাসই করতে পারিনি তারবার্তার মর্ম। পররাষ্ট্রমন্ত্রী কর্তৃক প্রেরিত এই তারবার্তায় বলা হয়েছে—আমি শুধু কলম্বোরই বাণিজ্যদূত নয়, এর সঙ্গে সিঙ্গাপুর এবং বাটাভিয়ার ভারও আমাকে নিতে হবে।

আমার মাহিনা ১৬৬.৬৬ ডলারের উপরে আরও ৩৩৩.৩২ ডলার বাড়িয়ে দেওয়া হলো। অর্থাৎ আপাততঃ ক্যাম্পখাটে শোয়াটা আমার বন্ধ করা যায়।—অবশ্য বস্তুগত আকাঙ্ক্ষা আমার খুব একটা ছিলো না।

এখন ভয় শুধু আমার কিরিয়াকে নিয়ে। ওকে কোথায় রাখবো? সর্প-শিকারে ক্লান্ত এই বেজিটিকে যার কাছেই দিই না কেন, সে তো আর আমার মতো ওর যত্ন করবে না। জঙ্গলে ছেড়ে দিলেও সংগ্রাম করে বেঁচে থাকার মতো প্রাণশক্তি তো এখন আর ওর নেই। ওকে নিয়ে এদেশ-সেদেশ করা যাবে না আর জাহাজেও ওকে নেবে না। শেষে ঠিক করলাম আমার সিংহলী ভৃত্য ভ্রাম্পকে সঙ্গে নেবো। যদিও জানতাম এই ধরনের বিলাসিতা আমার পক্ষে একটা পাগলামী। কিন্তু আর তো কোনো উপায় নেই। ভ্রাম্প কিরিয়াকে ভালোবাসে এবং ভালোভাবে ওর প্রকৃতিও জানে—এর ফলে জাহাজে করে নিয়ে যাওয়াটা হয়তো কোনো সমস্যা হবে না। ভ্রাম্পর বাক্সে ঢুকে সকলের চোখ এড়িয়ে বেশ ভালোভাবেই যেতে পারবে।

এমনি করেই এক সকালে ভ্রাম্প আর কিরিয়াকে সঙ্গে নিয়ে সিংহলদ্বীপ ছেড়ে পাড়ি দিলাম অজানা অচেনা আর এক পৃথিবীর উদ্দেশে—মনজোড়া দুঃখ আর বেদনা রেখে এলাম পিছনে।

এটা আমার পক্ষে বোঝা দুঃসাধ্য ছিলো যে, দক্ষিণ মেরুর পাশে চিলির মতো এতটুকু ছোট্ট একটা দেশের এত বাণিজ্যদূত-রাজদূত সারা পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে রাখার কি এমন প্রয়োজন?

সত্যি কথা বলতে কি—এই সব দূতেরা ছিলেন দক্ষিণ আমেরিকার ভুয়ো অহমিকা এবং অক্ষম গর্বের প্রতিভূ মাত্র। অবশ্য এও সত্যি যে, এই সব দেশ থেকে চিলির জন্য আমদানী করা হতো মোম, পাট আর চা। ভাবতে অবাক লাগে—যে চা চিলির মাটিতে জন্মায় না সেই চা চিলির মানুষেরা দৈনিক চার-পাঁচবার পান করে!—এই চায়ের জন্য একবার চিলির এক কারখানায় ধর্মঘট পর্যন্ত হয়েছিলো। কারণ সেই কারখানার শ্রমিকরা সময় মতো চা পাচ্ছিলেন না।

চা রপ্তানীকারী এক ইংরেজ একদিন খাবার টেবিলে বসে আমায় প্রশ্ন করেছিলেন—চিলির মতো একটা ছোট্ট দেশে এত চা কি হয়? উত্তরে আমি বলেছিলাম, পান করা হয়। অবশ্য উনি সেদিন যদি আমাকে মাড়াই করতেন তাহলে বিন্দুমাত্রও চায়ের নির্যাস পেতেন না।

গত দশ বছর যাবৎ সিঙ্গাপুরে চিলির একজন দূত আছেন জানতাম। তাই নিশ্চিন্ত মনেই ভ্রাম্প আর কিরিয়াকে নিয়ে আমি 'রাফল' হোটেলে উঠলাম। জামা-কাপড় পরিষ্কার করতে পাঠিয়ে স্নান সেরে বারান্দার আরাম-কেদারায় গা এলিয়ে দিয়ে ধীরে সুস্থে তিন গ্লাস জিন খেলাম।

সেদিন নিজেকে সমারসেট ম্যমের মতো লাগছিলো, যদি না ফোন-গাইডে সিঙ্গাপুরে চিলির দূতাবাসের নম্বর খুঁজতে বসতাম।

পাতার পর পাতা ঘেঁটেও কোথাও খুঁজে পেলাম না নাম আর ফোন নম্বর। উৎকণ্ঠিত হয়ে বৃটিশ দূতাবাসে ফোন করে সিঙ্গাপুরস্থ চিলির দূতাবাসের ফোন নম্বর চাইতে, বোধহয় একটু খোঁজাখুঁজির পর, ওঁরা জানালেন যে, চিলির দূতাবাসের কোনো নাম বা ফোন নম্বর ওঁদের জানা নেই।

আমি জানালাম যে, বাণিজ্যদূতের নাম হচ্ছে সিঁনর মানসিলা। এ নামেও কারুর খোঁজ ওঁরা দিতে পারলেন না।

ভাবনায় পড়লাম। কারণ এই হোটেলে একটা দিন থাকার মতো পয়সাও আমার কাছে ছিলো না। হঠাৎ মনে হলো—সিঙ্গাপুরের দূত তো বাটাভিয়ারও দূত। তবে হয়তো তিনি বাটাভিয়াতেই থাকেন। এও মনে হলো—যে জাহাজে এসেছি সেই জাহাজ তো বাটাভিয়াতেও যাবে। ধোপাখানা থেকে জামা-কাপড় ফিরিয়ে এনে ভ্রাম্পি আর কিরিয়াকে সঙ্গে নিয়ে বিদ্যুৎগতিতে জাহাজে পেঁছিলাম। এর কিছু পরেই জাহাজটি তার যাত্রা শুরু করলো।

জাহাজে এক ইহুদী মেয়ের সঙ্গে আলাপ হলো, নাম তার 'ক্লজি'। কমলালেবুর মতো রঙীন তার চোখ দু'টি। মাথা ভর্তি সোনালী চুল। ঈষৎ মোটাসোটা এই মেয়েটি ছিলো প্রাণ প্রাচুর্যে ভরপুর। মেয়েটি আমাকে বলেছিলো—বাটাভিয়াতে একটা কাজ পেয়েছে সে। এই খবরটি জানার পর থেকে আমি আর ওর কাছ ছাড়িনি। ছায়ার মতোই ওর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়াতাম। নাচের আসরে আমাকে টেনে নামাতো ক্লজি। জাহাজযাত্রার শেষ রাত্রিটা ও আমার কাছে শুয়ে প্রায়-সমাপ্ত রাতটা সম্ভোগের মধ্যেই কাটালো।—এটা ছিলো নেহাৎই বন্ধুত্বপূর্ণ।

আমার দুর্ভোগের সমস্ত কথাই ক্লজিকে জানিয়েছিলাম। শুনে ক্লজি আমার গায়ে হাত বুলিয়ে আমায় সান্ত্বনা দিয়েছিলো।

কি কাজ পেয়ে ক্লজি বাটাভিয়ায় চলেছে সেটা আমাকে ও খুলেই বলেছিলো। ওখানকার একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান এশিয়ার রাজা-মহারাজা, জমিদার আর বড়ো বড়ো ব্যবসায়ীদের শোবার ঘরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সুন্দরী সরবরাহ করতো, সেই প্রতিষ্ঠানের ডাকে সাড়া দিয়ে ক্লজি চলেছে তার দেহদানের বিনিময়ে জীবিকার্জনে।

ক্লজিকে প্রশ্ন করেছিলাম—কোন্ লোককে ওর পছন্দ—ভারতবর্ষ বা নেপালের কোনো রাজা-মহারাজা, না বাটাভিয়ার কোনো চীনা ব্যবসায়ী। ও চীনা ব্যবসায়ীকেই পছন্দ করলো, বললো—আমি যে মানুষটির কাছে যাবো, শুনেছি তাঁর ব্যবহার অত্যন্ত মিষ্টি।

পূর্বদিন জাহাজ নোঙর করার সময় জানলার ফাঁক দিয়ে ক্লজির কাঙ্ক্ষিত চীনা ব্যবসায়ী আর তাঁর রোলস্ রয়েস গাড়িটিকে দেখেছিলাম।

যাত্রীদের ভীড় আর দৃষ্টি পেরিয়ে ক্লজি হঠাৎ হারিয়ে গেল।

নেদারল্যাণ্ড হোটেলে উঠলাম। সবে মাত্র দুপুরের খাওয়াটা শুরু করবো—এমন সময় দেখি ঘরের দরজা ঠেলে কাঁদতে কাঁদতে ক্লজি এসে আমার কোলে লুটিয়ে পড়লো। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললো, ওরা আমাকে এখান থেকে বার করে দিয়েছে—আমাকে কালই এই শহর ছেড়ে চলে যেতে হবে।

জিজ্ঞাসা করলাম, কারা তোমায় শহর ছাড়া করতে চায় ?

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে ও আমায় যা বলেছিলো তার মর্মার্থ হচ্ছে—ও যখন 'রোলস্ রয়েসে' উঠতে যাচ্ছে তখন একজন 'অভিবাসন কর্মচারী ওকে দেখতে পেয়ে ধরে নিয়ে যায়। তারপর শুরু হয় প্রশ্নবাণ এবং যখন ওরা সব কিছু জানতে পারে তখন ওর উপর আদেশ হয়—হয় চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে শহর ত্যাগ অথবা ওলন্দাজ সরকারের জেলখানা—। ক্রুজির সবচেয়ে বড়ো দুঃখ ওই চীনা মানুষ ও তার বিরাট রোলস্ রয়েস গাড়ীটি। অবশ্য ওর চোখের জলের নীচে একটা নরম মনও উঁকি দিয়েছিলো বারবার।

প্রশ্ন করলাম, তুমি কি ওঁর ঠিকানা বা ফোন নম্বর জানো ?

ও উত্তর দিলো, হ্যাঁ, কিন্তু আমার ভয় করছে ওরা যদি আমায় জেলে দেয়।

বললাম, তোমার তো আর কিছু হারিয়ে যাবার নেই। তুমি বরং একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করে তোমার মনের এই অশান্তি আর দুঃখের বোঝা লাঘব করে তাঁকে সব কিছু জানিয়ে এসো—অন্ততঃ এটুকু তিনি জানুন যে, তুমি তাঁর সঙ্গে কোনো প্রতারণা করোনি।

গভীর রাত্রে তাঁর কাছ থেকে ফিরে এসে ক্রুজি তার সমস্ত অভিজ্ঞতাটুকুই আমার কাছে বর্ণনা করেছিলো। ফরাসীভাষী এই চীনা ভদ্রলোকের বিবাহিত জীবনের একঘেঁয়েমি—শ্বেত সুন্দরীর আশায় সমুদ্র-তীরে বানানো বিরাট সুন্দর বাঙলো—ফ্রিজ ভর্তি খাবার—দামী আসবাব-পত্তর, নানান্ রঙের দামী মদ—সবই ছিলো ক্রুজির প্রতীক্ষায়। তারপর এক সময়ে বিরাট সুসজ্জিত বিছানার পাশে রাখা 'ওয়ারড্রব' খুলে তিনি ওকে দেখিয়েছিলেন হাজার হাজার মেয়ের অন্তর্বাস আর প্যান্টি—। মহামূল্যবান সেই নানান্ রঙের প্যান্টি আর অন্তর্বাস। তাকালেই মনে হয়—একটি মানুষ তার অস্বাভাবিক স্বপ্নের রামধনু এনে জড়ো করেছে আলমারীটিতে।

—আমি বিস্ময়াহত হয়ে হাতের কাছে যে ক'টা প্যান্টি পেয়েছি তুলে এনেছি। বলেই অশ্রু ভরা চোখে আমার দিকে একগাদা প্যান্টি ছুঁড়ে দিলো ক্রুজি।

এই গোপন অস্বাভাবিক অভ্যাস আমায় সেদিন অবাক করেছিলো—কোটিপতি একজন মানুষের একি নেশা—মেয়েদের এই অতর্বাস সংগ্রহ !

ক্রুজিকে অনুরোধ করলাম একটা প্যান্টি আমাকে দেবার জন্য। বললাম—সেই প্যান্টির উপরে যেন ও কিছু লিখে দেয়।

সিল্কের সাদা একটি প্যান্টির উপর নিজের নাম লিখে কয়েক ফোঁটা চোখের জল ছিটিয়ে সেটি আমার হাতে সেদিন তুলে দিয়েছিলো ক্রুজি।

পরদিন সকালে ক্রুজি চলে গেল।

ক্রুজির সঙ্গে আর কখনও আমার দেখা হয়নি। তার দেওয়া প্যান্টিটা বহুকাল আমার সঙ্গী হয়েই ছিলো। জানি না, অজান্তে কোন্‌দিন কোন্ সুন্দরীর অঙ্গবাস হয়ে সে বিদায় নিয়েছে।

বাটাভিয়া

তখনকার দিনে 'মোটেল' অর্থাৎ গাড়ির আরোহীদের থাকার জায়গার কথা যখন ভাবাই যেতো না, নেদারল্যাণ্ড সে বিষয়ে ছিলো একেবারে স্বতন্ত্র! নেদারল্যাণ্ডে ছিলো বিশাল বিশাল বাগানবাড়ি। এই রকম এক বাড়িতে আশ্রয় নিলাম আমরা। বাড়ির মাঝখানে রয়েছে খাবার ঘর, তার অন্য একদিকে অফিসঘর, অতিথিদের জন্য ছোটো ছোটো বাঙলো। বাঙলোগুলোর চারপাশ ঘিরে বিরাট বিরাট গাছে ভরা এক একটি বাগান। গাছগুলোতে হাজার হাজার পাখির মেলা আর দুরন্ত কাঠবিড়ালির আনাগোনা, শোনা যায় নানান্ কীট-পতঙ্গের কোলাহল। দেখে মনে হবে যেন জঙ্গলের রাজত্ব।

ভ্রাম্পির কাছে এই নতুন জায়গা মোটেই আনন্দদায়ক ছিলো না। এখানে কিরিয়াকে সামলে রাখা ওর পক্ষে খুবই কষ্টসাধ্য হয়ে উঠেছিলো।

বাটাভিয়াতে সত্যিই আমাদের বাণিজ্যদূত রয়েছেন। ঠিকানা যোগাড় করে পরদিন সকালেই রওনা হলাম। কিছু দূরে একটি বাড়ির উপরে দেখলাম চিলির পতাকা উড়ছে। আশ্বস্ত হলাম মনে মনে। সেখানে পৌঁছে একজন পদস্থ ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করলাম। বললাম, আমি চিলির নতুন বাণিজ্যদূত।—পরিচয়-পত্র দেখালাম। তারপর বললাম, প্রয়োজনীয় কাগজপত্রগুলি দয়া করে যদি একবার দেখান তাহলে আজই দায়িত্ব নিতে পারবো।

ভদ্রলোক অত্যন্ত চটে গেলেন। বেশ রাগতস্বরে বললেন—আমিই চিলির একমাত্র বাণিজ্যদূত।

আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম, সেটা কি করে হয়?

তিনি বললেন, না হবার কি আছে! যাক্‌গে, আমার পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে দিয়ে দায়িত্ব বুঝে নাও।

আমি আরও অবাক হলাম। আমাকে কথা বলার কোনো রকম সুযোগই তিনি দিচ্ছেন না! কথায় কথায় চীৎকার করে থামিয়ে দিচ্ছেন আমাকে। এরপর অনেক কষ্টে ডাচ ভদ্রলোকটিকে শান্ত করে সমস্ত ঘটনা জানলাম। এখানে নিযুক্ত আমাদের বাণিজ্যদূতটি কখনও বাটাভিয়াতে এসে তাঁর কর্তব্য করেন নি। তিনি এই ভদ্রলোকের উপর দায়িত্ব চাপিয়ে প্যারিসে পরম সুখে কাল কাটাচ্ছেন আর ইনি মাসকাবারি কিছু অর্থের লোভে বাণিজ্যদূতের দায়িত্ব পালন করে চলেছেন! কিন্তু এ পর্যন্ত কোনো পারিশ্রমিকই জোটেনি এঁর কপালে, তাই পাওনা পেতে ইনি এখন একরোখা হয়ে উঠেছেন।—এ রকম একটা ব্যবস্থার বিষয়ে আমাদের সরকার বা আমার কিছুই জানা ছিলো না। সমস্ত ঘটনা জানার পরে ডাচ্ ভদ্রলোকটির ক্রোধের কথা ভুলে তাঁর প্রতি করুণা দেখা দিলো আমার হৃদয়ে। হোটেলে ফিরলাম।

পরের দিনটি গভীর দুঃখদায়ক। প্রচণ্ড জ্বরে নাক দিয়ে রক্ত পড়ছিলো আমার।

গায়ে প্রচণ্ড উত্তাপ, তার উপর কুলকুলে ঘাম। এই ক্লান্তি আর নিঃসঙ্গতা তেমনুকোয় আমার ছোটবেলার কথা মনে জাগিয়ে তুললো।

অসুস্থ অবস্থাতেই ধীরে ধীরে সরকারী অফিসে পেঁছে রাজকর্মচারীদের সাক্ষাৎপ্রার্থী হলাম। দেখা সাক্ষাতের মাধ্যমে আমার পরিচয় ওঁরা নথিভুক্ত করে নিলেন।

বেরিয়ে এসে বেশ ক্লান্ত লাগছিলো। রাস্তার ধারে একটা ইউক্যালিপটাস গাছের ছায়ায় বসলাম। গাছটির শাখা-পল্লব বেয়ে অদ্ভুত একটা মিষ্টি গন্ধ এসে আমার নাকে লাগছিলো। যেন অদৃশ্য কেউ আমার কষ্ট আর দুঃখে অভিভূত হয়ে কোনো সুন্দর সুবাস পাঠিয়ে আমাকে জীবনদান করতে চাইছে! অথবা, জানি না—বটানিকালগার্ডেনের ঘন জঙ্গল থেকে নানান্ রঙের নানান্ জাতের ফুল আর পত্র-পল্লবের সৌন্দর্য, তাদের সৌগন্ধ আর সেই সঙ্গে ম্যাকাও পাখীর ডাক এবং কাঠবিড়ালির বিচিত্র স্বরধ্বনি—সব কিছু একত্রীভূত হয়ে হয়তো আমার এই অসুস্থ হতাশাগ্রস্ত জীবনে বেঁচে ওঠার আনন্দধ্বনি বহন করে আনতে চাইছিলো কিনা।

হোটেলে ফিরে প্রিয় বেজীটিকে পাশে বসিয়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র টেবিলে জড়ো করলাম চিলির পররাষ্ট্র দপ্তরে খবরটা পাঠানোর জন্য। কলমের কালিটা ফুরিয়ে গিয়েছিলো। হোটেলের বয়কে ডেকে ইংরেজীতে 'ইন্‌ক' শব্দটি প্রয়োগ করে কালি আনার জন্য বললাম। ও আমার এই শব্দের অর্থ বুঝতে না পেরে একজনকে ডেকে নিয়ে এলো। যতক্ষণ আমার কলমটা সামনে ধরে ভাবে-ভঙ্গীতে তাদেরকে বোঝাবার চেষ্টা করছিলাম ততক্ষণে আমার চারপাশে প্রায় দশ-বারোজনের ভীড় জমে গেছে এবং আমায় নকল করে 'ইন্‌ক-ইন্‌ক' বলে ওরা হাসিতে গড়িয়ে পড়ছিলো। সৌভাগ্যবশতঃ সামনেই ছিলো একটা দোয়াতদানি—সেটা ওদের সামনে তুলে ধরে কলমটা ডুবিয়ে বোঝালাম 'কালি' চাই—ওরা সবাই তখন একসঙ্গে বিচিত্র এক সুরে বলে উঠলো—'টিনতা-টিনতা'! সেদিনই জানলাম—মালয়ী ভাষায় স্পেনিশ ভাষার মতোই কালিকে ওরা টিন্‌তো বলে।

এরপর দূতাবাসের ভার নিলাম। বিতর্কিত এই পিতৃত্ব গ্রহণ করার পর সম্পত্তি হিসাবে পেলাম রবারের অস্পষ্ট কয়েকটি স্ট্যাম্প ও শীলমোহর, একটা কালির বাক্স আর লাভ-ক্ষতির হিসাবের বিবরণী সম্বলিত খাতা। প্রতারিত সেই নকল ডাচ বাণিজ্যদূত আমায় সব বুঝিয়ে দিলেন। কয়েকটা দিন পরেই বুঝেছিলাম—লভ্যাংশের সবটুকুই প্যারিসে বসবাসকারী বাণিজ্যদূতের আর ক্ষতির সবটুকু অংশই আমার।

এরপর থেকে সেই হতশ্রী শীলমোহর আর আমার স্বাক্ষর একত্রিত হয়ে স্বর্ণমুদ্রায় পরিণত হতে লাগলো ডলার। তার থেকে সামান্য যা আমার জন্য বরাদ্দ ছিলো তাতে আমার, ভ্রাম্পির ও কিরিয়ার কোনরকমে চলে যেতো। ইদানীং আমার পোষ্যদের খিদেটাও যেন বেশ বেড়ে গিয়েছিলো—প্রয়োজন দেখা দিয়েছিলো আমার নিজের পোশাকেরও। নানান্ চিন্তা, অভাব ও একাকীত্বের তাড়নায় মাঝে মাঝেই কোনো হোটেলের একটি কোণে একলা বসে মদ্যপান করতাম।

চীনাদের মতে ভালো খাবারের থাকে তিনটি গুণ—স্বাদ, গন্ধ আর রঙ। আমার

হোটেলটিতে এই তিনটি ছাড়া আরও একটি ছিলো—সেটি প্রাচুর্য। আমি বরাবরই একটু বেশী খাইয়ে—কাজেই এই চতুর্গুণের সংস্পর্শে এসে বেশ কিছুদিনের মধ্যেই আমার দেহটি পর্বত-সদৃশ হয়ে উঠলো।

ঠিক এই সময়েই আমি আমার প্রিয় বেজীটিকে হারালাম। ওর অভ্যাস ছিলো সব সময়েই আমার পায়ে পায়ে চলা আর আমার সঙ্গে চলা মানেই গাড়ী-লরী-রিক্সার মাঝ দিয়ে নিজেকে বাঁচিয়ে চলা। তার উপর ছিলো পথচারীদের ভীড়। প্রভুভক্ত ওই বেজীটির কাছে আমি ছাড়া আর কোন দ্বিতীয়জনের অস্তিত্বই ছিলো না। অঘটন ঘটলো—। একদিন হোটেলে ফিরে ভ্রাম্পির মুখে দেখলাম একটি বিয়োগান্ত নাটকের শেষ দৃশ্য। কিছু না বলে বারান্দার চেয়ার বসলাম, কিন্তু অন্যদিনের মতো কেউ এসে আমার কোলে চড়ে বসলো না—কারুরই লোমশ লেজের স্পর্শ পেলাম না আমার দেহে।

পরের দিন কাগজে বিজ্ঞাপন দিলাম—"কিরিয়া নামে ডাকলে সাড়া দেয়—এমন একটি বেজী হারিয়ে গেছে"—কোনো খবরই এসে পেঁছাল না—চিরদিনের মতোই সে হারিয়ে গেল। মাঝ রাত্রে কোনো আওয়াজ কানে এলে হাতে আলো নিয়ে ওকে খুঁজতে বেরোতাম। ঘুমের মধ্যে মনে হতো কিরিয়া যেন কোনো জঙ্গল থেকে আমায় ডাকছে—। ভ্রাম্পি এরপর থেকে সব সময়েই নিজেকে অপরাধী মনে করতো, আমার চোখের দৃষ্টির আড়ালে ও নিজেকে লুকিয়ে রাখতো। তাই যেদিন ভ্রাম্পি নিজের দেশ সিংহলে ফিরে যেতে চাইলো সেদিন ওকে আর বাধা দিইনি।

বাটাভিয়াতে একটি বাড়ী ভাড়া নিলাম। বাড়ীটিতে শোবার ঘর ছাড়াও বসার ও রান্নার ঘর এমন কি গাড়ী রাখার জন্য গ্যারেজেরও ব্যবস্থা ছিলো—যদিও আমার কোনো গাড়ী ছিলো না। একজন বৃদ্ধা জাভানীজ রাঁধুনি ও স্থানীয় একটি ভৃত্যকে নিযুক্ত করলাম। এই বাড়ীতেই পৃথিবীর অধিবাসী বইটি লেখা শেষ করলাম।

অসহনীয় নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে বিবাহ করার জন্য মনস্থ করলাম। আধা ডাচ্, আধা মালয়ী দীর্ঘাঙ্গী এক সুন্দরীকে—যাঁর নাম ছিলো মারিয়া আনতোনিয়েতা হ্যাগমার—বিবাহ করলাম। শিল্প বা সাহিত্যের প্রতি কোনো অনুরক্তিই তাঁর ছিলো না।

পরবর্তীকালে আমার জীবনীকার ও বান্ধবী মারগারিটা অ্যাগুইরি আমার এই বিবাহ-প্রসঙ্গে লিখেছিলেন : '১৯৩২-এ নেরুদা চিলিতে ফিরে আসার দু'বছর আগে এই ভদ্রমহিলাকে বিবাহ করেন। জাভাবাসী এই মহিলা একজন বাণিজ্যদূতকে বিবাহ করতে পারায় নিজেকে খুবই গর্বিত বোধ করতেন, তাছাড়া আমেরিকা সম্বন্ধে এই মহিলার ছিলো দুর্বলতা ও আকর্ষণ। এই মহিলা স্প্যানিশ ভাষা শিখতে শুরু করেছিলেন এবং নেরুদার প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিলো গভীর। নেরুদা তাঁকে আদর করে 'মারুকা' বলে ডাকতেন। সুন্দরী এই মহিলার মধ্যে ছিলো অসাধারণ ব্যক্তিত্ব।'

দূতাবাসের মাধ্যমে কিউবান দূত ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আমাদের হৃদ্যতা গড়ে উঠলো। যদিও তখন কিউবার গদীতে আসীন ছিলেন অত্যাচারী 'মাচাদো'। কিউবান দূতের কাছে শুনতাম সে দেশের রাজনৈতিক বন্দীদের জীবন-কথা, শুনতাম বন্দীদের ঘাড়,

চশমা বা সোনায় মোড়া দাঁত কেমন করে নরখাদক হাঙরের পেট থেকে অক্ষত অবস্থায় পাওয়া যেতো! হাভানার সৈকতেই ধরা পড়তো এই হাঙরগুলো।

জার্মান-বাণিজ্যদূত 'হারতাৎস' ছিলেন আধুনিক মৃৎশিল্পের একজন বিশেষ ভক্ত। 'ফ্রানজ মার্ক'এর নীল ঘোড়াটি ছিলো তাঁর কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পকলা। কল্পনাপ্রিয় হারতাৎস জাতিতে ইহুদী। একবার ওঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম : হিটলার নামে যে মানুষটির কথা জার্মানীতে প্রায়ই শোনা যায়, যিনি ইহুদী আর কম্যুনিস্টবিরোধী হিসাবে খ্যাতিলাভ করেছেন, উনি যদি কোনোদিন ক্ষমতায় আসেন তাহলে কি রকম হবে?

—অসম্ভব। বেশ জোরের সঙ্গেই বলেছিলেন হারতাৎস।

—কেমন করে অসম্ভব? ইতিহাস তো এমনি অনেক অসম্ভব ঘটনার সাক্ষ্য দিচ্ছে।

হারতাৎস বললেন, নেরুদা, জার্মানীকে তুমি চেনো না। হিটলারের মতো একটা পাগলের পক্ষে জার্মানীর একটা গ্রাম শাসন করাও সম্ভব নয়।

হায়, হায়, হারতাৎস! সেই পাগলটাই এক সময়ে পৃথিবীকে শাসন করার জন্য প্রায় এগিয়ে এসেছিলেন—আর আপনি হারতাৎস আপনার ইহুদী-কল্পনাপ্রবণতা আর ঐতিহ্যকে সঙ্গী করে অজানা কোনো এক গ্যাস-চেম্বারে ভস্মে পরিণত হয়েছিলেন।

৫

স্পেন—আমার প্রিয় স্পেন

কেমন ছিলেন এই ফ্রেদেরিকো

১৯৩২ সালে চিলিতে ফিরলাম। আমার 'প্রদীপ্ত শিকারী' আর 'মর্ত্যের অধিবাসী' বই দু'খানি প্রকাশিত হলো।

১৯৩৬ সালে বুয়েনস্ এয়ার্সে বাণিজ্যদূত নিযুক্ত হলাম এবং আগস্টে সেখানে পেঁছিলাম।

ফ্রেদেরিকো গারসিয়া লোর্কা প্রায় সেই সময়েই সেখানে এলেন তাঁর 'বিবাহ-শোণিতের' নাটকটির অভিনয় দেখার জন্য। লোলামেমব্রিভ-র দল নাটকটি মঞ্চস্থ করেছিলেন। এখানেই আলাপ হলো ফ্রেদেরিকোর সঙ্গে আমার। বন্ধু-বান্ধব আর সাহিত্যিকরা প্রায়ই আমাদের দু'জনকে তাঁদের খানাপিনার আড্ডায় আমন্ত্রণ জানাতেন। অবশ্য আমাদের দু'জনের নিন্দুকেরও অভাব ছিলো না। নিন্দুকেরা সব সময়েই চেষ্টা করতেন লোর্কার সঙ্গে আমার বন্ধুত্বে ফাটল ধরাতে। সেবার পি. ই. এন.

ক্লাব প্লাজা হোটেলে আমাদের জন্য এক ভোজসভার আয়োজন করেছিলেন। এবং সারাদিন ধরে টেলিফোনে কে বা কারা আমাদের দু'জনকে ঐ ভোজসভা বাতিল হয়েছে বলে জানাতে লাগলেন। তাঁরা প্লাজা হোটেলের ম্যানেজারকেও বার বার ফোন করে বলে দিয়েছিলেন যে, আমাদের জন্য যেন কোনো টেবিল সংরক্ষণ করে রাখা না হয়! তাঁদের সে চেষ্টাকে ব্যর্থ করে প্রায় শতেকখানেক আর্জেনটাইন কবি আর কথাশিল্পীর সঙ্গে ফ্রেদেরিকোকে নিয়ে সেই ভোজসভায় হাজির হয়েছিলাম। আমরা দু'জনে সেই ভোজসভার জন্য একটি বক্তৃতা রচনা করেছিলাম, নাম দিয়েছিলাম 'অ্যাল্ অ্যালিমেঁ্যান'। আপনাদের মতো আমিও এর মানে বুঝিনি। কিন্তু ফ্রেদেরিকোর মাথায় সব সময়েই চমকপ্রদ সব কল্পনা ঘোরাফেরা করতো। উনি আমাকে বুঝিয়েছিলেন—যখন দু'জন বুল-ফাইটার একসাথে একটা উত্তেজিত ষাঁড়ের সঙ্গে লড়াই করেন, সম্ভবতঃ দুই সহোদর অথবা এঁদের থাকে রক্তের নিবিড় সম্বন্ধ, তখন এই বুল-ফাইটিংকে বলা হয় অ্যাল অ্যালিমেঁ্যান। ভোজসভায় পাঠ করার জন্য তাই এই বক্তৃতা তৈরী করা হলো।

সে রাতের সেই ভোজসভায় তাই করেছিলাম। আমাদের এই পরিকল্পনা আমরা দু'জন ছাড়া আর কারুর জানা ছিলো না। ভোজ শেষে পি. ই. এন. ক্লাবের সভাপতিকে ধন্যবাদ জানাতে আমরা একসঙ্গে উঠে দাঁড়ালাম এবং বুল-ফাইটারদের মতোই বক্তৃতা শুরু করলাম আমরা একই সঙ্গে।

আমাদের দু'জনকে এক সঙ্গে উঠে দাঁড়াতে দেখে প্রথমে সকলে একটু অবাক হয়েছিলেন এবং টেবিলের একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা ফ্রেদেরিকোর জামা ধরে টেনে অনেকে তাঁকে বসিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন আর অন্য প্রান্তে সে চেষ্টা আমার উপর দিয়েও হয়েছিলো। কিন্তু ওই টানাটানিকে কোনো আমল না দিয়েই আমরা শুরু করে দিলাম বক্তৃতা। ফ্রেদেরিকো বললেন—ভদ্রমহোদয়গণ, সঙ্গে সঙ্গে আমি বললাম —ভদ্রমহিলারা।—এইভাবেই উভয়ে আমরা কথার পর কথার রেশ ধরে বক্তৃতা দিতে লাগলাম। উপস্থিত সকলেই ব্যাপারটা বুঝতে পেরে তন্ময় হয়ে আমাদের বক্তৃতা শুনতে লাগলেন। বক্তৃতার শেষে মনে হলো আমরা একসঙ্গে একই সুরে কোনো গান গাইলাম। বক্তৃতার বিষয় ছিলোঃ স্প্যানিশ কবি রুবেনদারিও। কবি রুবেনদারিও স্প্যানিশ সাহিত্যের অন্যতম সৃজনধর্মী সাহিত্যিক। অন্তত আমাদের দুজনের মত হচ্ছে তাই। আমাদের বক্তৃতাটি ছিলো এই রকম ঃ

নেরুদা—ভদ্রমহিলারা—

লোরকা—ভদ্রমহোদয়গণ, বুল ফাইটিং-এ একটি লড়াই আছে যার নাম হলো 'বুল-ফাইটিং অ্যাল্ অ্যালিমেঁ্যান্' এই ফাইটে অর্থাৎ লড়াইয়ে দু'জন ম্যাটাডোর একটা লাল-কম্বল হাতে নিয়ে একটি উত্তেজিত ষাঁড়ের সঙ্গে লড়াই করে ষাঁড়টিকে পরাস্ত করেন—

নেরুদা—একটি বৈদ্যুতিক প্রবাহের মধ্যে আবদ্ধ আমি আর ফ্রেদেরিকো দু'জনে একসঙ্গে এই সম্মানের জন্য আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

লোরকা—এ রকম একটা সভায় এটাই নিয়ম যে, কবি তাঁর নিজের ভাষায় কথা বলবেন—সে ভাষাতে রুপোলি চমক্ বা কাঠের কাঠিন্য যাই থাকুক

না কেন, সেই ভাষাতেই তিনি তাঁর সঙ্গী-সাথীদের প্রীতি-সম্ভাষণ জানাবেন।

নেরুদা—আজ আমরা একজন মৃত ব্যক্তিকে আপনাদের সঙ্গী হিসাবে আপনাদের মাঝখানে উপস্থাপিত করছি। যে উজ্জ্বল জীবন এক জমকালো মুহূর্তে তাঁর পত্নী ছিলেন, সেই জীবনের কাছে তিনি আজ এক মৃতদার পুরুষ। অনেক মৃত্যুর মধ্যে একটি মৃত্যু এসে তাঁকে সরিয়ে নিয়েছিলো অন্ধকারের গোপনতায়। আমরা তাঁর প্রজ্বলিত ছায়ার মধ্যে দাঁড়াবো—তাঁর নাম ধরে তাঁকে ডাকবো।—যতক্ষণ না ওই শূন্যতার মধ্য থেকে তাঁর শক্তি লাফিয়ে এসে আমাদের সামনে হাজির হয়।

লোর্কা—প্রথমেই আমরা একটি পেঙ্গুইন পাখির মতই নরম আর দরদী সাংকেতিক আলিঙ্গন জানাচ্ছি আমাদের নিদারুণ তীব্র কবি 'আমাদো ভীলার'কে। এর পরেই আমরা আর একটি নাম রাখতে চাই—যে নামটি শুনে টেবিলে রাখা মদের গ্লাসগুলি কেঁপে উঠবে, কাঁটা-চামচগুলি ছুটে যাবে ক্ষুধার্ত দৃষ্টির সামনে আর সমুদ্রের ঢেউ এসে টেবিলের উপরে ঢাকা কাপড়টাকে ভিজিয়ে দিয়ে যাবে। সেই নামটি হচ্ছে স্পেন তথা আমেরিকার কবি রুবেন—।

নেরুদা—দারিও। কারণ ভদ্রমহিলারা—

লোর্কা—এবং ভদ্রমহোদয়গণ—

নেরুদা—এই বুয়েনস্ এয়ার্সের কোথাও কি আছে রুবেনদারিওর নামে একটি সরনি—

লোর্কা—কোথাও কি রয়েছে রুবেনদারিওর একটি মর্মর মূর্তি—

নেরুদা—রুবেন ছিলেন উদ্যানের ভক্ত, কোথাও কি আছে রুবেনদারিও উদ্যান?

লোর্কা—কোন্ ফুলওয়ালী 'রুবেনদারিও-গোলাপ' সাজিয়ে রাখে তার বিপণিতে?

নেরুদা—কোথাও রয়েছে 'রুবেনদারিও আপেল'এর গাছ?—কোথাও বিক্রি হয় 'রুবেনদারিও আপেল'?

লোর্কা—কোথায় আছে রুবেনদারিওর হাতের ছাপ?

নেরুদা—বলুন, কোথায়—কোথায়?

লোর্কা—রুবেনদারিও ঘুমিয়ে রয়েছেন নিকারাগুয়ায়। প্লাস্টারের তৈরি এক সিংহ-মূর্তির তলায়—মর্মরখচিত সেরকম সিংহ-মূর্তি অনেক ধনীর গৃহের সিং-দরজায় শোভা পায়।

নেরুদা—সিংহের জনক হয়েও তাঁর ভাগ্যে জুটলো কিনা হুকুমমাফিক বানানো প্লাস্টারে তৈরি সিংহ-মূর্তি!—যিনি সমস্ত মানুষকে তারার রাজ্য উৎসর্গ করলেন, একটি তারাও তাঁর জন্য কেউ রাখলেন না!

লোর্কা—তাঁর এক একটি শব্দের মধ্যে রয়েছে জঙ্গলের ধ্বনি—তাঁর শব্দের রাজ্য লেবুর নীলাভ পাতার মতো তৈরি করতো গ্রহলোক, তৈরি করতো চকিতা হরিণীর পায়ের পলায়নী ছন্দ বা শম্বুকের ভয়ার্ত শূন্যতা! রুবেনদারিওর দৃষ্টি দিয়ে আমরা ধাবমান যুদ্ধ জাহাজে ছুটেছি সমুদ্রের

স্রোতে।—অপরাহ্নের ধূসর আকাশকে ধরে রাখার জন্য তিনি সৃষ্টি করেছিলেন গড়ের মাঠের মতো বিরাট বিরাট শব্দের ফাঁদ। দখিনা বাতাসকে তিনি সম্বোধন করতেন নিবিড় আত্মীয়তায় পরিপূর্ণ হৃদয় দিয়ে। তিনি হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন ঐতিহাসিক করিনথিয়ান সাম্রাজ্যের স্তম্ভে—যেখানে সময় সম্বন্ধে ছিলো একটা অবিশ্বাস বিদ্রূপাত্মক করুণার ভঙ্গী!

নেরুদা—তাঁর উজ্জ্বল নামটা যেন তাঁর জীবনের সবটুকু সৌরভ বহন করে, বহন করে তাঁর হৃদয়ের দুঃখ, অনিশ্চিত ভাস্বরতা, নরকের গভীর স্তরে তাঁর অবনমন, যশের সাম্রাজ্যের শিখরে আরোহণ—অদ্বিতীয় এবং অনন্য কবি হিসাবে তিনি লাভ করুন চিরজন্ম!

লোর্‌কা—যিনি তাঁর সময়ের বয়োজ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ সব কবিকেই শিক্ষা দিয়েছিলেন নিজস্ব ভঙ্গীর মাধ্যমে যা আজকের কোনো কবিই দিতে পারলেন না। ভ্যালে ইনক্লান জুয়্যান ও জুয়্যান রামোন জিমেনেজ্—সবাই ছিলেন তাঁর ছাত্র, এমন কি মাচাদো ভ্রাতৃদ্বয়ও। রুবেনদারিওর শব্দে ছিলো জল আর রাসায়নিক সামগ্রী—যা এই প্রাচীন ভাষার মধ্য থেকেই বেরিয়ে আসতো। তিনি আসার আগে, স্প্যানিশ ভাষাশব্দের এতো বর্ণাঢ্য, এতো স্ফুলিঙ্গ আর এতো রূপ কখনও দেখেন নি। রুবেনদারিও নিজ জমির মতোই স্পেনের সমস্ত মাটিকে দেখেছিলেন।

নেরুদা—তারপর একদিন উত্তরে সমুদ্রের জোয়ার তাঁকে টেনে নিয়ে ফেললো চিলির উপকূলে। তাঁকে সেখানে রেখে ফিরে গেল সমুদ্র। পাথরের মতো রুবেনদারিও সেখানে পড়ে রইলেন। সমুদ্রের নোন্‌তা ফেনা এসে বার বার তাঁকে আঘাত করলো। ভালপারাইসোর কালো ধোঁয়ায় ভরা বাতাস তাঁকে শুনিয়ে গেল নোন্‌তা সমুদ্রের গান।—আসুন, আজ এই রাতে হাওয়া দিয়ে তাঁর মূর্তি গড়ি আর তারপর সেই ধোঁয়া, স্বর এবং এই পরিবেশ দিয়ে তাঁর সেই মূর্তির মাঝে প্রাণ সঞ্চার করি যে প্রাণ বহন করবে তাঁর কবিতা আর বিশাল স্বপ্ন!

লোর্‌কা—আমি কিন্তু হাওয়ায় গড়া এই মূর্তিতে সমুদ্রের রক্তাভ প্রবালের মতো শোণিত ধমনী দিতে চাই। একটা ছবিতে ফুটে ওঠা বিদ্যুৎ-রেখার মতো দিতে চাই স্নায়ু। দিতে চাই বৃষাসুরের মাথা—যার মুখাবয়বে তুষারের আল্পনা। তাঁর অদৃশ্য অশান্ত চোখের কোলে দিতে চাই ব্যর্থ-মনোরথ কোনো লক্ষপতির কয়েক ফোটা অশ্রু। ফাঁকা প্রান্তরে ভেসে আসা বাঁশীর সুর।—মদ্যপ্রীতির নমুনা হিসাবে কণিয়াক মদের বোতলের শোভাযাত্রা। স্বাদের আকর্ষণীয় অনুপস্থিতি আর শব্দের চমক ও ঠাট —যা তাঁর কবিতাকে মানুষের খুব কাছে এনে উপস্থিত করেছিলো। তাঁর এই উর্বর সাফল্য কোনো নিয়ম কোনো পদ্ধতি বা শিক্ষা—কিছুই মেনে চলেনি!

নেরুদা—ফ্রেদেরিকো গার্সিয়া লোর্‌কা একজন স্প্যানিশ আর আমি হচ্ছি চিলির

মানুষ।—একসঙ্গে আজ আমরা মিলিত হয়েছি বন্ধুদের সঙ্গে একটি বিরাট ছায়াকে সম্মান জানাতে যিনি আমাদের চেয়েও অনেক অনেক বেশি মহিমান্বিত গান শুনিয়েছেন আমাদের, যিনি তাঁর অনন্যসাধারণ স্বর দিয়ে অভিনন্দন জানিয়েছেন আরজেনটিনার মাটিকে—যে মাটির উপরে আজ আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি।

লোরকা—পাবলো নেরুদা একজন চিলিয়ান আর আমি এক স্প্যানিয়ার্ড।
—সেই নিকারাগুয়া—আরজেনটিনা—চিলি এবং স্পনখ্যাত কবি রুবেনদারিওকে—

উভয়ে—সসম্মানে স্মরণ করছি আর এই গ্লাস তুলে ধরে তাঁর গৌরবে আজ আমাদের দু'জনকে গৌরবান্বিত করার জন্য আপনাদের সবাইকে সশ্রদ্ধ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সভা ভাঙার পরে নীরবে আমরা যার যার গন্তব্যস্থলাভিমুখী হলাম।

প্রসঙ্গত আর এক ভোজসভার অভিজ্ঞতার কথা এখানে বলা যাক্। ফ্রেদেরিকোর সহযোগিতা সে রাতে আমাকে খুবই মুগ্ধ করেছিলো। এরকম উদারতা দুর্লভ।

এক কোটিপতির বাড়িতে আমি আর ফ্রেদেরিকো দু'জনেই নিমন্ত্রিত হয়েছিলাম। এক সান্ধ্যভোজের আসরে। এক ধরনের চমকপ্রদ সংবাদপত্রের ব্যবসা করে তিনি কোটিপতি হয়েছিলেন। নাতালিও বোতানা নামক এই ব্যবসায়ী বুয়েনস্ এয়ার্সের জগতকে পরিচালনা করতেন নিজ প্রাসাদে বসেই।

সেই সন্ধ্যায় খাবার টেবিলে আমি আর ফ্রেদেরিকো সামনা-সামনি বসেছিলাম এবং বোতানা ও সুন্দরী দীর্ঘাঙ্গী এক মহিলা কবি বসেছিলেন অন্যদিকে। মহিলাটির সুন্দর সবুজ চোখের দৃষ্টি বার বার আমার দিকে এসে পড়ছিলো। তাঁর সেই অন্তরঙ্গ দৃষ্ট আমার শরীরের জ্বলন্ত আগুনে ঘৃতাহুতি নিক্ষেপ করতে লাগলো। —এতে আমি কাম-কাতর হয়ে পড়লাম। বন্ধু ফ্রেদেরিকোর চোখে এটা ধরা পড়েছিলো। ভোজ শেষে মহিলাটিকে সঙ্গে নিয়ে ফ্রেদেরিকো আর আমি সাঁতার-পুলের দিকে এগোলাম।

ফ্রেদেরিকো দেখলাম ক্রমশঃ আমাদের ছেড়ে এগিয়ে এগিয়ে চলতে শুরু করলো আর মাঝে মাঝে হাসি-তামাসার টুকরো ছুঁড়ে দিতে লাগলো—যাতে আমরা দু'জনেই উত্তেজনায় অস্থির হয়ে উঠি। মনে হলো ফ্রেদেরিকোর মতো সুখী মানুষ বোধহয় দ্বিতীয়টি খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।—এটাই ছিলো ফ্রেদেরিকোর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

সাঁতার-পুলের উপরটায় ছিলো বেশ উঁচু একটা ছাদ। তার মধ্যে অতি সুন্দর-ভাবে সাজানো একটা ঘর। গল্প করতে করতে তিনজনেই ছাদে উঠলাম। ছাদে উঠে মহিলাটিকে চুম্বন করলাম, আপত্তি করলেন না তিনি। বরং মনে হলো কামাতুরা এক নারীদেহ আমাকে যেন নিবিড়ভাবেই পেতে চাইছে। এর পরে ফ্রেদেরিকোর বিস্মিত দৃষ্টির সামনেই মহিলাটিকে শুইয়ে দিয়ে বিবস্ত্র করতে লাগলাম। তিনি নিথর নিশ্চল হয়ে আমাকে প্রশ্রয় দিলেন। ফ্রেদেরিকোকে বললাম লক্ষ্য রাখতে যাতে কোনো ব্যাঘাত না ঘটে।

রাত্রির দেবী আফ্রোদাইতকে সাক্ষী রেখে তারায় ভরা নীল আকাশের নীচে সবে

আমরা সম্ভোগ শুরু করেছি এমন সময় ফ্রেদেরিকো এক অস্ফুট আর্তনাদ করে গড়িয়ে পড়লো নীচে। আমি আর ভদ্রমহিলা তাড়াতাড়ি উঠে পোশাক জড়িয়ে ছুটে গেলাম, তুললাম ফ্রেদেরিকোকে।

এরপর প্রায় সপ্তাহ-দুয়েক খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে হয়েছিলো ফ্রেদেরিকোকে।

মিগুয়েল হারনান্দেজ

বুয়েনাস এয়ার্সে বেশিদিন আমাকে থাকতে হয়নি। ১৯৩৪-এর শুরুতেই বারসিলোনার্তে বদলির আদেশ এলো। স্পেনে নিযুক্ত তৎকালীন বাণিজ্যদূত ছিলেন দন্ তুলিও ম্যাকুইরা। ইনি ছিলেন একজন সৎ ও কঠোর পরিশ্রমী রাজকর্মচারী। আমি তাঁর কাছে অত্যন্ত ভদ্র ব্যবহার পেয়েছিলাম। আমার সঙ্গে কথা বলেই তিনি বুঝেছিলেন যে, যোগ-বিয়োগে আমি একেবারেই কাঁচা। ম্যাকুইরা আমাকে বললেন, পাব্‌লো, তুমি মাদ্রিদে যাও। সেখানের আকাশে অসংখ্য কবিতা ছড়িয়ে রয়েছে। এখানে বারসিলোনায় যোগ-বিয়োগের ভয়ংকর রাজত্বে তুমি হারিয়ে যাবে। ওটা আমিই সামলাবো।

স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে পেঁাছে ফ্রেদেরিকো ও আলবার্তির বন্ধুদের সঙ্গে আমার পরিচয় হলো। অল্পদিনের মধ্যেই স্প্যানিশ কবিদের সঙ্গেও আলাপ হয়ে গেল। লাতিন আমেরিকার কবিদের শুধু একটাই পার্থক্য ছিলো সেটা হচ্ছে আমরা দু'দলই একটি গর্বের গন্ডী টেনে সখ্যতার বন্ধনে আবদ্ধ ছিলাম।

আমার সময়ে স্পেনের মানুষদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও একাত্মবোধ ছিলো, যেটা তখনকার সময়ের লাতিন আমেরিকানদের মধ্যে ছিলো না বললেই চলে। আরো অনেকটা বিশ্বজনীন ছিলাম আমরা। অপরের সংস্কৃতি আর ভাষা জানবার আগ্রহ ছিলো আমাদের। স্পেনিয়ার্ড খুব কমই ছিলেন যাঁরা নিজস্ব ভাষা ছাড়া অন্য ভাষা জানতেন। ডেসনস ও ক্রিভেল যখন মাদ্রিদে আসেন তখন আমার উপরে ভার পড়েছিলো তাঁদের দোভাষী হওয়ার।

আলবার্তি আর ফ্রেদেরিকোর বন্ধু তরুণ কবি মিগুয়েল হাব্‌নান্‌দিজের সঙ্গে আলাপ হলো। কর্ডুরয়ের মোটা প্যান্ট আর স্প্যানিশ চাষীর পোশাক পরা মিগুয়েলকে দেখলাম। ওরিহুয়েলা গ্রামে ছাগল চরাতেন তিনি। তাঁর একটি কবিতার নাম 'সবুজ ঘোড়া'। 'কবিতাটি আমার পত্রিকায় প্রকাশ করলাম। প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরা এই কবিতাটি আমায় আকৃষ্ট করেছিলো।

কৃষক-কবি মিগুয়েলের কবিতায় ছিলো মাটির গন্ধ। তাঁর মুখাবয়বটা জমি থেকে সদ্য তুলে আনা একটি আলুর মতো। আমার বাড়িতেই তিনি থাকতেন, এখানে থেকেই কবিতা লিখতেন। আমার আমেরিকান কবিতার দিগ্‌বলয় আর বিশাল প্রান্তর ওঁর রচনাকে উত্তরকালে প্রভাবিত করেছিলো।

কবি মিগুয়েল প্রায়ই পশু-পাখির স্বর শোনাতেন। উনি ছিলেন তেমনি একজন কবি যিনি প্রকৃতির পিঠ থেকে বেরিয়ে আসা অসমান পাথরের টুকরোর মতো জঙ্গলের

সজীবতা আর প্রাণশক্তিতে ভরপুর। মিগুয়েল বলতেন, একটি ঘুমন্ত ছাগীর পেটে কান পেতে শব্দ শোনার মতো উত্তেজনা আর কিছুতে নেই। শোনা যাবে ছাগীর স্তন বেয়ে দুগ্ধ প্রবাহের শব্দ—যে গূঢ় নিবিড় অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা একমাত্র ছাগ-পালকের পক্ষেই সম্ভব।

মাঝে মাঝে বুলবুলি পাখির গানের গল্প শোনাতেন তিনি। মিগুয়েল আমার কাছে শুনেছিল যে, আমাদের দেশে বুলবুলি নেই। তাই উনি প্রায়ই বুলবুলির গান শোনাতেন, শোনাতেন তাদের সুরেলা গলার গান গাছের উঁচু ডালে বসে।

মিগুয়েলের তখন কোনো কাজ ছিলো না। আমি ওঁর জন্য একটা কাজ যোগাড় করার চেষ্টা করতে লাগলাম। কাউন্টের পুত্র এক উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারিকে মিগুয়েলের জন্য কাজের কথা বলতে তিনি বললেন, মিগুয়েল, হ্যাঁ, আমি ওঁর নাম শুনেছি—ওঁর লেখা অনেক কবিতাও পড়েছি। ওঁর কবিতা আমার ভালো লাগে। তোমার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করো কি ধরনের কাজ তিনি চান, আমি সেই বুঝে ওঁকে নিয়োগপত্র দেবো।

আনন্দে ডগমগ হয়ে বাড়ি ফিরে মিগুয়েলকে বললাম, হারনানদেজ, তোমার দুঃখের দিন শেষ হয়েছে। আজই আমি এক কাউন্টের পুত্রের সঙ্গে কথা বলেছি। —তুমি কি কাজ চাও, বলো?—খুব ভালো কাজই পাবে।

মিগুয়েল অনেকক্ষণ ভাবলেন। ভাবতে ভাবতে ওঁর শরীরে মেঘের ছায়া এসে জমলো। অপরাহ্নের দিকে মুখ ভর্তি হাসি আর উদ্দীপনা নিয়ে আমার কাছে এসে বললেন, ভেবেছি—অনেক ভেবেছি এবং এই সমস্যার সমাধানও পেয়েছি।—তোমার বন্ধুকে বলো, এই মাদ্রিদ শহরের কোথাও যদি ছাগল চরানোর একটা কাজ উনি আমাকে যোগাড় করে দিতে পারেন—।

কথাটা শুনে হেসেছিলাম সেদিন।

মিগুয়েল হারনানদিজের স্মৃতি আমার জীবন থেকে মুছে যাবার নয়। অন্ধকার জঙ্গলের বুলবুলির কণ্ঠস্বর প্রস্ফুটিত নব পল্লবের মতো তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করে রাখতো। মাটির স্বাদ প্রবাহিত হতো তাঁর রক্তে—যার রঙীন স্বপ্নগুলো ভরে তুলতো তাঁর কবিতাকে। কিন্তু একজন তরুণ স্প্যানিশ কৃষকের মতোই বলিষ্ঠতায় উদ্ভাসিত হয়ে থাকতো প্রতিটি ছন্দ।

হারনানদিজের মুখ ছিলো স্পেনের মুখ। আলো দিয়ে কাটা—কর্ষিত মাটির মতো এবড়ো-খেবড়ো—রুটী বা পৃথিবীর মতো গোল। ত্বক চামড়ার মতো রুক্ষ, চোখের দৃষ্টিতে কাঠিন্য আর অনুকম্পা। তাঁর ব্যবহৃত শব্দগুচ্ছ থেকে আমি কবিতাকে স্বয়ং উঠে আসতে দেখেছি। আমার এই ভবঘুরে কবি-জীবনের মধ্যে বিদ্যুতের শক্তি সঞ্চালিত শব্দে আর কাউকেই কবিতা লিখতে দেখিনি আমি।

সবুজ ঘোড়া

আমার বাড়ির সামনেই থাকতেন ফ্রেদেরিকো আর আলবার্তি। প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় আমরা হয় কফিখানায়, নয়তো কারুর বাড়িতে মিলিত হতাম। সেই আড্ডায় এসে যোগ দিতেন বিমূর্ত ভাস্কর আলবার্তো, বিখ্যাত কবি আলতাগুইরো ও বার্জামিন—স্থপতি লুই লাসাকা প্রভৃতি।

আমরা সবাই দোতলা বাসের উপরে চড়ে গান গাইতে গাইতে বা কবিতা আবৃত্তি করতে করতে ফিরতাম। বাড়িতে এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতেন তরুণ কবি ও শিল্পীরা।

আহ্, আমার সেই আনন্দঘন মাদ্রিদের দিনগুলো! সূর্যের আগুনে পোড়া স্পেন—শুষ্ক ও শিলাবৎ তার নীরস মাটি থেকে স্ফুলিঙ্গের কণা ছিট্‌কে বেরিয়ে আলোর প্রাসাদ গড়তো—মেঘ ও ধুলোর রাজ্যে। এই নীরস শুষ্ক উষ্ণতার মধ্যে মাত্র একটিই সত্যিকার নদী প্রবাহিত ছিলো, সেটি হচ্ছে স্পেনের কবিকুল। কবি কুইভ্রাভেদো যিনি ছিলেন গভীর সবুজ জলের মাঝে কৃষ্ণবর্ণ ফেনার মতো, কবি কালডেরোন—যাঁর শব্দগুলি সঙ্গীতের ধ্বনি তুলতো; স্ফটিক স্বচ্ছ জলের মতোই ছিলেন কবি আরজেনসোলাম, লাল চুনীর নদী যেন কবি গ্যনগোরা।

একবারই মাত্র দেখা হয়েছিলো আমার ভেলি ইন্‌কালান-র সঙ্গে। তাঁর বইয়ের মধ্যে চাপা পড়া একটা চিপসে যাওয়া পাতার মতো উনি এসে দাঁড়িয়েছিলেন আমার সামনে।

রহস্যে ঘেরা পম্‌বো কাফেতে দেখা হয়েছিলো রামোন গোমেজের সঙ্গে। গোমেজের লেখায় ছিলো পিকাসো আর কুইভ্রাভেদোর সংমিশ্রণ—যার মিষ্টতা আমায় গভীরভাবে আকর্ষণ করেছিলো। কবিতায় তাঁর পদবিন্যাস সমস্ত স্পেনের সাহিত্যে এমন একটা পরিবর্তন এনেছিলো যা তাঁর সময় বা তাঁর পরে আর কেউই স্পেনীয় সাহিত্যে তাঁর অনুসৃত রীতিকে বদলাতে পারেন নি।

একটি বৃদ্ধ স্প্যানিশ গাছের মতোই দেখেছিলাম ডন্ এ্যান্তোনিও মাচাদোকে। নোটারির লেখ্য প্রমাণকের কালো পোশাক পরা নীরব নির্লিপ্ত মানুষটি বসে থাকতেন কফিখানায়। প্রসঙ্গতঃ নিন্দুক জুয়্যান র‍্যামোন জিমেনেজ্ তাঁর সম্বন্ধে বলতেন, সিগারেটের টুক্‌রোগুলো পকেটে রেখে ছাইয়ের উপর দিয়ে চলতেন মাচাদো।

এই উজ্জ্বল দীপ্তিময় কবি জুয়্যান র‍্যামোন জিমেনেজ্‌ই আমায় সেই কুখ্যাত স্প্যানিশ পরশ্রীকাতরতা সম্বন্ধে জ্ঞান দিয়েছিলেন। এই কবি যাঁর কবিতা তখনকার অন্ধকারময় জগতে দীপ্ত ও ভাস্বর ছিলো, সবাইকেই তাঁর গুপ্ত আশ্রয়স্থল থেকে বিদ্বেষ আর নিন্দায় ভরা সমালোচনা করতেন। যখনই তাঁর মনে হতো যে, অপরে তাঁর রচনাকে ছাড়িয়ে যেতে চাইছে—এমন কি বৃদ্ধ সন্ন্যাসী কবি মাচাদোকেও তিনি রেহাই দিতেন না। লোর্‌কা, আলবার্তি বা আমি—কেউই তাঁর বিদ্বেষপূর্ণ

সমালোচনা থেকে রেহাই পাইনি। প্রতি সপ্তাহের রবিবারের কোনো না কোনো কাগজে আমাদের উদ্দেশে তাঁর কোনো না কোনো সমালোচনা প্রকাশিত হতো। আমি অবশ্য আমার সম্বন্ধে তাঁর কোনো সমালোচনার উত্তর কোনো সময় দিইনি, দেবার প্রয়োজনও মনে করিনি। কারণ আমি বিশ্বাস করি—নিজে বাঁচো এবং অপরকেও বাঁচতে দাও এই নীতিতে।

কবি মেন্যুয়েল আলতাগুইর্য়োর একটি ছাপাখানা ছিলো। তিনি নিজেই ছিলেন সেই ছাপাখানার মুদ্রাকর। একদিন সকালে এসে তিনি আমাকে জানালেন যে, স্পেনের সমস্ত কবির শ্রেষ্ঠ রচনা নিয়ে তিনি একটি সংকলন প্রকাশ করতে চান এবং সেই সংকলনটির সম্পাদনার দায়িত্ব নিতে হবে আমাকে।—কারণ তাঁর মতে এ কাজে আমিই একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি! রাজি হলাম তাঁর প্রস্তাবে।

সত্যিকার একজন গুণী মুদ্রাকর ছিলেন মেন্যুয়েল আলতাগুইর্য়ো। তাঁর হাতের স্পর্শ পেয়ে সংকলনটি প্রাণবন্ত আর সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে উঠেছিলো। তাঁর নিজের লেখা কয়েকটি কবিতাও সেই সংকলনটিতে প্রকাশিত হয়েছিলো। কবি পেদ্রো এস্‌পিনাসোর "গ্র্যানিল নদীর উপকথা" কবিতাটি সোনালী মুদ্রণে সোনার মতোই চকমকে ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিলো।

এই কবিতাগুচ্ছের পাঁচটি সংকলন বিভিন্ন বই-এর দোকানে বিক্রীর জন্য রাখা ছিলো। আমি দূরে দাঁড়িয়ে বই-এর বিক্রী দেখতাম—আর অবাক হয়ে দেখতাম কবি ম্যানুয়েল্ তাঁর মেয়ের পেরামবুলেটরে বইগুলো ঢাকা দিয়ে বেরিয়ে পড়তেন দোকানে দোকানে বিলি করতে। তাঁকে দেখে রাস্তার পথচারীরা বলাবলি করতেন—'দেখছো কেমন সুযোগ্য পিতা—কতো সযত্নে বাচ্ছাটিকে ঢেকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন'।

এই শিশুই ছিলো সেই কবিতাগুচ্ছ, যা 'সবুজ ঘোড়া'য় চেপে বেরুতো। এই কবিতা সঞ্চয়নটির মধ্যে বহু বিখ্যাত ও অখ্যাত প্রাচীন ও তরুণ কবির রচনা স্থান পেয়েছিলো। বইটি প্রকাশিত হবার কিছুদিন পরেই জুয়্যান জিমেনেজ্ তাঁর স্বভাব সুলভ ব্যঙ্গ ও তীব্র বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গীতে সুরু করে দিলেন আমার সমালোচনা! র‍্যাফল আলবার্তি আমায় খানিকটা অনুযোগের সুরেই বললেন, 'সবুজ কেন—ঘোড়াটা কি লাল হতে পারতো না?'

আমি কিন্তু ঘোড়াটির রঙ বদলাইনি। অবশ্য সেজন্য র‍্যাফলের সঙ্গে আমার মতান্তরও কোনোদিন হয়নি, কারণ আমরা দু'জনেই জানতাম যে, এই পৃথিবীতে সব রঙের ঘোড়া আর কবিদের জন্য প্রচুর স্থান রয়েছে।

'সবুজ ঘোড়া'র ষষ্ঠ সংস্করণটি আমরা উৎসর্গ করেছিলাম স্পেনিশ কবি 'জুলিও হোরেরো'কে। বইটি সবে প্রকাশিত হতে সুরু হয়েছে, কিন্তু ভিরিয়াতো স্ট্রীটের প্রকাশকের ঘরে বই-এর পাতাগুলো খোলাই পড়ে রইলো—বাঁধানো আর হলো না। ১৯৩৬ সালের ১৯শে জুলাই যেদিন বইটি প্রকাশিত হবে—সেদিন সমস্ত রাস্তাঘাট গুলি-গোলার আওয়াজে মুখর হয়ে উঠলো! সেদিন আফ্রিকার সৈন্যাবাসে একজন অজ্ঞাত স্বৈরাচারী অত্যাচারী অধিনায়ক—'ফ্রান্সিস্কো ফ্র্যাঙ্কো'—গণতন্ত্রকে ধ্বংস করার জন্য সসৈন্যে স্পেনের দ্বারপ্রান্তে সমাগত।

যে অপরাধ গ্রানাদায় ঘটেছিলো

এই লেখার সময়ে স্পেনে বহু বছরের সফল বিদ্রোহের সরকারীভাবে সমারোহ-উৎসব চলছে। ঠিক এই সময়ে রঙীন পোশাক পরা মুর দেহরক্ষী পরিবৃত হয়ে ইংলণ্ড ও আমেরিকার দূত সমভিব্যাহারে অধিনায়ক তাঁর সৈন্যদল পরিদর্শনে ব্যাস্ত—যে সৈন্যের অধিকাংশই বালক—যারা যুদ্ধ দেখেনি কিন্তু আমি দেখেছিলাম। দেখেছি লক্ষ লক্ষ স্পেনিয়ার্ডের মৃতদেহ ও লক্ষাধিক নির্বাসিত স্পেনিয়ার্ড। দেখে মনে হয়েছিলো—রক্তাক্ত এই ছুরীর দাগ মানুষের বিবেক থেকে আর কোনোদিনও ওঠানো যাবে না। ওই বালক বা সৈন্য এই বীভৎস যুদ্ধজয়ের প্রকৃত ইতিহাস কোন-দিনই জানবে না।

১৯শে জুলাই ১৯৩৬-এ আমার দিনটা শুরু হলো। কথা ছিলো আমি আর ফ্রেদেরিকো সেদিন সন্ধ্যায় কুস্তী দেখতে যাবো। নির্দিষ্ট জায়গায় মিলিত হয়ে আমাদের রওনা হবার কথা, কিন্তু ফ্রেদেরিকো এলেন না। ততক্ষণে তিনি পরলোকের পথে। অধিনায়ক ফ্রাংকোর এক কুস্তীগীর তাঁকে ইহলোক থেকে সরিয়ে দিয়েছে। মহান্ এক কবির এই ভয়ংকর অন্তর্ধানের মধ্য দিয়ে স্পেনের সেদিনের যুদ্ধ আমার কবিতার ধরনকে বদলে দিলো। কি মহৎ কবি এই ফ্রেদেরিকো! প্রতিভা আর মাধুর্যের এমন সমন্বয় আমি আর দেখিনি, ডানামেলা মুক্ত হৃদয় আর স্বচ্ছ স্ফটিক জলপ্রপাতের এমন যোগাযোগও দেখিনি। তাঁর আনন্দোচ্ছল লেখনী প্রাণ-প্রাচুর্যে ছিলো ভরপুর, তা অন্যকেও আকর্ষণ করতো। দিলখোলা আনন্দমুখর মানুষ ছিলেন তিনি। সততাই ছিলো তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। আরব আর আন্দালুসিয়ান শিকড় থেকে জেগে ওঠা যুঁইফুলের গন্ধে সারা স্পেনকে মাতোয়ারা করে দিয়ে চিরতরে চলে গেলেন ফ্রেদেরিকো। তাঁর সমস্ত রচনাই আমাকে আকৃষ্ট করেছে। মাঝে মাঝে আমার সাম্প্রতিক কবিতা পড়ে শোনাবার সময় তিনি চিৎকার করে উঠতেন—থামো থামো, তোমার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ছি আমি।

থিয়েটারের নীরবতায় হোক, আর কোলাহল মুখরিত মানুষের মাঝেই হোক সৌন্দর্যের সৃষ্টি করতে পারতেন কবি ফ্রেদেরিকো। এমন যাদুযুক্ত অঙ্গুলি বা এমন করে আনন্দোচ্ছল হাসিকে ভালোবাসতে আমার কোনো ভাইকেই আমি দেখিনি।

হায় হতভাগ্য বন্ধু আমার!—এই পৃথিবীর জন্য তুমি গান গাইলে, লাফালে, নাচলে, পিয়ানো বাজালে—জীবনের উজ্জ্বলতা দিয়ে স্বপ্ন গড়ে তুললে—কৃতী শিল্পীর মতো মণি-মুক্তার কারুকার্যে ঝলমলে হীরকসম তোমার কবিতা রেখে গেলে।

একবার গার্সিয়া লোর্কার উপরে বক্তৃতা করার সময় শ্রোতৃমণ্ডলীর ভিতর থেকে একজন আমাকে প্রশ্ন করলেন—ফ্রেদেরিকোর উদ্দেশে লেখা আপনার কবিতায় হাসপাতালটিকে আপনি নীল রঙে সাজালেন কেন?

বন্ধুবর! আমি উত্তর দিয়েছিলাম, একজন কবিকে এই প্রশ্ন করাটা অনেকটা

কোনো মহিলাকে তার বয়স জিজ্ঞাসা করার মতো। কবিতা কোনো সময়েই স্থিতিশীল নয়, কবিতা জলস্রোতের মতো, মাঝে মাঝে সৃষ্টিকর্তার হাতের নাগাল থেকে বেরিয়ে এগিয়ে যায়। কবির রচনার অবিমিশ্র বস্তুতে যে কোনো পদার্থ থাকতেও পারে, আবার নাও থাকতে পারে। আবার এমন বস্তুও হতে পারে যা আছে বা যা একেবারেই নেই। তবু আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দেবার সৎ চেষ্টাই করছি। আমার কাছে নীল রং সবচেয়ে প্রিয় রং। নীল হচ্ছে শূন্যতার প্রতীক—উঁচু আকাশের সীমানার রং—যা স্বাধীনতা আর আনন্দের জয়গানে মুখর। ফ্রেদেরিকোর উপস্থিতি, তাঁর যাদুকরী ব্যক্তিত্ব আর আনন্দঘন মুহূর্ত দিয়ে তাঁকে ঘিরে রাখতো। আমার রচনায় আমি বোধহয় এইটাই বোঝাতে চেয়েছিলাম—তাঁর উপস্থিতি হাসপাতালের সেদিনের সবটুকু বিষণ্ণতাকে যাদুর স্পর্শে, তার চঞ্চল প্রাণের আনন্দোচ্ছ্বাসে ভরিয়ে তুলেছিলো। বিষাদাতুর মুহূর্তগুলি ভরে গিয়েছিলো নীল রঙে।

ফ্রেদেরিকো নিজের মৃত্যু সম্বন্ধে পূর্বাশংকা করেছিলেন। একবার একটা নাটুকে দল নিয়ে বাইরে থেকে ফিরে এসে আমাকে তাঁর এক নতুন অভিজ্ঞতার কথা বলেছিলেন। এক গ্রামে সকলের সঙ্গে রাতে শুয়ে আছেন—এক সময় ওঁর ঘুম ভেঙে যেতে উঠে বাইরে যান এবং বেড়াতে বেড়াতে এক নির্জন জায়গায় এসে তিনি হঠাৎ খুব ভয় পেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন। এমন সময় কয়েকটি ভেড়ার ছানাকে দেখে তিনি আশ্বস্ত বোধ করলে হঠাৎই দেখেন একদল শুয়োর এসে সেই ভেড়ার পালে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওঁর শংকিত দৃষ্টির সামনেই নৃশংসভাবে তাদের হত্যা করলো। এই দৃশ্যটি তিনি মন থেকে সরাতে পারেন নি। সেদিন তাঁর মনে হয়েছিলো—তিনি যেন সেই রাতেই নিজের মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

ফ্রেদেরিকো গারসিয়া লোরকাকে শুধু গুলিই করা হয়নি, তাঁকে হত্যা করা হয়েছিলো। আমি ভাবতেই পারিনি যে, পৃথিবীতে এমন রাক্ষসও আছে যে শিশুর মতো সরল আনন্দোচ্ছল স্পেনের এই কবিকে হত্যা করতে পারে।—কে ভেবেছিলো ফ্রেদেরিকোর অতি প্রিয় এই গ্রানাদার মাটিতে এমন এক ভয়ংকর, পৈশাচিক অপরাধ ঘটবে!

আমার সংগ্রামী জীবনের অধ্যায়ে সেদিনের এই ভয়ংকর অপরাধটা ছিলো সবচেয়ে দুঃখজনক। স্পেনের মাটিতে অজস্র রক্তই ঝরেছে, এখানে মানুষের সঙ্গে ক্ষিপ্ত ষাঁড়ের লড়াইয়ে অনেক রক্ত আজও ঝরে। কিন্তু এই মৃত্যু—অন্ধকারের সঙ্গে আলোর যুদ্ধের মতো মনে হয়েছিলো।

তদন্তের ফলে কারারুদ্ধ ফ্রে লুই দ্য লিন্তন কুইভেদো অন্ধকার কারাগারের যন্ত্রণা ভোগ করলেন, কলম্বাস শৃঙ্খলবদ্ধ হয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে শিখলেন। আর লক্ষ লক্ষ মানুষের কবরের উপরে ক্রুশবিদ্ধ যীশু শোভা পেতে লাগলেন এক অন্ধকার স্বপ্নকে সামনে নিয়ে।

সময় কাটতে লাগলো। যুদ্ধে আমরা হেরে যাচ্ছিলাম। কবিরা সবাই স্পেনের মানুষের পাশে এসে দাঁড়ালেন। গ্রানাদার মাটিতে ফ্রেদেরিকোকে হত্যা করা হয়েছে। মিগুয়েল হারনানদিজ ছাগলের রাজত্ব ছেড়ে যুদ্ধের ভাষায় অলংকৃত করলেন তাঁর কবিতা। সৈনিকের পোশাক পরে তিনি যুদ্ধরত বিপ্লবীদের কাছে তাঁর কবিতা পাঠ করে শোনাতেন। ম্যানুয়েল আলতাগুইরো তাঁর প্রকাশনযন্ত্রকে যুদ্ধক্ষেত্রের প্রায় সামনাসামনি সরিয়ে আনলেন এবং সেখান থেকেই আমার লেখা 'আমার স্পেন—আমার হৃদয়' বইটি প্রকাশিত হলো। আমার মনে হয় খুব কম বই-এরই এমন রোমাঞ্চকর জন্ম আর এমন অস্থির-চঞ্চল ঐতিহাসিক মুহূর্তের মুখোমুখি দাঁড়ানোর সৌভাগ্য ঘটেছে। এখনও যে ক'খানি বই পাওয়া যায় তাতে এর প্রকাশনার চমৎকারিত্ব মানুষকে অবাক করে দেয়। বহুকাল পরে ওয়াশিংটনের সরকারী পুস্তক সংগ্রহালয়ে রক্ষিত বইখানির একটি প্রতিলিপির পাশে দেখেছিলাম লেখা রয়েছেঃ 'পৃথিবীর অন্যতম একটি দুর্লভ সংস্করণ'।

আমার বইটি সবেমাত্র প্রকাশিত হয়েছে সেই সময়েই গণতন্ত্রের পরাজয় নেমে এলো স্পেনের বুকে। হাজারে হাজারে উদ্বাস্তু মানুষ স্পেন ছেড়ে অজানার পথে পা বাড়ালেন। যে বিরাট উদ্বাস্তু-স্রোত স্পেনের সীমা ছেড়ে বাইরে চলে গেলো তার মধ্যে ম্যানুয়েল আলতাগুইরো ও তাঁর সেই ছাপাখানার অখ্যাত অনভিজ্ঞ সৈন্যরা, যাঁরা 'আমার স্পেন—আমার হৃদয়' বইটি প্রকাশ করেছিলেন তাঁরাও ছিলেন। তাঁদের সবচেয়ে বড় গর্ব ছিলো—মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও তাঁরা আমার বইটি প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁরা সকলেই ফ্রান্সের উদ্দেশে রওনা হলেন। সীমাহীন এই উদ্বাস্তু-স্রোতের উপর বার বার বোমা বর্ষণ করা হলো। অনেকেই লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে। এঁদের মধ্যে যাঁরা শেষ পর্যন্ত সীমান্তে পৌঁছলেন তাঁদের কাছ থেকে বইটির প্রতিলিপিটিও কেড়ে নিয়ে বহ্ন্যুৎসব করা হলো।

মিগুয়েল হারনানদিজ চিলির রাষ্ট্রদূতের আশ্রয়প্রার্থী হলেন। ইতিমধ্যে চিলির দূতাবাসে হাজারো ফ্রাঙ্কো অনুগামীকে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রদূত কারলোস মোরলা লিঞ্চ যদিও নিজেকে মিগুয়েলের বন্ধু মনে করতেন তবু তাঁকে রক্ষা করার কোনো দায়িত্ব নিতে চাইলেন না। কয়েকদিনের মধ্যেই কারারুদ্ধ করা হলো মিগুয়েলকে। বন্দীজীবন আর ক্ষয়রোগে তিন বছর বাদে তাঁর মৃত্যু হলো। বন্দী বিহঙ্গ বেশিদিন গান শোনাতে পারলো না।

আমার দূতগিরির দিনও ফুরোলো। স্পেনের গৃহযুদ্ধে অংশগ্রহণের ফল স্বরূপ চিলি-সরকার বরখাস্ত করলেন আমাকে।

এই যুদ্ধ ও প্যারি শহর

প্যারিসে পেঁছে র‍্যাফেল ও তাঁর পত্নী ম্যারিয়া তিরেসার সঙ্গে একটি বাড়ি ভাড়া নিলাম আমরা। আমাদের বাড়ি থেকে চতুর্থ হেন্‌রির মূর্তি 'পন্ত ন্যুইফ' এবং সিয়েনের তীর জেলেদের মাছ ধরা দেখতাম। ফরাসী সাহিত্যিক আলিজো কারপেন্‌-তিয়্যার আমাদের সামনেই থাকতেন, তাঁর সঙ্গেও পরিচয় হয়েছিলো। নিজস্ব মতামত বলে কিছুই ছিলো না আলিজোর।—এমন কি ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো নাৎসীবাহিনী যখন ফ্রান্সের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো সেই দুর্দিনেও তিনি ছিলেন নির্বিকার।—এই হলো তাঁর চরিত্র।

ফ্রান্সে সেই সময় দু'জন সাহিত্যিকের সঙ্গে আলাপ হয়। দু'জনকেই আমার ভালো লেগেছিলো। এঁরা হলেন পল্‌ ইলুয়্যার ও এ্যারাগ্যোঁ। এঁদের দু'জনের লেখাই বেশ সহজ সরল, তবে প্রাণোচ্ছল আবেগে ভরা। কিন্তু তারই সঙ্গে মিশে থাকতো ঐতিহাসিক নীতিবোধ। আমার অনেকটা সময় কাটতো পল্‌ ইলুয়্যারের সঙ্গে গল্প করে। সময় নষ্ট করায় কবিদের বিকল্প মেলা ভার। পলের সঙ্গে গল্প করতে বসলে দিন-রাত্রির হিসাব থাকতো না; আর মনে আসতো না আমাদের আলোচ্য বিষয়ের কোনো গুরুত্ব আছে কি নেই।

পল্‌ ছিলেন চতুরতা-জ্ঞান আর অতিরিক্ত তীব্রতার একটি পরমাণু যন্ত্র বিশেষ। পলের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার পর মনেই হতো না কেন বেরিয়ে এলাম আর এ্যারাগ্যোঁর বাড়ি থেকে বেরোনোর পরে দেখতাম চিন্তার ভারে আমি পরিশ্রান্ত! এই দুই প্রতিভাবান সাহিত্যিকের বিপরীত চিন্তাধারা খুবই আকৃষ্ট করেছিলো আমাকে।

নেন্‌সি কুনারড্‌

পৃথিবীর সমস্ত কবির কাছে আহ্বান জানাচ্ছি—আজ স্পেনের দুর্ভাগা মানুষদের জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাঁদের পাশে এসে আপনারা দাঁড়ান।

এই পুস্তকটি প্রকাশকালে নেন্‌সি আমার সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন। প্যারি শহরের প্রান্তে তাঁরই বাগানবাড়িতে নিজস্ব একটা ছাপাখানা ছিলো তাঁর। রাত্রে তাঁর বাড়িতে যখন পেঁছিলাম তখন চাঁদের আলোর সঙ্গে মিশে তুষারকণারা এক অপরূপ দৃশ্যময় জগতের সৃষ্টি করেছে। ছাপাখানা সম্বন্ধে নেন্‌সির অভিজ্ঞতা ছিলো। এ্যারাগ্যোঁর কয়েকখানি গ্রন্থের অনুবাদ তিনি মুদ্রণ করেছিলেন। কিন্তু এ বিষয়ে আমি একেবারেই অনভিজ্ঞ। এই প্রথম আমি মুদ্রাকর হিসাবে আমাদের বইতে কাজ করতে গিয়ে কখনো p-কে d, কখনো d-কে p করলাম। Parpados (আঁখিপল্লব)-কে করলাম dardapos এবং এর জন্য বহুদিন নেন্‌সি কৌতুকচ্ছলে আমায় Mr.

dardapos বলে ডাকতেন। যাই হোক, এইভাবেই আমাদের পুস্তকটি প্রকাশিত হলো। এবং এক অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তার মধ্যে পরে আরো পাঁচ-ছ'টি সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছিলো বইটির। এই বইখানিতে গনজালেজ তুনোন্, আলবার্তি ছাড়াও অডেন স্পেন্ডার প্রভৃতি বহু কবিরই রচনা স্থান পেয়েছিলো।

মাঝে মাঝে কোটের বোতামে ফুল গুঁজে ইংলণ্ড থেকে ফুলবাবু সব কবিরা আসতেন এবং স্পেনের গৃহবিপ্লবের উপর কিছু কবিতা লিখে আবার চলে যেতেন। স্পেনের গৃহবিপ্লবের সময় পৃথিবীর বহু কবি তাঁদের কবিতার অনেক উপকরণই খুঁজে পেয়েছিলেন এখানে। ফ্রাঙ্কো-বিরোধী কবিতাতে তখন প্রায় সারা য়ুরোপ ছেয়ে গিয়েছিলো। স্পেনের রাস্তায় রাস্তায় মুক্তিকামী মানুষের ঝরা রক্তে ছিলো এক চুম্বকী-শক্তি যা দিয়ে তৈরি হয়েছিলো কবিতা লেখার উপাদান। স্পেনের গৃহবিপ্লবে গণতন্ত্রের চরমতম পরাজয় ও নিষ্ঠুর একনায়কের আবির্ভাবের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পৃথিবীতে নেমে এসেছিলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যার ব্যাপক ভয়াবহতা কল্পনার বাইরে থাকা সত্বেও স্পেনের গৃহবিপ্লবে যতো কবিতার জন্ম হয়েছিলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তা হয়নি।

এর কিছুদিন পরেই আমায় চিলিতে ফিরতে হয়। এক বুল-ফাইটারকে বিয়ে করে নেন্সিও চিলিতে আসেন। শক্তিমান বুল-ফাইটার ষাঁড়টিকেও সঙ্গে এনেছিলেন তাঁরা। সান্তিয়াগোতে এদের রেখে বুল-ফাইটার মহোদয় মাংসের ব্যবসা করার জন্য অনির্দেশের পথে রওনা হলেন। কিন্তু আমার বিত্তবান ইংরেজ বান্ধবীটি সহজে ছাড়বার পাত্রী নন্। এবার তিনি চিলির এক কবিকে বিয়ে করলেন—যাঁর কবিতায় প্রতিভা ছিলো, কিন্তু ছিলো না কোনো ধার। অতি মাত্রায় মদ্যপ এই কবিটি রাতে ঘরে ফিরে প্রায়ই নেন্সিকে মারধোর করতেন এবং এই মারধোরের ফলে ভদ্রমহিলাকে প্রায়শঃই বড়সড়ো কালো চশমা পরতে হতো বাইরে বেরোবার সময়ে আঘাতপ্রাপ্ত চোখের কালো দাগ ঢাকতে।

অপরিমেয় ধৈর্যশীলা এবং ব্যথাতুরা নেন্সির মতো মহিলা আমি কখনও দেখিনি। ইংলণ্ডের বিশিষ্ট ধনীর দুলালী লেডি কুনারডের কন্যা এই নেন্সি ১৯৩০ সালের কোনো এক সময়ে সারা ইংলণ্ডকে চমকে দিয়ে এক নিগ্রোর সঙ্গে দেশ ছেড়েছিলেন। স্যাভয় হোটেলে জাজ্-সঙ্গীত গাইতেন সেই নিগ্রোটি।

সকালে উঠে লেডি কুনারড্ যখন দেখলেন তাঁর কন্যার খালি বিছানার উপর একখানি চিঠি, ক্রোধে আত্মহারা হয়ে তিনি ছুটলেন আইনজ্ঞের কাছে।—মেয়েকে সমস্ত সম্পত্তি আর মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করতে। কালো ভবিষ্যৎ মাথায় নিয়ে মেয়ে তখন তার নিগ্রো-প্রেমিকের হাত ধরে পৃথিবীর পথে পা বাড়িয়েছেন। উদ্দেশ্যহীনভাবে যখন তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন তখনই আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হলো। তাঁর কাছেই শুনেছি লেডি কুনারডের বিশ্রামকক্ষে জর্জ মুর (কথিত আছে ইনিই নাকি নেন্সির আসল পিতা) স্যার টমাস বীচান, যুবক আলডুস হাক্সলি, ডিউক অব উইণ্ডসর প্রভৃতি নামী ব্যক্তিরা সান্ধ্য-মজলিসে জমায়েত হতেন।

নেন্সি কুনারড্ বেশ সজোরেই আঘাত করেছিলেন উদ্ধত ইংরেজ সমাজের উপর। মা যে বছর বঞ্চিত করলেন ওঁকে সেই বছরেরই ডিসেম্বর মাসে সমগ্র উদ্ধত—

অভিজাত ইংরেজ সমাজকে তিনি উপহার দিলেন একটি পুস্তক—'নিগ্রো মানুষ ও শ্বেতাঙ্গিনী মহিলা'। এমন বিস্ফোরক রচনা খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়। কালো মানুষের সমর্থনে নেন্‌সির লেখা এই বইটি লেডি কুনারড্ আর তাঁদের উদ্ধত-অভিজাত ইংরেজ সমাজের মাথায় কুড়ুলের মতো আঘাত হেনেছিলো। সবটা আমার মনে নেই, তবে বইয়ের একটি অংশকে আমি এখনও মনে রেখেছি, সেটা হচ্ছেঃ মনে করো, তুমি তোমার 'লেডি' উপাধিসহ তোমার অন্যান্য লোকেদের সঙ্গে তোমাদের চেয়েও শক্তিশালী কোনো উপজাতির দ্বারা অপহৃত হলে তারপর তোমাদেরকে শৃঙ্খলিত করে চাবুকের আঘাত করতে করতে জাহাজে চাপিয়ে ইংলণ্ড থেকে বহুদূরে কোথাও নিয়ে গিয়ে দাস বা ভৃত্য হিসাবে তোমাদের বিক্রি করা হলো। তখন তোমার এই শ্বেতচর্মের ঔদ্ধত্য আর শ্বেত জাতির গৌরব কোথায় থাকবে? পৃথিবীর কালো মানুষেরা ঠিক এই ব্যবহার—এমন কি এর চেয়েও অনেক বেশি নির্মম ব্যবহার তোমাদের কাছ থেকে পেয়েছেন। শতাব্দীর এই অত্যাচারের পরেও এই কালো মানুষরা আজও পৃথিবীর সবচেয়ে সুদৃঢ় সৌষ্ঠবে ভরা ক্রীড়াবিদ্, এবং তাঁদের সঙ্গীত আজ সমস্ত পৃথিবীতে নতুন জগতের সৃষ্টি করেছে। তুমি বা তোমাদের ওই অহংকারী শ্বেতাঙ্গরা এই অবস্থায় থাকলে কোনোদিন কি কিছু সৃষ্টি করতে পারতে? তাহলে বলো—কারা বড়ো, সত্যিকার ভালো কারা?—এইভাবেই তিরিশ পাতার সেই বইটি রচিত হয়েছিলো।

এরপর নেন্‌সি কুনারড্ আর ইংলণ্ডে ফিরে যেতে পারেন নি। কিন্তু বরাবরই কালো মানুষদের জন্য অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন।—কখনো ইথিওপিয়ায়, কখনও আমেরিকায়। আমেরিকায় যখন কালো মানুষদের ঘাড়ে মিথ্যা বোঝা চাপিয়ে তাঁদের উপর অত্যাচার হচ্ছে, তাঁদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হচ্ছে নেন্‌সি তখন ছুটে গেছেন সেখানে আর গণতান্ত্রিক উত্তর আমেরিকা পরের দিনই জাহাজে চাপিয়ে তাঁকে ফেরৎ পাঠিয়েছে।

বন্ধু নেন্‌সি কুনারড্ ১৯৬৯-এ প্যারিসে মারা গেলেন। মৃত্যু যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় তিনি হোটেলের সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে আসেন, তারপর তাঁর সুন্দর আকাশী নীল চোখ দুটি চিরদিনের জন্য বন্ধ করে হোটেলের মেঝেতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। কংকালসার নেন্‌সির মৃত্যু-সময়ে তাঁর ওজন ছিলো মাত্র পঁয়ত্রিশ কিলো। জীবন ও দেহের সবটুকুই তিনি নিঃশেষ করেছিলেন অন্যায় আর অবিচারের বিরুদ্ধে লড়াই করে। পুরস্কার?—হ্যাঁ, পুরস্কারে তিনি পেয়েছেন নিঃসঙ্গ একাকীত্ব আর দুর্দশাগ্রস্ত মৃত্যু।

মাদ্রিদের এক মহাসভা

স্পেনের গৃহযুদ্ধের চরম অবস্থা ১৯৩৬এ। স্পেনের মানুষের প্রবল প্রতিরোধে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন পৃথিবীর নানাস্থান থেকে স্বেচ্ছাসেবী সৈন্যবাহিনী। মাদ্রিদে এঁদের দেখতে অপূর্ব লাগতো—রঙ, বয়স, চুলের বাহার, ভাষার অপরূপ সমন্বয়—এক কথায় সব মিলিয়ে এঁদের দেখে আনন্দ পেতাম।

১৯৩৭ এর কথা। প্যারিসে আমরা তখন বিশ্বব্যাপী ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলন ও সভা করার নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। ঠিক হলো মাদ্রিদেই এই মহাসভা ডাকা হবে। এই সময়েই এ্যারাগোঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তাঁর নিরলস পরিশ্রম আর সাংগঠনিক ক্ষমতায় মুগ্ধ হলাম। ছোট্ট অফিসঘরটিতে বসে সারা সময় কি কঠিন পরিশ্রমই না তিনি করতেন! প্রত্যেকটি চিঠি তিনি নিজেই লিখতেন এবং এর উপরে ছিলো ফরাসী সাহিত্যে তাঁর অতুলনীয় দান।

দূতের চাকরি যাবার পর আমার যখন কপর্দকহীন অবস্থা, এ্যারাগোঁর প্রচেষ্টায় তখন এক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে মাসিক চারশো ফ্রাঙ্কের মাইনেয় একটা কাজ পেলাম।

আমার স্ত্রী দ্যালিয়া দ্য ক্যারিলকে লোকে বলতো জমিদার গিন্নী। কিন্তু তিনি ছিলেন আমার চেয়েও দরিদ্র। ছোট্ট একটি হোটেলে প্রায় অর্ধাহারে তখন দিন কাটছে আমাদের। এর মধ্যে ফ্যাসি-বিরোধী সাহিত্যিক, কবি ও সংগ্রামীদের মহাসভার দিন যতই এগিয়ে আসতে লাগলো ততই এক অদ্ভুত উত্তেজনায় মনটা ভরে উঠতে লাগলো। একের পর এক অমূল্য সব চিঠি এসে পৌঁছতে লাগলো আমাদের অফিসে। ইয়েটস্, সেলমা, লেগারলফ—সবাই স্বাগত জানিয়ে লিখলেনঃ বার্ধক্য হেতু যদিও তাঁরা মাদ্রিদের মহাসভায় হাজির থাকতে পারবেন না তবু এই আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন আছে তাঁদের।

সাধারণতঃ এই সব কাজে সুনাম ছিলো আমার। কিন্তু তবুও কেন জানি না স্পেন সরকারের কাছ থেকে আসা চিঠিটার দিকে সেদিন হতবুদ্ধি হয়ে তাকিয়ে থাকতে হয়েছিলো আমাকে। স্পেন সরকারের সেই আমন্ত্রণ-পত্রের সঙ্গে তাঁরা বেশ মোটা অঙ্কের ব্যাংক-ড্রাফট্ পাঠিয়েছিলেন—মহাসভায় যোগদানেচ্ছু প্রতিনিধিদের যাওয়া-আসা, থাকা-খাওয়া ইত্যাদির জন্য। ভেবে পেলাম না অত টাকা আমরা কি করবো!

আলবার্তিকে বললাম, যেহেতু আমার নামে এই টাকা এসেছে, সমস্ত টাকাই আমি এই প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাই।

শুনে আলবার্তি বললেন, সত্যিই তুমি একটি মুর্খ! দূতের চাকরিটা তোমার গেছে, তোমার পরণে ছেঁড়া জামা-প্যান্ট, জুতোয় তালির পর তালি—এর পরেও সমস্ত টাকা হাতছাড়া করাটা ঠিক কাজ হবে? ঐ টাকা থেকে অন্ততঃ হাজারখানেক তোমার নিজের জন্য রাখা উচিত।

পরে অবশ্য আলবার্তি আমাকে একজোড়া জুতো কিনে দিয়েছিলেন।

আলবার্তির সঙ্গে আলোচনার কয়েকঘণ্টা পরেই আমরা প্যারিসের যন্ত্রণাদায়ক ভিসা সংগ্রহ করে মাদ্রিদ রওনা হলাম। আমার স্ত্রী দ্যালিয়া ও গনজালেসের উপর প্রতিনিধি-দের দায়িত্ব দেওয়া হলো।

নরওয়েজিয়ান, ইতালিয়ান, আর্জেন্টিনিয়ান প্রতিনিধির সঙ্গে মেক্সিকো থেকে আমাদের সঙ্গী হলেন তরুণ কবি অক্টাভিয়ো পাজ্। যদিও তখনও পর্যন্ত তাঁর মাত্র একখানি গ্রন্থই প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু ঐ একটি বই পড়েই তাঁর রচনায় ভবিষ্যতের ইঙ্গিত লক্ষ্য করেছিলাম। তাঁর সঙ্গ পেয়ে গর্বিত হলাম।

যাত্রাকালে পুরোনো বন্ধু সিজার ভেল্লিজো মুখটা গোমড়া করে আমার কাছে এসে বললেন যে, তাঁর স্ত্রীর জন্য টিকিট যোগাড় করতে পারেন নি তিনি এখনও। শুনেই

তাঁর টিকিটের ব্যবস্থা করলাম। পরে অবশ্য বন্ধু-পত্নীটি আমাদের কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছিলেন। সিজারের গোমড়াভাবটা কিন্তু রয়েই গিয়েছিলো, কয়েক মাস বাদে অবশ্য এর কারণটা আমরা খুঁজে পেয়েছিলাম।

চিলি থেকে এসেছিলেন ভিনসেন্তি হুইদোব্রো। ভিনসেন্তর সঙ্গে আমার বাক্যালাপ প্রায় ছিলো না বললেই চলে। সিজারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এই ভিনসেন্তি আমার সম্পর্কে অনেক কথাই বলেছিলেন সিজারকে। একদিন উত্তেজনার মুহূর্তে সব কথাই বেরিয়ে পড়লো সিজারের মুখ দিয়ে।

সেদিনের স্পেন আমাদের প্রায় সকলের কাছেই এক প্রহেলিকা বিশেষ।—ঐতিহাসিক মুহূর্তে প্রবেশের এক চাবিকাঠি যেন। প্যারি শহরের ষ্টেশন থেকে বিভিন্ন দেশের এ'তো কবি আর সাহিত্যিক-পূর্ণ কোনো ট্রেন এর আগে কখনো কোথাও যাত্রা করেনি! ট্রেনের ভিতরে আমাদের মধ্যে বিশেষভাবে পরিচিত অল্প পরিচিত ছাড়াও অনেক অপরিচিতও ছিলেন। অনেকে সারা রাত জেগে কাটালেন, অনেকেই আবার খানিক খানিক ঘুমিয়ে নিলেন।

সীমান্তে এসে ট্রেনটি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলো। ইতিমধ্যে নাকি ভিনসেন্তির স্যুটকেশটি হারিয়ে গেছে! তিনি দলনেতা আদ্রে ম্যালরোর কাছে অভিযোগ জানালেন। আদ্রে ম্যালরো ক্ষিপ্তস্বরে বলে উঠলেন, যাও যাও, এসব অভিযোগের সময় এখন নয়, খুঁজে দেখ কোথায় ফেলেছো।

জীবন অতি আশ্চর্য বস্তু। হায় ভিনসেন্তি! তুমি তো আমারই স্বদেশবাসী। আমার বিরুদ্ধে কতই না অকথ্য মিথ্যা বদনাম করে গেলে!

ট্রেন আবার চলতে শুরু করলো, স্পেনের সীমানা ছেড়ে সেখানকার গ্রাম্য প্রান্তরে যখন ট্রেনটি প্রবেশ করলো তখন কয়েকজন লাতিন আমেরিকান বন্ধুকে বললাম, যাও —দেখ, ভিনসেন্তি কেমন আছেন, ওঁকে একটু সান্ত্বনা দিয়ে এসো।

প্রায় কুড়ি মিনিটের মধ্যে বন্ধুরা ফিরে এসে জানালেন যে, ভিনসেন্তি বলেছেন—স্যুটকেশের কথা ছাড়ো, ওটা এমন কিছু জরুরী বিষয় নয়। আসল কথাটা এই যে, শিকাগো, বার্লিন, কোপেন হাগেন ও প্রাহা-র বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাবলোকে তো এতো সম্মানদান করলো, কিন্তু তবু সে তার নিজের দেশে কোনো সম্মান পেলো না কেন?—উত্তর দাও?—আসলে তার কবিতা এত নীচুস্তরের যে, চিলিতে কেউ পড়ে না। —এমন কি কোনোরকম বক্তৃতা দিতেও কোনো সময় তাকে আমন্ত্রণ জানানো হয় না সেখানে।

কথাগুলো শুনে হেসেছিলাম। হায়রে আমার স্বদেশবাসী কবি ভিনসেন্তি!

অবশেষে মাদ্রিদে পৌঁছলাম। এখানে পৌঁছে অনেকেই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা নিয়ে আর সেই সুযোগে আমি বেরিয়ে পড়লাম আমার ফেলে যাওয়া 'ফুলকুঞ্জ' নামের পুরোনো বাড়িটি আবার দেখার জন্য। বাড়িটিতে আমার বইপত্র, পাণ্ডুলিপি ইত্যাদি অনেক কিছুই রেখে চলে যেতে হয়েছিলো। জেনারেলিসিমো ফ্রাঙ্কোর সেনাবাহিনী সেখানে পেঁৗছে সব কিছু ওলট-পালট করে দিয়ে গেছে।

কবি বন্ধু মিগুয়েল হারনান্দিজ প্রতিরোধ-বাহিনীর পোশাক পরে হাতে রাইফেল নিয়ে একখানি সামরিক গাড়িতে করে আমাকে নিয়ে গেলেন সেই বাড়িটিতে। বললেন—তোমার বইপত্র, পাণ্ডুলিপি এবং আর যা কিছু নেবার আছে নিয়ে এসো।

বাড়িটিতে প্রবেশ করে উঠে গেলাম পাঁচতলার ঘরটিতে। এই ঘরেই থাকতাম। দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে দেওয়ালে একটু ধাক্কা দিতেই বইগুলো সব মাটিতে ছড়িয়ে পড়লো। জঞ্জাল আর ধ্বংসস্তূপের ভিতর থেকে সব কিছু উদ্ধার করা দুঃসাধ্য। অবাক লাগলো এই দেখে যে, আমার কাছে যে সকল জিনিস অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হতো, সেই সকল জিনিসগুলোই লুট হয়েছে! দেখলাম—আমার কন্সালের পোশাক, পলিনেশিয়ার মুখোস আর তরবারির কিছু কিছু ছেঁড়া আর ভাঙা অংশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে এখানে ওখানে।

বললাম, জানো মিগুয়েল—যুদ্ধটা হচ্ছে স্বপ্নের মতোই খেয়ালী। কথাগুলো শুনতে শুনতেই তিনি জঞ্জাল হাতড়ে কয়েকটি পাণ্ডুলিপি তুলে এনে আমার হাতে দিলেন। কিন্তু এখানকার এই বিশৃংখলা আমার জীবনের শেষ দরজাটিও রুদ্ধ করে দিলো। মিগুয়েলকে বললাম, এখানকার কোনো কিছুই আমি সঙ্গে নিয়ে যাবো না।

তিনি অবাক হলেন, কিছুই না—একখানা বইও নয় ?

—না, একটা বই পর্যন্তও নয় !

খালি গাড়ি নিয়েই সেদিন ফিরে এসেছিলাম।

মুখোস আর যুদ্ধ

দুই বিপরীত যুদ্ধ-সীমানার মাঝে আমার বাড়ি। একদিক থেকে এগিয়ে আসছে মুর আর ইতালিয়ান সৈন্যরা, অপর দিক থেকে মাদ্রিদকে রক্ষা করতে প্রতিরোধ-বাহিনীর সেনারা এগিয়ে আসছেন—নিহত দেহগুলি মাটিতে শায়িত। গোলন্দাজবাহিনীর গোলার আঘাতে আমার ঘরের দেওয়াল বিধ্বস্ত—জানলাগুলি টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে রয়েছে। মাটিতে আমার বইয়ের স্তূপের মধ্যে বোমার টুকরো দেখতে পেলাম। কিন্তু মুখোসগুলির একটিও নেই। শ্যাম, বালি, সুমাত্রা, মালয়, জাভা—বিভিন্ন স্থান থেকে সংগৃহীত সব মুখোস—কোনোটা ছাই রঙের, কোনোটা গাঢ় লাল। কোনোটার রুপোলি রঙের জোড়া ভ্রু-র নীচে দৈত্যের মতোই নীল দু'টি চোখ—কোনো মুখ আবার চিন্তামগ্ন। মুখোসগুলি ছিলো আমার স্মৃতিরক্ষার একমাত্র নিদর্শন—যা প্রমাণ করতো আমার সঙ্গে প্রাচ্যের সম্বন্ধকে। সেই প্রাচ্য—যে প্রাচ্যের দরজায় আমি আমার যৌবনের প্রারম্ভে একদিন উপস্থিত হয়েছিলাম। যে প্রাচ্য তার চায়ের গন্ধ, গোময়, আফিম্ আর ঘাসের গন্ধ—রাস্তায় পচা ফলের গন্ধ আর যুঁই ফুলের তীব্র মধুর গন্ধ দিয়ে আমায় স্বাগত জানিয়েছিলো। সেই মুখোস—যে মুখোসের দিকে তাকালে মন্দিরের দ্বারপ্রান্তে নৃত্যরতা দেবদাসীদের কথা মনে পড়তো। পৌরাণিক ভাষার রঙে রাঙানো কাঠের টুক্রো, ফুলের উপকথার অবশিষ্টাংশ—যা আকাশে আঁকতো স্বপ্ন, রীতিনীতি—দৈত্যদানা আর রহস্য—যার সবটুকুই আমার আমেরিকান স্বভাবের সঙ্গে ছিলো বেমানান্। হয়তো আমার জানলায় এই মুখোস পরে প্রতিরোধ-বাহিনীর কোনো সৈন্য মুর সৈন্যদের ভয় দেখিয়েছিলো। অনেক মুখোসই রক্তের দাগ মেখে টুক্রো টুক্রো হয়ে ছড়িয়ে

পড়েছিলো মাটিতে। কয়েকটা মুখোসের কিছু টুক্‌রো বুলেটাঘাতে ছিট্‌কে পড়েছিলো পাঁচতালার জান্‌লা দিয়ে নীচে—রাস্তার উপরে।

ফ্রাঙ্কোর আগুয়ান সৈন্যরা সেই মুখোসগুলর সামনে এসে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে পড়লো, আর অশিক্ষিত ভাড়াটে গুণ্ডার দল মুখোসের উপর দিয়েই চলে গেল!

আমার সংগৃহীত প্রাচ্যের সেই তিরিশটি মুখোস যেন নাচতে নাচতে উঠে দাঁড়ালো—এই তাদের শেষ নাচ, মরণ-নাচ! কয়েকটি মুহূর্ত সাময়িক বিরতি। অবস্থান ও অবস্থার পরিবর্তন। মাটিতে জঞ্জাল। আমার মাদুরে লেগে থাকা রক্তের দাগের দিকে তাকিয়ে রয়েছি আর দেখছি গুলিতে ফুটো হওয়া দেওয়ালের মধ্য দিয়ে পুরোনো দিনের প্রাসাদ—সমতলভূমি, কলেজের ছাত্রাবাস ছাড়িয়ে আমার প্রসারিত দৃষ্টির সামনে সেদিনের স্পেন শূন্যতায় ভরা। মনে হলো বাড়ি থেকে শেষ অতিথিটিও বিদায় নিলেন।

এই যুদ্ধ—এই জয়োল্লাস, এই জীবন, এই মৃত্যু—এই মুখোস, অথবা মুখোস ছাড়াই সব আজ সমাপ্ত, একটি বনভোজনের পর যেন সম্পূর্ণ নীরবতা। যে মুখোস পড়ে থাকলো, যে মুখোস চলে গেল তারই মধ্য দিয়ে আমার প্রিয় স্পেনও আমার জীবন থেকে বেরিয়ে গেল।

৬

নিহত যোদ্ধাদের খোঁজে

একটি রাস্তা খুঁজে পেয়েছি

যদিও স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় থেকেই আমি নিজেকে সাম্যবাদী বলে ভাবতে শুরু করেছিলাম তবু চিলির কম্যুনিস্ট পার্টির সক্রিয় সভ্য আমি অনেককাল পরে হয়েছিলাম। নানান কারণ ও ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সাম্যবাদের উপর আমার একটি দ্বিধাহীন আস্থা জন্ম নিয়েছিলো।

নীটশেপন্থী কবি বন্ধু লিও ফেলিপ্ যদিও খুবই আকর্ষণীয় ব্যক্তি ছিলেন তবু তাঁর নৈরাজ্যবাদী ঝোঁক আর হাস্যকর বৈপ্লবিক মনোভাব এক উচ্ছৃঙ্খল পরিবেশের সৃষ্টি করেছিলো। গৃহযুদ্ধের সময় তিনি খুব সহজেই আইবেরিয়ান এনার্কিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়ে প্রায়শঃই সব জায়গায় প্রাচীনতা এবং রীতিনীতি বিরোধী বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতেন। তাঁর গরম গরম বক্তৃতায় আগাছার মতো এনার্কিস্ট পার্টি মাদ্রিদ শহরের চারিদিকে গজিয়ে উঠতে লাগলো। সীমান্তে তখন গৃহযুদ্ধের চরমাবস্থা। এই বে-আইনি এনার্কিস্ট সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁদের মাথাভর্তি লম্বা লম্বা চুল, মুখভর্তি দাড়ি নিয়ে গলায় বুলেটের মালা আর হাতে বুলেটের চুড়ী পরে স্পেনের

মৃত্যু-আসরে নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। নিজেদের গাড়ির একপাশে লাল আর অন্যপাশে হলদে রং লাগিয়ে এঁরা ঘুরে বেড়াতেন পথে পথে। আমি এমন অনেককেই দেখছি যাঁদের জুতোগুলিও ঐভাবে রং করা হয়েছে—একদিকে লাল অপরদিকে কালো।—এঁদের কাছে সব সময়েই ছুরি, রিভলবার, রাইফেল আর হাত-বোমা মজুত থাকতো। এঁদের আসল কাজ ছিলো ভয়ার্ত মানুষের কাছ থেকে অর্থ আদায় করা। সেই সঙ্গে অলংকার ঘড়ি ইত্যাদি ছিনতাই-এর কাজও করতেন এঁরা।

একদিন ফেলিপ এক সভায় নৈরাজ্যবাদী বক্তৃতা দিয়ে ফেরার পথে একটি কাফেতে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হলো। মাথায় স্প্যানিশ টুপি, ছোটো ছোটো দাড়ি দিয়ে ঢাকা মুখ—বেশ মানিয়েছিলো তাঁকে। দু'জনে গল্প করতে করতে কাফে থেকে বেরিয়ে রাস্তার উপরে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকজন এনার্কিস্ট যুবকের সঙ্গে আচমকা ধাক্কা লাগলো ফেলিপের।

শুরু হয়ে গেল কথা কাটাকাটি। যুবকগুলি ফেলিপকে টানতে টানতে নিয়ে গেল এক বধ্যভূমিতে। এই বধ্যভূমিটি আমার বাড়ির পাশেই। জানলা দিয়ে এঁদের স্বারা সংঘটিত অনেক হত্যালীলাই আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি এর আগে। যাই হোক, এই সময় প্রতিরোধবাহিনীর সশস্ত্র সৈন্যদের দেখতে পেয়ে তাঁদের শরণাপন্ন হলাম। ফেলিপের পরিচয় জানাতে সে রাতে তিনি রক্ষা পেলেন।

আদর্শের এই বিশৃঙ্খলতা এবং মূল্যহীন ধ্বংসোন্মত্ততা আমার চিন্তার বিষয় হয়ে উঠেছিল। একজন অস্ট্রিয়ান এনার্কিস্টের সম্পর্কে শুনেছিলাম তিনি নাকি তাঁর বিরোধীদের বেড়াতে নিয়ে যেতেন এবং মনোমত জায়গায় তাঁদের প্রাণনাশ পর্ব সমাধা করতেন। প্রাণনাশের আগে তিনি তাঁর শিকারকে প্রশ্ন করতেন, 'তোমার কি কখনও মাথাব্যথা হয়নি?'

হতভাগ্য উত্তরে বলতেন, 'নিশ্চয়ই—কখনও কখনও হয়েছে বইকি।'

—'আচ্ছা, আমার কাছে এই ব্যথার যে মহৌষধ আছে আমি তা তোমাকে দিচ্ছি।' এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সেই এনার্কিস্ট তাঁর রিভলবারটা হতভাগ্যের কপালে বসিয়ে গুলি চালাতেন।

এই ধরনের অসংখ্য এনার্কিস্ট মাদ্রিদ শহরের চারপাশে সদা সর্বদা ঘুরে বেড়াতো। এর ফলে বুঝেছিলাম কম্যুনিস্টরাই একমাত্র সুসংগঠিত, সুসংবদ্ধ আর আদর্শবাদী। এই কম্যুনিস্ট দলের সশস্ত্র সেনাবাহিনীই ফ্রাংকোর ইতালিয়ান, মুর আর জার্মান সৈন্যদের সঙ্গে শেষাবধি লড়াই করেছিলেন। এই কম্যুনিস্টরাই সুশৃংখল প্রতিরোধ বাহিনী গড়তে সক্ষম হয়েছিলেন। কাজেই আমার সামনে তখন এই প্রশ্নই এসে উপস্থিত হয়েছিলো—কোন্ পথটা ঠিক! ইতিহাসের সেই বিষণ্ণ মুহূর্তে, অন্ধকার আর আলোর মধ্যে সঠিক পথটাই খুঁজে পেলাম—সক্রিয় সভ্য হিসাবে যোগ দিলাম কম্যুনিস্ট পার্টিতে এবং এর ফলে আমাকে কোনোদিন কোনো আক্ষেপ করতে হয়নি, পথ হারানোর দ্বন্দ্বে কোনদিনও আমার মন দ্বিধাগ্রস্ত হয়নি।

শান্তির জন্যই কবিতা। আটা থেকে যেমন রুটী তৈরি হয়, তেমনি শান্তি থেকেই জন্ম হয় কবিতার। ঘরে আগুন লাগানোর দল যুদ্ধ ও দাঙ্গাবাজেরা, আর নেকড়ের দল কবিকে পুড়িয়ে মারার জন্য পৃথিবীর রাস্তায় খুঁজে বেড়ায়। এই অত্যাচারীদের অত্যাচারের অন্যতম নিদর্শন অন্ধকার বিষাদাচ্ছন্ন এক উদ্যানের মধ্যে তরবারী-বিদ্ধ পুশ্‌কিনের নিষ্প্রাণ দেহটি। যুদ্ধে অগ্নিময় গোলা পিটোফির দেহকে প্রাণহীন করেছিলো।

যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়েই বায়রনকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিলো গ্রীসে। স্পেনের ফ্যাসিস্টরা তাদের যুদ্ধ শুরু করেছিলো স্পেনেরই মহত্তম কবি ফেদেরিকো লোর্‌কাকে খুন করে।

এই সবের মধ্যেই র‍্যাফেল আলবার্তি কেমন করে যেন বেঁচে গিয়েছিলেন, যদিও বহুবার বহুভাবে তাঁকে মারার চক্রান্ত করা হয়েছিলো। চক্রান্ত করা হয়েছিলো গ্রানাদায়, বাদাদোজে—এমনিভাবে নানান্ জায়গায় ফাঁদ পাতা হয়েছিলো। এমন কি তাঁর গ্রামের বাড়িতেও হানা দিয়েছিলো নেক্‌ড়ের দল, কিন্তু সফল হতে পারেনি তারা। বিড়ালের জীবনের মতই কঠিন প্রাণ প্রাচুর্যে পূর্ণ কবিতারও মৃত্যু নেই। কবিতাকে হয়রান করে রাস্তায় টেনে নিয়ে আসে—থুথু ছিটিয়ে মস্করা করে—নির্বাসনে পাঠায়—জেলে ভরে রাখে—সীসের গুলি চালিয়ে জখম করে—তবু সে মরে না, সে তার সুন্দর মুখে দিগন্তজোড়া নবান্নের হাসি নিয়ে বেঁচে থাকে।

মাদ্রিদের রাস্তায় চলতে দেখেছি আলবার্তিকে। জনতার সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করতেও দেখেছি তাঁকে। যদিও স্পেনে গৃহযুদ্ধের পদধ্বনি তখনও শোনা যায়নি তবু সেই আসন্ন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে দেখেছি আলবার্তিকে। তাঁর জন্ম হয়েছিলো দক্ষিণে—সমুদ্রে সঙ্গীতের মধ্যে। জন্ম থেকেই তিনি যে একজন কবি এটা কোনোদিন উপলব্ধি করেন নি। কিন্তু শুধু স্পেন নয়, সারা বিশ্ব তাঁকে একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে স্বীকার করে নিয়েছে। কারুকার্যখচিত কাচের সুরাপাত্রের মতই ছিলো আলবার্তির কবিতা, শীতের দিনে ফোটা লাল-গোলাপের মতই ছিলো তাঁর কবিতার মাধুর্য। সেই গোলাপের ঔজ্জ্বল্যের আভা ছড়িয়ে পড়তো স্পেনের সেই সব রাস্তায় যেখানে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে নিরন্তর লড়াই চলছিলো। বীরত্ব আর জয়ের মহাকাব্য রচনা করে আলবার্তি প্রতিটি ছাউনিতে প্রতিটি ছাত্রাবাসে গিয়ে সেই সব কবিতা পড়ে মানুষকে উদ্‌বুদ্ধ করতে লাগলেন ফ্যাসিবাদ আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে। তাঁর রচিত গানগুলি যুদ্ধের উত্তপ্ত আগুনের মাঝখানে ডানা মেলে ঘুরে বেড়াতো। সে গান একদিন এই উপগ্রহকেও ছাড়িয়ে এগোতে পেরেছিলো অসীম আকাশের বুকে। পরিপূর্ণ একজন কবি হিসাবে মানব ইতিহাসের এই সংকটময় সন্ধিক্ষণে উদ্দীপনাময় কবিতার গুরুত্ব তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। এই সময়ে তাকে মায়াকোভস্কির মতো মনে হতো। নিপীড়িত মানুষের কল্যাণসাধন করতে হলে কবিতার মধ্যে যে সকল

গুণ থাকা একান্ত প্রয়োজন তার সব কিছুই ছিলো আলবার্তি'র কবিতায়। কবিতা যে শুধুমাত্র ধ্বনি বা সঙ্গীত নয়, তাঁর কবিতায় তা প্রমাণিত—মানব-সঙ্গীতে ভরপুর তাঁর কবিতায় ছিলো চিরদিনের—চিরকালের সঙ্গীত।

চিলির নাৎসাবাহিনী

জাহাজের তৃতীয় শ্রেণীতে চড়ে আবার একবার ফিরে এলাম নিজের দেশে। লাতিন আমেরিকায় তেমন প্রসিদ্ধ কোনো সাহিত্যিক তখন ছিলেন না—সেলিনি, রচোল বা এজরা পাউণ্ডের সঙ্গে যাঁদের তুলনা করা চলে। অবশ্য এঁরা সকলেই পরে বিশ্বাসঘাতকতা করে ফ্যাসিবাদের ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছিলেন। হিটলারের সমর্থনপুষ্ট এক ফ্যাসিস্ট আন্দোলনের জন্ম ঘটেছিলো তখন। ঝটিকাবাহিনী সবে গড়ে উঠছিলো। ফ্যাসিস্ট কায়দায় হাত তুলে পরস্পর পরস্পরকে অভিবাদনও জানাতেন। খুব নগণ্য বা সংখ্যালঘু এঁরা নয়। কম্যুনিজমকে যে কোনোভাবে রুখবার জন্য সব সময়েই প্রস্তুত থাকতেন জমিদার আর ভূস্বামীর দল। চিলিয়ান, ব্রাজিলিয়ান আর জার্মানরা মেক্সিকোতে খুব একটা কম ছিলেন না। হিটলারের আকস্মিক আবির্ভাব ও জার্মান জাতির আধিপত্যের অগ্রগতি এঁদেরও মোহগ্রস্ত করে তুলেছিলো। সেই সময়ে আমি অনেকবারই চিলির বিভিন্ন গ্রামে গিয়েছি। তখন সেখানকার গ্রামে গঞ্জে যে জিনিসটি আমার নজরে পড়তো তা হচ্ছে বিজয় গর্বে গর্বিত স্বস্তিক আঁকা হিটলারের পতাকাগুলি।

একবার এক গ্রামে আমায় অত্যন্ত অনিচ্ছা ও ঘৃণার সঙ্গে ফ্যুরারের ছবিকে অভিবাদন জানাতে হয়েছিলো। সেই গ্রামে শুধুমাত্র একটিই টেলিফোন ছিলো, তাও এক জার্মানের বাড়িতে। গৃহস্বামী তাঁর টেলিফোনটি হিটলারের একখানি ছবির কাছে এমনভাবে সাজিয়ে রেখেছিলেন যে, যখনই কেউ সেই ফোন ধরতে হাত বাড়াবে তখন আপনা আপনিই অভিবাদন জানানো হয়ে যাবে হিটলারকে। সেই সময়ে 'চিলির সূর্য' নামে একটি পত্রিকার সম্পাদনা করতাম। পত্রিকাটিতে বেশিরভাগই ফ্যাসিবিরোধী রচনা প্রকাশ করা হতো। হিটলার তখন একের পর এক দেশকে গ্রাস করে চলেছেন। আর হিটলার কর্তৃক নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত চিলির জাতীয় গ্রন্থাগারে হিটলার ও ফ্যাসিবাদের স্তুতিতে পূর্ণ জার্মান গ্রন্থ প্রচুর পরিমাণে দান করে চলেছেন। তাই 'চিলির সূর্য' পত্রিকাটির মাধ্যমে এর বিরোধিতা করে দেশবাসীকে অনুরোধ জানাতাম প্রকৃত জার্মান সাহিত্য পাঠের জন্য। এ সময়ে হিটলার-স্তুতি এবং ফ্যাসিবাদ সংক্রান্ত রচনা ছাড়া অন্যান্য সব রকমের সাহিত্য এদেশে নিষিদ্ধ করা হয়েছিলো হিটলারের নির্দেশেই। আমার জীবনের তখন এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় শুরু হয়েছিলো। মৃত্যুভয় দেখিয়ে বহু চিঠি আমার কাছে আসতো, আসতো সুন্দর কাগজে জড়ানো সুন্দর সুন্দর মোড়ক—যা খুললে দেখা যেতো সেগুলি কেবল অবাঞ্ছিতই নয়, নোংরামিতে পূর্ণ। একবার এমনই একটি মোড়ক খুলতে দেখলাম 'দারসিটরমার' নামে ইহুদী-বিরোধী অশ্লীল একখানি পত্রিকা। পত্রিকাটির সম্পাদক

ছিলেন জুলিয়াস স্ট্রাইখার। এই জুলিয়াসকে ন্যুরেমবার্গের বিচারে কয়েক বছর পরেই ঝোলানো হয়েছিলো ফাঁসিকাঠে।

সব সময়েই যে কেবল খারাপ জিনিস আমার হাতে বা আমাদের দপ্তরে আসতো তা নয়, মাঝে মাঝে ভালো জিনিসও পেতাম আমরা। হাইনরিখ হাইনে, টমাস মান, অ্যানা সিঘারঘ, অ্যালবার্ট আইনস্টাইন, আরনল্ড জুয়াইনো প্রভৃতি মনীষীদের গ্রন্থাদিও চুপি চুপি এসে পেঁছাতো। এই জাতীয় গ্রন্থের সংখ্যা যখন পাঁচশতাধিকে পেঁছালো তখন সেই গ্রন্থগুলি জাতীয় গ্রন্থাগারে দেবার মনস্থ করলাম। প্রথমে সফল হতে পারিনি, আমাদের জন্য জাতীয় গ্রন্থাগারের দ্বার তখন বন্ধ। কাজেই শোভাযাত্রা সহকারে বইগুলি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আমরা জমায়েত হলাম। আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্বে সভা করা হলো। শেষে যুদ্ধে আমরা জিতলাম, বইগুলি জাতীয় গ্রন্থাগারে স্থান পেলো।

ইস্লা নেগ্রা

এবার ঠিক করলাম আরো গভীর মনোযোগ সহকারে একান্তভাবেই কবিতার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করবো। 'কুড়িটি প্রেমের কবিতা'র গতানুগতিকতা এবং 'এই পৃথিবীর অধিবাসী'র ব্যথাতুর দুঃখবোধ আমার আর ভালো লাগছিলো না। কেবলই মনে হচ্ছিল মানুষকে—আমার দেশের মানুষকে আরও নতুন কিছু দিই। সমসাময়িক সাহিত্যে যেন প্রতিটি মানুষের মধ্যে মমত্ববোধের অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছিল। অথচ সমস্ত মানুষই এই মমত্ববোধের আশায় উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে ছিলো ভবিষ্যতের দিকে।

শুরু করলাম আমার লেখা 'চিলির সঙ্গীত'। কিন্তু লিখতে হলে নিভৃত কোনো জায়গা চাই। তাই খুঁজতে খুঁজতে নির্জন সমুদ্রোপকূলে ইস্লা নেগ্রায় একটি বাড়ি পেলাম। আমার স্বরচিত বইগুলির অর্থে বাড়িটি কেনা সম্ভব হলো না। শেষে একজন প্রকাশকের সাহায্যে বাড়িটি কিনলাম। এবার নিশ্চিন্ত মনে আরম্ভ করলাম লেখা। লেখার প্রধান বস্তু—দেশের ভূগোল, দেশবাসীর দৈনন্দিন জীবন অর্থাৎ তাদের বেঁচে থাকার সংগ্রামকে মূল হিসাবে বেছে নিলাম। ইস্লা নেগ্রার উত্তাল সমুদ্রতীরের নির্জন কুটীরে আমার সমস্ত অনুভূতি আর আশক্তি নিয়ে সাহিত্যের জগতে গান গেয়ে ওঠার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলো 'চিলির সঙ্গীত'।

স্পেনিয়ার্ডদের নিয়ে এসো

কিন্তু না, নির্জন কুটীর আমাকে ধরে রাখতে পারলো না বেশিদিন, বাইরের জগতে এগিয়ে আসতে হলো। স্পেনীয় উদ্বাস্তুদের ভয়ংকর খবরটা আমায় স্তম্ভিত করে দিলো। প্রায় পাঁচ লক্ষ স্পেনিশ উদ্বাস্তুকে—এদের বেশিরভাগই প্রতিরোধবাহিনীর লোক এবং সাধারণ মানুষ, এঁদের ফরাসী সীমান্তে, বন্দীশিবিরে রাখা হয়েছে প্রতিক্রিয়াশীল ফরাসীচক্রের প্ররোচনায় ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী লিঁও ব্লুম এই জঘন্য কাজ করেছেন।

চিলিতে তখন সরকারের পরিবর্তন ঘটেছে। স্পেনের জনতার ভাগ্য পরিবর্তন চিলির প্রগতিবাদী শক্তিকে সচেতন করে তুলেছিলো এবং তাদের সাহায্য ও শক্তিতে চিলিতে তখন প্রগতিশীল সরকার কায়েম হয়েছে। চিলির জনপ্রিয় এই সরকার আমার জীবনের এক মহত্তম কাজের দায়িত্ব দিলেন আমায়। কাজটা হচ্ছে ফ্রান্সে গিয়ে শিবিরে বন্দী স্পেনীয় উদ্‌বাস্তুদের ফিরিয়ে এনে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা। পুলকিত হলাম এই ভেবে—সূর্যের আলোর মতো আমার কবিতাগুলি সেই সব ক্লান্ত মানুষের মধ্যে পৌঁছবে এবং তার ফলে শতাব্দীর ঋণ পরিশোধের দিন এগিয়ে আসবে চিলির।

আমার শরীরের অবস্থা তখন খুবই শোচনীয়। অপারেশন করানোর ফলে একটা পা পুরো প্লাস্টার করা। কোনোমতে লাঠিতে ভর দিয়ে চলাফেরা করি। সরকারের আদেশ শিরোধার্য করে সেই অবস্থাতেই ঘর ছেড়ে রাষ্ট্রপতি ডন্‌ পেদ্‌রো আন্‌তোইরে সের্‌দা-র সঙ্গে দেখা করলাম। রাষ্ট্রপতি বললেন—পাব্‌লো, ফ্রান্স থেকে সমস্ত স্পেনের উদ্‌বাস্তু মানুষকে ফিরিয়ে নিয়ে এসো। আমি তাঁদের জন্য পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করবো।

সরকারী আদেশনামা সঙ্গে নিয়ে ফ্রান্সে গেলাম। দেশে যদিও সরকারের পরিবর্তন ঘটেছে, কিন্তু ফ্রান্সে নিযুক্ত আমাদের রাষ্ট্রদূতের আচরণে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন দেখলাম না! সেখানকার রাজকর্মচারীরা আমার আর্জি শুনে অগ্নিশর্মা হলেন। চারতলায় একটা রান্নাঘরের পাশে একটা গুমোট ঘর দিলেন আমার অফিসের কাজের জন্য। লিফট্ অচল করে দেওয়া হলো। অশান্তি এড়াতে সব অসুবিধাই সহ্য করতে হলো। মাঝে মধ্যে আহত পঙ্গু স্পেনিশ উদ্‌বাস্তুরা যখন অতি কষ্টে কোনোরকমে আমার ঘরে আসতেন তখন দুঃখে আমার মন ভেঙে পড়তো, কিন্তু দেখতাম দূতাবাসের কর্মচারীরা এতে বেশ আনন্দ পেতেন!—যত রকমে পারা যায় আমার কাজে বাধা সৃষ্টি করে চললেন তাঁরা।

শয়তান সুলভ এক চরিত্র

আকস্মিক আসা একখানি চিঠি বেশ জটিল করে তুললো আমার জীবনকে। চিঠিখানিতে নতুন কর্মকর্তার পরিচয় সহ জানানো হয়েছে যে, শীঘ্রই তিনি ফ্রান্সে এসে দূতাবাসের দায়িত্ব নেবেন এবং আমারই অধীনে কাজ করবেন!

পত্রে উল্লিখিত সেই নতুন কর্মকর্তাটি একদিন এসে হাজির হলেন দূতাবাসে। বয়স তেইশ-চব্বিশ বছর বলেই মনে হলো। শীর্ণকায় সুন্দর তরুণ। তাঁর নাকের ডগায় ঝুলছে সোনালি ফ্রেমের চশমা, কথাবার্তায় তিনি পরিপাটি। ক্ষীণ অথচ আবেগপূর্ণ কণ্ঠে নিজের পরিচয় দিলেন আমাকে এবং জানালেন যে, আমার কাজে তিনি সহযোগিতা করবেন। এও জানালেন যে, দূতাবাসের পূর্ণ দায়িত্ব যদিও তাঁর নিজের, তবুও তিনি আমার কথা মেনে চলবেন!

এই নবাগত মানুষটি অল্পদিনের মধ্যেই আমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠলেন।

খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম—এই ব্যক্তিটি প্রথম দিকে কম্যুনিস্ট-বিরোধী এক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরে প্রগতিশীল শক্তি যখন চিলিতে জয়ের উচ্চ শিখরে—তখন এই তরুণ আরলিনো মেরিন কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন এবং সভ্যপদ পান। তাই এঁকেই এখানে পাঠানো হয়েছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তখন ফ্রান্সের দ্বার প্রান্তে। প্রায় প্রতি মুহূর্তেই জার্মান বোমারু বিমানের আক্রমণের আশঙ্কায় দিন কাটছে। এরই মধ্যে দেখা গেল আরলিনো মেরিন বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন—যা আমার পক্ষে এখনও পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। স্পেনিশ পার্টির কয়েকজন নেতার সঙ্গে তাঁর আলাপ করিয়ে দিয়েছিলাম। পরে দেখতাম সেই সব নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা প্রায়ই আরলিনোর কাছে এসে বেশ কিছু সময় কাটিয়ে যেতেন, কিন্তু আমার সঙ্গে কথা বলার কোনো প্রয়োজন বোধ করতেন না।—এটা আমার কাছে বেশ রহস্য মনে হতো।

মাঝে মাঝে আরলিনো নিজের অর্থ-সম্পদাদি দেখাতেন আমাকে। সময় সময় এক একটি দুর্মূল্য রত্নালঙ্কার দেখিয়ে বলতেন কার কাছ থেকে কোন্‌টি উপহার হিসাবে পেয়েছেন তিনি। কথা প্রসঙ্গেই স্বর্ণাভকেশী নবলব্ধ এক বান্ধবীর কথা বললেন আমার কাছে।—এঁকে নাকি প্যারী শহরের কোনো সুন্দরীর সঙ্গেই তুলনা করা যায় না—ইনি অতুলনীয়া! তবে একটিই দোষ মহিলাটির—তা হচ্ছে অত্যন্ত বেশি মাত্রায় খরুচে। অর্থাৎ অর্থের উপর আকর্ষণ বেশ প্রবল। সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সম্পদের পরিমাণও বাড়িয়ে চললেন আরলিনো। প্রায় প্রতি সপ্তাহেই তাঁর গাড়ি বদল শুরু হলো আর সেই সঙ্গে বেড়ে চলতে লাগলো স্বর্ণাভকেশী সেই অনন্যা সুন্দরীর আকাঙ্ক্ষা।

অভিবাসন সংক্রান্ত জরুরী প্রয়োজনে হঠাৎ ব্রাসেলসে যেতে হলো আমাকে। ছোটো একটি হোটেলে উঠলাম সেখানে। আরলিনোও তখন ব্রসেলসে নামজাদা এক হোটেলে উঠেছিলেন। সন্ধ্যায় গেলাম তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। অর্কিডে সাজানো টেবিলে শ্যাম্পেন আর নানান্‌ সুখাদ্য সহকারে আমাদের নৈশভোজ সমাপ্ত হলো। এই সুযোগে তাঁর অর্থ ও সম্পদ সংগ্রহের অনেক গল্প শুনলাম। নিজের প্রতি আরলিনোর অতিভক্তি এবং সেই সঙ্গে আমার উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি আর তাঁর সম্পদ ও অর্থ লোলুপতা আমাকে ভাবিয়ে তুললো। ভাবলাম—যা হয় হোক, উপদেশ দেবার সময় এসেছে এবার। বললাম, জরুরী কথা আছে। চলুন—কফিটা আপনার ঘরে বসেই খাওয়া যাবে।

আরলিনোর সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময়ে দেখলাম সেখানে দুটি স্যুটকেশ হাতে আমার অপরিচিত দু'জন আগন্তুক অপেক্ষা করছেন। এঁরা আরলিনোর কাছে অবশ্য অপরিচিত নন্‌—সেটি বুঝলাম যখন এঁদেরকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বলে তিনি আমাকে নিয়ে নিজের ঘরে প্রবেশ করলেন।

কফির কথা ভুলে আন্তরিকতাশূন্য কণ্ঠে আলোচনা শুরু করলাম। বললাম, মিঃ আরলিনো, ভুলপথে চলেছেন আপনি! অর্থের মোহ আপনাকে আদর্শচ্যুত করে তুলেছে। আপনার আমার দায়িত্ব যে অনেক বেশি—এটা হয়তো উপলব্ধি করতে পারছেন না আপনি। অবশ্য আপনার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে কোনো উপদেশ দেবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা আমার নেই। কিন্তু আমি অনেক সময়েই অনেককেই তাঁদের

সুখ-শান্তিহীন শেষ জীবনে বলতে শুনেছি—'সু পরামর্শ দেবার মতো কাউকেই পাইনি জীবনে'। কর্তব্য সম্পর্কে সজাগ করে দেওয়া উচিত মনে হওয়াতে কথাগুলো বললাম। এখন আমাদের মনে রাখতে হবে লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল মানুষের দুর্দশার কথা, সেই সকল মানুষের সুষ্ঠু পুনর্বাসনের গুরু দায়িত্বের কথা এবং গুরুত্ব সহকারে সেই দায়িত্ব পালন করার কথা। এই পর্যন্ত বলেই উঠে পড়লাম আমি।

বিদায় জানানোর সময়ে তাঁর দিকে তাকালাম, দেখলাম তিনি রোরুদ্যমান! তাঁর কাঁধে হাত রেখে বললাম, 'চিন্তা করবেন না—কান্নার কি হলো?'

আরলিনো বললেন, কাঁদছি রাগের চোটে।

এই গল্পের পরিসমাপ্তি ঘটেছিলো অনেক পরে। আমি তখন মেক্সিকোতে রাষ্ট্রদূত। একদিন কয়েকজন স্পেনিশ উদ্বাস্তু দ্বিপ্রাহরিক-ভোজে আমাকে নিমন্ত্রণ করলেন। কথামতো সেখানে পেঁছে দেখলাম কিছুকাল আগে আরলিনোর জন্য হোটেলে অপেক্ষারত অপরিচিত সেই লোক দুটিও এই ভোজ সভায় উপস্থিত রয়েছেন! আমাকে দেখে অভিবাদন জানালেন তাঁরা। আমি প্রশ্ন করলাম, আপনারা আমাকে চেনেন নাকি?

'—আমরা সেই দুজন, ব্রাসেলসের সেই হোটেলে দেখা হয়েছিলো আপনার সঙ্গে—আরলিনোর ঘরের সামনে। ওঁর সঙ্গে আমাদের কিছু আলোচনা ছিলো সেদিন।'

আমার কৌতূহল আগে থেকেই ছিলো, তাই জিজ্ঞেস করলাম, 'বলুন না কি আলোচনা হয়েছিলো সেদিন আপনাদের।' উত্তরে তাঁরা যা বললেন তা শুনে অবাক হলাম। আমি আরলিনোর ঘর থেকে বেরিয়ে আসার পর ওঁরা ঘরে ঢুকে দেখেন যে, আরলিনো হাউ হাউ করে কাঁদছেন এবং ওঁদের দেখে সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলে উঠলেন যে, এইমাত্র আমার জীবনের সবচেয়ে ভয়ংকর খবরটা পেলাম—নেরুদা তোমাদেরকে এক্ষুনি গেস্টাপোর হাতে তুলে দেবে, তোমরা নাকি স্পেনের মারাত্মক কম্যুনিস্টদের অন্যতম! নেরুদা এ বিষয়ে মুহূর্ত মাত্রও অপেক্ষা করতে নারাজ।—শীগ্গির পালাও এখান থেকে!—তোমাদের স্যুটকেশ আমার কাছে জমা রেখে যাও, আমি সযত্নে রেখে দেবো!

'—হারামজাদা, বদমাশ'—আমি তীব্রস্বরে চেঁচিয়ে উঠেছিলাম। ভগবানকে ধন্যবাদ তোমরা জার্মানদের হাত থেকে সেদিন রক্ষা পেয়েছিলে—।'

'—সেটা ঠিক, কিন্তু জানেন—স্পেনিস শ্রমিক ইউনিয়নের সংগৃহীত নগদ দুই হাজার ডলার ঐ স্যুটকেশে ছিলো, সে টাকা বা স্যুটকেশ আমরা আর ফেরৎ পাইনি!'

পরে জেনেছিলাম শয়তান আরলিনো ফ্রান্সের সেই স্বর্ণাভকেশী প্রেমিকাকে নিয়ে প্রমোদ ভ্রমণে বেরিয়ে শ্রমিক ইউনিয়নের টাকাগুলির যথেচ্ছ সদ্ব্যবহার করেছিলেন আনন্দ উপভোগের মাধ্যমে! পরে এও জেনেছিলাম যে, আরলিনোর সেই বান্ধবীটি নারী নয়—পুরুষ, সরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র। চিলির কম্যুনিস্ট পার্টি থেকে তাঁর পদত্যাগের খবরটিও বেশ ফলাওভাবে ছড়িয়ে পড়েছিলো। খবরের কাগজের মাধ্যমে পদত্যাগের কারণ হিসাবে ছাপা হয়েছিলো—'আদর্শগত মতবিরোধের জন্য পদত্যাগ করলাম।'

প্রধান সেনাপতি ও কবি

পরাজয় বা বন্দীদশা থেকে মুক্তি পাবার পরে যে কোনো মানুষ হাসি-অশ্রু আর একাকীত্বের বিচিত্র অধ্যায় সমন্বিত এক উপন্যাস হয়ে দাঁড়ায়। এই রকম বহু গল্পই আমাকে বিস্ময়াভিভূত করে তুলতো। বিমানবাহিনীর একজন অধিনায়ক হেরেরার সম্বন্ধে এমনিই একটা গল্প শুনেছিলাম। ফ্রাংকোর সেনাবাহিনী যখন যুদ্ধে প্রায় জয়ী হতে চলেছে তখন তিনি প্রতিদিন গভীর রাতে ফ্রাংকোর বাহিনীকে আকাশ থেকে নেমে এসে আঘাত হানতেন। প্রতি রাতেই এই একঘেয়েমি আক্রমণের গতানুগতিকতা সহ্য করতে না পেরে তিনি হঠাৎ ব্রেইল পদ্ধতিতে লেখাপড়া শুরু করে অল্পদিনের মধ্যেই তা শিখে নিলেন। এরপর রাতের অন্ধকারেই বিমান নিয়ে বেরোতেন। আমাকে তিনি বলেছিলেন—ব্রেইল শেখার পর রাতের অন্ধকারে বিমানে বসে 'দ্যুমা'র কাউন্ট অফ্ মন্টিক্রিস্টো, দি থ্রী মাস্কেটিয়ার্স প্রভৃতি বইগুলি পড়া শেষ করেছিলেন। তারপর একদিন ফ্রাংকোবাহিনীর হাতে ধরা পড়ে নির্বাসিত হয়েছিলেন। এই ধরনের আর একটি গল্প—যা আমার মনের গভীরে গেঁথে গিয়েছিলো সেটা আন্দালুসিয়ান কবি পেদ্রো গারিফাস সম্বন্ধে, যিনি বন্দী হবার পর স্কটল্যান্ডের এক প্রাসাদে নির্বাসিত হন। শূন্য প্রাসাদের সরাইখানায় গিয়ে এক কোণে একলা বসে মদ খেতেন। তাঁর ভাষা কেউ বুঝতো না, এমন কি মাঝে মাঝে তাঁর জিপ্সী-স্প্যানিশ ভাষা আমিও বুঝতাম না। তাঁর এই নীরবতা একদিন সরাইখানার মালিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। সরাইখানা থেকে অন্যান্য মদ্যপায়ীরা চলে যেতেই তিনি ইসারা করে পেদ্রোকে সেখানে থাকতে বললেন এবং তারপর আগুনের পাশে বসে দু'জনে মদ খেতে খেতে ইসারা আর ভাব-ভঙ্গীতে নিজেদের মনের কথা আদান-প্রদান করলেন। এরপর প্রতি রাত্রেই এটা তাঁদের নিয়মিত কার্যে পরিণত হলো। গারিফাস্ চীৎকার, গালিগালাজ আর লাফালাফি করে স্পেনের গৃহযুদ্ধের কথা এই সরাইখানার মালিককে বোঝাবার চেষ্টা করতেন এবং সরাইখানার মালিকও গারিফাসের মতই তাঁকে তাঁর স্ত্রীর পালিয়ে যাওয়া থেকে শুরু করে নিঃসঙ্গ জীবনের অনেক যন্ত্রণার কথাই জানাতেন। এই দু'জনের আন্তরিকতা কিন্তু ভাষার বাইরেই থেকে গেল, কারণ কেউ কারুর কথা বুঝতেন না। তবু এঁদের মধ্যে এক অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিলো, একজন নিঃসঙ্গ মানুষ আর একজন নিঃসঙ্গ মানুষের মধ্যে সুখ ও শান্তির খোঁজে প্রতি সন্ধ্যায় এক জায়গায় মিলিত হয়ে নিজের নিজের নিঃসঙ্গ সঙ্গ-সুখের স্বপ্ন দেখতেন। এর পর ছাড়া পেয়ে গারিফাস্ যেদিন মেক্সিকোতে চলে যাবেন, যাবার মুহূর্তে দু'জনে কান্নায় ভেঙে পড়লেন, তারপর সুরাপাত্রে দু'জনে স্বাস্থ্য পান করে একে অপরের কাছ থেকে বিদায় নিলেন।

পরে যখন গারিফাস্ পেদ্রোর সঙ্গে আমার দেখা হয় আমি ওঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'পেদ্রো, তোমার কি মনে পড়ে সরাইখানার মালিক কি কথা বলতেন?'

'—আমায় বিশ্বাস করো পাবলো, আমি তাঁর একটি কথাও বুঝতাম না। আর

তিনিও আমার কোনো কথাই বুঝতেন না। তবু এটা আমরা উভয়েই অনুভব করতাম যে, উনি আমাকে কিছু জানাতে চাইছেন এবং আমিও তাঁকে কিছু জানাতে উদ্গ্রীব। এই ছিলো আমাদের অকথিত বন্ধুত্বের সূত্র।'

উইনিপেগ প্রসঙ্গ

একদিন সকালে দূতাবাসে পেঁছে সেখানকার সকলের মুখে হাসি দেখে একটু হকচকিয়ে গেলাম। কারণ আমাকে দেখার পর থেকেই দূতাবাসকর্মীদের হাসিখুসি ভাবটা লোপ পেয়েছিলো। আমাকে সামান্য অভিবাদনটুকু জানাতেও ইচ্ছুক ছিলেন না আমার সহকর্মীরা! তাই ভাবলাম—নিশ্চয়ই এমন কিছু ঘটনা ঘটেছে যাতে এঁরা সকলেই আনন্দিত। কিছুক্ষণ পরেই অবশ্য হাস্য পরিহাসের রহস্যটা পরিষ্কার হয়ে গেল আমার কাছে। আমাদের রাষ্ট্রপতি ডন্ পেদ্রো আমার কাছে একটি তারবার্তা পাঠিয়ে জানিয়েছেন যে, স্পেনিশ উদ্বাস্তুদের চিলিতে পুনর্বাসনের কাজটা পত্র পাঠ বন্ধ করতে। অথচ এই কিছুদিন আগেই তো তিনি আদেশ দিয়েছিলেন আমাকে এই উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের কাজ সুষ্ঠু এবং শীঘ্র সমাধা করার জন্য। মনটা খারাপ হয়ে গেল এজন্য যে, আমার কথায় ফ্রান্স ও আফ্রিকার বন্দী শিবিরের হাজার হাজার উদ্বাস্তু চিলিতে যাবার জন্য উন্মুখ হয়ে রয়েছেন। চিলির গণতান্ত্রিক সরকার তাঁদের সব্বাইকে চিলিতে নিয়ে যাবার জন্য উইনিপেগ নামে একটি জাহাজ কিনে প্রস্তুত রেখেছেন 'বরদ্যু'র কাছে একটি বন্দরে।

এখন কি করবো? যখন ভালোবাসার হাত বাড়িয়ে হতভাগ্য উদ্বাস্তুদের আমার দেশে নিয়ে যেতে এসেছি, আমার দেশের এই উদারতা আর ন্যায়বোধের বিরুদ্ধাচরণ করতে হবে এখন! রাষ্ট্রপতির তারবার্তা আমার গর্ব, আমার স্বপ্নকে ধূলিসাৎ করে দেবে!

ঠিক করলাম উদ্বাস্তু নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করবো। সেই ইচ্ছা নিয়েই তাঁদের সভাপতি জুয়্যান নেগ্রিনের সঙ্গে দেখা করে রাষ্ট্রপতির পুনরাদেশের কথা জানিয়ে বললাম যে, এখন তিনটি রাস্তা দেখতে পাচ্ছি—এক, অত্যন্ত বিরক্তি ও ঘৃণার সঙ্গে আমায় বলতে হবে যে, চিলিতে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়েছে। দুই—নাটকীয়ভাবে জানিয়ে দিই যে, আমার অনুরোধ আমাদের রাষ্ট্রপতি গ্রহণ করতে রাজি নন্—এই বলেই নিজের রিভলবারের গুলি চালিয়ে আত্মহত্যা করা অথবা, তিন হচ্ছে এই যে, অপেক্ষমান জাহাজে আপনাদের সকলকে নিয়ে চিলির উদ্দেশে রওনা হওয়া।—এরপর যা ঘটে ঘটুক।

নেগ্রিন চুরুটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আমার সব যুক্তির কথা শুনে জিজ্ঞেস করলেন, এখান থেকে একটা টেলিফোন করা যায় না?

'তখনকার দিনে য়ুরোপ থেকে আমেরিকাতে ফোনে কথা বলা খুবই দুঃসাধ্য ছিলো—একবার ফোন করতে হলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়। যাইহোক, নানান্ গোলযোগ আর কান ফাটা সব আওয়াজের মধ্যেই শেষ পর্যন্ত বেশ চীৎকার করেই

পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে জানিয়ে দিলাম যে, রাষ্ট্রপতির আদেশ যাইহোক, আমি জাহাজ বোঝাই করে সমস্ত উদ্‌বাস্তুকে নিয়ে ভালপারাইসো রওনা হচ্ছি।—এতে যা হয় হবে।

রাত্তিরটা খুব অস্বস্তির মধ্যে কাটলো। সকালে খবর পেলাম পররাষ্ট্রমন্ত্রী অরতেগা আমার সঙ্গে একমত হয়ে মন্ত্রিত্বে ইস্তফা দিয়েছেন। এর ফলে মন্ত্রী-পরিষদে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। এও জানা গেল যে, কয়েকজন প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়েই নাকি রাষ্ট্রপতি নিষেধাজ্ঞা-পত্র পাঠিয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নতুন করে তারবার্তা পাঠিয়েছেন আমার কাছে—সত্বর উদ্‌বাস্তু পুনর্বাসনের কাজ সমাধা করার জন্য।

পুনরাদেশ পেয়ে উদ্‌বাস্তুদের জাহাজে ওঠালাম। স্ত্রী-পুত্র পরিজন সবাই মিলিত হবার সুযোগ পেলেন—এঁদের মধ্যে সর্ব শ্রেণীর মানুষ ছিলেন। নৈতিক সংগ্রামে জয়ী হলাম, জয়ী হলো আমার কবিতা। গর্বে সেদিন আমার বুক ভরে গিয়েছিলো।

সেদিন একটি পত্রিকা কিনে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আকাশের ধূসর রঙের ছোঁয়ালাগা বড়ো বড়ো প্রাচীন প্রাসাদগুলির দিকে তাকিয়ে মনে পড়ছিলো অনেক পুরোনা দিনের কথা, মনে হচ্ছিল প্রাচীনতম এই প্রাসাদগুলির মধ্যে কোনো একটির কোনো এক ঘরে হয়তো কোনো এক মহৎ কবি প্রকৃতি আর মানুষের মিলনের ছন্দকে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। কিছুদূর এগিয়ে একটা বেঞ্চিতে বসলাম। পত্রিকাটির প্রথম পাতায় বেশ বড়ো বড়ো হরফে লেখা রয়েছে—'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলো'। হাত থেকে পত্রিকাটি মাটিতে পড়ে যাবার আগেই দেখলাম কালো রঙের বড়ো বড়ো হরফগুলো লাল রক্তে ভরে গেল, কাদা ভরা মাটিতে কাদা আর রক্ত এক সঙ্গে মিশে গেল।

সকলেরই জানা ছিলো যে, বিশ্বযুদ্ধ সমাগত। হিটলার তখন একের পর এক শহর, গ্রাম গ্রাস করে চলেছেন। ব্রিটেন আর ফ্রান্সের রাজনীতিকরা ছাতা মাথায় তাঁকে নগর, রাজ্য, মানুষ উপহার দিতে ছোটাছুটি করছেন।

প্যারিতে আমার ঘরে বসেই সেদিন দেখলাম শুধু অদক্ষই নয়, যুদ্ধ জিনিসটা যে কি ভয়ংকর সেটুকু বোঝবার ক্ষমতাও যাদের নেই সেই সব সেনানীর দল কুচকাওয়াজ করে এগিয়ে চলেছে মৃত্যুগহ্বরে প্রবেশের জন্য!

চরম সর্বনাশের কালো ধোঁয়ায় মানুষ তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ়। সবাই জানতো পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। তবু, তবু মনোবল রাখতে হবে শত্রুকে রুখবার জন্য। কিন্তু না, এই চিন্তায় যেন বিষণ্ণ বোধ করলাম। কারণ এর ভিতরেই উৎকট দেশপ্রেমিকরা রাস্তায় রাস্তায় কলেজে হোস্টেলে খুঁজে বেড়াতে লাগলো প্রগতিবাদী বুদ্ধিজীবীদের। তাদের কাছে হিটলারের ছাত্ররা শত্রু নয়, শত্রু হচ্ছেন তাঁরা যাঁরা ফরাসী চিন্তাধারায় নবপল্লবের আগমনী সঙ্গীত শুনিয়েছিলেন। লুই এর‍্যাগোঁ আমাদের দূতাবাসে এসে সারাদিন সারারাত্রি সমানে লিখে মাত্র চারদিনের মধ্যে তাঁর উপন্যাস 'অদৃষ্টের যাত্রী'র লেখা শেষ করে যোদ্ধার পোশাক পরে বেরিয়ে পড়লেন সংগ্রাম ক্ষেত্রে। এই নিয়ে তিনি দু'বার সীমান্তে গেলেন জার্মানবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে।

ইতিহাসের সেই গোধূলি লগ্নে বিশেষ একটি বিষয়ে আমার জ্ঞানলাভ ঘটেছিলো

সেটা হচ্ছে য়ুরোপীয় চিন্তাধারায় স্থির সংকল্পের এতই অভাব যে বিপ্লব বা ভূমিকম্পকে তারা মেনে নেবে না, কিন্তু যুদ্ধের বিষাক্ত হাওয়ায় বাতাস—নিঃশ্বাসের সাথে যে বাতাস নিয়ে মানুষ বেঁচে থাকে আর রুটি—যে রুটি খাদ্য হিসেবে মানুষের বাঁচার উপকরণ—তাদের নির্দ্বিধায় বিষাক্ত হবার সুযোগ করে দেবে! দেখতাম আলোয় ঝলমল শহরগুলি ব্ল্যাক-আউটের ঘোমটায় চাপা থাকতো, আর প্রায় সত্তর লক্ষ মানুষ সেই অন্ধকারে নির্বাসিতে পরিণত হতো! শহর আর মানুষের হৃদয় জোড়া সেই অন্ধকার আজও আমার স্মৃতিতে অম্লান।

এই যুগের শেষে নব আবিষ্কৃত এক দ্বীপে পৌঁছে দেখলাম সেখানেও আমি একা। আমার এ যাত্রাটা বিফলেই গেল। নিদারুণ যন্ত্রণা আর নিঃসঙ্গতা—যেমনটি হয় জন্ম মুহূর্তে, বিপদ শংকাপূর্ণ শুরুতে আধ্যাত্মিক আতংকে ভরা, ঝর্ণার স্রোত বেয়ে নেমে আসা আমার কবিতাগুচ্ছ। এই নতুন গোধূলি লগ্নে উত্তেজিত আমার সৃষ্টি।

আমায় কোথায় যেতে হবে, কোন্ পথ ধরে ফিরবো—কোন্ উদ্দেশ্য নিয়ে, কোন্ পথে নিস্তব্ধতা—কোথায় পাবো নিঃশ্বাস ছাড়ার মতো একটু জায়গা? আলো আর অন্ধকারকে উল্টে দিলাম, তার ভিতরকে টেনে বাইরে এনে বাইরেটাকে ভরে দিলাম ভিতরে। কিন্তু একমাত্র শূন্যতা ছাড়া কিছুই পেলাম না—যে শূন্যতাকে আমার এই দু'টি হাত অতি সযত্নে সৃষ্টি করলো।

তবু যারা আমার খুব কাছের, একেবারেই অপরিহার্য, বিস্তৃত আর সম্পূর্ণ আশাতীত তারা আমার চলতি পথের ধারে এসে এই প্রথম উপস্থিত হবে। এই পৃথিবীটার জন্য অনেক—অনেক চিন্তাই করেছি, কিন্তু চিন্তা করিনি মানুষের জন্য। মানুষের হৃদয় নিয়ে অনেক ঘেঁটেছি, কিন্তু মানুষ নামক জাতির জন্য কোনো চিন্তাই করিনি। শহর আমি দেখেছি—শূন্য শহর, আমি কারখানা দেখেছি, যে কারখানার উপস্থিতি বিয়োগান্ত নাটকের মতই। ছাদের নীচে, রাস্তার ধারে, স্টেশনে—শহরে, গ্রামে-গঞ্জে নিপীড়িত মানুষের যন্ত্রণা তো আমি দেখিনি।

যেদিন প্রথম গুলীটি গিয়ে স্পেনিশ গীটারের বুকটাকে বিদ্ধ করলো সেদিন সেই গীটার থেকে সঙ্গীতের বদলে প্রবাহিত হয়েছিলো শোণিতস্রোত। আমার কবিতা অশরীরী প্রেতাত্মার মতো মানুষের যন্ত্রণাকাতর গোঙানি শুনে রাস্তার ধারে থমকে দাঁড়িয়েছিলো আর একগুচ্ছ শিকড় ও অনেক রক্ত তার পা বেয়ে উঠেছিলো।

হঠাৎ দক্ষিণের নিঃসঙ্গতা থেকে আমি উত্তরে এলাম, এলাম, জনতার মাঝখানে—যে জনতার তরবারী আর রুমাল হওয়ার জন্য আমার কবিতা বিনত, নম্র। আমার কবিতা চায় বিশাল দুঃখের বোঝা বওয়া মানুষের গড়িয়ে পড়া ঘামকে মুছিয়ে দিতে, রুটির লড়াইয়ে শাণিত তরবারী হতে। তারপরেই শূন্যতা ডানা মেললো, গভীর হলো, চিরন্তনী হলো। আমরা সমচতুর্ভুজ অবস্থায় পৃথিবীর উপরে দাঁড়িয়ে আছি।—যা কিছু আছে তাকে চিরন্তনভাবে পেতে চাই। আমরা কোনো রহস্যের অনুসন্ধান করছি না। কারণ আমরা নিজেরাই রহস্যময়! বস্তুগতভাবে আমার কবিতাই প্রমাণ করছে তার অসীম পরিব্যাপ্তি।—যা ছুটে চলেছে সমুদ্র আর পৃথিবীর তলদেশ ধরে চমকপ্রদ গাছপালার দরদালানের মধ্য দিয়ে—সে কথা বলতে চায়, উদ্ভাসিত আলোকে সূর্য কিরণের সুতীক্ষ্ন শর নিয়ে সরস মাটির তলদেশে ধনসম্পদের বার্তা পৌঁছে দিতে চায়,

শরতের ঋতুর সঙ্গে মানুষের হারিয়ে যাওয়া যোগসূত্রটিকে পুনঃস্থাপিত করে দিতে চায়।

আকাশ কালো হয়ে আসে। মাঝে মাঝে অনুপ্রভাদীপ্ত বজ্র আর তার আতঙ্ক সেই কালো আকাশের বুকে ঝলসে ওঠে। একটি নতুন অবয়ব—যা শব্দরাজির মধ্যে পড়ে না, দিগন্তে উঁকি মারছে এক নতুন মহাদেশ—আমার কবিতার অন্তস্থল থেকে জন্মলাভ করছে। আমি বছরের পর বছর কাটিয়েছি এই মাটিকে স্থাপন করতে, বহু রহস্যে ভরা এর প্রান্তদেশকে স্পর্শ করতে, এর মূর্তিকে শান্ত করতে—এর প্রাণীবিদ্যা, এর ভূগোলকে অনুধাবন করতে—এদেরই মধ্যে অন্ধকারে আমি আমার নিঃসঙ্গ একাকী জীবন কাটিয়েছি।

৭

মেক্সিকো

কণ্টকাবৃত পুষ্পবিকাশ

চারপাশের ঘটনাবলীর প্রভাবে আমি যখন প্রায় একটি ভগ্নস্তূপে পরিণত হতে চলেছি, সময়টা ১৯৪০ সাল, সরকার আমাকে মেক্সিকোর প্রধান বাণিজ্যদূত করে পাঠালেন।

সর্প এবং কাঁটায় ভরা ন্যাসপাতি—এই নিয়ে মেক্সিকো কণ্টকাবৃত পুষ্পের মতো প্রস্ফুটিত। শুকনো মাটির বুকে বয়ে চলে সমুদ্রের ঘূর্ণিঝড়—হিংস্র হলেও বেশ রঙীন তার দিগ্‌বলয়, তীব্র তার বিস্ফোরণ আর সৃষ্টি-সুষমা।—এই সব ইন্দ্রজাল দিয়েই মেক্সিকো আমায় আবদ্ধ করলো, আমার সামনে মেলে ধরলো বহুবর্ণের এক আশ্চর্য আলো।

সিনেমার পর্দায় দেখা, সমব্রিরো পরা মেক্সিকান—প্যান্টের কোমর থেকে ঝুলছে রিভলভার, হাতে রয়েছে বন্দুক, মাথায় শোলার টুপি—মেক্সিকো কিন্তু তা নয়। মেক্সিকো ছড়িয়ে রয়েছে তার বাজারে যার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত আমি ঘুরে বেড়িয়েছি, অনেক কিছুই দেখেছি সেখানে। আমি দেখেছি টকটকে

লাল আর বর্ণাঢ্য আসমানি রঙের শালের মত মেক্সিকোর মাটি। মাটির কলসী বা গামলার মতই দেখতে সেই মাটি আর সেই মাটির উপরে অজস্র পোকায় ভরা ফলের সারি। ঘন নীল রঙের গাছের গায়ে অসংখ্য কাঁটায় ভরা মেক্সিকোর অন্তহীন গ্রামাঞ্চল।

বিচিত্র এই দেশ আমার আমেরিকা। এই বিরাট দেশের প্রতিটি প্রদেশ কত ভিন্ন, কত বৈচিত্র্যপূর্ণ। কোথাও তীক্ষ্ন চূড়ায় ভরা পাহাড়ের মিছিল, কোথাও ঘন সবুজ সমতল ভূমিকে দু'ভাগে ভাগ করে উঠে গেছে কঠিন পাথরের দেওয়াল—কোথাও বা আবার বন জঙ্গলের মধ্যে নানান্ রঙের পাখী, সাপ আর বাঁশবনের ঝাড় সৃষ্টি করেছে রূপকথার রাজত্ব।

আমি দূত হয়ে বিভিন্ন দেশে কাজ করার সময় তুষার, কুয়াশা কিংবা চেরীফুলের গাছ দেখে কখনও বিস্ময় বোধ করিনি। কারণ, এসব তো আমেরিকার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে রয়েছে। এই আমেরিকায়, সম্ভবতঃ এই উপগ্রহের কোথাও মেক্সিকানদের মতো প্রাণখোলা ও মানবিকতাবোধে সচেতন মানুষ আর নেই। উদার, প্রাণবন্ত এবং কঠিন এদের ইতিহাস—যাতে আছে শুধু সীমাহীন ঊর্ধ্বগতি।

জেলেপাড়ায় ঘুরে বেড়াবার সময় দেখেছি তাদের মাছধরা জালের স্বচ্ছতা—যা দেখে যে কোনো মাছ তাদের হারানো আঁশ খুঁজে পাবার আশায় স্বেচ্ছায় সেই জালে এসে ধরা দেবে। খনিগুলির আশপাশ দিয়ে যাবার সময়ে সেখানকার জ্বলন্ত গলিত ধাতুর দিকে তাকিয়ে দেখেছি খনি-মুখ থেকে সেই জ্বলন্ত ধাতুর ঝিলিক জ্যামিতিক রেখার মতো বেরিয়ে আসতে। ক্যাথলিক কনভেন্টে ভরা রাস্তার ধারে কণ্টকাবৃত ক্যাকটাস গাছের সারি আর তারই পাশে পাশে বর্ণাঢ্য মেক্সিকান বাজার। ঘুরতে ঘুরতেই একদিন গিয়েছিলাম জুকাতানে, যেখানে নিমজ্জিত রয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো একটি জাতির দোলনা—এই প্রতিমার উপাসক জাতিই হচ্ছে মায়া-জাতি—এদের দাপটেই এখানকার মাটি এক সময়ে কেঁপে উঠেছিলো, কেঁপে উঠেছিলো অংকুরিত বীজের স্পর্শে।

সব শেষের রাস্তা পেরিয়ে আমরা প্রবেশ করলাম বিরাট এক প্রান্তরে, যেখানে মেক্সিকোর প্রাচীনতম মানুষরা জঙ্গলে লুকিয়ে রেখে গেছেন তাঁদের কারুকার্যখচিত ইতিহাস। এখানে এসে এক নতুন জলের সন্ধান পেলাম—যা পৃথিবীর অন্য কোথাও নেই। নদী, হ্রদ বা সমুদ্রের জল নয়, জুকাতানের এই জল থাকে মাটির গভীরে। মাঝে মাঝে মাটিতে চিড় ধরে, মাটি সরে যায়—বেরিয়ে আসে সেই জল, সৃষ্টি হয় জলাশয়ের চারপাশ জুড়ে বনানী জন্মায়। সেই জলের দিকে তাকালে দেখা যায় দর্পণে দেখার মতই বনানীর ছায়া, বেশ ঘন নীল রঙ ফুটে ওঠে পুকুরটির নিচের দিকে। এখানকার মায়াজাতির মানুষেরাই প্রথম আবিষ্কার করেন এই অনন্য জল এবং বিচিত্র এক ধর্মীয় আচারের মাধ্যমে জলের উপর করেন এই দেবত্ব আরোপ। পৃথিবীর তাবৎ ধর্মের মতই এই মায়াজাতি মনে করতেন যে, এই জল মাটিকে উর্বর করে তোলার জন্যই। নিজেকে মাটি দ্বিধাবিভক্ত করে বাইরে টেনে আনে সুপ্ত সেই জলধারাকে!

তারপর হাজার বছর কেটে গেছে। অতীত এই বছরগুলির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জলাশয়গুলির আশেপাশে জন্মলাভ করেছে গভীর এক রহস্য—যার কিছুটা গড়েছেন

দেশীয়রা, কিছুটা এসেছে অভিযান বা আক্রমণকারীদের কাছ থেকে। এই সমস্ত জলাশয়গুলির কাছে কয়েকশো কুমারী মেয়েকে এনে ফল, সোনার মুকুট আর জড়োয়ায় পরিপাটি করে সাজিয়ে একের পর এক তাদের ছুঁড়ে দেওয়া হতো গভীর জলে। ক্রমে মালা আর স্বর্ণমুকুট ভেসে উঠতো জলের উপরে কিন্তু জড়োয়া পরা সেই মেয়েরা আর উঠতে পারতো না, ক্রমে ক্রমে কাদায় তারা হারিয়ে যেতো। হাজার বছর বাদে তাদের মাত্র কিছু অলঙ্কার উদ্ধার করা গিয়েছিলো, যে অলঙ্কারগুলি আমেরিকা আর মেক্সিকোর যাদুঘরে এখন দেখা যায়। আমিও গিয়েছিলাম সেই নির্জন প্রান্তরে, স্বর্ণ আহরণের উদ্দেশ্য নয়—গিয়েছিলাম হারিয়ে যাওয়া মেয়েগুলির কান্নার শব্দ শোনার আশায়। পাখীর চিৎকারের মধ্যে তাদের যন্ত্রণারুদ্ধ কান্না অনুভব করেছি, তাদের ডানা ঝাপটানোর মধ্যে লক্ষ করেছি গভীর জলের তলায় তলিয়ে যাওয়া সেই সকল কুমারী কন্যাদের হলুদ-রঙা বিকীর্ণ হাতের আকুতি। এখানে দাঁড়িয়ে আমি সেই আদিম আমেরিকান—একটি ঘুঘু পাখী, যা চতুর এক চিলের হিংস্র নখরাঘাত বাঁচাতে উড়ে যেতে চায় নিঃসীম শূন্যে, রক্তাক্ত দেহে—প্রাণীজগৎ ছাড়িয়ে।

মেক্সিকোর চিত্রকরেরা

মেক্সিকোর বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের প্রায় সবটুকুই শিল্পাঙ্কনে প্রতিভাত। সেখানকার চিত্রকরেরা দেশের ইতিহাস, ভূগোল থেকে শুরু করে গণ-জীবনের অশান্তি আর মতপার্থক্যকে প্রকাশ করতেন তাঁদের চিত্রে। জোজে ক্লিমেন্তে ওরোজকো তাঁর রুগ্ন, শীর্ণ দীর্ঘকায় শরীর আর একখানি হাত নিয়েই এই অলীক মূর্তি সর্বস্ব জগতের গোইয়া হিসাবে পরিগণিত হতেন। আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলার সময় বুঝেছি শিল্পের এই হিংস্রতা তাঁর স্বভাবের সঙ্গে একেবারেই বেমানান। তাঁর আঁকা সেনাবাহিনী ও তাদের সঙ্গিনীরা, জোতদারের গুলিতে নিহত কৃষকের দেহ বা কারুকার্যখচিত শবাধারে ক্রুশবিদ্ধ যীশু—নিষ্ঠুরতার সাক্ষ্য বহন করে। এই সময়ে দিয়েগো রিভেরা তাঁর অনেকগুলি চিত্রাঙ্কনের কাজ সমাধা করে অনেকের সঙ্গেই হৈ-হট্টগোল বাধাচ্ছেন এবং এই জন্যই হৃষ্টপুষ্ট এই শিল্পীটি প্রায় এক উপকথার নায়ক হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে আমার মনে হতো মাছের আঁশ বা ঘোড়ার খুর এই দুটো কেন ওঁর নেই! প্যারিসে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে ইলিয়া এর‍্যানবুর্গ তাঁর উদ্দেশে একখানি বই লিখেছিলেন। বইটির নাম 'জুলিও জুরেনিতোর অসাধারণ অভিযান'। বইখানির মাধ্যমে ইলিয়া এই শিল্পীটিকে শোষণ আর ফাঁকির প্রতিভূরূপে দেখিয়েছেন। ত্রিশ বছর পরেও দিয়েগো রিভেরা একজন প্রসিদ্ধ চিত্রকর এবং বড়ো বড়ো কথা বলার মানুষ হিসাবেই পরিচিত ছিলেন। তাঁর মতে মানুষের ধ্বংস হচ্ছে সবচেয়ে উপাদেয় ও স্বাস্থ্যকর খাদ্য! একজন ভালো রাঁধুনির মতই তিনি বিভিন্ন বয়সের মানুষের মাংসের বিভিন্ন প্রকারের রান্না এবং প্রয়োজনীয় মশলাপাতির হিসাব বুঝিয়ে দিতেন ইচ্ছুক-অনিচ্ছুক মানুষদের। তিনি মনে করতেন —মেয়েদের মধ্যে সমকামিতা হচ্ছে ইতিহাসগ্রাহ্য অত্যন্ত স্বাভাবিক একটি ঘটনা এবং

তাদের সমকামিতা যে একমাত্র স্বাস্থ্যকর জিনিস এটা প্রমাণ করতে তিনি বহু ঐতিহাসিক নজির ও নমুনা উপস্থিত করতেন। তাঁর অসাধারণ সম্মোহনী কণ্ঠস্বর, অতি সূক্ষ্মতার সঙ্গে শান্ত অথবা আবেগহীন বর্ণনা তাঁকে এমন একজন ভণ্ড পণ্ডিতে পরিণত করে তুলেছিলো যে, যাঁর সঙ্গে তাঁর একবার আলাপ হয়েছে তাঁর পক্ষে তাঁকে ভোলা খুবই কঠিন।

ডেভিড আলফারো সিকুইরস্ তখন বন্দী অবস্থায় জেলে রয়েছেন। তাঁর অপরাধ—কে একজন তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছিলেন যে, তিনি নাকি ট্রট্স্কির বাড়িতে হানা দিয়েছেন। আমি তাঁর সঙ্গে জেলের ভিতরে ও বাইরে দেখা করেছি। জেলের ওয়ার্ডেনের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে তাঁকে ও ডেভিডকে সঙ্গে নিয়ে জেলের বাইরে এক সরাইখানায় প্রায়ই মদ্যপান করতে যেতাম তিনজনে। তারপর সরাইখানা থেকে বেরিয়ে জেলের দরজার কাছে এসে ডেভিডকে আলিঙ্গন ও শুভরাত্রি জানিয়ে ফিরে আসতাম।

এমনিই চলছিলো দিনের পর দিন। এর মধ্যে ডেভিডকে জেলের দরজায় ছেড়ে আসার সময় একদিন রাস্তাতে ডেভিডের ভাই জিসাস্ সিক্যুইরাসের সঙ্গে আমার আলাপ হলো। এক অসাধারণ চরিত্র। এক কথায় বলা চলে শঠ ও দক্ষ ব্যক্তি ইনি। নিঃশব্দে অতি সন্তর্পণে সকলের চোখ এড়িয়ে চলতেন জিসাস্। তবুও এক অসতর্ক মুহূর্তে তাঁকে চমকে দিয়ে দাঁড়ালাম তাঁর সামনে। কথা খুবই কম বলতেন জিসাস্—যাও বা বলতেন তাও ধীরে ধীরে আর ফিস্ ফিস্ করে। ছোট একটি ব্যাগে করে প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশটি পিস্তল নিয়ে ঘোরাফেরা করতেন তিনি। একদিন তাঁর এই ছোটখাটো অস্ত্রাগারটি দেখে আমি প্রায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম। কিন্তু পিস্তলগুলি বয়ে বেড়ানো একেবারেই নিরর্থক, কারণ ডেভিডের মতো জিসাসও ছিলেন একজন শান্তিপ্রিয় মানুষ। শুধু তাই নয়, তিনি ছিলেন দক্ষ শিল্পী, সুদক্ষ অভিনেতা এবং রসিক ব্যক্তি। শরীর ও শরীরের কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে এতটুকুও নাড়াচাড়া না করে শুধু মুখের রেখাকে এদিক থেকে ওদিকে সরিয়ে এবং চোখের দৃষ্টির সাহায্যে তিনি দেখাতেন মানুষের প্রেম-ভালোবাসা স্নেহ-রাগ-বিরাগ আর আনন্দ ও যন্ত্রণা। দেহাতীত সাদা মুখমণ্ডলের ভিতর দিয়ে প্রকাশ পেতো মানুষের জটিল জীবনের মুহূর্তগুলি—যেমন করে তিনি নানান্ রঙ আর ধাতুর রিভলবারগুলিকে রাখতেন তাঁর ব্যাগে, যা কোনদিনও তিনি ব্যবহার করেন নি। এই তীব্র ভাবাবেগে-চালিত হিংস্র শিল্পীরা জনসাধারণকে বিশেষ একটি গণ্ডীর বাইরে রাখতেন। একবার এক বিতর্ক-সভায় দিয়েগো রিভ্যেরা ও সিক্যুইরাস—একই সঙ্গে দুজনের দুটি বিরাট রিভলবার থেকে গুলি চালালেন—অবশ্য কেউ কারুর উপরে গুলি চালান নি। ঐ গুলি গিয়ে আঘাত হানলো বক্তৃতা-মঞ্চের ছাদে, ছাদের চূণ-বালি আর কিছু টুকরো খসে এসে পড়লো শোতৃমন্ডলীর উপরে। নিমেষে বক্তৃতা-গৃহ খালি হয়ে গেল। বারুদের গন্ধে ঘরটি ভরে উঠলো।

দিয়েগো আর সিক্যুইরাসের চিত্রাবলীর মধ্যে তুলনা করা অসম্ভব। এক উচ্চাঙ্গ অনুভূতির মধ্যে রিভ্যেরার চিত্রগুলি ফুটে উঠতো। নিষ্ঠাবান ঐতিহাসিকের সুন্দর হস্তাক্ষরের মতই উজ্জ্বলতায় পূর্ণ সেই সব চিত্রকলা। মেক্সিকোর ইতিহাস, তার পুরুষানুক্রমিক ঐতিহ্য-ক্রমিক ঘটনাবলী এবং তারপরের বিয়োগান্ত নাটক—এই

ছিলো দিয়েগোর চিত্রসমূহের ভাষা। সিক্যুরস ছিলেন মেক্সিকোর ভূমিকম্প আর আগ্নেয়গিরির অগ্নিস্রোত, যার মিলিত যোগাযোগের মধ্যে ছিলো নতুনতর অনুসন্ধিৎসা।

জেলের ভিতর সিক্যুইরাসের সঙ্গে কথা বলার সময় ঠিক করেছিলাম যে কোনো প্রকারে, জেল থেকে তাঁকে বাইরে আনতেই হবে। তখন মেক্সিকোর জনসাধারণের আর্থিক সহায়তায় চিলিতে একটি বিদ্যালয় তৈরি হচ্ছিল। সেই সময়ে আমি নিজে হাতে ছাপ লাগিয়ে সেক্যুইরাসের জন্য একটি ভিসা তৈরি করলাম। নির্মীয়মান ঐ বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক হিসাবে ওঁর নিয়োগপত্রের ব্যবস্থাও করলাম। এর ফলে জেল জীবন থেকে মুক্তিলাভ করলেন তিনি, স্ত্রী এঞ্জেলিকাকে নিয়ে তিনি চিলিতে পেঁছিলেন। মেক্সিকান অর্থানুকূল্যে চিলিতে যে বিদ্যালয়টি তৈরি হয়েছিলো কিছুকাল পরে ভূমিকম্পে সেটি ধ্বংস হয়ে যায়। ঐ বিদ্যালয়টির দেওয়ালে ডেভিড সিক্যুইরাসের সৃষ্টি অনবদ্য ও অসাধারণ একটি ম্যুরাল ছিলো।—চিলির সাংস্কৃতিক জীবনে ডেভিডকে স্থান দেবার জন্য চিলি-সরকারের কাছ থেকে পুরস্কার স্বরূপ দু'মাসের জন্য পদচ্যুতি ঘটলো আমার কর্মজীবনে।

নেপোলিঁয়ন উবিকো

গুয়াতেমালা দেখার জন্য রওনা হলাম। আকাশে বাতাসে মধু আর চিনির গন্ধ ছড়ানো। প্রজাপতির মতো রঙীন পোশাক পরা সব মেয়েরা চলাফেরা করছে। মেক্সিকোর সোনালি প্রদেশে প্রবেশ করলাম তেহুনতাপেক-এর যোজক ছুঁড়িয়ে। ক্রমে হাজির হলাম চিয়াপাশের গভীর জঙ্গলে। রাত্রে গাড়ি থামিয়ে কান পেতে শুনতাম সেখানকার বিচিত্র শব্দ আর তড়িৎ প্রবাহের মতো ভেসে আসা জঙ্গলের বার্তা। অসংখ্য কীটপতঙ্গ আর পশু-পাখীর স্বর সৃষ্টি করে চলেছে মাধুর্যমণ্ডিত এক অনির্বচনীয় সঙ্গীত। মেক্সিকোর সবুজ ছায়া তার প্রাসাদে অলিন্দে আর কুঁড়েঘরে, তার স্মৃতিসৌধে মর্মর মূর্তিতে ছড়িয়ে দিয়েছে, এই সবুজের স্বাদ তারা পেয়েছিলো মেক্সিকোর ধন সম্পদে ভরা ঘন সবুজ এই জঙ্গলে। সীমান্ত পেরিয়ে মধ্য আমেরিকার সর্বোচ্চ শৈল শিখর যখন গুয়াতেমালার দ্রাক্ষাকুঞ্জ আর ঘন সবুজ গাছপালার দিকে তাকিয়ে আমার চোখ ধাঁধিয়ে উঠেছিলো।

মিগুয়েল এঞ্জেল আসতুরিয়াসের সঙ্গে আমি এক সপ্তাহ ছিলাম। তাঁর কোনো উপন্যাস তখনও বিশেষ নাম করতে পারেনি। আমরা দু'জন প্রায় দুই ভাইয়ের মতই ছিলাম, সারাটা দিন একসঙ্গে কাটিয়ে সন্ধ্যায় বেরিয়ে পড়তাম কুয়াশা-ঢাকা পাহাড় পর্বতের উদ্দেশে।

গুয়াতেমালাতে কেউ কোনো বিষয়ে খোলাখুলিভাবে কথা বলতে পারতো না, বাক্-স্বাধীনতা ছিলো না সেখানে, বিশেষ করে রাজনীতি নিয়ে আলোচনার উপরে ছিলো কঠোর নিষেধাজ্ঞা। দেওয়ালের কান ছিলো সেখানে। কেউ নিষেধাজ্ঞা অমান্য করলে জেল-জীবন তার অবধারিত।

মাঝে মাঝে আমরা উঁচু কোনো সমতলভূমিতে গাড়ি থামিয়ে সেখানকার পরিবেশ লক্ষ্য করতাম এবং সেই সঙ্গে সচেতন থাকতাম যাতে আমাদের আলাপ আলোচনা তৃতীয় ব্যক্তির কানে না পেঁছয়। বেশ সতর্কতার সঙ্গে গুয়াতে-মালাকে নিয়ে নিবিড় আলোচনা করতাম। এই দেশের উৎপীড়ক শাসকটির নাম উবিকো। উবিকো বেশ কয়েক বছর ধরে নির্মম শাসন চালাচ্ছেন। মোটাসোটা এই মানুষটির দৃষ্টি নির্মম হিমশীতল। তাঁর আদেশই হচ্ছে আইন। এখানে সামান্য কিছু করতে হলেও উবিকোর অনুমতি নিতে হবে। তাঁর একজন সচিবের সঙ্গে পরে আমার আলাপ হয়েছিলো। এই সচিবটি তখন একজন বিপ্লবী। তাঁর কাছেই শুনেছিলাম একবার কোনো এক কারণে উবিকোর সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ ঘটে, এর ফলে তাঁকে সচিবালয়ের থামের সঙ্গে বেঁধে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করেছিলেন উবিকো।

গুয়াতেমালার তরুণ কবিরা আমাকে অনুরোধ করলেন আমারই লেখা কবিতা পড়ে শোনাবার জন্য। কবিতা পাঠ করে শোনাবার জন্যও উবিকোর অনুমতি নিতে হবে। উৎসাহী কবিরাই অনুমতি যোগাড় করলেন। আমার বহু বন্ধু এবং তরুণ কবিদের ভীড়ে প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ হয়ে গেল। আমার খুব ভালো লেগেছিলো জেলখানার মতো এই বিরাট প্রেক্ষাগৃহের দেওয়ালের সীমা ডিঙিয়ে মুক্তবায়ু এসে কবিতার সঙ্গে স্পর্শ করেছে আমার কবিতার শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয়কে। শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে রবাহুতের মতো পুলিশ-প্রধানও উপস্থিত ছিলেন কয়েকজন সঙ্গীসাথী এবং তাঁদের মারণাস্ত্রাদি সঙ্গে নিয়ে। পরে জেনেছিলাম চারটি মেসিনগানের নল আমার এবং আমার কবিতার শ্রোতৃবর্গের প্রতি ফেরানো ছিলো।—পুলিশ-প্রধানের অঙ্গুলি যে কোনো মুহূর্তেই তা থেকে গুলিবর্ষণ করতে পারতো। যাইহোক, তেমন কোনো ঘটনা ঘটেনি। তিনি শেষ পর্যন্ত একাগ্র এবং শান্তচিত্তেই আমার কবিতা হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। পরে কেউ একজন আমাকে সেই একনায়কের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। এবং একথাও বলেছিলেন—যে তিনি যদি কোনোভাবে জানতে পারেন তাঁর সঙ্গে আলাপ করার প্রস্তাবকে আমি প্রত্যাখ্যান করেছি তাহলে সেটা হবে আমার পক্ষে খুবই বিপজ্জনক! কিন্তু না, আমি তাঁর সঙ্গে করমর্দনের প্রস্তাবটুকুও প্রত্যাখ্যান করে পরদিনই মেক্সিকোতে এসে পেঁছেছিলাম।

পিস্তলের সাহিত্য-সঙ্কলন

সে যুগে মেক্সিকোতে বন্দুকের লড়াইয়ের চেয়েও বন্দুক নিয়ে ঘোরাফেরা করাটাই ছিলো বেশি। রিভলবার—বিশেষ করে ৪৫ কোল্ট রিভলবার সম্বন্ধে অনেকেরই ছিলো অন্ধ ভক্তি আর গভীর বিশ্বাস। একটা পিন পড়ার আওয়াজ হলেও মুহূর্তের মধ্যে কোমর থেকে পিস্তল লোকের হাতে উঠে আসতো। পার্লামেণ্ট আর খবরের কাগজ রিভলবার-বিরোধী অনেক প্রচার চালিয়ে বুঝেছিলেন একজন মেক্সিকানের কাছ থেকে রিভলবার কেড়ে নেওয়ার চেয়েও তাঁর একপাটী দাঁত তুলে নেওয়াটা সহজ।

একবার একদল কবি ঠিক করলেন যে, আমায় নিয়ে তাঁরা ফুল দিয়ে সাজানো নৌকাতে বিহারে বেরুবেন। প্রায় পনেরো কুড়িজন চারণ-কবি জমায়েত হলেন। জোচিমিলকো হ্রদের ধারে বহু বিচিত্র ফুল দিয়ে পরিপাটি করে সাজানো হলো একখানি নৌকাকে। মেক্সিকানদের হাত যেন চীনাদের মতই, দৃষ্টিকটু কোনো কিছুই তারা তৈরি করে না—তা সে যে কোনো জিনিস হোক না কেন।

নৌকাতে যেতে যেতে বেশ কয়েকপাত্র কড়া ধরনের মেক্সিকান মদ্যপানের পর একজন কবি বলে উঠলেন—রুপো আর সোনা দিয়ে বাঁধানো তাঁর রিভলবার থেকে একটি গুলি যেন আমি আকাশের দিকে ছুঁড়ি। তাঁর পাশে যে কবিটি দাঁড়িয়েছিলেন তিনি এক থাপ্পড়ে সেই রিভলবারটি সরিয়ে দিয়ে নিজের রিভলবারটি আমার হাতে ধরিয়ে দিলেন। ব্যস্—শুরু হয়ে গেল, প্রত্যেকেই নিজের নিজের রিভলবার আমার হাতে ধরিয়ে দিতে উদ্যত হলেন প্রথম গুলিটি ছোড়ার জন্য! আমার মুখ চোখের আশপাশ দিয়ে তাঁদের রিভলবারগুলি ঘোরাফেরা শুরু হওয়াতে হতচকিত হয়ে পড়লাম। কবিকুলকে শান্ত করে মেক্সিকোর সেই আলখাল্লা মার্কা স্যাস্ব্রিরো পোশাকটা খুলে ধরে কবিতা ও শান্তির নামে রিভলবারগুলিকে আমার কাছে জমা দিতে বললাম। সেদিন সকলেই আমার কথার মর্যাদা দিয়েছিলেন এবং তাঁদের সেই রিভলবারগুলি বাজেয়াপ্তর মতই দীর্ঘদিন আমার কাছেই রেখেছিলাম। বোধহয় আমিই একমাত্র কবি—যার সম্মানে সেদিন অতগুলি রিভলবারের 'সাহিত্য-সঙ্কলন' হয়েছিলো।

কেন এই নেরুদা?

পৃথিবীর সমস্ত নুনটুকু তখন মেক্সিকোর মাটিতে জমা হচ্ছে, বিশ্বের প্রায় সকল নির্বাসিত কবিই মেক্সিকোর স্বাধীন মাটিতে স্থান পেয়েছেন। ততদিনে হিটলারের সৈন্যবাহিনী একের পর এক শহর গ্রাম ও দেশ দখল করে চলেছে। ফ্রান্স ও ইতালি জার্মানদের কাছে পরাজিত। যে সব কবি মেক্সিকোতে আশ্রয়ের জন্য এসেছেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন এ্যানা সেখারস ও চেক্ ব্যঙ্গ-কবি ঈগন্ আরউইন কিশ্—যিনি আজ মৃত। কিশ্ কয়েকটি মনোগ্রাহী পুস্তক লিখেছিলেন কিন্তু আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছিলো তাঁর শিশুসুলভ মনটি, আর তাঁর ভোজবিদ্যা। আমার বাড়িতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি কান থেকে ডিম বের করতেন অথবা একটার পর একটা পয়সা গিলে শরীরের নানা জায়গা থেকে এক এক করে সেই পয়সাগুলি বের করতেন। তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয় স্পেনে। আলাপ হবার সঙ্গে সঙ্গেই আমার 'নেরুদা' নামটি সম্বন্ধে তাঁর প্রবল কৌতূহল জন্মায় এবং প্রায়ই আমাকে এই নিয়ে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে তুললেন তিনি। আমি ব্যঙ্গচ্ছলে তাঁকে বলেছি, 'দেখ কিশ্, তুমি ১৯১৪ সালের সেই বিখ্যাত গুপ্তচর কর্নেল রেডি-র রহস্য হয়তো উদ্ঘাটন করতে পারবে কিন্তু আমার এই 'নেরুদা' নামের রহস্য কোনদিনও জানতে পারবে না। এবং তাই-ই হলো। প্রাহা-তে তাঁর মৃত্যুর সময়ে এই কবি তাঁর স্বাধীন স্বদেশ ভূমির সমস্ত সম্মানটুকু পেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর এই পেশাদারী অনধিকার হস্তক্ষেপের ফল তিনি জেনে যেতে

পারেন নি যে নেরুদা কেন নিজেকে 'নেরুদা' বলে ডাকে। এর উত্তরটা এত সহজ ও ঔজ্জ্বল্যবিহীন যে আমি এই গোপন রহস্যটুকু সন্তর্পণে আগলে রেখেছিলাম। আমার যখন চৌদ্দ বৎসর বয়স তখন আমার বাবা আমার এই সাহিত্য প্রচেষ্টাকে মোটেই পছন্দ করতেন না। বাবা মোটেই চাইতেন না যে, তাঁর পুত্র কবি হোক। আমার কবিতাগুলি প্রকাশ হওয়ার সময়ে আমি আমার নামের শেষের অক্ষরগুলি বদলে এমন একটি নাম রাখতে চাইলাম যাতে বাবা একেবারেই বুঝতে না পারেন। এই সিদ্ধান্তের ফলে এই চেকোশ্লোভাকিয়ান নামটি আমি এক মাসিক পত্রিকা থেকে খুঁজে পেয়েছিলাম এবং তখন জানতামও না যে এই নামের একজন চেক্ সাহিত্যিক ছিলেন যাঁর লেখা পল্লীগীতি আজও অমর এবং যাঁর স্মৃতিসৌধ রয়েছে প্রাহা-তে। বহু বছর বাদে চেকোশ্লোভাকিয়াতে গিয়ে প্রথম যে কাজটি আমি করেছিলাম সেটি হচ্ছে প্রাহা-তে এই শ্মশ্রুমণ্ডিত মূর্তির পাদদেশে ফুলের তোড়া অর্পণ।

পার্লহারবারের সন্ধিক্ষণ

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাহিত্যিক কবি ঔপন্যাসিক—যাঁরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সেই সময়টায় মেক্সিকোতে নির্বাসিত জীবন কাটাচ্ছিলেন তাঁরা প্রায় সকলেই বেশির ভাগ সন্ধ্যাবেলায় আমার বাড়িতে আসতেন, আলোচনা করতেন—আড্ডা দিতেন। মেক্সিকো তখন এই স্বেচ্ছায় বা সরকারী আদেশে নির্বাসিত সাহিত্যিকদের ভিড়ে গিজ গিজ করছে। সারা মেক্সিকো জুড়ে তখন এক বিশ্বজনীন আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে আর মাঝে মাঝে আমার বাড়িটা পৃথিবীর হৃদপিণ্ডের মতই সচল হয়ে উঠতো।

১৯৪১ সালের একটি ঘটনা এখানে লিপিবদ্ধ করা খুবই প্রয়োজনীয়। নাৎসীরা তখন লেনিনগ্রাদকে অবরুদ্ধ করে সোভিয়েত রাশিয়ার আরো ভিতরে এগোচ্ছে। জাপান তখন জার্মানির জয়লাভের কথা সুনিশ্চিত ভেবে নিজেদের সম্বন্ধেও সচেতন হয়ে উঠেছে। চারপাশে গুজব—এইবার এশিয়াতে রণাঙ্গনের শুরু এবং জাপানীরা যে কোনো সময়ে হানা দেবে। এটা প্রায় সুনিশ্চিত ছিলো যে, জাপান এক সময় অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে ঝটিকা অভিযানে রক্তাক্ত করবে এশিয়ার রণাঙ্গন।

কিছু কিছু জাপানী জাহাজ তখন বাণিজ্য সূত্রে প্রায়ই চিলিতে আসা যাওয়া করতো। খুচরো লোহা কেনা আর ছবি তোলা—এই ছিলো জাহাজের কর্মচারীদের কাজ। এই জাহাজগুলি জাপান থেকে চিলিতে আসা-যাওয়ার পথে পেরু, ইকুয়েডর এবং মেক্সিকোর ম্যানজালিনো বন্দরগুলি ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেতো। এই সব জাহাজে আমি নিজেও বারকয়েক যাওয়া-আসা করেছি।

তখনও আমি মেক্সিকোতে চিলির প্রধান বাণিজ্য দূত। সাতজন জাপানী—যাঁদেরকে দেখেই মনে হয়েছিলো শিক্ষিত উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ, এঁরা চিলিতে যাবার জন্য ছাড়পত্র চাইছিলেন। সকলেই আমেরিকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এখানে এসেছেন। কেমন যেন একটি সন্দেহজনক ছায়া দেখেছিলাম তাঁদের চোখে মুখে। চিলিতে যাবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তাঁরা জানালেন যে, চিলিতে পেঁছেই সেখানে

টকোপেলাতে অপেক্ষারত জাপানী জাহাজে চড়ে জাপানে ফিরে যেতে চান। আমি বলেছিলাম—'এতে অত তাড়া কিসের, সে জাহাজ তো মেক্সিকোর ম্যান্‌জানিলো বন্দর হয়েই ফিরে যাবে—সেটাই তো আরো সহজ হবে আপনাদের পক্ষে।'

আমার কথা শুনে নিজেদের মধ্যে তাঁরা সকলে চোখ চাওয়া-চাওয়ি ও ইসারা সেরে বললেন যে, জাপানী দূতের সঙ্গে কথা বলে তাঁরা জেনেছেন যে, এই জাহাজটি পথ পরিবর্তন করেছে এবং চিলি থেকেই জাহাজটি সোজা জাপানে ফিরে যাবে।

সমস্ত জিনিসটাই আমার কাছে কেমন যেন রহস্যজনক মনে হলো। হঠাৎ এঁরা আমেরিকা থেকে মেক্সিকোতে এসে চিলি হয়ে জাপানে ফিরতে চাইছেন কেন?—এবং সেই কারণে ছাড়পত্র পাবার জন্য এত তাড়াই বা কিসের! আর কেনই বা জাপানী জাহাজটি তার গর্ত ত্রিশ বছরের রাস্তা বদলে হঠাৎ চিলি থেকে সোজা জাপানে ফিরতে চায়? আমি ওঁদের বললাম—আমায় একটু সময় দিন, যাতে আমার দেশের সরকারের সঙ্গে কথা বলে নিতে পারি। কারণ এভাবে ছাড়পত্র দেবার অধিকার আমার নেই।

সেদিন রাত্রেই আমি আমার সন্দেহের কথা সকলকে জানালাম। বিশেষ করে ফ্রান্সের যে ক'জন দ্যগলপন্থী বন্ধু বান্ধব ছিলেন তাঁদেরকে এই জাপানী ভদ্রলোকদের কথা জানিয়েছিলাম, এও বলেছিলাম যে, আমার মনে হয় এঁরা সবাই জাপানী গুপ্তচর এবং জাপান যে যুদ্ধের আসরে অবতীর্ণ হতে চলেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার কথা তখন কেউই বিশ্বাস করেন নি, এমন কি, দ্যগলপন্থী বন্ধুরাও।

আমি ছাড়পত্র দিতে না চাইলেও সেই জাপানীরা আমার রাষ্ট্রদূতের কাছ থেকে পরদিনই ছাড়পত্র আদায় করে চিলিতে পেঁছে জাপানী জাহাজে চড়ে যথাসময়ে জাপানের উদ্দেশে রওনা হয়েছিলেন।

এই ঘটনার এক সপ্তাহ পরেই একদিন পার্ল হারবারের বোমার শব্দে বিশ্বের মানুষের নিদ্রাভঙ্গ ঘটলো।

একজন শম্বুক বিশারদ হিসাবে

কয়েক বছর আগে আমার দেশের খবরের কাগজে আমার বিশিষ্ট বন্ধু অধ্যাপক জুলিয়ান হাক্‌সলি সম্বন্ধে একটি খোস গল্প বেরিয়েছিলো। সান্‌তিয়াগো বিমান বন্দরে পেঁছে তিনি আমার খোঁজ করাতে অপেক্ষামান সাংবাদিকরা তাঁকে প্রশ্ন করলেন—'কবি নেরুদার সঙ্গে কি আপনি দেখা করতে চান'?

'—না না, আমি নেরুদা নামে কোনো কবিকে চিনি না। আমি শম্বুক বিশারদ নেরুদার সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

গল্পটি শুনে আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছিলাম, যদিও জানতাম আমায় উত্যক্ত করবার জন্যই তৈরি করা হয়েছিলো এটি। কারণ জুলিয়ান হাকস্‌লি তাঁর ভাই আলডুসের চেয়েও অনেক তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন, রসাত্মক তাঁর বাক্যালাপ। তাছাড়া বেশ কয়েক বছর ধরেই আমরা খুবই নিকট বন্ধু, কাজেই তিনি ভুল করতে পারেন না।

মেক্সিকোতে থাকার সময় সমুদ্রের ধারে ঘুরতে ঘুরতে এবং কখনও বা সমুদ্রের জলে ডুব দিয়ে আমি ঝিনুক কুড়িয়ে আনতাম। পরে কিউবা ও অন্যান্য জায়গাতেও আমি এই ঝিনুক কুড়িয়ে এনেছি। কখনও কখনও এখান-ওখান থেকে চুরি করেও এনেছি। —একটার পর একটা এই বর্ণাঢ্য আর দুষ্প্রাপ্য ঝিনুক, শঙ্খ প্রভৃতিতে আমার সমস্ত বাড়িটিকে প্রায় ভরিয়ে তুলেছিলাম। দক্ষিণ চীন থেকে শুরু করে কিউবা, ফিলিপিন, জাপান, বালটিক উপসাগর প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের সমুদ্রতট থেকে বহু বিচিত্র আর অপরূপ এই ঝিনুক সংগ্রহ করাটা ছিলো আমার অন্যতম প্রধান একটা নেশা।

প্রায় পনেরো হাজারের উপর এইসব ঝিনুক, শঙ্খ প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে সংগ্রহ করেছিলাম ঝিনুক আর শঙ্খ সম্পর্কিত নানান্ পুস্তক। এরপর এগুলি কয়েকটি বাক্সে ভরে নিয়ে একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করে এলাম। বিশ্ববিদ্যালয়কে কিছু দেওয়ার আনন্দে সেদিন আমার মনটা গর্বে ভরে উঠেছিলো। দক্ষিণ আমেরিকার অন্যান্য সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো আমার বিশ্ববিদ্যালয়ও খুবই যত্নের সঙ্গে এই উপহার গ্রহণ করেছিলো। পরে জেনেছিলাম মাটির নীচে গুদামঘরে সেগুলিকে রাখা হয়েছে এবং আজ পর্যন্ত সেগুলি আর কেউ দেখতে পায়নি।

আরাউ কেনিয়া

আমি আমার কর্মজীবনে যখন বহু দূর-দূরান্তের দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে গিয়ে থাকতাম তখন সামনের সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আমার একাকীত্বের সঙ্গী হিসাবে আমার চিন্তাগুলিকে নিয়ে নাড়াচাড়া করতাম। এর ফলে রাজদূতের চাকরীজীবনের অক্ষমতা আমাকে দুঃখ দিতো। দেশ থেকে আসা সরকারী নির্দেশনামা পালনকারী একজন ভৃত্য মাত্র, বিদেশে এসে আমার দেশের যেন একজন পুলিশ হিসাবে কাজ করছি! আমর উপর নির্দেশ ছিলো যাতে এশিয়ান, আফ্রিকান বা ইহুদি সম্প্রদায়ের কোনো মানুষ আমার দেশে যাবার ছাড়পত্র না পায়। অবাস্তব এই আদেশ পালন করতে অনেক মূল্যও আমাকে দিতে হয়েছিলো। আমি 'আরাউ কেনিয়া' নামক পত্রিকাটির প্রকাশনা আরম্ভ করেছিলাম। আমাদের পূর্ব পুরুষ—যাঁদের রক্ত আমাদের প্রত্যেকের দেহে প্রবহমান সেই বিরাট জাতির আদর্শ সংস্কৃতি প্রভৃতির উপরে গবেষণামূলক একটি চিত্র এই পত্রিকাটির প্রচ্ছদপট হিসাবে ছাপা হতো। ছবিটি ছিলো দাঁতের সাহায্যে তৈরি একটি জামাপরা একজন আরাউ কেনিয়ানের। আমার দেশের মন্ত্রী-পরিষদের কাছ থেকে সাবধানসূচক একটি পত্র পেলাম। পত্রটির মাধ্যমে আমাদের মহান্ জাতিকে অপমান করার জন্য কৈফিয়ৎ তলব করা হয়েছে। আমার ভাবতে অবাক লেগেছিলো যে, শুধু আমি নই, আমাদের রাষ্ট্রপতি ডন্ পেদ্রো সেদ্রার মুখের সঙ্গে প্রচ্ছদপটে ব্যবহৃত ছবিটির কি আশ্চর্য মিল রয়েছে!

সকলেই তো জানে যে, আরাউ কেনিয়ানরা এক সময়ে এক বিরাট জাতি হিসাবে খ্যাত ছিলো। ইতিহাস তো সব সময়ে বিজেতারাই লেখেন। কাজেই আরাউ কেনিয়ার

সংস্কৃতি, তার শৌর্য, অপরূপ সমাজব্যবস্থা সবই তো আজ বিজেতাদের মিথ্যা অহংকারের অসত্য অপলাপে ভরা। অদ্ভুত এই জাতিভেদ, বর্ণভেদ আমার কাছে দুঃসহ হয়ে উঠেছিলো। একজন শ্বেতচর্ম তার দেহের ফ্যাকাশে রঙের জন্য অশ্বেতকায় মানুষের উপর প্রভুত্ব করবে—এ ব্যবস্থাকে আমি কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারছিলাম না। সেই কারণে বিরক্ত হয়ে আমি একদিন পদত্যাগ করলাম। এখন অবশ্য বিশ্ব-পরিষদে কৃষ্ণকায় এবং পীতকায় মানুষ ধীরে ধীরে নিজ নিজ স্থান অধিকার করছেন—এতে আমি আশ্বস্ত হয়েছি।

রহস্য এবং ইন্দ্রজাল

আমি উপলব্ধি করেছিলাম নিপীড়িত জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী মেক্সিকো আমার উপস্থিতি বা সম্মতি ছাড়াই তার প্রাক্ কলম্বিয়ান্ যুগে একদিন ফিরে যাবে। যখন মেক্সিকোতে এসেছিলাম তখন সেখানকার শিল্প বা সাহিত্যের সঙ্গে তেমন একটা পরিচয় আমার ছিলো না। পরে পরিচয় হতে দেখলাম সেখানকার পরস্পরবিরোধী সংস্কৃতি সব নিজেদের ছায়াতেই নিজেরা বেড়ে উঠছে। কিন্তু বাইরে থেকে কোন মন্তব্য করলেই সমূহ বিপদ।

বিদায়ের আগে আমার সম্মানার্থে এক নৈশভোজের আসরে দু'একশো নয়, প্রায় হাজার তিনেক নিমন্ত্রিত অতিথিকে দেখেছিলাম। সেটাকে নৈশভোজ বলে মনে হয়নি, মনে হয়েছিল এক বৃহৎ জনসভার আয়োজন হয়েছে। বেশ কয়েকজন সভাপতি আমাকে অভিনন্দন পাঠিয়েছিলেন। আমেরিকার পরশ পাথর মেক্সিকো, প্রাচীন আমেরিকার সৌর পঞ্জিকার সূর্যরশ্মির ছবি, তার জ্ঞান বা রহস্য এ সবই মেক্সিকোর প্রস্তর গাত্রে ইতিহাসের জন্মের আগে থেকেই প্রোথিত হয়ে আছে।

এখানে সবই হয়, সব কিছুই ঘটতে পারে এখানে। বিরোধীদের দৈনিক খবরের কাগজটি নিয়মিত সরকারী অর্থ সাহায্য পেয়ে থাকে। এমন স্বৈরতন্ত্রী গণতন্ত্র কেউ কল্পনাই করতে পারেন না।

দুঃখজনক একটি ঘটনা মনে পড়ে। এক কারখানায় বেশ কিছুদিন ধরে ধর্মঘট চলছিলো। ধর্মঘটী শ্রমিকদের স্ত্রীরা একদিন মিলিত হয়ে ঠিক করলেন যে, রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করে তাঁদের দুরবস্থার কথা তাঁকে জানাবেন। ফুল কিনলেন রাষ্ট্রপতির জন্য। বাদ সাধলো প্রহরীরা—রাষ্ট্রপতির প্রাসাদে যেতে দিলো না। অনুনয়-বিনয় কোনো কিছুই প্রহরীদের টলাতে পারলো না, তাঁদের বলা হলো সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকে গিয়ে দাবীপত্র পেশ করার জন্য। মেয়েরাও নাছোড়বান্দা—তাঁরা সেখান ছেড়ে যাবেন না, অবস্থান শুরু করলেন সকলে। তারপরেই অবস্থানরত সেই নারীদের উপর হঠাৎ এক ঝাঁক গুলি ছুটে এলো রাষ্ট্রপতি প্রাসাদের স্তম্ভ থেকে। ছ-সাতজন মহিলা মুহূর্তে প্রাণ হারালেন এবং গুরুতর আহত হলেন কয়েকজন।

পরদিনই তাড়াহুড়ো করে, নিহত মহিলাদের কবর দেওয়া হলো।

ভেবেছিলাম বিরাট এক শোভাযাত্রা দেখবো, কিন্তু না—মাত্র কয়েকজন মানুষের

ভীড় চোখে পড়েছিলো। তবে হ্যাঁ, ইউনিয়নের নেতা—যিনি নিজেকে বিপ্লবী বলে জাহির করতেন তিনি এসে সমাধিস্থলে একটি বক্তৃতা দিলেন—যার মধ্যে জঘন্য এই হত্যাকাণ্ডের না ছিলো প্রতিবাদ, না ছিলো বিচারের দাবি—এমন কি ছিলো না কোনো ক্ষোভ, দুঃখ বা ক্রোধের চিহ্নমাত্র।

এর কয়েকদিন পরেই সবাই এই ঘটনার কথা ভুলে গেলেন, এমন কি এই হত্যাকাণ্ডের সমালোচনা করে কোনোরকম লেখাও প্রকাশ পায়নি কোনো সংবাদপত্রে।

মেক্সিকোর রাষ্ট্রপতি একজন অ্যাজটেক বংশীয় শাসক, ইনি ইংলণ্ডের রাজপরিবারের চেয়েও শুচিবায়ুগ্রস্ত। কাজেই তাঁর বিরুদ্ধে কোনোরকম সমালোচনা বা কটূক্তি করার সাহস কারুরই ছিলো না। অন্যথায় শাস্তি পেতে হতো। মেক্সিকোর মাটির তলায় ছড়িয়ে রয়েছে অ্যাজটেকের সংস্কৃতি ও শৌর্য—যাকে আগলে আছে ঐ বংশের পূর্ব-পুরুষের মাথার খুলি আর সেই খুলির খোঁজ আজও চলেছে।

একটি পথভ্রষ্ট চিলের মতো মেক্সিকো আমার রক্তপ্রবাহের সঙ্গে মিশে নিরন্তর প্রবাহিত হয়ে চলেছে আমার সমস্ত শরীরে। একমাত্র মৃত্যুই তার ডানা দুটোকে একদিন চিরকালের জন্য মুড়ে দেবে—সঙ্গে থাকবে আমার ঘুমন্ত সৈনিক-হৃদয়।

হায়! অন্ধকারে নিমজ্জিত আমার স্বদেশ

স্বেচ্ছায় আমার অবসর গ্রহণের পত্র আমার সরকার সানন্দেই গ্রহণ করলেন। এই কূটনৈতিক আত্মহত্যার পর গভীর আনন্দ নিয়ে দেশে ফিরে এলাম। আমি বিশ্বাস করি মাতৃভূমি হতে মূলোচ্ছেদ ঘটলে মানুষের জীবনে হতাশা আসতে বাধ্য, যে আলো দিয়ে সে তার আত্মাকে দেখে সেই আলোর পথে বাধার সৃষ্টি হয়। মাটির বুকে কান না রেখে, জলের ঝির-ঝির আওয়াজ না শুনে অস্পষ্ট ছায়ার চলাফেরা না দেখে আমি বাঁচতে পারি না। এই মাটির শিকড় আত্মার অন্তঃস্থলে পৌঁছে মাতৃস্নেহের করুণারসে আমাদের সঞ্জীবিত করে। কিন্তু চিলিতে পৌঁছানোর আগেই আরেক আবিষ্কার আমার কবিতায় এক নতুন ধারা সংযোজন করেছিলো।

পেরুতে নেমে সেখানকার ভগ্নস্তূপ মাকু-পিকু দেখতে গিয়েছিলাম। তখনও রাস্তা হয়নি, ঘোড়ায় চড়ে যেতে হলো। উঁচুতে উঠলাম, দেখলাম প্রাচীন সেই পাথরের ধ্বংসাবশেষগুলি, ঘন সবুজ বৃক্ষরাজি দ্বারা আবৃত সুউচ্চ চূড়া। শতাব্দীর খরস্রোতে ক্ষয়ে আসা নগর-দুর্গের ভগ্নাবশেষ। উইলকামারু নদীর

উপর দিয়ে ভেসে আসা ঘন সাদা কুয়াশার মধ্যে পাহাড়ের নাভিদেশে দাঁড়িয়ে নিজেকে সেদিন খুবই ক্ষুদ্র মনে হয়েছিলো। একদিন এখানে গড়ে উঠেছিলো এক প্রতাপান্বিত সাম্রাজ্য। আজ সেই সাম্রাজ্যই পরিত্যক্ত, মরুভূমির মতো পড়ে আছে। মনে মনে ভাবলাম—হয়তো একদিন আমিও এখানে ছিলাম। হয়তো আমার এই হাত দু'টি দিয়ে ওখানে বসে কত পাথর পরিষ্কার করে ঘষেমেজে সাজিয়েছি। অনুভব করেছিলাম—আমি চিলির, আমি পেরুর আমি আমেরিকার। এই উঁচু চূড়ার চারপাশে ছড়ানো মহিমান্বিত ভগ্নস্তূপের পাশে দাঁড়িয়ে আমার বিশ্বাসের মূল উৎস খুঁজে পেয়েছিলাম। আমার কবিতা লেখা চলছে ও চলবে।

জন্ম নিলো আমার আরেক কবিতা—'মাকু-পিকুর উচ্চতা'।

ক্ষারে পরিণত বিস্তীর্ণ প্রান্তর

১৯৪৩ সালের শেষাশেষি আমি আবার সান্তিয়াগোতে ফিরে এলাম। কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য একটি বাড়ি কিনলাম। শুরু হলো আমার নতুন জীবন। দেখলাম দেশের তেমন কোনো পরিবর্তনই হয়নি তখনো। সেই ঘুমন্ত গ্রাম আর তার প্রান্তর। এক দিকে খনি-শ্রমিকদের হৃদয়বিদারক দারিদ্র্য, অপরদিকে অভিজাত-শ্রেণীর ক্লাবঘরে আনন্দোচ্ছাস—এই দ্বিমুখী স্রোতের মাঝে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আমাকে নিতেই হবে এবং আমার এই সিদ্ধান্ত আমার জীবনে নিয়ে এলো একাধারে হয়রানি আর বিজয়-গৌরবের মুহূর্ত। কোনো কবি কি সেজন্য কখনো অনুশোচনা করেছেন? ক্যুরজিয়োঁ মালাপার্তে আমার সম্বন্ধে এক প্রবন্ধে লিখেছিলেন—'আমি সাম্যবাদী নই, কিন্তু আমি যদি চিলির কবি হতাম তাহলে আমিও পাবলো নেরুদার মতই হতাম। ক্যাডিলাক্ গাড়ির পাশে দাঁড়ানো ঠিক হবে—না যে মানুষগুলো বিদ্যালয়ের মুখও দেখেনি, যাদের পায়ে কখনও একজোড়া জুতোও জোটেনি তাদের পাশে দাঁড়াবে—এটা বেছে নিতেই হবে'। এই মুর্খ নগ্নপদ মানুষগুলো ১৯৪৫ সালের ৪ঠা মার্চ আমায় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্বাচিত করে পাঠালেন। আমার স্মৃতিতে চিরকালের জন্য এই গর্ব জাগ্রত থাকবে যে, চিলির সবচেয়ে কঠিন প্রান্তর তাম্র আর ক্ষারের খনি অঞ্চল থেকে হাজারো দরিদ্র মানুষ আমাকেই নির্বাচন করেছিলেন তাঁদের ভাষা আর বাণী সারা চিলিতে পৌঁছে দেবার জন্য।

এই রুক্ষ মরুভূমির মতো প্রান্তরের ছায়া ছিলো এখানকার মানুষের মুখে-চোখে। দাবদগ্ধ চেহারা, কালো চোখে ছিলো অবহেলিত একাকীত্বের তীক্ষ্ন, ক্লান্ত দৃষ্টি। অর্ধভুক্ত এই মানুষগুলির ঘরে ঘরে ঢুকে তাঁদের অপরিসীম পরিশ্রম ও তাঁদের আশা-আকাঙ্ক্ষা তাঁদের কোটরাগত চোখের উপর উপচে পড়তে দেখেছি, দেখে বুঝেছিলাম এদের ভাষা আর আশাকে উপযুক্ত জায়গায় পৌঁছে দেওয়া আমার পক্ষে কষ্টসাধ্য। কিন্তু আমার কবিতা এই সব মানুষের সঙ্গে নিবিড়তা এনে দিয়েছিলো এবং আমার স্বদেশবাসীর সঙ্গে আমরণ ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আমায় আবদ্ধ করেছিলো।

আমার সঠিক মনে নেই, প্যারী অথবা প্রাগের বন্ধুদের বিশ্বকোষসুলভ জ্ঞান সম্পর্কে আমার কিছুটা সন্দেহ জেগেছিলো। তাঁরা বেশিরভাগই সাহিত্যিক এবং বাকীরা সব ছাত্র। চিলি সম্পর্কে অনেক আলোচনা তাঁদের সঙ্গে করেছিলাম। চিলির মানুষ হিসাবে আমি তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—'আচ্ছা, আপনারা কি আমার দেশ সম্পর্কে কিছু জানেন? অবশ্য চিলি এখান থেকে অনেক দূর। যেমন ধরুন—চলাফেরার জন্য কি শকট ব্যবহার করি? হাতি, গাড়ি, রেলগাড়ি, বিমান, সাইকেলগাড়ি, উট না শ্লেজ গাড়ি?' দেখলাম বেশীর ভাগ শ্রোতাই খুব আন্তরিকতার সঙ্গে উত্তর দিলেন—'হাতি'!?

কিন্তু চিলির কোথাও হাতি বা উট কিছুই নেই। দক্ষিণ মেরুর তুষারস্তূপ থেকে শুরু করে উপরে উঠতে উঠতে নুনের খনি ছাড়িয়ে মরুভূমির উপত্যকায় যেখানে কোনো যুগেই বৃষ্টি হয় না এমন একটা দেশকে কী আশ্চর্যই না মনে হয়। এই বুনো প্রান্তর, এই তামা আর ক্ষার-খনির শ্রমিকের যাঁরা একটি গোটা জামা গায়ে পরতে পান না তাঁদের প্রতিভূ হিসাবে বহুদিন আমায় এই মরুপ্রান্তরে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। এই মরুপ্রান্তর আর পাহাড়ের নাভিদেশ থেকে নীচে নেমে এসে মনে হতো চাঁদে এসে পেঁছেছি। যে দেশের মাটির তলায় প্রকৃতির সম্পদ লুকিয়ে ছিলো সেখানকার মানুষের অমানুষিক পরিশ্রম, কষ্টসাধ্য জীবন আর সীমাহীন দারিদ্র্য সব সময়েই চোখে লাগতো—মনে হতো এটা যেন অন্য কোনো এক উপগ্রহ।

আমি এসেছিলাম প্রজাতন্ত্রী এই রাষ্ট্রের আর এক প্রান্ত থেকে যেখানে সবুজ বৃক্ষের বনরাজি। আমার ছেলেবেলা কেটেছে বৃষ্টি আর তুষারপাতের সঙ্গীত শুনে। কাজেই আমার পক্ষে এই রুক্ষ কঠিন মরুপ্রান্তরের মানুষের ভাষা ও বেদনা বোঝা এবং তাকে লোকসভায় পেঁছে দেওয়া দুষ্কর ছিলো। তবুও পিছিয়ে আসিনি।

বহু বছর ধরে আমার দেশের এই সম্পদ বিদেশীদের দখলে ছিলো। বৃটিশ আর জার্মান হানাদারেরা এই খনিজ সম্পদ লুটেছে, বিভিন্ন ব্যবসা করেছে, কিন্তু শ্রমিকদের কোনো কথা কোনো দাবি তারা শুনতে চায়নি। এখানে কোনো রাজনৈতিক দল বা সমাবেশ ছিলো নিষিদ্ধ, কাগজ বা ইস্তাহারও। এমন কি ছাড়পত্র ছাড়া এসব জায়গাতে প্রবেশও নিষিদ্ধ ছিলো।

মারিয়া এ্যালেসার পটাশিয়াম নাইট্রেট খনির শ্রমিকদের সঙ্গে একদিন বিকালে আমার কথা হচ্ছিলো। কারখানার মেঝেটা কাদামাটি আর অসংঘটিত ক্ষারে প্যাচ্ প্যাচ্ করছিলো। ছোটো একটা পাটাতনের উপর দিয়ে হাঁটবার সময়ে সেখানকার শ্রমিক ইউনিয়নের নেতাটি আমাকে জানালেন যে, চলাফেরার জন্য কাঠের ছোট্ট এই পাটাতনের দাবি জানাতে পনেরোবার ধর্মঘট, আট বছর দরবার এবং সাতজন শ্রমিককে প্রাণ দিতে হয়েছে।

কয়েক বছর আগে অবস্থা আরো ভয়াবহ ছিলো। ১৯০৬ সালে এই খনির সমস্ত শ্রমিক একত্রিত হয়ে তাঁদের দাবি-দাওয়া জানাবার জন্য মিছিল করে শহরাভিমুখে যেতে শুরু করলেন। ঠিক করেছিলেন রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করে দাবি-সনদ তাঁর হাতে তুলে দেবেন। যেতে যেতে পরিশ্রান্ত ক্লান্ত শ্রমিকেরা শহরের ধারের একটি স্কুলের সামনের চত্বরে বসে বিশ্রাম করছিলেন। হঠাৎ সেনাবাহিনীর এক কর্নেল

একদল সৈন্য নিয়ে সেখানে এসে তাঁদের ঘিরে ধরলেন এবং গুলি চালাতে আরম্ভ করলেন, এর ফলে প্রায় ছ'হাজার শ্রমিক প্রাণ হারালেন। রাষ্ট্রপতির কাছে দাবি-সনদ পেশ করা তাঁদের আর হয়ে ওঠেনি।

১৯৪৫ সালে অবস্থা যদিও অনেকটা ভালো ছিলো, কিন্তু আমার মনে হতো আবার ধ্বংসের দিন আগতপ্রায়। যেমন একবার আমার উপর এক নিষেধাজ্ঞা জারী করা হলো—আমি যেন শ্রমিক ইউনিয়নের অফিসঘরে কোনো বক্তৃতা না দিই। তাই বাধ্য হয়ে তীব্র গরমের মধ্যে মরুপ্রান্তরে দাঁড়িয়ে শ্রমিকদের কাছে আমায় বক্তৃতা দিতে হলো। প্রায় দুশোজনের মতো শ্রমিক জমায়েত হয়েছিলেন। হঠাৎ একটা গাড়ির চাকার আওয়াজে তাকিয়ে দেখি আমার কাছ থেকে প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে সেই গাড়িটা এসে থামলো। তারপর গাড়ির ঢাকা খুলে একটি মেশিনগানের নল আমার দিকে তাক করে রেখে একজন অফিসার দাঁড়িয়ে রইলেন। আমি কিছু গ্রাহ্য না করে আমার বক্তৃতা চালাতে থাকলাম। আমার কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেই মেশিনগানটা আমার দিকেই তাক করা ছিলো। এইতেই সেদিন বুঝেছিলাম—আমারও ধ্বংসের কালরাত্রি আগত প্রায়।

সাম্যবাদের উপর শ্রমিকদের এ বিশ্বাসের সবটুকু কৃতিত্বই ছিলো লুই এ্যামিলো রিকাবারেনের—যিনি এই শ্রমিকদের স্বার্থে মরুভূমির মধ্যে অক্লান্ত পরিশ্রম ও সংগ্রাম চালিয়েছিলেন। একজন সাধারণ শ্রমিক হিসাবে জীবন শুরু করে পরে এক বিপ্লবী ও তারপরে কম্যুনিস্ট আন্দোলনের একজন নেতা হিসাবে তাঁর আবির্ভাব শ্রমিকশ্রেণীর কাছে এক অতিকায় গ্রীক্ দেবতার কল্প-মূর্তির আবির্ভাবের মতো দেখা দিয়েছিলো। শ্রমিক ইউনিয়ন আর ফেডারেশনে প্রায় সমস্ত দেশটা তিনি ভরে দিয়েছিলেন। জাগ্রত শ্রমিকদের কাছ থেকে যৎসামান্য অর্থ গ্রহণ করে তিনি সারা দেশজুড়ে প্রায় কুড়িটি শ্রমিক-সংবাদপত্র চালাতেন। তাঁর গড়া অনেক ছাপাখানা দেখেছি আমি নিজে। ছাপাখানাগুলির বেশির ভাগই পুলিশী তাণ্ডবে চূর্ণ হয়ে গিয়েছিলো, এগুলিকে অতি যত্নে আবার তিনি গড়ে তুলেছিলেন।

আমার এই দীর্ঘ ভ্রমণ-পথে কখনও মাঠে, কখনও কোনো ছোটো বাড়িতে আবার কখনও বা শ্রমিকদের ঝুপড়ি বা মাটির ঘরে থেকেছি। যেখানেই গিয়েছি পতাকা আর নিশান হাতে শ্রমিকরা এগিয়ে এসেছেন—আমার যত্ন করেছেন, খাওয়া থাকার ব্যবস্থা করেছেন। দিন-রাত শ্রমিক-ছেলে মেয়েরা আমার সঙ্গে দেখা করে তাঁদের অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ও দারিদ্র্যের কথা আমাকে শোনাতেন। মাঝে মাঝে তাঁদের অভিযোগগুলি একজন বহিরাগতের কাছে খুব হাস্যকর বা অসম্ভব মনে হতে পারতো। যেমন একবার চায়ের অভাবে শ্রমিকরা ধর্মঘট করে বসলেন। আসলে চিলির মানুষ সারাদিনে বেশ কয়েকবার চা না খেয়ে থাকতে পারেন না। সময় সময় নম্রপদ শ্রমিকরা আমাকে প্রশ্ন করতেন, এই বিদেশী বস্তুটি এত দুর্লভ কেন, তাছাড়া এ জিনিস পান না করলে মাথাই বা ধরে কেন?

নির্বাক দেওয়ালের মাঝে আবদ্ধ নিঃসঙ্গ এই মানুষগুলি তাঁদের সীমাহীন একাকীত্বের মধ্যে বাস করলেও রাজনীতি সম্বন্ধে খুব সচেতন ছিলেন। প্রায়ই যুগোস্লাভিয়া বা চায়নার কোথায় কী ঘটছে এই জাতীয় প্রশ্নের উত্তরও তাঁদের কাছে

দিতে হতো আমায়। সমাজবাদী রাষ্ট্রগুলির কোথায় কি ঘটছে, বিপ্লব কোন্ দেশে সমাজবাদকে ত্বরান্বিত করে তুলছে—এ সকল প্রশ্নেরও উত্তর দিতে হয়েছে আমাকে।

হাজারো জমায়েতে আমার কাছে অনুরোধ আসতো কবিতা পড়ে শোনাবার জন্য। মাঝে মাঝে প্রশ্ন জাগতো—আমার সমস্ত বা কিছু কবিতার প্রকৃত অর্থ এঁরা বুঝতে পারেন কিনা? কিন্তু সে যাই হোক, দেখতাম এক সশ্রদ্ধ নীরবতার সঙ্গেই তাঁরা আমার কবিতা পাঠ শুনতেন।

মাঝে মাঝে রাত্রের খাবারের সঙ্গে জুটতো মহামূল্যবান ও দুর্লভ মুরগীর মাংস যা এই দরিদ্র শ্রমিকদের কাছে ছিলো স্বপ্ন। নয়তো বেশির ভাগ দিনই রান্না হতো গিনিপিগ—ল্যাবোরেটরীর প্রাণী—অবস্থা বিপাকে এরা শ্রমিকদের খাদ্যে পরিণত হয়েছিলো।

যে সব বাড়িতে রাত্রে শুতাম, সেখানকার গৃহস্থরা গদি-তোশক যে কি জিনিস তা জানতেন না। বিছানাহীন মেঝে বা কাঠের উপরে শুয়ে কাটাতেন তাঁরা, তাঁদের কাছে বিলাস-শয্যা ছিলো শূন্য মেঝে বা কাঠের উপরে মোটা সাদা চাদর বিছিয়ে দেওয়া, তাও হতো কেবল অতিথিদের জন্য। কিন্তু এতেই বেশ শান্তিতে ঘুমোতে পারতাম। সারাদিনের পরিশ্রমের পর আমরা দশ-বারোজন শ্রমিক-দরদী একই সঙ্গে শুতাম এবং অল্পক্ষণের মধ্যে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়তাম সকলে। দিনের বেলায় যে মরু-প্রান্তর শুষ্ক ভাস্বর জ্বলন্ত এক টুকরো অঙ্গারের মতো লাগতো—রাত্রে হাজার তারকাখচিত মুকুট মাথায় কালো আকাশের নীচে কি শান্ত আর ঠাণ্ডাই না হয়ে উঠতো সে।

আমার কবিতা আমার জীবন চিলির খরস্রোতা জলের ধারাটিকে সঙ্গে নিয়ে দক্ষিণ আমেরিকায় জন্মলাভ করে আমেরিকার খরস্রোতা একটি নদীর মতো বয়ে চলে। সেই নদীর দুই তটে যা কিছু ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে, যা কিছু জন্মেছে সবই সে গ্রহণ করে আপন ধারায় বয়ে নিয়ে সমুদ্রে এসে মিশ খেয়েছিলো। আসক্তি, রহস্য, ভালোবাসা—সব কিছু নিয়ে সে মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করেছিলো।

আমাকে সংগ্রাম করতে হয়েছে, কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে, আমাকে ভালোবাসতে আর গান গাইতে হয়েছে। এই পৃথিবীর জয় পরাজয়ের ভাগ আমাকেও নিতে হয়েছে। রুটি আর রক্ত—দুইয়েরই আস্বাদ আমি পেয়েছি। একজন কবি তাঁর জীবনে এর চেয়ে বেশি কী আশা করতে পারেন? আমার সমস্ত পছন্দ-ভালোবাসা-অশ্রু অথবা চুম্বন—আমার নিঃসঙ্গতা, আমার বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ—আমার কবিতার মধ্যে সব কিছুই বেঁচে রয়েছে। কারণ আমি আমার কবিতাকে আমার জীবনের সব কিছু দিয়ে লালন করেছি। যদি কোনো পুরস্কার পেয়ে থাকি—যে পুরস্কার প্রজাপতির মতই ক্ষণস্থায়ী বা পরাগের মতো ক্ষণভঙ্গুর—তার চেয়েও বিরাট পুরস্কার আমি অর্জন করেছি যা হয়তো কিছু লোকের কাছে উপহারের বস্তু, খুব কম লোকেই যা অর্জন করতে পেরেছেন; কণ্টকর শিক্ষানবিশীর মধ্যে আমায় বহু খুঁজে লিখিত শব্দের বহু জটিল ও সর্পিল পথের মধ্য দিয়ে মানুষের কাছে পেঁছে 'দেশের মানুষের কবি' হিসেবে পরিচিতি লাভ করতে হয়েছে।—এটাই আমার সবচেয়ে বড় পুরস্কার।

আমার পুরস্কার লাভের অতি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সেদিন রচিত হয়েছিলো—

যেদিন লোটা কয়লাখনির একজন শ্রমিক মাটির ভিতর থেকে এসে সূর্যালোকে দাঁড়ালেন, দেখে মনে হলো যেন নরক থেকে বেরিয়ে এলেন—কালিমাখা বিবর্ণ তাঁর মুখ, ধুলো লাগা চোখ দুটো লাল আর ফোলা ফোলা। তিনি তাঁর রুক্ষ-কঠিন হাতটি বাড়িয়ে আমার হাতখানি সজোরে নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে আমায় বলেছিলেন—'ভাই, আমি তোমাকে বহুযুগ হতে চিনি। আমার কবিতার মাথায় সেদিন উঠেছিল তাঁর দেওয়া সম্মানের মুকুট। সেই বিবর্ণ প্রান্তরে সেদিন আমার কবিতা চিলির রাত্রির তারকা আর বাতাসকে সাথী করে শ্রমিকদের বলে এসেছিলো, তোমরা একলা নও—তোমাদের সাথে রয়েছেন একজন কবি, যাঁর চিন্তা তোমাদের সমস্ত দুঃখ-কষ্টের মধ্যে সব সময়ে মিশে রয়েছে।

১৫ই জুলাই ১৯৪৫ সালে চিলির কম্যুনিস্ট পার্টির সক্রিয় সভ্য হিসাবে আমি যোগদান করলাম।

গনজালেস্ ভিদেলা

যে তিক্ত অবিচারগুলিকে আমি ও আমার কমরেড বন্ধুরা ব্যবস্থাপক সভায় ব্যক্ত করতে চাইতাম, সেগুলি সেখানে পেঁছাতে রীতিমতো কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে আমাদের। ব্যবস্থাপক সভার চারপাশের দেওয়ালটা ছিলো যেমন ভীষণ মোটা, তার সভাগৃহটি ছিলো তেমনি আরামদায়ক, কাজেই দুস্থ মানুষের কান্না সেই সভায় কখনই পেঁছাতো না। আমার বিরোধীরা তাঁদের দেশপ্রেম ও স্বদেশভক্তির বড়ো বড়ো বুলি-ভরা বক্তৃতাতে সভাগৃহ যখন ভরিয়ে তুলতেন তখন তাঁদের সেই অসার আর হৃদয়হীন কথাগুলি আমার কাছে নিরর্থক মনে হতো।

হঠাৎ এক সময়ে যখন জানলাম যে, গনজালেস ভিদেলা রাষ্ট্রপতি-পদপ্রার্থী তখন আমাদের মনে একটু আশার উদ্রেক হলো। কারণ তিনি জাতীয়তাবাদী নেতা হলেও তাঁর অপূর্ব জ্বালাময়ী বক্তৃতা এবং ন্যায় বিচারের প্রতিশ্রুতি তাঁকে বেশ জনপ্রিয় করে তুলেছিলো। তাঁকে সমর্থন করার জন্য দেশের সর্বত্র প্রচার চালিয়েছিলাম, দেশবাসীকে অনুরোধ জানিয়েছিলাম ভিদেলাকে নির্বাচিত করার জন্য। শেষ অবধি বিপুল ভোটে জয়লাভও করেছিলেন তিনি। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে, রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবার কয়েক মাসের মধ্যেই অকল্পনীয় পরিবর্তন ঘটলো গনজালেসের চরিত্রে। তিনি অভিজাত শ্রেণীর এক ধনীর কন্যাকে বিবাহ করলেন। এবং ক্রমে ক্রমে ভিদেলা ক্ষমতার লোভে মত্ত হয়ে উঠলেন, পরিণামে পরিবর্তিত হলেন বিপুল ক্ষমতাশালী এক রাষ্ট্রপতিরূপে।

দক্ষিণ আমেরিকার অন্যান্য স্বৈরতন্ত্রী একনায়কদের সঙ্গে গনজালেসের তফাৎ ছিলো অনেক। অন্যান্য যাঁরা স্বৈরতন্ত্রীরূপে নিজেদের চিহ্নিত করেছিলেন, প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন—যেমন বলিভিয়ার মেলগারেজো বা ভেনেজুয়েলার জেনারেল লোপেজ, তাঁরা এসেছিলেন বুলেটের জোরে এবং তাঁদের মধ্যে সেনানী সুলভ নিয়মানুবর্তিতা ছিলো, শাসন ছিলো—কিন্তু গনজালেসের রূপান্তরিত স্বৈরতন্ত্র জন্ম নিয়েছিলো স্বল্পালোকিত কফি হাউসের কফি ও চা-এর ধোঁয়ার নীতি থেকে।

কাজেই চারিত্রিক দুর্বলতা আর তুচ্ছ কারণে সার্কাস-ক্লাউনদের মতো ব্যবহারের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছিলো স্বৈরতন্ত্রী শাসন।

আমেরিকার প্রাণীকুলে একনায়কেরা বিরাট বিরাট এক একটি কুমীর—যারা প্রাগৈতিহাসিক সামন্ততন্ত্রের জীবিত বা বিদ্যমান চিহ্ন বিশেষ। চিলির এই জুড়াস্ ভদ্রলোক ছিলেন একজন সৌখীন অপেশাদার প্রজাপীড়ক, কুমীরকুলে তাঁকে বিবর্তিত এক গিরগিটি বলা চলে। চিলির প্রভূত ক্ষতি ইনি করেছিলেন, বহু বছরের জন্য পিছনে ঠেলে দিয়েছিলেন দেশকে। সেদিন চিলির মানুষ লজ্জিত ও বিহ্বল হয়ে একজন আর একজনকে প্রশ্ন করেছিলেন—এই ব্যক্তিটিকেই কী আমরা রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন করেছিলাম?

এই বাজীকর মানুষটি সব দিকেই ঘুরতে পারতেন। প্রয়োজনের সময় তাঁর বামপন্থী মার্কা মিথ্যা বুলি হাসির খোরাক যোগাতো। এই সার সত্যটি দেশবাসী যখন বুঝতে পারলো তার আগেই রাজনৈতিক বন্দীর ভিড়ে জেলখানাগুলো পূর্ণ হয়ে উঠেছে। এখন এক নতুন রাজত্ব কায়েম হলো—স্বদেশী পুলিশ রাজত্ব। রাস্তা একটিই খোলা রইলো—সেটা হচ্ছে প্রকৃত সময়ের জন্য অপেক্ষা করা এবং সেই সময়কে ত্বরান্বিত করার জন্য আত্মগোপন করে ভব্যতা ও শান্তি ফিরিয়ে আনার কাজে সচেষ্ট হওয়া।

গনজালেস্ ভিদেলীর বহু বন্ধু ও সহকর্মীকে তাঁর এই রূপান্তর মেনে নিতে না পারার জন্য জেলে যেতে হলো। আসলে সেই ধনী অভিজাতকুল তাঁকে এবং তাঁর সরকারকে উদরসাৎ করলো, যেমন তারা আগেও করেছে। অবশ্য এবার হজম করাটা একটু কষ্টসাধ্য ছিলো। কারণ, গোটা চিলি তখন আহত ও স্তম্ভিত।

আমেরিকার ছত্রছায়ায়, আমাদেরই ভোটে নির্বাচিত আমাদের এই রাষ্ট্রপ্রধান একটি রক্তচোষা বাদুড়ে পরিণত হয়েছিলেন। মনে হয় তাঁর বিবেক হয়তো তাঁর রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিলো। কিন্তু তাঁর প্রাসাদের বাইরেই ছিলো তাঁর নিজস্ব ভৃত্যাবাস আর বেশ্যালয়—কারপেট এবং আয়নায় যার জমি থেকে দেওয়াল পর্যন্ত আবৃত হয়েছিলো অস্বাভাবিক কাম প্রবৃত্তির নিবৃত্তির জন্য। এই ঘৃণ্য মানুষটির মনটিও ছিলো বাঁকা এবং ক্রূর। একবার কয়েকজন শ্রমিক নেতাকে নৈশভোজে ডেকে যেভাবে তাঁর কম্যুনিস্ট-বিরোধী মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন তা ভাবা যায় না, অবিশ্বাস্য মনে হয়। নৈশভোজের পর অতিথিদের সঙ্গে সঙ্গে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এসে তাঁদের সঙ্গে আলিঙ্গন করে চোখের কয়েক ফোঁটা জল মুছতে মুছতে তিনি বললেন, 'আমি কাঁদছি কারণ এই মাত্র আমি আপনাদের সবাইকে বন্দী করার আদেশ দিয়েছি। আমার এই দরজার বাইরে গেলেই আপনারা বন্দী হবেন।—তারপর জানি না। আর কোনদিন আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে কিনা।'

দ্বিধাবিভক্ত শরীর

ধীরে ধীরে আমার বক্তৃতা তীব্র হতে লাগলো। ভিড়ে ভর্তি ব্যবস্থাপক সভা নিস্তব্ধ হয়ে আমার বক্তৃতা শুনতো। আমাকে তাড়ানোর ব্যবস্থা হলো, পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হলো আমায় গ্রেপ্তারের। কিন্তু আমাদের অর্থাৎ কবিদের শরীরে অনেক আগুন আর ধোঁয়া জমা আছে। এই আগুনে ধোঁয়া দিয়েই আমার লেখা শুরু হলো। আমার চারপাশের ঘটনাবলীর সঙ্গে প্রাচীন আমেরিকার এক ঐতিহাসিক সাদৃশ্য রয়েছে। আমার সেই আত্মগোপন আর বিপদের বছরে আমার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রচনা 'ক্যাণ্টো জেনারেল' লেখা শেষ করলাম।

এক দরজা থেকে আর এক দরজায় যাওয়া শুরু হলো। সবাই দরজা খুলে আমায় অভ্যর্থনা জানিয়ে আশ্রয় দিলেন। এই সব মানুষদের আমি চিনতাম না, তাঁরা আমাকে দু'দিন তাঁদের বাড়িতে আশ্রয় দেওয়ার ইচ্ছায় ব্যাকুল হয়ে উঠতেন। কয়েক ঘণ্টা থেকে কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত তাঁরা আমাকে আশ্রয় দিতেন। মাঠ, ঘাট, বন্দর, শহর— তাঁবুতে আমি ঘুরে বেড়িয়েছি; কৃষক ডাক্তার উকিল নাবিক এবং খনি-শ্রমিকদের সঙ্গেও আমি দিনের পর দিন কাটিয়েছি।

আমার দেশের সর্বত্রই একটি জনপ্রিয় লোক-সঙ্গীত আছে যার বিষয়বস্তু হচ্ছে 'দ্বিধাবিভক্ত শরীর'। এই জনপ্রিয় লোক-সঙ্গীতের লেখক মনে করতেন তাঁর দুটি পা এক জায়গায়, তাঁর মূত্রগ্রন্থি আরেক স্থানে—ইত্যাদি ভাবে তিনি বোঝাতে চাইতেন তাঁর শরীরের বিভিন্ন অংশ দেশের বিভিন্ন স্থানে তিনি রেখে এসেছেন। ওই সময়টায় আমারও ঠিক তাই মনে হয়েছিলো। উষ্ণ হৃদয়ের যে সব জায়গাগুলিতে দিন কাটিয়েছিলাম তার মধ্যে ভালপারাইসোর একটি ছোট্ট পাহাড়ের ধারে দু'কামরা যুক্ত বাড়িটিকে ভুলতে পারবো না। একটি ঘরের আধখানায় আমি থাকতাম আর তার জানলার একাংশ দিয়ে বন্দর দেখতাম। সেই ছোট্ট চিলেকোঠার ঘর থেকে রাস্তা দেখা যেতো। রাত্রে স্বল্পালোকিত রাস্তার ধারে মানুষের চলাফেরা আর ভাঙাচোরা দোকানগুলির দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতাম। একখানি ঘরের এক পাশে বন্ধ থেকে থেকে কৌতূহলের অবসর আমার ছিলো না। নানান্ কল্পনা আর অনুমানের উভয় সংকটে আমার সময় কাটতো। ভাবতাম ঐ যে একজন পথচারী একটি দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে অতক্ষণ ধরে কি দেখছেন?—কি এমন মনোমুগ্ধকর সামগ্রী ঐ দোকানে আছে? মাঝে মাঝে দেখতাম গোটা একটি পরিবার এমন কি মায়ের কোলের বাচ্ছাটি পর্যন্ত অবাক বিস্ময়ে ঐ দোকানটিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কি যেন দেখছে!

দু'মাস পরে শুনেছিলাম ওটা একটা জুতোর দোকান। সেদিন বিশ্বাস হলো— জুতোই মানুষের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় সামগ্রী। তারপর আমার অনেক কবিতায় জুতোর শব্দ ধ্বনিত হয়েছে। যদিও জুতোকে আমার কবিতার অঙ্গ হিসাবে আমি কোনদিন ভাবিনি।

মাঝে মাঝে বাড়িতে অতিথিরা আসতেন, নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা

চালাতেন। কিন্তু কেউ জানতো না একটা মোটা কাগজের হাল্‌কা দেওয়ালের ওপারে একজন কবি আত্মগোপন করে রয়েছেন—যাঁকে ধরার জন্য সরকারের পুলিশ রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।

শনিবার সন্ধ্যায় অথবা রবিবার সকালে এই বাড়ির মেয়েটির প্রেমিক প্রবর আসতেন দেখা করতে। মেয়েটির হৃদয় ছিলো তার, কিন্তু সর্বস্ব তখনও সে পায়নি। সে ছিলো একজন সাধারণ শ্রমিক। জানলার ফাঁক দিয়ে দেখতাম কারখানা থেকে বেরিয়ে সাইকেলে চড়ে সে আসতো বাড়িটিতে গুন গুন করে গান গাইতে গাইতে। আমার শান্তিময় পরিবেশে সে ছিলো এক আতঙ্ক! আতঙ্ক এই জন্য যে, আমার কাছ থেকে মাত্র কয়েক হাত দূরে মেয়েটির সঙ্গে সে প্রেম করতো। মেয়েটি যদিও পার্কে বা সিনেমায় যাবার জন্য তাকে বলতো, তবু সে ঘরে বসে থাকাটাই বেশি পছন্দ করতো। আর আমি অভিশাপ দিতাম ঘর-কুনোটাকে। যে বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলাম সেই বাড়ির মাত্র কয়েকজনই আমার পরিচয় আর আত্মগোপনের কথা জানতেন। মা, মেয়ে ও ছেলে। ছেলেটি নাবিকের কাজ করতেন। তাঁদের কাছেই শুনেছিলাম যে, একটি পুরোনো জাহাজ ভেঙে বিক্রি হচ্ছে আর সেই জাহাজের অগ্রভাগের একটি সুন্দরী গ্রীক্ নারীমূর্তি ছেলেটি চুরি করে নিয়ে এসে নীচের গুদাম ঘরে রেখে দিয়েছে। আজ এই অনুস্মৃতি লিখতে বসে সমুদ্রতীরের সেই বাড়ি সেই ঘরের সঙ্গে কাঠের উপর খোদাই করা সেই অপরূপ নারীমূর্তিটির কথা মনে এলেই মনে হয় সে যেন তার ঐকান্তিক কামনাপূর্ণ সৌন্দর্যময় দৃষ্টি নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

ঠিক ছিলো যে আমি একজন নাবিকের সঙ্গে গোপনে জাহাজে গিয়ে তাঁর কেবিনে আত্মগোপন করে থাকবো। কলার ঝুড়ির ফাঁকে, তারপর জাহাজ যখন গুয়ায়াকুইল বন্দর ছাড়িয়ে যাবে তখন হঠাৎ একজন সুসজ্জিত যাত্রী হিসাবে ঠোঁটে বড় একটা চুরুট চেপে আমার আবির্ভাব হবে। আমার যাওয়ার দিন এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে একটি সুন্দর জমকালো স্যুট আমার জন্য তৈরি হয়ে এলো। স্যুট দেখে সেদিন আমার খুব হাসি পেয়েছিলো। বাড়ির মেয়েরা তখন 'গন উইথ দি উইন্ড' সিনেমাটি দেখে ক্লারক্ গেবেলের মতো ঢঙে ঐ স্যুটটি তৈরি করিয়েছিলেন, ঝোলা ডব্‌ল ব্রেস্ট কোট—হাঁটুর কাছে চাপা ট্রাউজার। ওদের নাচের আসরের ক্যারিবিয়ান পোশাকই ফ্যাশনের শেষ কথা। আমি স্যুটটিকে সরিয়ে রেখে দিলাম, জীবনে কোনদিনও পরার সুযোগ আর আমার হয়নি। জাহাজের গুপ্ত ঘর থেকে বেরিয়ে কলার ঝুড়িতে চড়ে গুয়ায়াকুইলে পেঁাছে নকল ক্লারক গেবেল সাজার সুযোগ আমার হয়নি। আমায় যেতে হলো উল্টো রাস্তায়। চিলির দক্ষিণে—আমেরিকার বহুদূরে দক্ষিণে পর্বতমালা পেরিয়ে গোপন পথে।

জঙ্গলের রাস্তা ধরে

রিকারডো ফনসেকা তখন আমার পার্টীর প্রধান সম্পাদক। আমার মতো তিনিও ছিলেন দক্ষিণের ঠাণ্ডা হাওয়ার মানুষ। মুখে হাসি লেগে থাকলেও তিনি ছিলেন খুবই কঠিন। আমার আত্মগোপন, পর্যটন—আমার লেখা প্রচার পুস্তিকা, এমন কি আমার যাতায়াত ও থাকার সমস্ত খবরই তিনি নিজে রাখতেন। এই দীর্ঘ দেড় বৎসরের আত্মগোপনকালে আমি কোথায় থাকি কিভাবে থাকি এবং কি খাই তা একমাত্র ওই প্রাণচঞ্চল সৎ আদর্শবান এবং পারটির একনিষ্ঠ কর্মী ফনসেকা-ই জানতেন। কিন্তু ধীরে ধীরে তাঁর স্বাস্থ্য ভাঙন ধরলো, মুখের হাসি অদৃশ্য হলো—কোটরগত চোখ থেকে একটি নীলাভ শিখার আভা ছড়িয়ে আমাদের চিরদিনের জন্য ছেড়ে তিনি চলে গেলেন।

আমাদের পার্টিতে কখনও ব্যক্তিপূজা হয়নি এবং ব্যক্তিপূজায় আমরা বিশ্বাসও করতাম না। চিলির মাটি জল হওয়া আর মানুষকে ভালোবাসাই ছিলো আমাদের পার্টির মূলমন্ত্র, তাঁদের মুক্তি-কামনাই ছিলো আমাদের মূল লক্ষ্য।

রিকারডো ফনসেকা পরে যিনি আমাদের পার্টির নেতৃত্বে এলেন তিনি ভালপারাইসোর একজন নাবিক। নীরস কর্কশ একজন মানুষ। প্রথম প্রথম এঁকে দেখে ভুল ধারণা হবার সম্ভাবনা ছিলো—একজন প্রতারক বলে। এঁর নাম হচ্ছে গালো গনজালেজ।

পার্টি নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও স্তালিনের রাজনৈতিক প্রভাব চিলির আবহাওয়াতে এসেও ধাক্কা দিয়েছিলো। গনজালেজের পক্ষে ক্রমবর্ধমান পার্টির যোগাযোগ রাখাটাও বেশ দুষ্কর হয়ে উঠছিলো। নির্যাতন বেড়েই চললো। হাজার হাজার লোক বন্দী হলেন, পিসান্তয়ার মরুভূমিতে একটি বিশেষ বন্দী-শিবির তৈরি হলো। গালো গনজালেজ এক সমাজ-বহির্ভূত ব্যক্তির মতো নানান্ স্থান থেকে বিপ্লবী কাজকর্ম ও সংগঠন চালালেও সব কিছুকে একত্র করে কিছু করাটা তাঁর পক্ষে খুবই দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছিলো। তবু তাঁর সাহস, উদ্দীপনাও বুঝি অনেক আশার সঞ্চার করেছিলো।

আমার কাছে নির্দেশ এলো—রাজধানী থেকে হাজার কিলো মিটার ছাড়িয়ে পার্বত্য উপকূলের মধ্য দিয়ে আমাকে নিয়ে যাওয়া হবে এবং অপর পারে আরজেনটিনার কমরেডরা আমার জন্য অপেক্ষা করবেন।

সূর্যাস্তে একটি গাড়িতে রওনা হলাম। এ বিষয়ে আমায় সাহায্য করেছিলেন আমার বন্ধু পুলিশের চিকিৎসক ডাক্তার রাউল বুলনেস। তিনিই আমাকে তাঁর গাড়িতে করে পেঁছে দিয়েছিলেন। কারণ তিনি ছাড়া তাঁর গাড়িতে আর কোনো আরোহী ছিলেন না। সেই গাড়ী সানতিয়াগোর সীমানা ছাড়াবার পরই সেখানে আর একটি বড়ো গাড়ি নিয়ে আমার আর এক বন্ধু এসকোবার আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

দিন ও রাত্রি রাস্তাতেই কাটতো আমাদের। দিনের বেলায় সারা শরীর কম্বলে

ঢেকে শুধু দাড়ি-গোঁফ ভরা মুখ আর মোটা চশমা লাগানো চোখ দুটি খুলে রাখতাম —যাতে কারুর কোনো সন্দেহের উদ্রেক না হয়।

দুপুরের মধ্যেই আমরা তেমুকো পার হয়ে গেলাম। এমনই ভাগ্য যে, তেমুকোই আমার বহির্পথ হলো। পাদ্রে লাস কাসাস গ্রাম ছাড়িয়ে সেতু পেরিয়ে আমরা রওনা হলাম। একবার মাত্র একটা পাহাড়ের চূড়ায় বসে কিছু খাবার খেয়েছিলাম। পাহাড় থেকে নীচের দিকে তাকিয়ে পাহাড়ী জলস্রোতের আওয়াজ কানে আসতেই মনে হলো আমার ছেলেবেলা যেন আমায় তার বিদায় সম্ভাষণ জানাচ্ছে। এই শহরেই আমি বড়ো হয়েছি, এই পাহাড় আর নদীর মধ্যেই জন্ম নিয়েছে আমার কবিতা আর ঐ বাঁশঝাড়ের মতই সে জঙ্গলের মধ্যে উঁচু হয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে। তেমুকোর জলের ধারে এক মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়িয়ে জলস্রোতের শব্দ শুনে নিলাম—এই শব্দগুলিই আমায় একদিন গান গাইতে শিখিয়েছিলো।

আবার রওনা হলাম। একবার মাত্র খুব উদ্বেগের মুহূর্ত কেটেছিলো। মাঝে রাস্তায় একজন সামরিক অফিসার হঠাৎ আমাদের গাড়িটা দাঁড় করালেন। আমি স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম। অবশ্য অহেতুক এই ভয় পরে অসার প্রমাণিত হলো। সেই সামরিক অফিসার আমার চালক বন্ধু কমরেড এস্কোবারের পাশে বসে গল্প করতে করতে প্রায় একশো কিলোমিটার পেরিয়ে নেমে গেলেন। আমি পিছনের আসনে চুপ করে শুয়ে রইলাম, কারণ আমি জানতাম চিলির রাস্তার প্রতিটি পাথরের টুকরো তাদের কবির গলার স্বর চেনে।

সে যাত্রায় উল্লেখযোগ্য আর কোনো ঘটনা ঘটেনি। আমরা নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছলাম। ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে রানকো হ্রদ পেরিয়ে চারপাশে জলে ঘেরা বড়ো বড়ো গাছের ফাঁকে নির্জন একটি সুন্দর বাড়ি, বাড়িটি এখানকার বাঁশবাগানের মালিকের, এই বাড়িটিতে এসে উপস্থিত হলাম। চারপাশের জঙ্গল জল আর পাহাড়ের মধ্যে ছদ্মবেশের সাজ পরে দাঁড়িয়ে আছে বাড়িটি। আমি শুনেছি লোকে বলে— পৃথিবীর এক কোণে পড়ে রয়েছে নিঃসঙ্গ চিলি। এখানে এসে এই কথাটা আমার খুবই সত্য বলে মনে হয়েছিলো। একটি অস্থায়ী ঘরে জায়গা পেলাম আমি। লোহার একটা উনুনে বন থেকে সদ্য কেটে আনা কাঠ জ্বালিয়ে ঘরটিকে সব সময়ে গরম রাখা হতো। দক্ষিণের প্রবল ঝড়ো বৃষ্টি এসে আঘাত করতো জানলার কাচে, দেখে মনে হতো জানলা ভেঙে ঘরে ঢুকতে চায়। সূর্যহীন জঙ্গল, হ্রদ আর আগ্নেয়গিরির এই বৃষ্টি চাইতো তার আধিপত্য বিস্তার করতে। তাই মানুষের এই আশ্রয়স্থলকে ভেঙে দিয়ে বিজয়ীর মুকুটই ছিলো তার কাম্য। এখানে জোরগে বিলেট নামক যে বন্ধুটি আমার জন্য অপেক্ষায় ছিলেন তাঁকে আমি খুব কমই চিনতাম। অনুসন্ধিৎসু, বস্তুনিষ্ঠ চিন্তা ও জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত এই মানুষটির মধ্যে সেনানী সুলভ দৃঢ়তা আর নেতৃত্বের ভাব ছিলো। যদিও সেই জঙ্গলে সেনা বলতে সারি সারি বিরাট লম্বা বৃক্ষ ছাড়া আর কিছুই ছিলো না।

গৃহকর্ত্রী ভদ্রমহিলাটি ছিলেন রুগ্ন, ক্ষীণকায়া ও স্নায়বিক ব্যাধিগ্রস্ত। জঙ্গলের এই নিঃসঙ্গতা, বিরামহীন বৃষ্টির এই একঘেঁয়ে শব্দ আর শীত—সমস্ত কিছুই মহিলাটির কাছে ব্যক্তিগত অবমাননার মতো লাগত। দিনের বেশি সময়টাই তাঁর

ফোঁপানি আর কান্নায় কাটলেও ঘরদোর গোছানো বা পরিষ্কার করা এবং অন্যান্য কাজ-কর্ম বা উপাদেয় খাদ্য রান্না ইত্যাদি সব কিছু ঠিক সময় মতই তিনি করে যেতেন।

বিলেট এখানকার এক কাঠ-চেরাই কোম্পানীর তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। সারাদিন ধরে ঘরে বসে বসে শুনতাম করাতের আওয়াজ—সুরহীন ছন্দহীন বুনো বেহালার মতো কর্কশ তীক্ষ্ন আর প্রাণহীন—তারপরেই মাটি ঢাকের মতোআওয়াজ তুলে আর্তনাদ করত। উপকথার মতো একটা আতঙ্ক ঘিরে ধরতো জঙ্গলকে। জঙ্গলটা মরছে—আমি জঙ্গলের সেই শোকবিহ্বল কান্না শুনতে পেতাম, মনে হতো—আমি এখানে এসেছি যেন ক্ষয়িষ্ণু এই জঙ্গলের সুপ্রাচীন বিলাপের স্বর শুনতে।

এই জঙ্গলের মালিক অর্থাৎ বড় কর্তা থাকতেন সান্তিয়াগোতে। তাঁকে আমি দেখিনি। তাঁর জঙ্গল পরিদর্শনের সময় শুনেছিলাম এবারের গ্রীষ্মে। নাম তাঁর পেপি রোডরি গুয়েজ। তিনি একজন চরম প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তি, চিলির চরম দক্ষিণপন্থী পার্টির একজন সক্রিয় সদস্য এবং বহু কলকারখানার মালিক, অত্যন্ত দাম্ভিক, তবে খুব করিৎকর্মা। তাঁর নাকের ডগায় তাঁর অজান্তে আমি তাঁরই সাম্রাজ্যে লুকিয়ে রয়েছি—এটা ভাবতে আমার অবাক লাগতো। তবে তাঁর দৌলতে পুলিশ বা সেনাবাহিনীর লোকের দৃষ্টি এ জায়গায় না পড়াতে লুকিয়ে থাকতে আমার সুবিধাই হয়েছিলো।

আমার যাওয়ার দিন এগিয়ে এলো। তুষারের স্তূপ পর্বতমালায় সবে জমতে শুরু করেছে। এনডিসের পথ সহজ নয়। আমার লোকজনরা রাস্তার খবর আনতেন, অবশ্য রাস্তা বলতে তেমন কিছুই নেই, তার উপর আবার তুষারের স্তূপ নামতে আরম্ভ করেছে। আমিও যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম, কারণ অপর পারে আর্জেনটিনার কমরেডরা আমার অপেক্ষায় রয়েছেন।

যখন যাবার জন্য সব তৈরি ঠিক সেই সময়ে জোরগে বিলেট খবর দিলেন যে, তাঁর মনিব অর্থাৎ পেপি দু'দিনের মধ্যেই জঙ্গল পরিদর্শনে আসছেন, তিনি ইতিমধ্যে রওনা হয়েছেন।—এর ফলে আমি এক মানসিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হলাম। আমার যাবার সব ব্যবস্থা তখনও সম্পূর্ণ হয়নি। তাছাড়া জঙ্গলের মালিকটি এসে যদি জানতে পারেন যে, এখানে আমি লুকিয়ে রয়েছি, যদি তাঁর জানা থাকে যে, আমার জীবিত বা মৃত মাথাটির দাম অনেক তাহলে কি হবে? তিনি আবার গনজালেজ ভিদেলের একজন বন্ধু!

বিলেট অবশ্য মালিকটির মুখোমুখি হবার জন্য শুরু থেকেই প্রস্তুত হচ্ছিলেন। ওঁর বক্তব্য ছিলো যে, উনি বেশ ভালোরকমই চেনেন রোদরিগুয়েজকে, কাজেই বিলেট আমাকে আশ্বাস দিলেন যে আশ্রিতকে তিনি কখনই বিপদে ফেলবেন না।

আমি ঘোরতর আপত্তি জানালাম, গুপ্ত কথা বা গুপ্ত যোগাযোগ ইত্যাদি সম্পূর্ণ গোপন রাখাই আমার মত।—এ নিয়ে বিলেটের সঙ্গে আমার তীব্র বাদানুবাদও হয়ে গেল। শেষে স্থির হলো জঙ্গলের পাদদেশে একজন স্পেনিশ-আমেরিকান কর্মীর ঘরে গিয়ে আমি উঠবো। সেই মতো ব্যবস্থা হলো বটে, কিন্তু সেখানে উঠবার পর আমায় খুব গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হতে হলো। কাজেই শেষ পর্যন্ত বিলেটের অনুরোধে আমি পেপির সঙ্গে সাক্ষাৎকারে রাজী হলাম। ঠিক হলো—কারুর বাড়িতে নয়,

কোনো একটি নির্দিষ্ট জায়গায় আমরা মিলিত হবো।

মাঠের ধারে একটি জীপগাড়ি এসে দাঁড়ালো, তার মধ্যে থেকে যুবকসুলভ এক মধ্য বয়সী ব্যক্তি নামলেন—কাঁচা-পাকা চুল, তীক্ষ্ণ চেহারার একজন মানুষ, তাঁর পাশে আমার বন্ধু বিলেট। প্রথমেই তিনি আমায় বললেন—তোমার নিরাপত্তার সব দায়িত্ব এখন থেকে আমার। তোমার কেশাগ্রও কেউ স্পর্শ করতে পারবে না।

ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলে ভালো লাগলো। তাঁকে আমার ঘরে নিয়ে গেলাম। এরপর ওঁর সঙ্গে আরো অনেক কথা হলো। উনি আমার জন্য শ্যাম্পেন ও হুইস্কি আনালেন। কয়েক পাত্র মদ্যপানের পরেই আমাদের মধ্যে শুরু হয়ে গেল বাদানুবাদ। দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তাধারায় দেখলাম তাঁর প্রগাঢ় বিশ্বাস। ক্রমে ক্রমে তাঁর কণ্ঠস্বরের তীব্রতা আমাকে ক্রোধান্বিত করে তুলতে লাগলো, এর ফলে আমরা উভয়েই বেশ কয়েকবার টেবিল চাপড়ালাম। কিন্তু মদ্যপান শেষ হয়েছিলো আমাদের শান্তিতেই। এর মাঝেই বেশ অদ্ভুতভাবেই আমাদের মধ্যে একটা দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিলো। ভদ্রলোকের মন-খোলা ভাবটা আমার খুব ভালো লেগেছিলো। আমার কবিতার তিনি একজন ভক্ত ছিলেন। যখন তিনি সতেজ উদাত্তকণ্ঠে আমার কবিতা আবৃত্তি করে আমাকে শোনাতেন তখন মনে হতো তাঁর কণ্ঠে আমার কবিতা যেন নবজন্ম লাভ করছে।

পেপির এখানকার কাজ শেষ হতে তিনি রাজধানীতে ফিরে গেলেন। যাবার আগের দিন আমাকে এবং তাঁর সমস্ত কর্মচারীকে ডেকে একত্রিত করে তাঁর স্বভাবসুলভ দৃঢ়কণ্ঠে কর্মচারীদের নির্দেশ দিলেন, 'আপনারা সিনর লেগারেটাকে প্রয়োজনীয় সব রকম সাহায্য করবেন, উনি চোরাচালানীদের পথ দিয়ে যেতে যদি কোনো বাধার সম্মুখীন হন তাহলে ওঁর জন্যে নতুন সড়ক তৈরি করে দেবেন—অন্যান্য সমস্ত কাজ বন্ধ রেখে। আমার এই আদেশের অন্যথা যেন না হয়।'

প্রসঙ্গত জানাই—তখন আমার ছদ্মনাম ছিলো সিনর লেগারেটা।

দাম্ভিক ও সামন্তবাদী পেপি রোদরিগুয়েজ এই ঘটনার দু'বছর পরেই মারা যান। মারা যাবার সময় তিনি কপর্দকহীন এক দাগী আসামী ছিলেন। একটি বেশ বড়ো চোরাকারবারী দলের সঙ্গে যোগাযোগ থাকার জন্য তিনি ধরা পড়েন এবং বেশ কয়েক মাস তাঁকে জেলে কাটাতে হয়। এই পতনের আঘাত তিনি সহ্য করতে পারেন নি। যে রোদরিগুয়েজের বাড়িতে মদ্যপানে নিমন্ত্রণের আশায় বহু ধনী ও শাসকগোষ্ঠীর বন্ধুরা সাগ্রহে অপেক্ষা করতেন তাঁদের মধ্যে একজনকেও দেখা যায়নি বিপদের সময়ে তাঁর পাশে, বরং পেপিকে দেখে পালিয়েছিলেন, না চেনার ভান করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই। এই চরম আঘাতে ভগ্নহৃদয় পেপি শেষ পর্যন্ত মৃত্যুই বেছে নিয়েছিলেন। আজও তাঁর বন্ধুত্ব, তাঁর স্মৃতি আমার মনে জ্বলজ্বল করছে। পেপি ছিলেন একজন ক্ষুদে সম্রাট—যাঁর হুকুমে সেদিন আমার জন্য তিরিশ কিলো-মিটার নতুন রাস্তা তৈরি হয়েছিলো এবং তা হয়েছিলো এক কবিকে স্বাধীন জীবনে ফিরে যেতে দেবার জন্য।

আন্দিয়ান্ পর্বতমালা

পাহাড়ী নদী ও উঁচু খাড়াই-এ ভরা আন্দিয়ান পর্বতমালায় যে রাস্তাটি আছে সেখানে পুলিসও টহল দিতে যায় না। কাজেই বহুকাল ধরে ওটা চোরাচালানীদের পথ হিসেবেই পরিচিত।

আমার সহযাত্রী জোরগে বিলেট অভিযানের পুরোভাগে ছিলেন। অন্যান্য আরো পাঁচজন নিপুণ অশ্বারোহীও তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে দলে ছিলেন। তাছাড়া আমাদের সাহায্য করেছিলেন আমার পুরোনো বন্ধু ভিক্টর বিয়ার্নাকি—যিনি জমি জরীপের কাজে এসেছিলেন। প্রথমে আমার মুখভর্তি দাড়ি-গোঁফ দেখে উনি আমাকে চিনতে পারেন নি, পরে আমার পরিচয় জানতে পেরে সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছিলেন।

আমরা একটা লাইন করে এগোচ্ছিলাম। ছেলেবেলার পর বহুদিন হয়ে গেল আমার ঘোড়ায় চড়ার অভ্যাস চলে গেছে, তবু আমাকে এগোতেই হলো। বিরাট বিরাট গাছ আর ঘন জঙ্গলের মধ্যে সর্পিল পথ—সব মিলিয়ে এক প্রাচীনতম যুগের হারিয়ে যাওয়া গীর্জার রাস্তার মতো মনে হচ্ছিল। আমরা একটি গুপ্ত নিষিদ্ধ পথ ধরে এগোচ্ছিলাম। রাস্তা বলতে যার কিছুই ছিলো না, দুরারোহ পর্বত সংকুল পথ—মাঝে মাঝে নির্জন তুষারস্তূপ আর বড়ো বড়ো গাছে ঢাকা। আমার সহযাত্রীরা তীক্ষ্ন বড়ো ছুরি দিয়ে গাছ কেটে কেটে রাস্তা বার করে এগোচ্ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমিও আমার স্বাধীনতার পথ খুঁজে নিচ্ছিলাম। সেখানে একই সঙ্গে নির্জনতা-নীরবতা-বিপদ-নির্বাক ও আমার জরুরী অবস্থা—সব যেন একাকার।

তুষারাবৃত পথ দিয়ে যেতে যেতে মনে হচ্ছিল—কতো মানুষই না এখানে প্রাণ হারিয়েছেন! তারই সাক্ষ্য বহন করছে এই দুর্গম পথ। মাঝে মাঝে চোখে পড়ছিলো গাছের ডালপালা কেটে ক্রুশের চিহ্ন—অজানা সমাধির বুকে, হয়তো কতো প্রাচীন শতাব্দী থেকে এই সব সমাধি ছড়িয়ে রয়েছে এই পথের পাশে। আমিও ছড়িয়ে দিয়েছিলাম বুনো মূল আর গাছের পাতা—সেই সমাধির উপর।

এক এক সময় তীব্র খরস্রোতা নদী পেরিয়ে যেতে হয়েছে। বিপুল বেগে এই নদী গাছপালা পাথর চূর্ণ করে এগিয়ে চলেছে নীচে—বহু নীচে।

একবার একটা হ্রদ পেরুতে হলো। স্বচ্ছ জল, কিন্তু তীব্র স্রোত। আমাকে পিঠে নিয়ে ঘোড়াটি অতি কষ্টে জল ঠেলে এগোচ্ছিল, জল প্রায় ঘাড় ছাপিয়ে উঠেছিলো ঘোড়াটির, সে কোনরকমে জলের উপর মুখ উঁচু করে এগোচ্ছিল আর আমি কোনোরকমে নিজেকে সামলে রেখেছিলাম। ওপারে পৌঁছতেই আমার সহযাত্রীরা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি, খুব ভয় পেয়েছিলেন ?'

—'নিশ্চয়ই।' আমি বললাম, 'মনে হচ্ছিল আমার শেষের দিন আগত।'

—'আমরা আপনার পিছনেই ছিলাম দড়ি নিয়ে, যদি ভেসে যেতেন তবে আমরা দড়ি ছুঁড়ে টেনে আনতাম আপনাকে।'

ওঁদের মধ্যে একজন বললেন, 'আমার বাবা এই হ্রদ পার হতে গিয়ে ভেসে গেছেন, তাঁকে আর পাওয়া যায়নি। আপনাকে তো তা হতে দিতে পারি না। সেজন্যই দড়ি নিয়ে প্রস্তুত ছিলাম।'

এইভাবেই এগোতে এগোতে আমরা গ্রানাইট পাথরের একটি প্রাকৃতিক টানেল পেরোলাম। তীক্ষ্ন পাথরে ধাক্কা খেয়ে ঘোড়ার পায়ের খুর থেকে আগুন বেরোচ্ছিল, পাথরের আঘাতে ঘোড়াগুলির শরীর, মুখ রক্তে প্রায় ভরে উঠেছিলো। আমিও একবার টাল সামলাতে না পেরে ঘোড়া থেকে ছিট্‌কে পড়লাম পাথরের উপরে। এই ঘন জঙ্গলের মধ্যে হঠাৎ মনে হলো আমাদের জন্য কোনো কিছু যেন অপেক্ষায় রয়েছে। পরক্ষণেই সামনে দেখলাম পাহাড়ের কোল ঘেঁষে সমতল এক তৃণভূমি—অবিশ্বাস্য সে দৃশ্য। বুনো ফুল জলস্রোতের শব্দ আর মাথার উপর খোলা আকাশ থেকে ছড়িয়ে পড়া ঝলমলে আলো। ইন্দ্রজালের এই বেড়ার মধ্যে এসে আমরা দাঁড়ালাম। সেদিন মনে হয়েছিলো যেন এক পুণ্য তিথিতে এই পবিত্র স্থানে জড়ো হয়েছি আমরা নিমন্ত্রিত ক'জন অতিথি।

ঘোড়া থেকে নামলাম সবাই। তারপর একটা ষাঁড়ের মাথার খুলি কুড়িয়ে এনে সকলের মাঝখানে সেটাকে রেখে বুনো ফুল আর খুচরো পয়সা সেই খুলিটার মধ্যে ফেলতে লাগলাম—এ এক ধরনের সুপ্রাচীন শাস্ত্রীয় আচার। ইউলিসিসের মতো পথভ্রষ্ট কেউ যদি এখানে এসে পেঁছিতে পারেন, তবে এই ষাঁড়ের মণিকোটর তাঁকে রক্ষা করবে। কিন্তু এই আচারের শেষ এখানেই নয়। আমার বন্ধুরা এরপর ষাঁড়ের খুলিটি ঘিরে শুরু করলেন নাচ।—সে এক আশ্চর্য নাচ। আমিও সেই নাচে যোগ দিলাম, এবং সেই সব অজানা বন্ধুদের সঙ্গে নাচতে নাচতে জানতে পারলাম যে, মানুষের সঙ্গে ভাবের আদান প্রদান সভ্যতার অতি প্রত্যূষে এই নির্জন স্থানেও ছিলো, ছিলো মানুষের অনাদিকালের প্রশ্ন আর তার উত্তর।

সেই রাত্রে শেষ গিরিসংকট—যা আমাকে আমার দেশ থেকে পৃথক করে দেবে—পার হবার সময় লোকালয়ের সন্ধান পেলাম। দূরে তাকিয়ে দেখলাম কয়েকটি ভগ্নপ্রায় বাড়ির জানলা থেকে আলোর রোশনাই। কাছে পেঁছে দেখলাম পাহাড় প্রমাণ পনীরের স্তূপ জমাট বাঁধানোর জন্য পর্বতের এতো উঁচুতে এনে রাখা হয়েছে। ঘরের মেঝেতে কম্বল ঢেকে গোটাকয়েক মানুষ আগুনের ধারে নিদ্রিত। দূর থেকে গীটার সহ গানের সুর ভেসে আসছে, কষ্টকর এই দীর্ঘ পথ-পরিক্রমায় প্রথম এই সুরেলা কণ্ঠ কানে এলো। যদিও বসন্ত তখন অনেক—অনেক দূরে তবু ওদের বসন্ত-বন্দনা শুরু হয়েছিলো। এই মানুষগুলি জানতেন না যে, আমরা কারা, কিম্বা হয়তো জানতেন। তবু সেই রাত্রে ওদের সঙ্গে গান গাইতে গাইতে আগুনের ধারে বসে আমরা খাওয়া দাওয়া করলাম।

ওঁদের ঘরের পাশেই ছিলো একটি উষ্ণ-প্রস্রবণ। সেখানে স্নান করলাম সকলে। পরম পরিতৃপ্তিতে দেহমন ভরে গেল।

পরদিন ভোরে, মাত্র পাঁচ কিলোমিটার পথ যা পার হলেই অন্ধকারাচ্ছন্ন আমার দেশের সীমানা পার হওয়া যায় সেই পথে যাত্রা শুরু করলাম। ঘোড়ার পিঠে চড়ে গান গাইতে গাইতে আমরা সেই বিরাট উঁচু পথের দিকে রওনা হলাম। আসার

সময় কিছু অর্থ দিতে চাইলাম সেই কৃষকদের—যাঁরা আমাদের রাত্রির আশ্রয়, খাবার, গান এবং উষ্ণ প্রস্রবণে স্নানের সুযোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা তা গ্রহণ করতে রাজি হলেন না। তাঁরা জানালেন যে, তাঁদের সাধ্যমতো আমাদের সেবাযত্ন করেছেন, এজন্য কোনরকম অর্থের আশা তাঁদের নেই। ব্যস, এর বেশি আর কিছু নয়। শুনে মনে হয়েছিলো—হয়তো আমরা সকলেই এক এবং একটি মাত্র স্বপ্নের সমান অংশীদার।

স্যান্ মার্টিন

একটা ক্ষুদে চালাঘর ছিলো সীমান্তের শেষ সাক্ষ্য। সেই চালাঘরের দেওয়ালে লিখে দিলাম ঃ হে স্বদেশ বিদায়—আমি তোমায় ছেড়ে চলে যাচ্ছি, কিন্তু তোমাকে আমার সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।

স্যান্ মার্টিনে আমাদের জন্য একজন চিলির বন্ধুর অপেক্ষা করার কথা। আর্জেন্টিনার এই ছোটো পার্বত্য গ্রামে আমাদের উপর নির্দেশ ছিলো সবচেয়ে ভালো হোটেলে ওঠার, সেখানে পেদ্রিতো রামিরেজ আমাদের সঙ্গে দেখা করবেন। নির্দেশমতো ভালো হোটেলের সন্ধান করতে গিয়ে দেখলাম সেখানে বেশ ভালো দুটো হোটেল রয়েছে। এর ফলে পড়লাম মহা সমস্যায়। এই দুটির মধ্যে কোন্ হোটেলটিতে রামিরেজ আসবেন! যাইহোক, দুটির মধ্যে সবচেয়ে সাজানো-গোছানো এবং ব্যয়বহুল হোটেলটিতে গিয়ে ঘর চাইতে ম্যানেজার ঘৃণার সঙ্গেই জানিয়ে দিলেন যে, এখানে কোনো ঘর নেই! সম্ভবত আমাদের ময়লা সাজপোশাক আর মুখভর্তি দাড়ি-গোঁফ ম্যানেজারটির মনে ঘৃণার উদ্রেক জাগিয়ে থাকবে। কারণ আমাদের পাশেই দাঁড়িয়ে থাকা সুবেশ অভিজাত ইংরেজ যাত্রীদের সঙ্গে তিনি আলোচনা করতে ব্যস্ত হলেন তাঁদের মধ্যে কোন্ ঘরটা কার প্রয়োজন।

ঠিক সেই সময়েই মার্জিত এবং উচ্চপদস্থ একজন সামরিক অফিসার ম্যানেজারটির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'থামুন, চিলির কোনো মানুষকে ফিরিয়ে দেবার কোনো অধিকার কারুর নেই।'

আমরা জায়গা পেলাম সেই হোটেলেই এবং যাঁর জন্য পেলাম তাঁকে দেখে মনে হলো তিনিই 'পেরণ' এবং তাঁর সঙ্গিনীটি বোধহয় তাঁরই স্ত্রী 'এলভিটা'। অবশ্য পরে জানা গেল যে, তিনি এখানকার সেনাবাহিনীর একটি অংশের অধ্যক্ষ আর তাঁর সেই সঙ্গিনী বুয়েনস্ এয়ারসের একজন অভিনেত্রী।

এরপর ওঁদের সঙ্গে আলাপ হতে আমরা কাঠের ব্যবসায়ী হিসাবে আমাদের পরিচয় দিয়েছিলাম এবং আমার বন্ধু ভিক্টর বিয়াংকা যিনি আমার সঙ্গে এসেছিলেন তিনি গীটার বাজিয়ে অর্থবোধক চিলির গান শোনানোর সময় ওঁরা মুগ্ধ হয়ে শুনেছিলেন। এদিকে আমরা যে রামেরিজের জন্য অপেক্ষায় রয়েছি, তাঁর কোনো পাত্তাই নেই। আমরা প্রায় কপর্দকশূন্য অবস্থায় এমনকি গায়ে পরার দ্বিতীয় জামাও আর নেই। এরই মধ্যে একদিন সেই সামরিক অফিসার তাঁর সেনানিবাসে আমাদের ভোজ খেতে ডাকলেন। সেখানে আলোচনার সময় জানলাম উনি পেরণ-বিরোধী। যদিও ওঁকে

পেরণের মতই দেখতে। তর্ক হলো কোন্ স্বৈরাচারী বেশী উৎপীড়ক—চিলির না আর্জেন্টিনার!

এক সন্ধ্যায় রামেরিজ আমাদের ঘরে এসে হাজির হলেন। আমি চিৎকার করে উঠেছিলাম—ব্যাটা বে-আক্কেলে, এতদিন কোথায় ছিলেন? কিন্তু যা হবার তাই হয়েছিলো, অন্য ভালো হোটেলটিতে তিনি আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। যাই হোক মিনিট দশেকের মধ্যেই আমরা তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়লাম, শুরু হলো আগের মতোই আমাদের একঘেঁয়ে একটানা সেই যাত্রা। মাঝে মাঝে কেবল চা পানের বিরতি।

প্যারিসে

বুয়েনস্ এয়ারসে আমার সব চেয়ে বড়ো সমস্যা ছিলো পাশপোর্ট। আর্জেন্টিনা থেকে য়ুরোপে যেতে হলে সবার আগে দরকার পরিচয়পত্র। যা নিয়ে আমি আর্জেন্টিনায় এসেছি তা নিয়ে য়ুরোপে প্রবেশ করা অসম্ভব। এদিকে চিলি-সরকার আর্জেন্টিনা সরকারকে আমার সমস্ত পরিচয় দিয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন এবং নির্দেশ দিয়েছেন দেখামাত্র আমাকে গ্রেপ্তার করতে।

এই সময় আমার মনে পড়লো যে, আমার বন্ধু ঔপন্যাসিক মিগুয়েল এন্জেল আস্তুরিয়াস্ বুয়েনস্ এয়ারস্-এ কোনো এক দূতাবাসে কাজ করেন। আমাদের দু'জনের চেহারার এতই মিল ছিলো যে, আমাদের বন্ধুরা আমাদের 'টাকি' পাখি বলে ডাকতো। আমাদের লম্বা নাকের তলায় ও আশেপাশে প্রচুর বাড়তি মাংস ছিলো—সারস পাখির মতো।

পূর্ব নির্দিষ্ট গুপ্ত ঘাটিতে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসতে ওঁকে বললাম, 'মিগুয়েল, তোমার পাশপোর্টটা আমায় ধার দাও, য়ুরোপে আমাকে মিগুয়েল এন্জেল আস্তুরিয়াস্ হয়েই পেঁছাতে দাও।'

সক্রিয় রাজনীতিতে না থাকলেও মিগুয়েলের মনটা ছিলো উদার এবং নিজেও তিনি উদার মতবাদেই বিশ্বাস করতেন। কয়েকদিনের মধ্যেই আমি গুয়াতেমালার বিখ্যাত ঔপন্যাসিক মিগুয়েল এন্জেল আস্তুরিয়াস হিসাবে আর্জেন্টিনা থেকে উরুগুয়ে হয়ে প্যারিসে পেঁছিলাম।

প্যারিসে পেঁছেও সেই একই সমস্যা। কেউই নিশ্চয়তার সঙ্গে আমার পাশ্পোর্ট ও পরিচয়পত্র গ্রহণ করতেন না। আমিও ঠিক বুঝতে পারছিলাম না কিভাবে আমার পরিচয় জ্ঞাপন করবো।—মিগুয়েল না পাব্লো নেরুদা! নেরুদা হলে প্রশ্ন উঠবে যে, পাব্লো নেরুদা ফ্রান্সে কবে এলেন?—মিগুয়েল তো এসেছেন কিন্তু…।

আমার উপদেষ্টারা আমায় বললেন, আমি যদি রাজা পঞ্চম জর্জের নামাঙ্কিত হোটেলে উঠি তাহলে সেখানে আমার পরিচয়পত্র নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে না। কারণ সেখানে বিশ্বের সেরা বুদ্ধিজীবীরা এসে ওঠেন। সুতরাং আমি আমার সেই পাহাড়ী পোশাকেই উপদেষ্টাদের নির্দিষ্ট হোটেলে উঠলাম এবং সুবেশ অভিজাত বাসিন্দাদের

সঙ্গে বেসুরো কয়েকটা দিন কাটালাম।

তারপর একদিন বিরাটতম প্রতিভা আর সহৃদয় মন নিয়ে দেখা দিলেন পিকাসো। ছোট্ট একটি শিশুর মতই তখন তিনি রোমাঞ্চিত। তাঁর জীবনের প্রথম বক্তৃতা—যেটি আমার কবিতার মর্মার্থ, আমার জীবন—আমার অনুপস্থিতি ও আমার উপর উৎপীড়নের উপর রচনা করেছিলেন—সেটি সবেমাত্র শুনিয়ে এসেছেন তিনি। আধুনিক শিল্পকলার সেই বৃষাসুর আমার কাছ থেকে সব জানলেন এবং আমার বিপজ্জনক পরিস্থিতিটি অনুধাবন করে তৎক্ষণাৎ উপরওয়ালার সঙ্গে কথা বলে আমায় মুক্ত করলেন। অনেক হোমরা চোমরা ব্যক্তিকে ডেকে পাঠিয়ে তাঁদের সঙ্গে আমার বিষয় নিয়ে আলোচনা করে অনেক সময় নষ্ট করলেন তিনি। আমার খারাপ লেগেছিলো এই ভেবে যে, আমার জন্য তিনি তাঁর কতখানি অমূল্য সময়ের অপচয় করলেন এবং তাঁর কতগুলি অমূল্য ছবি তৈরি হলো না।

সেই সময় এক শান্তি মহাসভার আসরে হঠাৎ হাজির হয়ে আমার অনেকগুলি কবিতা আবৃত্তি করলাম। অনেকেই এসে আমায় জড়িয়ে ধরলেন—সবাই সেই আনন্দোচ্ছ্বাসে যোগ দিলেন। সবাই ভেবেছিলেন আমি মৃত, কারণ চিলির পুলিসের নিরন্তর অত্যাচারে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়।

পরদিনই হোটেলে একজন সাংবাদিক এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—'আচ্ছা, এইমাত্র চিলির বেতারে শোনা গেল যে, পাবলো নেরুদা চিলিতেই রয়েছেন এবং আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে চিলির পুলিস তাঁকে ধরে ফেলবে।—আমরা এর কি উত্তর দেবো ?'

আমার মনে হলো আর একটি অযৌক্তিক আলোচনার কথা। একবার প্রশ্ন উঠেছিলো—'শেক্সপিয়র বলে সত্যিই কেউ ছিলেন কি না ? এবং তিনি সত্যিই এতো লেখা লিখেছিলেন কি না ?' মার্ক টোয়েন তাঁর স্বভাবসুলভ ভাষায় উত্তর দিয়েছিলেন—'আসলে উইলিয়ম শেক্সপিয়র এসব লেখেন নি। লিখেছিলেন একজন ইংরেজ—যিনি সেই সময়, সেই দিনটিতেই জন্মেছিলেন এবং মারাও গিয়েছিলেন ঠিক একই সময়ে এবং লিখেওছিলেন সেই শেক্সপিয়রের মতন, যাঁর নাম ছিলো উইলিয়ম শেক্সপিয়র। অদ্ভুত যোগাযোগ !'

আমি বললাম, 'উত্তর দিয়ে দিন—'এ পাবলো নেরুদা সেই পারলো নেরুদা নন, ইনি আর একজন চিলির মানুষ—যিনি কবিতা লেখেন এবং চিলির স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে নেমেছেন, যাঁর নাম পাবলো নেরুদা'।'

সেই অজ্ঞাতবাসের মধ্যে প্রয়োজনীয় সমস্ত কাগজপত্রাদি ঠিক ঠিক রাখা সহজ নয়, যদিও এই বিষয়ে এ্যারাগোঁ ও পল্ ইলুয়ার আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন।

বিভিন্ন আস্তানায় কাটাবার একটি সময়ে মাদাম ফ্রাসোঁয়া জিরু নাম্নী এক ভদ্রমহিলার কাছে কিছুদিন থাকতে হয়েছিলো আমাকে এবং সেই কয়েকটা দিনের স্মৃতি আমি কোনদিন ভুলতে পারবো না। অত্যন্ত বুদ্ধিমতী এই ভদ্রমহিলার মধ্যে ছিলো সৃজনী শক্তি।

কোলেৎ-এর পাশের বাড়িতেই থাকতেন ভদ্রমহিলা। একটি ভিয়েতনামী বালককে তিনি পোষ্য নিয়েছিলেন। ফ্রান্সের সেনাবাহিনী তখন ভিয়েতনামে নিরীহ মানুষদের হত্যা করতে ব্যস্ত, যে কাজটা কয়েক বছর বাদে আমেরিকা আরম্ভ করেছিলো।

তারই প্রতিবাদ স্বরূপ মাদাম জ্যিরু এই ভিয়েতনামী বালকটিকে পোষ্য হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। মাদাম জ্যিরুর বাড়িতে পিকাসোর একটি ছবি মুগ্ধ করেছিলো আমাকে। বিরাট একটি চিত্র—এটি পিকাসোর জ্যামিতিক শিল্পযুগের আগের আঁকা। একজোড়া লাল রঙ দুটি জানালার পর্দার মতো দ্বিধা বিভক্ত হয়ে একটা বড়ো টেবিলের উপর নেমে এসেছে আর সেই টেবিলের উপরে টেবিলটির চেয়েও বড়ো একটি বিরাট পাউরুটি পড়ে রয়েছে। এই চিত্রটির দিকে তাকালেই কেমন একটা শ্রদ্ধাবোধে মনটা আপ্লুত হয়ে যেতো। রুটিটীর দিকে তাকিয়ে আমার মনে হতো ও'টি যেন এল্‌গ্রীকোর অঙ্কিত কোনো প্রাচীনতম দেবীমূর্তি। আমি সেই চিত্রটির নাম দিয়েছিলাম 'বিশুদ্ধ রুটির স্বর্গারোহণ'।

একদিন আমার এই গোপন আশ্রয়স্থলে পিকাসো এলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। তাঁরই আঁকা বিস্মৃতপ্রায় সেই চিত্রের সামনে তাঁকে নিয়ে গেলাম আমি। চিত্রটির দিকে একমনে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এক অসাধারণ বিষাদে তাঁর মন আচ্ছন্ন হয়ে উঠলো। তিনি দশ মিনিট নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন ছবিটির খুব কাছে গিয়ে। তাঁর এই ধ্যান শেষ হতে তাঁকে বললাম, 'আপনার আঁকা এই ছবিটি আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে। আমার ইচ্ছে—আমার দেশের জাতীয় যাদুঘর এই ছবিটি কিনে রাখি। মাদাম জ্যিরুরও তাতে আপত্তি নেই।'

পিকাসো আবার একবার ছবিটির দিকে তাকালেন, তাঁর তীক্ষ্ন দৃষ্টি দিয়ে সেই বিরাট জাঁকালো পাঁউরুটিকে বিদ্ধ করে শুধু বলেছিলেন—'ছবিটি খুব খারাপ নয়।'

কম ভাড়ায় শ্রমিক ও দরিদ্র পাড়ায় একটা বাড়ি পাওয়া গেল। খাঁচার মতো বাড়িটা আমার ভালোই লেগেছিলো। তিনতলা এই বাড়িটার ঘরগুলো ছিলো ছোট্ট ছোট্ট, যেন এক একটা খাঁচা। এর নীচের তলায় আমার গ্রন্থাগার এবং বসার জায়গা করলাম। দোতলায় চিলির অনেক বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিত ব্যক্তিদের আশ্রয় হলো। এখানেই রাশিয়ান সাহিত্যের তিন দিক্‌পালের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়।

কবি নিখোলাই তিখোনফ্‌, নাট্যকার করণেচুক ও ঔপন্যাসিক কন্‌স্টান্‌টিন্‌ সিমোনোভ। পরিচিত বন্ধুর মতো তাঁরা আমায় আলিঙ্গন করে আমার গালে সজোরে চুম্বন করলেন। এই চুম্বন ও আলিঙ্গনের মধ্যে নিহিত আন্তরিকতার অর্থ আমি উপলব্ধি করেছিলাম। সেদিন ছোট একটি সত্য কাহিনী লেখার সময়ে শুরুতে লিখেছিলাম : যে পুরুষ আমায় প্রথম চুম্বন করেন তিনি ছিলেন চেকোশ্লাভাকিয়ান্‌ রাজদূত।

চিলি সরকার না দিয়েছিলেন আমাকে দেশে থাকতে, না চেয়েছিলেন আমি অন্য দেশে থাকি। যখনই যেখানে গিয়েছি, চিলি সরকার পিছনে লেগেছেন। নানাভাবে নানা উপায়ে হয় আমাকে নয়তো আমার আশ্রয়দাতাকে বিব্রত করেছেন। ফ্রান্সে বহিরাগতদের জন্য রেজিস্ট্রী অফিসের একটি ফাইলে আমার সম্বন্ধে তদানীন্তন চিলির সরকারের এই মন্তব্যটি লিপিবদ্ধ ছিলো : 'নেরুদা ও তাঁর স্ত্রী ডেলিয়া—দু'জনেই সোভিয়েত গুপ্তচর এবং সোভিয়েত দেশ থেকে বিপ্লবী-সাহিত্য ও সংবাদ তাঁদের মাধ্যমে স্পেনে পাচার করা হয়। রাশিয়ান সাহিত্যিক এলিয়া ইরেনবুর্গের সঙ্গে নেরুদা প্রায়শই গোপনে স্পেনে যাওয়া আসা করেন। ইরেনবুর্গের সঙ্গে সক্রিয়

যোগাযোগ রাখার উদ্দেশ্যেই নেরুদা সোভিয়েত সাহিত্যিকদের সাথে একই বাড়িতে থাকেন।'...ইত্যাদি।

মন্তব্যটির সবটাই মিথ্যায় ভরা। জ্যাঁ রিশার ব্লক আমায় একটা চিঠি দিয়ে তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে বললেন, পররাষ্ট্র দপ্তরের উচ্চপদস্থ একজন কর্মচারী ইনি। আমি গিয়ে তাঁকে সব কিছু জানিয়ে বললাম যে, আমাকে এখান থেকে নির্বাসিত করার জন্যই এই চক্রান্ত। আমি একথাও তাঁকে বলেছিলাম—ইরেনবুর্গের সঙ্গে সত্যি সত্যিই দেখা করতে চাই, কিন্তু সে সৌভাগ্য আমার এখনও হয়নি। উনি অনুগ্রহপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'এ বিষয়ে একটা তদন্ত করে দেখবো।' অবশ্য তাঁর এই প্রতিশ্রুতির পরেও আমার বিরুদ্ধে সেই অসত্য বহুকাল ছিলো।

তখন আমি ঠিক করলাম এলিয়া ইরেনবুর্গের সঙ্গে আলাপ আমাকে করতেই হবে। জানতাম প্রতিদিন সূর্যাস্তে তিনি খেতে যান লা কুপোলে। কাজেই একদিন তাঁর সামনে হাজির হয়ে বললাম, 'আমি চিলির কবি পাবলো নেরুদা। পুলিসের মতে আমরা দু'জনে খুব ঘনিষ্ট বন্ধু। ওঁরা বলেন—আমরা এক বাড়িতেই থাকি। আমাকে এই সব কারণে ওঁরা ফ্রান্স থেকে নির্বাসিত করতে চান। তাই মনে করলাম আপনার সঙ্গে আমার পরিচয়টা হওয়া দরকার। অন্তত নির্বাসনে যাবার আগে আপনার সঙ্গে করমর্দন করে যাওয়া উচিত।'

আমি জানি না ইরেনবুর্গ কোনদিন চোখের পলক ফেলতেন কিনা, কিন্তু সেদিন বিস্মিত অভিভূত ইরেনবুর্গ তাঁর রোমশ ভ্রুজোড়ার নীচে চোখের দৃষ্টি দিয়ে আমার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। মাথার উপর কাঁচা-পাকা চুলগুলো ছিলো অবিন্যস্ত। আমাকে তিনি বললেন, 'আমিও তো তোমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছি নেরুদা। তোমার কবিতা আমার ভীষণ ভালো লাগে। তার আগে এসো কিছু খেয়ে নেওয়া যাক।'

সেদিন থেকে আমরা দু'জনে সত্যিই গভীর বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলাম। ফ্রান্সের পুলিসকে ধন্যবাদ যে, তাঁদের জন্যই আমাদের মধ্যে এই সখ্য সেদিন গড়ে উঠেছিলো। 'হে সোম—আমার হৃদয়' এই কবিতাগুচ্ছটি ইরেনবুর্গ রাশিয়ান ভাষায় সেদিন থেকেই অনুবাদ শুরু করেছিলেন। তারপর তিনি তাঁর অনন্যসাধারণ লেখনীতে রাশিয়ান ভাষায় আমার বহু কবিতাই অনুবাদ করেছিলেন।

উরুগুয়ের কবি জ্যুলেস সুপারভিল একদিন আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। ততদিনে আমি আমার ন্যায়সঙ্গত পাশপোর্ট পেয়ে গেছি। এই বৃদ্ধ কবি নিজে আসাতে আমি একটু লজ্জিত ও আশ্চর্য বোধ করেছিলাম। উনি আমাকে বললেন, 'আমি তোমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি খবর এনেছি। আমার জামাই বারতো তোমার সঙ্গে জরুরী দেখা করতে চায়, অবশ্য আমি জানি না কি বিষয় নিয়ে।'

বারতো ছিলেন পুলিসের প্রধান। আমরা তাঁর অফিসে গেলাম। বারতো তীক্ষ্ণ বিচক্ষণ মুখ আর তাঁর টেবিলের উপরে সারি সারি টেলিফোন ইত্যাদি দেখে তাঁকে আমার মনে হচ্ছিল ঠিক সেই 'ফ্যানটোমাস' বা ইনস্পেক্টর 'মেগ্রো'র কথা। বারতো আমার সব বইই প্রায় পড়েছিলেন এবং আমার সম্বন্ধে অনেক খবরই

রাখতেন। তিনি বললেন, 'আমার কাছে চিলির সরকার খবর দিয়েছেন যে, আপনি নাকি দূতাবাসের পাশপোর্ট ব্যবহার করেন।—এটা বেআইনী। চিলির রাষ্ট্রদূত আমার কাছে জানতে চেয়েছেন এই বেআইনী কাজকে আমরা কেমন করে প্রশ্রয় দিচ্ছি।'

—'মোটেই না।' আমি উত্তর দিলাম।—'আমার কাছে আইনসঙ্গত পাশপোর্ট আছে। এই দেখুন, ভালো করে দেখে এটা আমাকে ফেরৎ দিন। কারণ এটা আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি।'

—'দেখতেই পাচ্ছি এটি একেবারেই আধুনিক। এটিকে পুনরায় কে নবীকরণ করলেন?' বারতো জিজ্ঞাসা করলেন।

—'এটি নিশ্চয়ই সর্বাধুনিক, কিন্তু কে এর নবীকরণ করেছেন তাঁর নাম আমি বলতে পারবো না। কারণ তা জানতে পারলে চিলি সরকার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে বরখাস্ত করবেন।'

আমার সমস্ত কাগজপত্র ও পাশপোর্টের উপর ভালোভাবে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বারতো সোজা চিলির রাষ্ট্রদূতকে ফোন করলেন। তাঁর সঙ্গে চিলির রাষ্ট্রদূতের সেদিনকার কথোপকথনটা আমার সামনেই হয়েছিলো।

—'না, মাননীয় রাষ্ট্রদূত, আমার দ্বারা এটা কোনো মতেই সম্ভবপর নয়। এঁর পাশপোর্ট একেবারে আধুনিক করা রয়েছে এবং কে করেছে তা জানি না। এই পাশপোর্ট কোনো রকমেই তাঁর কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবো না। আমি খুবই দুঃখিত। আমাকে ক্ষমা করবেন মাননীয় রাষ্ট্রদূত।'

রাষ্ট্রদূতের চাপ সৃষ্টির বিরুদ্ধে বারতো-র অনমনীয় মনোভাব ও রাগত স্বর দুই-ই আমার কানে এসে লেগেছিলো। শেষ পর্যন্ত বারতো আমায় বললেন, 'আপনার দেশেরই রাষ্ট্রদূত আপনার সর্বনাশ করার জন্য বদ্ধপরিকর। কিন্তু আমি আপনাকে বলছি—আপনার যতদিন ইচ্ছে ততদিন আপনি ফ্রান্সে থাকতে পারেন।'

সুপারভিলের সঙ্গে বেরিয়ে আসার সময় এই কথাটাই সেদিন আমার মনে হয়েছিলো—চিলির এই রাষ্ট্রদূত জোয়াকুইন ফারনানদেজ মাত্র কিছুদিন আগেও আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় থাকার জন্য বিশেষ গর্ব বোধ করতেন এবং সেই কথা সকলকে বলতেন, আজ তিনিই আমার মুণ্ডচ্ছেদের জন্য এখন এতো অধীর। দুঃখ হয়েছিলো এই জন্য যে, উরুগুয়ের বন্ধু কবি সুপারভিল সেদিন এসব ব্যাপারের কিছুই বুঝতে পারেন নি। জয় গৌরবের সঙ্গে মিশ্রিত এবং পরিবর্তিত ও আহত একটি মন নিয়ে সেদিন আমি বারতো-র অফিস ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম।

মূলদেশ

ইরেনবুর্গ আমায় ভর্ৎসনা করেছিলেন আমার কবিতার মধ্যে অত্যধিক মাত্রায় 'মূল' থাকার জন্য।

অত্যন্ত সত্য কথা। সীমান্ত আমার মধ্যে শিকড় গেড়ে বসেছে। আমার দেশের মাটির প্রতিটি স্তরে আমার শিকড় ছড়িয়ে রয়েছে। কেমন করে নিজেকে তা থেকে

আমি বিচ্ছিন্ন করবো? আমার জীবনের এই তীর্থ পরিক্রমায় দক্ষিণের কতো ঘন জঙ্গলে, আবার উত্তরের হারিয়ে যাওয়া কতো জঙ্গলে আমি আমার শিকড় প্রোথিত করে এসেছি।

মাঝে মাঝে সাতশো বছরের জীবন কাটিয়ে বড়ো বড়ো মহীরুহের দল মাটি থেকে আলাদা হয়ে মাটির উপরেই শিকড় বিছিয়ে চিরনিদ্রায় শুয়ে পড়ে, কখনও বা তাকে উপড়ে ফেলা হয়—আবার কখনো আসে জঙ্গল জুড়ে বহ্ন্যুৎসব—তখন তারা পুড়ে ছাই হয়ে যায়। শুনেছি দানব সদৃশ মহীরুহের পতনের আওয়াজ, বিরাট ওক্ বৃক্ষের পতনের সাথে ভেসে এসেছে নিঃশব্দ মহাপ্লাবনের স্বর, যেন মাটির বুকে করাঘাত করে দরজা খুলে দিতে বলেছে বার বার যাতে মৃত্তিকা-গর্ভে তারা সমাধিস্থ হতে পারে। কিন্তু শিকড় পড়ে থাকে মাটির বুকে—শত্রু সময় আর ভুঁইফোঁড় কীটানুদের দৃষ্টির সামনে—একের পর এক তারা এগিয়ে আসে সেই উন্মুক্ত শিকড় ধ্বংস করতে। দগ্ধ আহত সেই বাহুগুলির চেয়ে সুন্দর এই পৃথিবীতে বোধহয় আর কেউ নয়—ওরা জঙ্গলের রাস্তায় পড়ে থেকে সমাহিত মহীরুহের গোপন-বার্তা জানায়—ওরা যোগায় খাদ্য আর পেশী সমস্ত উদ্ভিদ জগতে, ওরা প্রকৃতির গোপন ভাস্বর মূর্তি—মৃত্তিকার অদ্বিতীয় সম্পদ।

একবার এই পাহাড়ী ঝরণা আর ঘন জঙ্গলের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আলবার্তি আমায় প্রতিটি শাখা-প্রশাখা দেখিয়ে বলেছিলেন—সবগুলোই কেমন যেন একে অন্যের থেকে পৃথক, সবারই একটা নিজস্ব সৌন্দর্য আছে, প্রত্যেকেই যেন নিজস্ব নক্শা আঁকার প্রতিযোগিতায় মত্ত।—তাকিয়ে দেখ, যেন প্রকৃতির ভূ-দৃশ্যের সৌন্দর্য সংগ্রহরত এক একজন মালী তাঁদের মনোরম উদ্যানের জন্য এসব সাজিয়ে রেখেছেন। বহুকাল পরে এই দিনটির কথা মনে আসায় আলবার্তি আমার দেশের জঙ্গলের সীমাহীন সৌন্দর্যে তাঁর অভিভূত হওয়ার কথা আমায় জানিয়েছিলেন।

এক সময় তাই-ই ছিলো, আজ আর নেই। বিষাদে আমার মন ভরে ওঠে—যখন মনে করি শৈশব আর যৌবনের প্রারম্ভ পর্যন্ত এই নদী জল আর জঙ্গলের মধ্যে আমি অহর্নিশ ঘুরে বেড়িয়েছি সৌন্দর্য সন্ধানে, আহরণ করেছি আমার জীবন-বেদের মূল মন্ত্র।

বৃষ্টিভেজা দারুচিনি গাছের গন্ধে ম ম করেছে আমার মন। অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থেকেছি তুষারাবৃত শ্যাওলা আর পানার দিকে—ওরা সৃষ্টি করেছে জঙ্গলের অগুনতি মুখাবয়ব। ঝরাপাতা সন্তর্পণে সরিয়ে শিকড়ের ভিতর তাকিয়ে দেখতে পেয়েছি অজস্র জোনাকী আর গুবরে পোকার ব্যালে নৃত্য।

পরে যখন আর্জেনটিনার পথে যেতে যেতে পাহাড়ী রাস্তার ধারে এক এক সময় বিরাট বিরাট বৃক্ষের ততোধিক বিরাট শিকড়স্তূপ আমাদের পথ আগলে দাঁড়িয়েছে, কুঠারাঘাতে তখন তাকে কেটে পথের পাশে সরিয়ে চলার পথ পরিষ্কার করতে হয়েছে। সেই সময়ে উপড়ে হয়ে পড়ে থাকা স্তূপাকার শিকড়গুলির দিকে তাকিয়ে মনে হয়েছে ওরা যেন উল্টানো এক একটি গীর্জা—যার জমকালো সব ঐশ্বর্য-সৌন্দর্যে অভিভূত ও সম্মোহিত হয়ে ওঠে মন।

নির্বাসিত জীবনের শুরু ও শেষ

১৯৪৯ সালে যখন আমার নির্বাসন সবে শেষ হয়েছে ঠিক সেই সময়েই পুশকিনের ষষ্ঠতম শতাব্দী উৎসবে মস্কো থেকে আমার নিমন্ত্রণ এসে পৌঁছলো। গোধূলি লগ্ন ও আমি—আমরা দু'জনে একই সঙ্গে উপস্থিত হলাম শীতার্ত বালটিকের ধারে—সাদা মুক্তোর মতো সেই সুপ্রাচীন অথচ নবীন বীরের শহর লেনিনগ্রাদে। মহামানব পিটার আর মহামানব লেনিনের এই শহর প্যারি-র মতো স্বর্গীয় পরী। এখানে পরীর রূপ পেটানো লোহার মতো। ধূসর রাস্তা, সীসার মতো রঙ মেখে পাথরের বাড়িগুলি আর সবুজ সমুদ্র। পৃথিবীর সবচেয়ে চমৎকার যাদুঘরে সাজানো রয়েছে জারের বহুমূল্য সম্পদ—স্বর্ণালংকার আর জমকালো পোশাক—অস্ত্রশস্ত্র আর কাঠের কারুকার্য। এদের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলাম আমি।

আমি এসেছিলাম শতাব্দীর পুরোনো মৃত এক কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে—যাঁর অমর কাব্যগাথা উপকথার মতো সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে রয়েছে। সোভিয়েত দেশের প্রতিটি মানুষের অন্তরে তিনি কবিতার যুবরাজ। তাঁর ষষ্ঠতম শতাব্দীর উৎসবের

সমারোহ করতে নাজিবাহিনীর কামানের গোলায় বিধ্বস্ত জারের প্রাসাদকে সোভিয়েতের মানুষ প্রতিটি ইঁট আর পাথর যথাযথ সাজিয়ে নতুন রূপ দিয়েছে। এক যুগের কবির জন্য নবতম যাদুঘর তাঁরা সৃষ্টি করেছিলেন।

সোভিয়েত দেশকে প্রথম দর্শনেই আমার ভালো লেগেছিলো। সমস্ত মানুষ একসঙ্গে কাজ করছেন আর কাজের ফল তাঁরা সবাই সমানভাবে নিজেদের মধ্যে প্রয়োজন অনুসারে ভাগ করে নিচ্ছেন। পৃথিবীর যে কোনো দেশের মানুষের পক্ষেই এ এক বিস্ময়কর উপলব্ধি। গোটা পৃথিবী মানুষের নবতম বৈজ্ঞানিক সমাজ ব্যবস্থার গবেষণার ফল জানার জন্য উৎসুক।

জঙ্গলের মাঝখানে রঙীন পোশাক পরা কৃষকেরা দল বেঁধে পুশকিনের কবিতা আবৃত্তি করছেন—গান গাইছেন—নাচছেন। মাঝে মাঝে আকাশ থেকে অঝোরে নামছে বৃষ্টির ধারা, বিদ্যুতের চমক আলোর রেখা টেনে দিয়ে যায়। এ সবই যেন আমার ধমনীতে প্রবাহিত কবিতার স্রোতের মতো—জঙ্গল আর বৃষ্টিতে যার জন্ম।

দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে সোভিয়েতের গ্রাম্য পরিবেশে। বড়ো বড়ো শহর, বিরাট বিরাট অট্টালিকা আর কলকারখানা গড়ে উঠছে সেখানে। সে দেশের গোটা মানচিত্রটাই যেন বদলে যাচ্ছে দিনে দিনে। মস্কো শহরেও তখন সাহিত্যিক আর কবিকুলে বইছে পরিবর্তনের স্রোত। নিন্দুক পশ্চিমী সভ্যতা যখন কাদা ছড়াতে ব্যস্ত আমি তখন জেনেছিলাম মায়াকভস্কি আর পাস্তেরনাক সোভিয়েতের সবচেয়ে জনপ্রিয় কবি। পাস্তেরনাক সন্ধ্যার কবি। রাজনীতিতে যদিও তিনি একজন সৎ প্রতিক্রিয়াশীল—তাঁর দেশের এই বিরাট পরিবর্তনটা তিনি একজন শিক্ষিত ধর্মযাজকের দৃষ্টিতেই দেখেছিলেন। অথচ তাঁর কঠোর সমালোচককেও আমি দেখেছি তাঁর কবিতা আবৃত্তি করে আমায় শোনাতে।

শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে সোভিয়েত মতবাদের গোঁড়ামি আছে একথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এই সঙ্গে এও মনে রাখতে হবে যে, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য বা ব্যক্তিপূজো সাহিত্য বা শিল্পকে অগ্রসরও হতে দেয় না—যে কোনো সংস্কৃতির উন্নয়নের প্রশ্নে এই ব্যক্তিপূজোকে বর্জন করতেই হবে। জীবন নীতি বা হুকুম মেনে চলে না। জীবন সর্বক্ষেত্রেই বেপরোয়া। বিপ্লবই জীবন, নীতি বা হুকুম হচ্ছে কবরখানা।

চির বিপ্লবী ইরেনবুর্গের বয়স বাড়ছিলো। আমি প্রায়ই তাঁর কাছে যেতাম। পিকাসোর ছবিতে ভর্তি তাঁর ঘরের দেওয়াল, চারপাশে সযত্নে সাজানো প্রস্তরলিপি আর প্রস্তরমূর্তি। আর ছিলো তাঁর চারাগাছ ও লতাপাতার সংগ্রহ।—এসব নিজের হাতে সংগ্রহ করতেন তিনি। তাঁর চারপাশে যা কিছু গড়ে উঠেছে সব কিছুর প্রতিই ছিলো তাঁর অদম্য কৌতূহল ও আগ্রহ।

পরবর্তীকালে রাশিয়ান কবি কিরসানোভের সঙ্গেও আমার আলাপ হয়েছিলো। আমার অনেক কবিতা তিনি তাঁর মাতৃভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। আমি তাঁর নিজস্ব কবিতায় জলপ্রপাতের মুক্তির শব্দ শুনেছি।

মস্কোতে আর একজন কবির সঙ্গে প্রায়শঃই দেখা হতো আমার। তিনি তুরস্কের কবি, নাম—নাজিম হিকমত। রূপকথার মতই জনপ্রিয় এই কবিকে দীর্ঘ আঠারোটা বছর কাটাতে হয়েছিলো তাঁরই দেশের কারাগারে—সরকারের উদ্ভট আদেশে। সে

দেশের নৌ-সেনাকে বিদ্রোহে প্ররোচিত করার অভিযোগে নাজিমের ভাগ্যে জুটেছিলো এই শাস্তি। এক যুদ্ধ-জাহাজে বসে তাঁর বিচারের বর্ণনা করতে করতে তিনি বলেছিলেন যে, জাহাজের ডেকে শৃঙ্খল-বদ্ধ অবস্থায় তাঁকে দৌড় করানো হয়েছিলো ততক্ষণ—যতক্ষণ না তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তারপর তাঁকে বন্ধ করে রাখা হয়েছিলো পায়খানাঘরে—সেই ঘরের পায়খানার স্তূপ তাঁর কোমর পর্যন্ত ডুবিয়েছিলো।—দুর্গন্ধে তাঁর মাথা ঘুরছিলো, তখন তাঁর শরীর অবসন্ন প্রায়। এমন সময় তাঁর মনে হয়েছিলো—যারা তাঁকে শাস্তি দিতে চায় তারা সবাই তাঁর দিকে তাকিয়ে রয়েছে—দেখতে চাইছে কখন তিনি এই অসহ্য যন্ত্রণা আর অত্যাচারে ভেঙে পড়েন। কিন্তু এক অভূতপূর্ব গর্ববোধে হৃতশক্তি ফিরে পেলেন তিনি। শুরু করলেন গান, গলা ছেড়ে চিৎকার করে তিনি গ্যন গাইতে লাগলেন—নিজের রচিত গান—কৃষকের গান, খামারের গান—প্রেমের গান। অত্যাচারীর অত্যাচার আর শরীরের সমস্ত নোংরা যেন মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল! আমি সেদিন হিকমতকে বলেছিলাম—ভাই, আমরা বুঝেছি—গানই আমাদের গাইতে হবে—মানুষের গান। ~~[illegible]~~.

তুরস্কের কৃষক ও শ্রমিকদের অসহনীয় দারিদ্র্য আর কষ্টের কথা বলেছিলেন নাজিম। জমির মালিক ও প্রভুদের অত্যাচারের গল্পও শুনিয়েছিলেন তিনি। নাজিম হিকমত দেখেছেন কৃষক আর শ্রমিকদের ধরে জেলখানায় এনে শুকনো রুটির গুঁড়ো আর ঘাস খেতে দিতে। যখন রুটির গুঁড়ো ফুরিয়ে যেতো তখন ক্ষুধার্ত শীর্ণ এই মানুষগুলিকে হাত আর পায়ের সাহায্যে চতুষ্পদ জন্তুর মতো চলে চলে ঘাস খেতে বাধ্য করা হতো।

নাজিম বহু বছর সোভিয়েত ভূমিতে কাটিয়েছিলেন এবং সোভিয়েত সমাজ ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক উন্নতি ও সেখানকার মানুষের মমত্ববোধ তাঁকে মুগ্ধ এবং আকৃষ্ট করেছিলো। সোভিয়েত সাহিত্যের প্রতি তাঁর ছিলো অসীম শ্রদ্ধা। তিনি বলতেন, কাব্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমি দৃঢ় আশাবাদী, কারণ এমন একটা দেশে রয়েছি যেখানে দেখেছি কবিতার মধ্য দিয়েই এসেছে মানুষের সার্বিক আত্মিক উন্নতি।—সমাজের চারপাশে ছড়ানো এই যে অসাম্য অবিচার অন্যায় অত্যাচার আর শোষণ—এর মধ্যে দাঁড়িয়ে সাহিত্য বা শিল্প কি কোনো অশরীরী স্বাধীনতার কথা চিন্তা করতে পারে?

শীতের শহর মস্কো। ছোটো-বড়ো বাড়িগুলির উপরে জমাট তুষারের স্তূপ। ঝকমকে পরিষ্কার বড়ো বড়ো রাস্তায় অসংখ্য মানুষের ভীড়। কনকনে ঠান্ডা হাওয়া কাচের টুকরোর মতো ছুটে এসে গায়ে লাগে। পথ-চলতি মানুষদের দেখে মনেই হয় না যে শীত ওদের স্পর্শ করতে পেরেছে! মনে হয় মস্কো এক স্বপ্নের শীতাবাস। একে ঘিরে রয়েছে অদৃশ্য আর দৃশ্যমান জীবন্ত সব মানুষের হাজারো স্বপ্ন।

*৩০°-র নীচে নেমে এসেছে তাপমাত্রা। মস্কো শহরকে দেখে মনে হচ্ছিল আগুন আর তুষার দিয়ে নির্মিত একটি নক্ষত্রের মতো, যেন পৃথিবীর বুকে জ্বলন্ত কোনো হৃদয়।

আমার এক স্প্যানিশ বন্ধু আমায় তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে জানিয়েছিলেন যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তিনি দেখেছিলেন মস্কোর ওই তীব্র শীতের রাত্রে সোভিয়েত সৈন্যরা আইসক্রীম খান—এটা দেখে তাঁর মনে হয়েছিলো এ যুদ্ধে

সোভিয়েতের জয় অবশ্যম্ভাবী। মস্কো শহর ছাড়িয়ে শহরের উপকণ্ঠ দিয়ে যাবার সময় শীতে বরফ হয়ে যাওয়া নদীর উপর দিয়ে যেতে যেতে লক্ষ্য করেছিলাম মাঝে মাঝে এক একজন জেলে প্রায় জমে ওঠা সেই বরফে গর্ত করে ছিপ ফেলে দাঁড়িয়ে আছেন মাছ ধরার জন্য। বিরাট বরফের সমুদ্রের মাঝে জেলেদের একাগ্রতা দেখে মুগ্ধ হলাম। সেই সব জেলেদের দূরে থেকে দেখে আমার মনে হচ্ছিল যেন চকচকে একটা সাদা টেবিলের পাশে ছোট্ট ছোট্ট এক একটা মাছি।—এই জেলেদের এমনিভাবে মাছ ধরার সঙ্গে কবিতার একটি নিবিড় সম্বন্ধ আছে। ঠিক এমনিভাবেই বরফে জমে যাওয়া নদীকে খুঁজে নিয়ে তার গায়ে গর্ত করে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় কবিকে। তাঁকেও সহ্য করতে হয় নিদারুণ এই শীতে মারাত্মক সমালোচনা—ব্যঙ্গ আর বিদ্রূপের মধ্যে মাথা উঁচু করে থাকতে হয় তাঁকে।—তারপর কোনো এক গভীর গর্তে তাঁর মনের ছিপটাকে ফেলে একের পর এক তুলে নেন তিনি ছোটো-বড়ো নানান্ রঙের ঈপ্সিত বস্তু।

সাহিত্য-সভায় আমার আমন্ত্রণ এলো। উপস্থিত হয়ে বক্তৃতা মঞ্চে দেখলাম বিশিষ্ট সোভিয়েত সাহিত্যিকদের।—দেখলাম একমাথা সাদা চুল আর সাদামাটা হাসিতে ভরা মুখ ফাদিয়েভকে। ইংরেজ জেলেদের মতো তীক্ষ্ন চোখ আর নাক ফেদিনকে। ইরেনবুর্গ বসেছিলেন তাঁর সেই চিরাচরিত পোশাকে—যেটা নতুন হলেও মনে হয় ওটা পরে উনি রাত্রে ঘুমিয়েছিলেন, আর দেখলাম টিকোনভকে। মঞ্চে অন্যান্য আরো অনেকের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের সুদূর সীমান্ত থেকে আসা মঙ্গোলিয়ান সাহিত্যিকরা—যাঁদের বর্ণমালা আমার কাছে তখনও অজ্ঞাত।

ভারতে পুনরাগমন

১৯৫০ সালে আমায় হঠাৎ একবার ভারতবর্ষে আসতে হয়। প্যারিতে অধ্যাপক জোলিও কিউরী আমায় ডেকে একটি দৌত্যকার্যে যাবার জন্য অনুরোধ করলেন। দিল্লী যেতে হবে, সেখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের মতামত জেনে ভারতবর্ষে বিশ্বশান্তি আন্দোলনকে আরো জোরদার করতে হবে।

অধ্যাপক কিউরী তখন বিশ্বশান্তি মহাসভার ফ্রান্স শাখার সভাপতি। তিনি চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন, কারণ শান্তিবাদ বা যুদ্ধবিরোধী মতবাদ ভারতবর্ষে তেমন গুরুত্বলাভ করছিলো না, যদিও সবাই জানে যে, ভারতবর্ষ শান্তিপ্রয়াসী দেশসমূহের মধ্যে অন্যতম। প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু নিজে শান্তি ও সহাবস্থান নীতির একজন বড়ো প্রবক্তা। কাজেই ভারতের মাটিতে এই নীতি অনেকখানি শিকড় গেড়ে বসেছিলো।

কিউরী আমায় দু'খানি চিঠি দিলেন, একটি প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুকে লেখা এবং অন্যটি বম্বের একজন বৈজ্ঞানিককে। চিঠি দু'খানি আমি যাতে নিজের হাতে তাঁদের দিই সেজন্যও অনুরোধ করলেন। এই সামান্য কাজের জন্য আমাকে নির্বাচিত করাটা আমার কাছে বেশ আশ্চর্যের লাগলো। ভাবলাম হয়তো ভারতবর্ষের

প্রতি আমার দীর্ঘস্থায়ী ভালোবাসার জন্য, এবং এদেশেই আমার প্রাক যৌবনের কয়েকটা বছর কেটেছিলো বলে আমাকে নির্বাচন করা হলো। অথবা এও হতে পারে যে, সেই বছরেই আমি আমার কাব্যগ্রন্থ "রেলের ঝনঝনানিতে জেগে ওঠো"র জন্য শান্তি পুরস্কার পেয়েছিলাম—যে সম্মান পাব্লো পিকাসো এবং নাজিম হিকমতও পেয়েছিলেন।

বম্বের প্লেনে উঠে বসলাম। প্রায় তিরিশ বছর পরে আবার যাচ্ছি ভারতবর্ষে। এখন আর ভারতবর্ষ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য নয়, এখন সে দেশ স্বাধীন, গণতন্ত্রী রাষ্ট্র। গান্ধীজীর স্বপ্ন—যার প্রথম মহাসভায় আমিও যোগ দিয়েছিলাম।—হয়তো সেদিনের কোনো বিপ্লবী বন্ধুই আর বেঁচে নেই যাঁরা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের গল্প একজন সহযোদ্ধার মতো আমাকেও শোনাতে পারতেন।

প্লেন থেকে নেমে শুল্ক বিভাগের অনুমতিপত্রের জন্য গেলাম। ঠিক ছিলো যে, সেখান থেকে বেরিয়ে সোজা হোটেলে যাবো, সেখানে পদার্থবিদ্ অধ্যাপক রমনকে কিউরীর চিঠিটা পেঁাছে দিয়ে রওনা হবো দিল্লী।

শুল্ক বিভাগের কিছু কর্মচারী তখন আমার জিনিসপত্তর খুলে পরীক্ষায় ব্যস্ত, যেন সরু একটা চিরুণী দিয়ে চুল আঁচড়ানো হচ্ছে। জীবনে অনেক অনুসন্ধান-পর্ব দেখেছি, কিন্তু এমনটি আর দেখিনি। আমার মালপত্তর বলতে ছিলো কাপড়জামা ভরা একটা স্যুটকেশ আর ছোটো একটা চামড়ার ব্যাগ—তার মধ্যে সাবান তোয়ালে চিরুণী মাজন ইত্যাদি। কিন্তু আমার প্যাণ্ট-সার্ট গেঞ্জি—প্রতিটি পোশাককে দেখলাম পাঁচজোড়া চোখ আর পঞ্চাশটা আঙুল তন্ন তন্ন করে খুঁজলো। আমার জুতোকে উল্টে ঠুকে দাঁড় করিয়ে সব রকমভাবেই খোঁজাখুঁজি হলো। প্যাণ্ট আর জামার পকেটগুলির সুতো খুলে দেখা হলো। ইতালীর বহু পুরোনো একটা সংবাদ-পত্র দিয়ে মুড়ে জুতোজোড়াকে স্যুটকেশে রেখেছিলাম—যাতে জামা-কাপড় নোংরা না হয়, সেই কাগজ খুলে আলোর সামনে ধরে সেটাকে অনেকক্ষণ যাবৎ পরীক্ষা করা হলো—যেন আমি কোনো গুপ্ত দলিল সঙ্গে এনেছি! পরীক্ষার পর সেই কাগজটি আমার আরও কিছু কাগজপত্র চিঠি পাশপোর্ট ইত্যাদির সঙ্গে আলাদা করে সরিয়ে রাখা হলো। এরপর আমার জুতোজোড়ার ভিতর-বাহির এমনভাবে পরীক্ষা করা হলো, যেন তারা এক অভূতপূর্ব প্রস্তরীভূত জীবদেহ!

প্রায় দুঘণ্টা যাবৎ এই অবিশ্বাস্য অনুসন্ধানপর্ব চললো। তারপর আমার পাশপোর্ট, ঠিকানা লেখা ডায়েরী, ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে লেখা চিঠি এবং জুতো থেকে খুলে নেওয়া সেই পুরোনো সংবাদপত্র একটি বাণ্ডিলে বেঁধে তার উপর জাঁকজমকপূর্ণ একটি সীল মারা হলো।—এবার হোটেলে যাবার অনুমতি পেলাম। অনুমতি তো পেলাম, কিন্তু কোনো হোটেলে থাকার অনুমতি তো পাবো না। তাই চিলির মানুষের প্রশংসনীয় ধৈর্যের সবটুকু অক্ষুন্ন রেখে আমার সমস্ত শক্তি নিয়ে আমি বললাম, বিনা পাশপোর্টে এবং পরিচয় ছাড়া কোনো হোটেলেই তো আমাকে থাকতে দেবে না। তাছাড়া এদেশে আসার উদ্দেশ্যই তো হচ্ছে এখানকার প্রধানমন্ত্রীকে জোলিও কিউরীর লেখা পত্রটি দেওয়া—সেটা বাজেয়াপ্ত হলে আমার আসাই ব্যর্থ। ওঁরা উত্তর দিলেন—আমরা বলে দিচ্ছি, হোটেলে থাকায় আপনার কোনো অসুবিধে

হবে না। আর কাগজপত্তর চিঠি ইত্যাদি যথা সময়েই আপনি ফেরৎ পাবেন।

এই সেই দেশ যে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনগুলি আমার যৌবনের অভিজ্ঞতা, আমার যৌবনের সেই রোমাঞ্চময় মুহূর্ত যা এই দেশের বিপ্লবী বন্ধুদের সঙ্গে সেদিন ভাগ করে নিয়েছিলাম। স্যুটকেশ এবং মুখ বন্ধ করার সময় শুধু একটি শব্দই আমার মনে এসেছিলো—'বিষ্ঠা'।

হোটেলে অধ্যাপক বরুয়ার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হওয়ার সময় তাঁকে এই ঘটনার কথা জানালাম, তিনি এতে কোনো গুরুত্বই দিলেন না। তাঁর মতে নতুন স্বাধীনতা প্রাপ্ত ভারতবর্ষে পরিবর্তনের জোয়ার চলেছে, কাজেই এসব ঘটনা ঘটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু আমার কাছে এর সবটাই একটা বিপথগামী বিশৃঙ্খলা বলে প্রতিভাত হয়েছিলো। নবলব্ধ এক স্বাধীন দেশের কাছে যে সামান্য অভ্যর্থনাটুকু আশা করেছিলাম এ যেন তার থেকে অনেক—অনেক দূরে মনে হয়েছিলো।

পারমাণবিক গবেষণাগারটি বেশ ঝকঝকে আর পরিষ্কারভাবে সাজানো গোছানো একটি বাড়ি—যার অলিন্দে অলিন্দে সাদা ধবধবে পোশাক পরা ছেলে-মেয়ে গবেষকরা সব সময়েই ব্যস্ত সমস্ত হয়ে চলাফেরা করেন। গবেষণাগারটি নানান্ যন্ত্রপাতি আর ব্ল্যাকবোর্ড প্রভৃতিতে পূর্ণ। পদার্থবিদ্যার নানা দুর্বোধ্য তত্ত্বে গোটা বাড়িটি গম্ গম্ করছে—এর অধিকাংশই আমার বোধশক্তির বাইরে। পুলিস আর শুল্ক দপ্তরের কাছে যে অপমান ও তাচ্ছিল্য আমাকে সহ্য করতে হয়েছিলো, এখানে এসে তার কিছুটা লাঘব হলো।

আমার অস্পষ্ট মনে আছে ছোট্ট একটা বাটির মধ্যে রাখা তরল পারা দেখেছিলাম। এই পদার্থটির মতো আশ্চর্যজনক কোনো বস্তুই আমি দেখিনি। অবিশ্বাস্য এক অসীম ক্ষমতা প্রাণীদেহের মতো এর মধ্যে রয়েছে, এর গতি তরলতা আর নিজেকে নানান্‌রূপে কখনও গোল কখনও চ্যাপ্টা করে বদলানোর ব্যাপারটি আমার চিন্তার বাইরেই ছিলো।

সেদিন যাঁর কাছে দুপুরের খাবার নিমন্ত্রণ রক্ষা করেছিলাম নেহরুর সেই বোনের নামটি আমার ঠিক মনে নেই, তবে তাঁর উপস্থিতিতে আমার মানসিক ক্লেশটা অনেকটা কমে আনন্দে মনটা ভরে উঠেছিলো। অপরূপ সুন্দরী সেই মহিলাকে একজন অভিনেত্রীর মতো দেখাচ্ছিল। নানান্ রঙে উদ্ভাসিত তাঁর শাড়ি আর দামী মুক্তো হীরের অলঙ্কার পরিহিতা এই রমণীটিকে দেখে মনে হচ্ছিল কোনো এক অচিন দেশের রাজকন্যা। আমার কাছে শুধু একটা জিনিসই বিসদৃশ লেগেছিলো—যখন তিনি হীরে জহরতের অলংকারে মোড়া আঙুল দিয়ে ভাত-তরকারি তুলে তুলে মুখে দিচ্ছিলেন। আমি তাঁকে বলেছিলাম যে, আমি তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে এবং শান্তি-সভার অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, তাঁর মতে ভারতবর্ষের সমস্ত মানুষেরই তো এই শান্তি আন্দোলনে যোগ দেওয়া উচিত।

সেদিন অপরাহ্নে হোটেলে আমার কাছে আমার বাজেয়াপ্ত বাণ্ডিলটি ফিরৎ দিয়ে গেল পুলিস, যে বাণ্ডিলটি এয়ারপোর্টে আমারই সামনে সীল করা হয়েছিলো,

দুর্মুখো পুলিসের দল সেটাকে খোলা অবস্থায় হাজির করলো।—আমি নিঃসন্দেহ ছিলাম যে, এর মধ্যেকার সবকিছুই যে তাঁরা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করেছেন তাই নয়, তার ছবিও তাঁরা তুলে রেখেছেন। হাসি পেয়েছিলো এই কথা ভেবে যে, আমার ধোপার বিলটারও ছবি তুলতে ভোলেন নি তাঁরা। পরে জেনেছিলাম—আমার ডায়েরীতে যাঁদের নাম-ঠিকানা ছিলো তাঁদের প্রত্যেকের কাছে গিয়ে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন।—এঁদের মধ্যে আমার শ্যালিকা, রিকারডো গুইরালদ্যেসের বিধবা পত্নীও বাদ যায়নি। এই অগভীর দিব্যজ্ঞানী ভদ্রমহিলার ভারতীয় দর্শনের উপর ছিলো অগাধ বিশ্বাস। ইনি সে সময়ে গ্রামে থাকতেন। আমার ডায়েরীতে এঁর নাম থাকার জন্য পুলিসের হাতে এঁকে অনেক নিগ্রহই সেদিন সহ্য করতে হয়েছিলো।

দিল্লীতে পেঁছে সেখানকার বেশ কয়েকজন নামকরাব্যিক্তির সঙ্গে পরিচয় হলো।—তাঁরা কেউ সাহিত্যিক, কেউ দার্শনিক, কেউবা হিন্দু, কেউ আবার বৌদ্ধ সন্ন্যাসী।—এঁরা সেই সব ভারতীয় যাঁরা সরল ও সহজ মানুষ। সবাই-ই সেদিন স্বীকার করেছিলেন যে, সুপ্রাচীন এই ভারতবর্ষের দর্শনে শান্তির জন্য এই সুসংবন্ধ হওয়ার এক বিরাট ঐতিহাসিক মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা আছে। এই মুহূর্তে শান্তি-আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য যেটি সবচেয়ে প্রয়োজনীয় সেটি হচ্ছে বিভিন্ন মতের মানুষকে একত্র করে একটি ঐক্যবন্ধ কর্মসূচীর মাধ্যমে মানব সমাজের কল্যাণের জন্য এই শান্তি আন্দোলনের হাতকে শক্ত করা।

ডাঃ জুয়্যান মার্টিন আমার একজন পুরোনো বন্ধু, ইনি চিকিৎসক ও সাহিত্যিক। মার্টিন তখন ভারতে চিলির রাষ্ট্রদূত। রাত্রে খাবার সময় তিনি দেখা করতে এলেন। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেক কথার পর তিনি জানালেন যে, পুলিস-প্রধানের সঙ্গে দেখা করার জন্য যেতে হবে আমাকে। দূতাবাসের লোকেদের সঙ্গে আমলারা যেমন শান্ত ও ভদ্রভাবে কথা বলে থাকেন, ঠিক তেমনিভাবেই পুলিস-প্রধান তাঁকে জানিয়েছিলেন যে, ভারতবর্ষে আমার উপস্থিতিটা তদানীন্তন ভারত সরকারের ঠিক পছন্দ নয়, কাজেই যত শীঘ্র সম্ভব আমি যেন এদেশ ছেড়ে চলে যাই। রাষ্ট্রদূত বন্ধুটিকে জানিয়েছিলাম যে, আমার একমাত্র ইচ্ছা এই হোটেলের অনাবৃত লনে বসে আমার চিন্তার অংশীদারদের সঙ্গে কিছু মত বিনিময় করে মাননীয় প্রধান মন্ত্রীকে দেবার জন্য নিয়ে আসা চিঠিটা নেহরুর হাতে তুলে দেবার পরেই আমি এদেশ ছেড়ে চলে যাবো।—যদিও এক সময় এদেশের মুক্তিসংগ্রামের জন্য আমার সমস্ত সহানুভূতি জড়িয়ে ছিলো তবু দেখলাম এখানে এসে এই অসম্মান-নিগ্রহ আর সন্দেহ—যার কোনো কারণই জ্ঞানতঃ আমার জানা নেই, সেখানে আর এক মুহূর্তও আমি থাকতে চাই না।

আমার বন্ধু এই রাষ্ট্রদূতটি চিলিতে এক সময় সমাজতন্ত্রী দলের একজন প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, কিন্তু বয়স এবং রাষ্ট্রদূতের আরামদায়ক চাকরির জন্য তিনি বেশ নরম ও ভীরু হয়ে পড়েছিলেন। আমার প্রতি ভারত সরকারের এই অসৌজন্যমূলক ব্যবহারের প্রতিবাদের পরিবর্তে চাকরির মোহে চুপ করে থাকাটাকেই তিনি শ্রেয় মনে করেছিলেন! কাজেই সেদিন দুজনেই আমরা দুজনের কাছ থেকে বেশ দূরে সরে গেলাম। তিনি মুক্ত বোধ করেছিলেন যখন তাঁর গুরুদায়িত্ব আমার সহযোগিতায়

সহজেই সুসম্পন্ন হয়েছিলো। আর আমি আমার বন্ধু সম্বন্ধে সহজেই মোহমুক্ত হতে পেরেছিলাম।

পরদিন সকালে নেহরুর সঙ্গে তাঁর অফিস ঘরে দেখা করার অনুমতি পেয়েছিলাম। উঠে দাঁড়িয়ে করমর্দনের সময় তাঁর মুখে অভ্যর্থনার স্মিত হাসিটুকুও আমি দেখিনি সেদিন। তাঁর এতো ছবি আমরা দেখে থাকি যে, সে বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। ঠাণ্ডা দু'টি কালো চোখের প্রাণহীন শীতল দৃষ্টি আমার দিকে সব সময়েই নিবদ্ধ ছিলো। ত্রিশ বছর আগে স্বাধীনতা সংগ্রামের মহতী এক জনসভায় তিনি ও তাঁর পিতার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়ের ঘটনা যখন উল্লেখ করেছিলাম তখনও তাঁর মধ্যে কোনো ভাবান্তর দেখিনি। আমার সব ক'টি প্রশ্নেরই উত্তর তিনি অল্প কথায় দিচ্ছিলেন এবং সর্বক্ষণ তাঁর সেই শীতল দৃষ্টি দিয়ে আমাকে পরীক্ষা করছিলেন। তাঁর বন্ধু জোলিও কিউরীর চিঠিটি তাঁকে দিলাম। এই ফরাসী বৈজ্ঞানিকের উপর শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি চিঠিটি পড়লেন।—এই চিঠিতেই জোলিও আমার পরিচয় দিয়ে আমাকে আমার কাজে সাহায্য করার জন্য নেহরুকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। চিঠি পড়া শেষ হলে সেটা দেরাজে রেখে কোনো কথা না বলে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। সেই সময়ে আমার হঠাৎ মনে হলো—আমার উপস্থিতিটা তাঁর মোটেই পছন্দ নয়। সেই সঙ্গে এটাও আমার মনে হয়েছিলো যে, খিটখিটে মেজাজের এই মানুষটির মধ্যে শারীরিক মানসিক ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব চলেছে। বিরাট শক্তিধর এই মানুষটি শুধু আদেশই করতে শিখেছেন, কিন্তু আদেশ করার মতো নেতৃত্বের গুণ তাঁর মধ্যে অনুপস্থিত। তাঁর পিতা পণ্ডিত মতিলাল ছিলেন একজন অভিজাত বংশোদ্ভূত জমিদার—যাঁর মধ্যে ছিলো সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামীর মনোবৃত্তি। তিনি গান্ধীজীকে শুধু রাজনৈতিক নয়, তাঁর বিরাট ঐশ্বর্যের দ্বারাও প্রভূত সাহায্য করেছিলেন। সেদিন আমার মনে হয়েছিলো যে, আমার সামনে বসা এই মানুষটি কোনো এক দুর্বোধ্য ক্ষমতাবলে আবার সেই জমিদারী যুগে ফিরে গেছেন এবং তাঁর সামনে উপস্থিত আমাকে দেখে যেন একজন নগ্নপদ দরিদ্র কৃষকের কথাই মনে মনে পোষণ করছেন। কাজেই আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম, প্যারীতে ফিরে অধ্যাপক জোলিওকে কি বলবো?

শুষ্ককণ্ঠের জবাব এলো, এ চিঠির উত্তর আমি দেবো।

কয়েক মুহূর্তের এই নীরবতা আমার কাছে মনে হচ্ছিল যেন অনন্তকাল। বোঝাই যাচ্ছিল নেহরু আমার সঙ্গে কথা বলাটা ঠিক পছন্দ করছেন না অথচ এর জন্য তিনি মৌখিক কোনো কিছুই প্রকাশ করেন নি।—আমারও খারাপ লাগছিলো যে, আমার উপস্থিতির জন্যই গুরুত্বপূর্ণ এই ব্যক্তিটির অমূল্য সময়ের অপব্যবহার হচ্ছে। তখন মনে হলো—যে কাজের ভার দিয়ে আমায় ভারতবর্ষে পাঠানো হয়েছিলো সে বিষয়ে দু-চারটে কথা বলা প্রয়োজন, তা না হলে এই ঠাণ্ডা যুদ্ধ যে কোনো সময়েই উত্তপ্ত হয়ে উঠতে পারে।—যে কোনো সময়েই এক নতুন মহাপ্লাবন এসে সমগ্র মানব জাতিকে গ্রাস করতে পারে। তাঁকে পারমাণবিক যুদ্ধের বিপদের কথাও জানালাম। এবং আরও জানালাম যুদ্ধবিরোধী মানুষদের ঐক্যবদ্ধ হবার আশু প্রয়োজনীয়তার কথাও।

গভীর চিন্তায় নিমগ্ন নেহরু আমার কথা না শোনার ভান করে কিছুক্ষণ পরে বললেন, শান্তির কথা বলতে বলতে দু'পক্ষই তো পরস্পর ঢিল ছুঁড়ে চলেছে।

বললাম, ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি যাঁরা শান্তির কথা বলেন এবং পৃথিবী-ব্যাপী শান্তি সৃষ্টির জন্য কিছু দান করতে যাঁরা আগ্রহী তাঁরা সবাই একদিকে থেকে শান্তির জন্য আন্দোলনকে জোরদার করতে পারেন।

নিস্তব্ধ ঘরটিতে নেমে এলো আরো গভীর নীরবতা। বুঝলাম আমার বলা ও শোনা শেষ হয়েছে, এবার যেতে হবে। উঠে নীরবে হাত বাড়িয়ে দিলাম, নীরবেই করমর্দন করলেন তিনি।

দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বন্ধুত্বপূর্ণ স্বরে প্রশ্ন করলেন, আপনার জন্য আমি কি কিছু করতে পারি, কোনো কিছু কি আপনার পছন্দ?

যে কোনো ঘটনার প্রতিক্রিয়া আমার মধ্যে একটু দেরীতেই হয়, এবং দুর্ভাগ্যবশতঃ কারুর প্রতিই বিদ্বেষপরায়ণ হতে পারি না আমি। যাই হোক, জীবনে এই একটিবার আমি রুখে দাঁড়িয়েছিলাম। উত্তর দিলাম, ও হ্যাঁ, আপনাকে বলতে ভুলে গিয়েছি যে, এক সময়ে আমি ভারতবর্ষে বেশ কিছুকাল ছিলাম, কিন্তু দিল্লীর খুব কাছে থাকা সত্ত্বেও তাজমহল দেখা হয়নি আমার। তাই ভেবেছিলাম যে, অপূর্ব সুন্দর স্মৃতিসৌধ তাজমহলটা দেখে যাবো এবারে, অবশ্য যদি পুলিস এই শহরের সীমানা অতিক্রমের অনুমতি আমাকে দিতো। যাই হোক, আগামীকাল ভোরেই আমায় চলে যেতে হচ্ছে এদেশ ছেড়ে।—ধন্যবাদ।

মনের মতো তীক্ষ্ণ উত্তর দিতে পেরে খুশি হয়ে তাঁকে বিদায় জানিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলাম।

আমার হোটেলের ম্যানেজার রিসেপশনে আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আমি প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বললেন, এইমাত্র সরকারী অফিস থেকে খবর দিয়ে গেছে যে, ইচ্ছা করলে যে কোনো সময়ে আপনি তাজমহল দেখতে যেতে পারেন।

আমি বলেছিলাম, শিগ্‌গির আমার বিল ইত্যাদি দেবার ব্যবস্থা করুন, আমি হোটেল ছেড়ে এখনই এয়ারপোর্টে যাবো, প্যারির প্রথম প্লেন ধরতে হবে।

এর পাঁচ বছর বাদে 'লেনিন শান্তি পুরস্কার সম্মেলন'এর বার্ষিক অধিবেশনে বিশ্বের অন্যান্য অনেক প্রতিভাবান ব্যক্তির সঙ্গে আমিও উপস্থিত ছিলাম। যখন সময় এলো সেই পুরস্কার প্রাপকের নাম মনোনীত করার এবং সেজন্য ভোট নেবার তখন উপস্থিত ভারতীয় প্রতিনিধি প্রধানমন্ত্রী নেহরুর নাম উত্থাপন করেছিলেন। বিচিত্র এক হাসির একটি ছায়া সেদিন আমার মুখে ভেসে উঠেছিলো—যদিও অন্যান্য বিচারকরা কেউই সেটা লক্ষ্য করেন নি। অন্যান্যদের সঙ্গে নেহরুর পক্ষেই ভোট দিয়েছিলাম আমি। এই পুরস্কার নেহরুকে সেদিন বিশ্বশান্তির একজন সংগ্রামী নেতা হিসাবে চিহ্নিত করেছিলো।

আমার প্রথম দেখা চীন

বিপ্লবোত্তর চীনকে আমি দু'বার দেখেছি। প্রথম যাই ১৯৫১ সালে। সেই বছরের লেনিন পুরস্কার সান্ ইয়াত্ সেনের বিধবা পত্নী মাদাম সুন্ চিঙ লেঙকে পৌঁছে দেবার ভার পড়েছিলো আমার উপরে। চীনের উপ-প্রধানমন্ত্রী কুয়ো-মো-জো—যিনি পুরস্কার সমিতির তদানীন্তন সভাপতি, তাঁরই অনুমোদনে এই স্বর্ণপদক তাঁকে দেওয়া হয়। এই সমিতিতে এ্যারাগো, এ্যানা সেঘার্স চলচ্চিত্রকর জাস্দ্রোভ, ইরেনবুর্গ প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে আমিও একজন সভ্য ছিলাম। এই পুরস্কার অন্যান্যদের মধ্যে আমরা পিকাসো, বারটোল্ট ব্রেখ্ট ও র‍্যাফেল আলবার্তিকেও দিয়েছিলাম। অবশ্য এজন্য অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিলো আমাদের।

ট্রান্স সাইবেরিয়ান রেলপথ ধরে আমরা রওনা হলাম। এই রেলে চড়লে মনে হয় যেন স্থলপথে জাহাজে চলেছি—যা অনেক রহস্যময় উপকূল দিয়ে নিয়ে চলেছে। সাদা হলদে লাল মাটি আর তুষারস্তূপের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে আমি আর ইরেনবুর্গ পায়ের জড়তা কাটাতে মাঝে মাঝে এক একটা স্টেশনে নেমে ঘুরতাম। প্রায় সব স্টেশনই এক রকমের। সব স্টেশনেই রয়েছে মাটি বা সিমেন্টে তৈরি স্তালিনের মূর্তি। ট্রেনের কামরায় ইরেনবুর্গের স্বভাবসুলভ অবিশ্বাস্য সব মজাদার গল্প শুনতাম। দেশভক্ত এই মানুষটি সমসাময়িক অনেক কথাই ব্যঙ্গচ্ছলে বলতেন।

ইরেনবুর্গ যুদ্ধের সময়ে সাংবাদিক হিসাবে বার্লিন শহরে গিয়েছিলাম রেড আর্মির সঙ্গে। রেড আর্মির সৈন্যরা পাগলাটে স্বভাবের এই লাজুক মানুষটিকে খুব পছন্দ করতেন। মস্কোতে একবার রেড আর্মিদের দেওয়া দু'টি উপহার আমাদের দেখিয়েছিলেন তিনি। সৈন্যরা যুদ্ধের ধ্বংসাবশেষ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন এগুলি, এর মধ্যে একটি হচ্ছে বেলজিয়াম রাইফেল যা নেপোলিয়ান বোনাপার্টের জন্য তৈরি হয়েছিলো। অন্যটি হচ্ছে রুশোরের গ্রন্থের ছোট্ট এক সংস্করণ—১৬৫০ সালে ফ্রান্সে ছাপা। এর মধ্যে রাইফেলটি উনি ফ্রান্সের যাদুঘরে দান করেছিলেন।

ইরেনবুর্গ ছিলেন সত্যকার ফরাসী-প্রেমিক, ফ্রান্সকে মনেপ্রাণে ভালোবাসতেন। যাবার সময় একটি প্রেমের কবিতা পড়ে শুনিয়েছিলেন তিনি—যার প্রেমিকা হচ্ছে প্যারী শহর। আমি এই কবিতাটিকে গুপ্ত কবিতা বলবো এই জন্য যে, সেই সময়ে রাশিয়ায় আন্তর্জাতিকতাবাদ বা সার্বজনীনতার উপর নিষেধাজ্ঞা ছিলো। সংস্কার-বিরোধী খবর তখন খবরের কাগজের প্রথম পাতায় প্রকাশ করা হতো। সার্বজনীন। প্রায়শই সেই সব শিল্পী বা সাহিত্যিককে তখন দোষাবহ অত্যন্ত অবমাননাকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হতো এবং তাঁদের সাহিত্য ও শিল্পক্ষেত্র থেকে সরে যেতে বাধ্য করা হতো। কাজেই গোপনে ফোটা একটি ফুলের মতই ইরেনবুর্গের

ফরাসী-প্রীতি সযত্নে তাঁর অন্তরেই বেড়ে উঠেছিলো—যাতে বাইরের জগতের স্পর্শ তাকে ব্যথা দিতে না পারে। তিনি যা কিছু আমাকে দেখিয়েছিলেন বা বলেছিলেন, আমি জানতাম স্তালিনের এই কালো জমানায় তার সব কিছুই শেষ হয়ে যাবে। এই অদৃশ্য হয়ে যাওয়া বা শেষ হয়ে যাওয়াটা স্তালিন-জমানার মতদ্বৈধতার বা বিরুদ্ধতার একটি বিশেষ অঙ্গ।

কপালের উপর অবিন্যস্ত কাঁচা-পাকা কয়েকগাছি চুল, সমস্ত মুখ জুড়ে বয়সের ছাপ—তামাকে হলদে হয়ে যাওয়া দাঁত, ধূসর চোখের শীতল দৃষ্টি, আর ঠোঁটের কোণে এক টুকরো বিষাদের হাসি ইলিয়া ইয়োনবুর্গ একজন অবিশ্বাসী এবং মোহমুক্ত মানুষ হয়ে পড়েছিলেন।

বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় এই যে রাস্তাঘাট স্টেশন, সিমেন্ট মাটি আর পাথরে তৈরি স্তালিনের অসংখ্য মূর্তি—সার্বজনীনতার উপর নিষেধাজ্ঞা ইত্যাদি ঘটনাপ্রবাহ, শুধু আমি নয়, ইয়োনবুর্গকেও ব্যথিত সংশয়িত করে তুলেছিলো। হয়তো আমাদেরই বোঝার ভুল এই চিন্তা করে আগামী বিংশ আন্তর্জাতিক সম্মেলনের দিকে আমরা তাকিয়ে ছিলাম।

ট্রান্স সাইবেরিয়ান যাত্রাপথে ইয়োনবুর্গ তাঁর উপন্যাস 'নবম ঢেউ' (নাইন্থ ওয়েভ) এবং আমি ম্যাটিলডের উদ্দেশে কয়েকটি ছোটো প্রেমের কবিতা লিখেছিলাম। আমার কবিতাগুলি পরে ছদ্মনামে নেপলসে প্রকাশিত হয়েছিলো।

ইরকুৎকে আমরা ট্রেন ছেড়ে মঙ্গোলিয়ার প্লেনে ওঠার আগে সাইবেরীয় সীমান্তের ''বৈকাল' হ্রদে বেড়াতে গেলাম। সাইবেরিয়ার বন্দীদশা থেকে মুক্তির আশায় পালানোর এইটিই ছিলো একমাত্র পথ। শুনতে পেলাম সেই মুক্ত বন্দীদের কণ্ঠস্বর, 'বৈকাল' হ্রদের ধারে আজও শোনা যায়—যেন অস্ফুটস্বরে তাঁরা বলছেন, 'বৈকাল—বৈকাল—বৈকাল'!

মঙ্গোলিয়ার অভিজ্ঞতা আজ আর বিশেষ মনে পড়ে না, তবে উটের দুধ দিয়ে তৈরি মঙ্গোলিয়ান হুইস্কির স্মৃতি মনে আছে যার স্বাদ সেদিন আমার সমস্ত শরীরে শিহরণ জাগিয়েছিলো। সেদিন মঙ্গোলিয়াকে ভালো লেগেছিলো। এই সব নানান্ দেশের নানান্ শহরের নানারকম মিষ্টি নাম আমার শব্দের স্বপ্নরাজ্যকে ফুলের মালার মতোই গেঁথে তুলেছিলো। আমি এই অজানা মিষ্টি শব্দরাজ্যের মধ্যেই বেঁচে থাকতে চেয়েছি—সে শব্দ সিঙ্গাপুর থেকে সমরকন্দ—যেখান থেকেই বেরিয়ে আসুক না কেন। যেদিন আমি মরবো, আমি চাই আমাকে কবরে দেবার আগে যেন একটি নূতন সুন্দর মিষ্টি মধুর আওয়াজের নাম আমাকে দেওয়া হয়—যে নাম আমার অস্থির মধ্যে সুললিত সঙ্গীতের সুর তুলে সমুদ্রে মিলিয়ে যাবে।

চীনারাই বোধহয় পৃথিবীর একমাত্র জাতি যাঁরা জীবনের সর্ব অবস্থাতেই মুখের হাসিটুকু বজায় রাখেন। পুরোনো সামন্তবাদের যুগে বিপ্লবের সময়, চরমতম দারিদ্র্য-দুর্ভিক্ষ আর বঞ্চনার দিনে—এমন কি চরম অত্যাচারের সময়েও তাঁদের মুখের হাসিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। একবার একটি চীনা শিশুর মুখের হাসি দেখে মনে হয়েছিলো—ধান তোলার সময়কার তৃপ্তির হাসির কথা। যেন সমগ্র জাতির পরিপূর্ণ তৃপ্তির হাসিটুকু ফুটে উঠেছে এই শিশুটির মুখে। কিন্তু চীনাদের এই হাসির দু'টি

রূপ আছে। একটি অতি স্বাভাবিক যা গমের রঙের মতো সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ে— এই হাসিই কৃষক আর অধিকাংশ চীনার হাসি। অন্যটি—যাকে বলা চলে কাষ্ঠহাসি, প্রাণহীন উদ্দেশ্যপূর্ণ এই হাসি যা নাকের তলায় সামান্য চেপ্টে লেগে থাকে—এ হচ্ছে চীনা রাজকর্মচারীদের প্রয়োজনীয় হাসি।

প্রথম যেদিন ইয়োনবুর্গকে নিয়ে পিকিঙ বিমানবন্দরে নেমেছিলাম সেদিন চীনাদের হাসির অর্থ বুঝতে কষ্ট হয়েছিলো আমাদের। যে হাসি স্বাভাবিক তা বহুদিন আমাদের অন্তর জুড়েই ছিলো—সেই হাসি দেখেছিলাম সমধর্মী চীনা সাহিত্যিকদের মুখে। লেনিন পুরস্কার বিজেতা তিঙ লিঙ ও চীনা সাহিত্য সংসদের সভাপতি মাও-তুঙ সিয়াও এমি এবং কবি আই চিঙ-এর সঙ্গে দেখা হলো আমাদের। সকলেই প্রায় ইংরাজী ও ফরাসী ভাষা জানতেন। আমাদের সম্বর্ধনায় বিমান বন্দরে এঁরা উপস্থিত ছিলেন। যে সময়ে আমরা চীনে গিয়েছিলাম সেই সময়ে এঁরা ছিলেন চৈনিক সাহিত্যের প্রস্ফুটিত ফুলের মতো।

পরদিন স্তালিন পুরস্কার—এখন যা লেনিন পুরস্কার, বিতরণী সভায় অন্যান্য সকলের সঙ্গে চীনা প্রধানমন্ত্রী চু-এন-লাই এবং সেনাধক্ষ্য মার্শাল চু-তে উপস্থিত ছিলেন। সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত—স্তালিনগ্রাদের একজন বীর সৈনিক, সোভিয়েত লোকগীতি শোনালেন। এরপরে শুরু হলো স্বাস্থ্যপান (টোস্ট)। আমি এক কোণে সুঙ-চিঙ-লিঙ-এর সঙ্গে বসেছিলাম। সেই সময়ে তিনি ছিলেন সমগ্র চীনদেশের একজন অত্যন্ত মাননীয় মহিলা।

আমাদের সকলের হাতেই ছিলো ভোদ্‌কা ভরা ছোটো ছোটো গ্লাস এবং চৈনিক প্রথানুসারে এক একবার 'কানপাই' আওয়াজের সঙ্গে এক ঢোকে সেই ভোদ্‌কা পান করতে হচ্ছিল। মার্শাল চু-তে এক একটি গ্লাস শেষ করেই তা ভরছিলেন আর আমার গ্লাসটিও সঙ্গে সঙ্গে আমার হাতে তুলে দিচ্ছিলেন। খাওয়ার শেষে মার্শাল চু তের ভোদ্‌কার বোতল থেকে আমি এক গ্লাস ভোদ্‌কা নিয়ে পান করার সময় বুঝতে পারলাম—যা সন্দেহ করেছিলাম তাই। তাঁর বোতলে ভোদ্‌কার বদলে ছিলো জল। অর্থাৎ আমি যখন একের পর এক গলিত উষ্ণ ধাতু পান করছিলাম, উনি তখন পান করছিলেন স্রেফ জল!

কফি পানের সময় আমার টেবিলের সঙ্গিনী মিওঙ-চিঙ-লিঙ তাঁর সিগারেটের খাপ থেকে যখন আমার দিকে সিগারেট এগিয়ে দিলেন, তখন বিনীতভাবে বলেছিলাম, ধন্যবাদ।—আমি সিগারেট খাই না। এরপর তাঁর সিগারেট-খাপটার প্রশংসা করতে তিনি বললেন, তাঁর জীবনের এক অমূল্য সম্পদ এটি, এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে একটি স্মৃতি। সোনার সেই খাপটার চারিদিকে হীরের কারুকার্য। খাপটি নিয়ে কিছুক্ষণ দেখার পর সেটি ফিরিয়ে দিলাম তাঁর হাতে। কিন্তু খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি ভুলে গিয়েছিলেন খাপটির কথা। টেবিল ছেড়ে ওঠার সময়ে তীক্ষ্ন দৃষ্টি ছুঁড়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, সিগারেট খাপটা কই?

আমি নিশ্চিত যে খাপটি তাঁকে ফেরৎ দিয়েছি, তবুও কফির টেবিলের আশপাশ দেখতে লাগলাম—যদি পড়ে থাকে। কিন্তু না, কোথাও নেই! এর ফলে নিজেকে অপরাধী মনে হতে লাগলো। ভদ্রমহিলার সেই তীক্ষ্ন দৃষ্টির হেরফের হয়নি

তখনও। আমার মনে হলো উনি আমাকে একজন স্বর্ণচোর ভাবছেন হয়তো।

যাই হৌক, সৌভাগ্যবশতঃ এর পরেই নিজের ব্যাগের মধ্যে সিগারেট খাপটি তিনি পেয়ে গেলেন। তাঁর মুখে হাসি ফিরে এলো।—কিন্তু তবু বহুকাল আমার মুখে হাসি ফিরে আসেনি। এখন আমার মনে হয় চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময়ে তাঁর সেই অমূল্য সম্পদ সিগারেট-খাপটি চিরদিনের মতোই হারিয়ে ফেলেছেন।

বিপ্লবের সেটা দ্বিতীয় বছর। তখন চীনের ছেলে-মেয়েরা সবাই ঘন নীল রঙের জামা-কাপড় পরতেন। রাস্তায় কোনো গাড়ী নেই, গাড়ি চলে না; প্রতিটি রাস্তা ও অলিগলিতে কেবল মানুষের ভীড়। জিনিসপত্রের অভাব। সমাজ জীবনে নানান্ বিচ্যুতি আর অন্ধত্ব চোখে পড়তো কেবল।

একদিন আমি ও ইয়োনবুর্গ ঠিক করলাম যে, আমাদের একজোড়া করে মোজা কেনা দরকার। এই ইচ্ছার কথা জানতে পেরে আমাদের চীনা কমরেডরা খুবই বিব্রত বোধ করলেন, নিজেদের মধ্যে আলোচনা শুরু করে দিলেন। শেষ পর্যন্ত আগে পিছে পুলিস দেহরক্ষী অনুবাদক ইত্যাদি সমভিব্যাহারে আমরা কয়েকটি গাড়িতে চড়ে রওনা হলাম। একটি দোকানের কাছে পৌঁছতেই পুলিস ও রক্ষীরা দোকানের সমস্ত লোককে এক কোণে সরিয়ে দিয়ে দোকানে যেতে বললেন আমাদের। আমরা মাথা নীচু করে দোকানে ঢুকে মোজা কিনে মাথা নীচু করেই বেরিয়ে আসার সময় প্রতিজ্ঞা করলাম—কেনাকাটা আর নয়।

এই সমস্ত ঘটনা ইয়োনবুর্গকে ক্রুদ্ধ করে তুলতো। যেমন ধরা যাক—রেস্তোরাঁর একটি ঘটনা। আমরা যে হোটেলে থাকতাম সেখানে রোজই পুরোনো সামন্ততান্ত্রিক ধাঁচে সাহেবী-খানা দেওয়া হতো আমাদের। একদিন আমরা আমাদের দোভাষীকে বললাম চাইনিজ খাবার দেবার জন্য। বিশেষতঃ চীনা খাদ্যের ভক্ত আমি। দোভাষী বললেন, পরে ব্যবস্থা হবে।

পরদিন অভ্যর্থনা সমিতির একজন গুরুত্বপূর্ণ সভ্য আমাদের হোটেলে এসে জিজ্ঞেস করলেন যে, সত্যি সত্যিই আমরা চীনা খাবার খেতে ইচ্ছুক কিনা। শুনে ইয়োনবুর্গ বললেন, নিশ্চয়ই।

—এইটেই তো সমস্যা। চীনা কমরেডটি উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন, এটা প্রায় অসম্ভব বর্তমানে।

ইয়োনবুর্গ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সন্দেহপ্রবণ বাঁকা হাসি হাসলেন, কিছু বললেন না। আমি কিন্তু এর একটা উত্তর দেবার প্রয়োজন অনুভব করলাম। বললাম, কমরেড, আমাদের প্যারীতে ফিরে যাবার কাগজপত্তরগুলো তাড়াতাড়ি ফেরৎ দেবার ব্যবস্থা করুন। পিকিঙে থেকেও যখন চীনা খাবার আমাদের ভাগ্যে জুটলো না, তখন প্যারীর ল্যাটিন মহলে গিয়ে চীনা খাবার খাওয়ার আনন্দ উপভোগ করতে দিন আমাদের।

আমার এই উত্তেজিত উত্তরে ফল হলো। চার ঘণ্টার মধ্যে পিকিঙের সেরা হোটেলে আমাদের খাবার ব্যবস্থা হলো। সেদিনের সেই খাবারের স্বাদ আজও আমার জিভে লেগে রয়েছে। দিন-রাত্রি খোলা এই হোটেলটি আমরা যে হোটেলে ছিলাম তার থেকে মাত্র তিনশো গজ দূরে।

সেনাধ্যক্ষের কবিতা

আমার নির্বাসিত জীবনের দিনগুলিতে দেশে বিদেশে ঘুরতে ঘুরতে যে দেশটি জীবনে প্রথম দেখেছিলাম সেই দেশটি আজও আমার সমস্ত হৃদয় জুড়ে রয়েছে, সেই দেশ হচ্ছে ইতালি। এই দেশের সব কিছুই আমার কাছে আশ্চর্য-সুন্দর লেগেছিলো। এ দেশের মানুষের সরলতা, অলিভ তেল, রুটি, মদ—সবই ছিলো স্বতস্ফূর্ত। এমন কি পুলিসও—যাঁরা কোনদিনও আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার তো দূরে থাকুক, অসম্মানও করেন নি কখনো, যদিও তাঁরা সব সময়েই আমাকে খুঁজে বেড়িয়েছেন।

সাহিত্যিকরা আমাকে আমন্ত্রণ জানাতেন আমার কবিতা পড়ে শোনাবার জন্য। বিশ্ববিদ্যালয়, গোলাকার থিয়েটার গৃহ, জেনোয়ার ডক-শ্রমিকদের মাঝখানে, ফ্লোরেন্স তুরিন ভেনিস—সর্বত্রই আমার কবিতা আবৃত্তি করে শুনিয়েছি আমি।

যেখানেই গিয়েছি সেখানেই লোকের ভিড়। কবিতা পড়ে শোনানোর সময় আমার কবিতা তাঁদের সেই চমৎকার ইতালিয়ান ভাষায় গুন্ গুন্ করে আমার সঙ্গেই আবৃত্তি করতেন তাঁরা। কিন্তু আমার কবিতায় শান্তির ভাষা—যে শান্তি তখন প্রাচ্য জগতে নিষিদ্ধ—আমার কবিতায় মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা আর সংগ্রামের ধ্বনি পুলিসের বেশিদিন ভালো লাগলো না। তারা আমার পিছু নিলো। যদিও ইতালীয় ভাষায় আমার কবিতার অনেক শব্দই উহ্য ছিলো।

মিউনিসিপ্যালিটির ইলেকশনে সেবার জনতা পার্টি জিতেছিলো। এবং নাগরিক সভাগৃহে আমার সংবর্ধনার আয়োজন হয়েছিলো। মিলান ফ্লোরেন্স জেনোয়া প্রভৃতি শহরগুলি আমাকে নাগরিকত্ব দান করেছিলো। এই সব সভাগৃহে শ্যাম্পেন পান, করমর্দন ইত্যাদির পালা শেষ হবার পর শুরু করতাম আমার কবিতা পাঠ। বিশপ থেকে আরম্ভ করে অভিজাত শ্রেণীর অনেক মানুষই থাকতেন সেই সব সভায়—আমার কবিতা শোনার জন্য। আর রাস্তায় আমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতো পুলিস।

ভেনিসে যে ঘটনা ঘটেছিলো তাকে ইতরামো বলা চলে। আমি কবিতা পড়লাম সেখানকার নাগরিক সভাগৃহে এবং আমার কবিতা পাঠ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ভেনিসের নাগরিকত্ব লাভ করলাম। তার পরেই পুলিস এলো শহর থেকে আমাকে বার করে দেবার পরোয়ানা নিয়ে।—এই সেই শহর যেখানে ডেজডিমোনা জন্মেছিলেন জীবন যন্ত্রণা ভোগ করার জন্য, আর এই শহরের হোটেলেই আমার দরজার পাশে দিনরাত দাঁড়িয়ে থাকতো পুলিস।

ত্রিয়েস্ত্ থেকে আমার পুরোনো বন্ধু ভিত্তোরিও ভিদালি, সেনাপতি কারলোস এলেন আমার কবিতা শুনতে। ভেনিসের জলে গণ্ডোলা নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে আমরা দেখতে পেতাম পুলিসের নৌকোও আমাদের অনুসরণ করে চলেছে। আমাদের সঙ্গে ছিলেন কস্টারিকার সাহিত্যিক জুয়্যান গুয়ারেজ। আমার হঠাৎ মনে হলো

কাসানোভার কথা। চড়ে বসলাম কম্যুনিস্ট মেয়রের মোটর লাগানো গণ্ডোলায়—যার সঙ্গে পুলিসের নৌকো পাল্লা দিতে পারবে না। জলের মধ্যে এই লুকোচুরিটা অনেকটা রাজহাঁসের সঙ্গে ডলফিনের দৌড় প্রতিযোগিতার মতো লাগছিলো।

নেপলসে একদিন সকালে এই যন্ত্রণাভোগ চরমে উঠলো। এখানে খুব সকালে কেউ ওঠে না, মায় পুলিসও নয়। দেরী করেই কাজ শুরু হয় এখানে। এক পুলিস এলেন আমার হোটেলে। আমার পাশপোর্টের একটা গাফিলতির প্রসঙ্গ তুলে আমাকে তাঁর সঙ্গে থানায় যেতে বললেন। থানায় খাতির করে বসিয়ে আমার হাতে এক কাপ এসপ্রেসো কফি দিয়ে বেশ মোলায়েমভাবে জানালেন যাতে আমি সেইদিনই ইতালি ছেড়ে চলে যাই। ইতালির প্রতি আমার ভালোবাসার কোনো যুক্তিই ওঁদের পছন্দ নয়।

বললাম, কোথাও যেন একটা বিরাট ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে।

ওঁরা বললেন, মোটেই না। আপনার প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা আছে, কিন্তু ইতালি ছেড়ে আপনাকে যেতেই হবে। এবং তারপরেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যে কথাটি আমাকে শোনালেন তার মর্মার্থ হচ্ছে—চিলির রাষ্ট্রদূত আমাকে ইতালি ছাড়া করার জন্য ইতালিয়ান গভর্নমেন্টকে অনুরোধ জানিয়েছেন, সেই কারণেই এই ব্যবস্থা!

সেদিন বিকেলে ট্রেন ছাড়ার সময়ে আমাকে বিদায় জানানোর জন্য স্টেশনে হাজারো মানুষের ভিড়ে আমি অভিভূত হলাম।—চুম্বন অশ্রু ফুলের তোড়া—'বিদায় বন্ধু'—'হে বন্ধু আবার দেখা হবে' সম্ভাষণে মুগ্ধ হলাম।

সেদিন পুলিসের লোকেরা আমার সঙ্গে খুবই সদ্‌ব্যবহার করেছিলেন। তাঁরা আমার স্যুটকেশটা নিজেরাই পেঁছে দিলেন স্টেশনে। প্রতিটি স্টেশনে আমার খাওয়া দাওয়া সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি তাঁদের সহৃদয় মনোযোগ দেখেছিলাম। আমার জন্য যোগাড় করেছিলেন বামপন্থী ও সমাজপন্থী পত্র-পত্রিকা, দক্ষিণপন্থী কোনো কাগজ দেননি তাঁরা আমাকে। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আমার অটোগ্রাফ নিলেন। অটোগ্রাফ নেবার সময়ে অনেকেই বললেন—নেহাতই পেটের দায়ে এই পুলিসি-চাকরী, শুধু সংসারের কথা ভেবেই এই সব অন্যায় আদেশ পালন করতে হয় আমাদের। অত্যন্ত ঘৃণার সঙ্গে এই কাজ করতে হয়।

রোম স্টেশনে পেঁছে সীমান্তে যাবার গাড়ি বদলের সময়ে ট্রেন থেকে নামতেই চোখে পড়লো এক বিরাট জনতা। চেঁচামেচি হই-হট্টগোলের মধ্যে আমার কানে এসে লাগলো লক্ষ মানুষের কণ্ঠস্বর, এক সঙ্গে তাঁরা বলে চলেছেন—'পাবলো, পাবলো—আমাদের পাবলো'। মানুষের মাথার সমুদ্র থেকে লক্ষ লক্ষ হাত আমার দিকে তাঁরা তুলে ধরেছেন, সেই সব হাতে ফুলের তোড়া।

পুলিসবেষ্টিত গাড়িতে ওঠার সময় শুরু হয়ে গেল বিশৃংখলা। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে কাতারে কাতারে সাহিত্যিক সাংবাদিক আর ছেলে-মেয়েরা সেই পুলিসবেষ্টনীর মধ্য থেকে আমাকে ছিনিয়ে নিলেন। পুলিস এগিয়ে এসে তাঁদের সরিয়ে দিয়ে আবার আমাকে আয়ত্বে নিয়ে গেলেন। এই সময়ে আমার চোখে পড়লো বিশ্ববিখ্যাত কয়েকজন কবি-সাহিত্যিক-শিল্পী। আলবার্তো মোরাভিয়া ও তাঁর স্ত্রী এলজা মোরানতে, শিল্পী রেঁনতো গোটুসো, কারলো লেভি বাড়িয়ে দিয়েছিলেন আমার দিকে গোলাপ গুচ্ছ। সেই হট্টগোলে গোলাপের পাপড়ির সঙ্গে সঙ্গে চলছিলো টুপি, ছাতা আর ঘুষোঘুষি।

পুলিসের হাত থেকে বন্ধুরা আমায় আর একবার উদ্ধার করলেন। এরই ভিতরে চোখে পড়লো মোরাভিয়া-পত্নী মোরানতে সজোরে এক পুলিস কর্মচারীর মুখের উপরে তাঁর সিল্কের ছাতাটি ছুঁড়ে মারলেন। এর মধ্যেই দেখতে পেলাম মালবাহী একজন কুলি তার লোহার রড দিয়ে এক পুলিসের পিঠে মারলেন। শেষ পর্যন্ত ঘটনা এমন স্তরে পেঁছালো যে, পুলিস নিরুপায় হয়ে আমাকে অনুরোধ করলেন—বুঝিয়ে সুজিয়ে বন্ধুদের শান্ত করার জন্য। কিন্তু ততক্ষণে সমস্ত মানুষ চেঁচাতে শুরু করেছেন—'নেরুদা ইতালিতে থাকবেন, রোমে থাকবেন। কেউই নেরুদাকে জোর করে নিয়ে যেতে পারবে না।—চিলির এই মানুষটি এখানে থাকবে, ওই জার্মান (জার্মান বলতে তদানীন্তন ইতালির রাষ্ট্রপ্রধান দ্য গাসপেরী) লোকটিকে এখান থেকে বের করে দাও!'

আধঘণ্টা এই অবস্থা চলার পর উপরওয়ালার কাছ থেকে নির্দেশ এলো—নেরুদা রোমেই থাকবেন, ইতালিতে থাকার অনুমতি তাঁকে দেওয়া হলো। এ খবর জেনে বন্ধুরা আলিঙ্গন আর চুম্বনে ভরিয়ে তুললেন আমাকে। এরপর ফুলের উপর দিয়ে হেঁটে যাবার সময়ে মনটা বিষণ্ণ হয়ে উঠেছিলো এই জন্য যে, যুদ্ধ-জয়ের শেষে নিরপরাধ ফুলের পাপড়িগুলিকে মাড়িয়ে চলতে হচ্ছে।

শিল্পী রেঁনতো গোটুসো সে রাত্রে পার্লামেন্টের এক সভার বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন যাতে রাত্রে আমায় আর কেউ বিরক্ত করতে না পারে। রাত্রিটা বেশ ভালোভাবেই কেটেছিলো!

ইতালিয় সংস্কৃতি ও আদর্শবিরোধী ঐ সমস্ত ঘটনার নিন্দা করে বিখ্যাত ঐতিহাসিক এডউইন সিরিও কাপ্রি দ্বীপ থেকে চিঠি পাঠিয়ে তাঁর কাছে গিয়ে থাকার জন্য অনুরোধ জানালেন আমাকে। সেখানে যাতে আমি স্বাধীনভাবে থাকতে পারি সেজন্য তিনি তাঁর একটি বাড়িও আমার জন্য প্রস্তুত করে রেখেছিলেন।

সমস্ত ব্যাপারটাই স্বপ্ন মনে হয়েছিলো। আমার সেই অবাস্তব অথচ বাস্তব ম্যাটিলডে উরুভিয়া—আমার ম্যাটিলডেকে নিয়ে এক শীতার্ত সাদা রাতে আমরা কাপ্রিতে পেঁছিলাম। সাদা ঘোড়ার একটি গাড়ি আমাদের জন্য উপস্থিত ছিলো স্টেশনে, সেই গাড়ি চড়ে যাবার সময় উঁচু-নীচু রাস্তার মাঝে মাঝে সাদা সাদা ছোটো ছোটো বাড়িগুলি দেখে মনে হচ্ছিল এক স্বপ্নরাজ্যে প্রবেশ করছি আমরা। আমাদের জন্য সাদা রঙের যে বাড়িটি নির্দিষ্ট করে রাখা ছিলো সেখানে এসে গাড়ি থামলো। লোকজন আমাদের জিনিসপত্র বাড়িতে তুললো। বাইরে থেকেই মনে হলো বাড়িটি খালি। ভিতরে ঢুকলাম আমরা। ঢুকে দেখলাম বেশ লম্বা একজন মানুষ সাদা পোশাক পরে জ্বলন্ত একটি উনুনের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আগুনের আভায় সাদা পোশাকে ঢাকা মানুষটিকেও জ্বলন্ত আভার মতোই দেখাচ্ছিল। ইনিই সেই বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও প্রকৃতিবিদ এডউইন সিরিও। ইনি অর্ধেক কাপ্রি দ্বীপের মালিক। বয়স প্রায় নব্বুই বছর। মানুষটি এখানকার অতি জনপ্রিয় এবং শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। ভদ্রলোক বললেন, এটাকে নিজের বাড়ি মনে করে এখানে থাকুন।—কেউ আপনাদের বিরক্ত করবে না। কথা ক'টি বলে চলে যাবার সময় নিজের হাতে তিনি আমাদের জন্য উপদেশাদি তাঁর বাগানের গাছের পাতার উপরে লিখে রেখে

গেলেন। তাঁকে দেখে মনে হয়েছিলো ইতালির সমস্ত সৌরভ যেন তাঁর সারা শরীর আর হৃদয় জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে।

ম্যাটিলডে ও আমি—দু'জনে আমরা আমাদের প্রেমের রাজ্যে আশ্রয় নিলাম। সমুদ্রের ধারে বেড়াতাম আমরা। বেড়াতে বেড়াতেই ভাবতাম—গায়ের উপর থেকে পর্যটকের ছাপটা সরিয়ে এই ছোটো ছোটো পাহাড়, পাহাড়ের উপর ঘন সবুজ সব গাছের সারি, গাছে গাছে ফুটে থাকা অপরূপ সব ফুল আর ফলের মেলা, মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা ছোটো দ্রাক্ষাকুঞ্জের মধ্য দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে মনে হতো যদি এখানকার মানুষদের বিশেষ করে কষ্টসহিষ্ণু দরিদ্র মানুষদের সঙ্গে মেলামেশা করে কিছু সময় কাটানো যায় তাহলে এখানকার আর এক সত্যকার রূপ দেখতে পাবো।

ঘোড়ার গাড়ির কোচোয়ান, জেলে আর এখানকার কৃষকদের সঙ্গে আলাপ হলে জানা যায়—এখানে কোথায় ভালো অলিভ তেল পাওয়া যাবে, কোথায় পাওয়া যাবে সুমধুর সুরা, আর দেখা যাবে দরিদ্র কাপ্রির মনোমুগ্ধকর আর এক রূপ।

কাপ্রির লালসাময় বিকৃত-জীবনের যে রূপ উপন্যাসে পড়ি তা ঐ বড়ো বড়ো হোটেল আর বাড়িগুলির দেওয়ালের মধ্যেই আবদ্ধ। তবে আমার সময় কেটেছে সেখানকার অতি সরল সেই সব দরিদ্র মানুষদের সঙ্গে, যাঁরা কাপ্রির আসল মানুষ তাঁদের সঙ্গেই। অবিস্মরণীয় সব মুহূর্তে—সারাদিন কবিতা লিখি, আর অপরাহ্নে ম্যাটিলডে সেই সব কবিতা টাইপ করে। এই প্রথম আমরা একত্রে একই বাড়িতে থাকলাম। এখানকার মনোরম পরিবেশে আমাদের প্রেম গভীর থেকে গভীরতর হয়ে উঠেছিলো। 'সেনাধ্যক্ষের কবিতা' গ্রন্থটি লেখার কাজ এখানেই সম্পূর্ণ করেছিলাম। বইটি পরে বেনামীতে প্রকাশিত হয়েছিলো নেপলসে।

বহু বিতর্কিত এই বইটির গল্প এবার শোনাবো আপনাদের। এই বইটিতে আমার নাম ছিলো না বহুকাল। বইটির রচয়িতা যে কে তা কেউ জানতো না। মনে হতে পারে—বইটিকে স্বীকার করতে চাইনি আমি অথবা বইটিরই মনে হয়েছিলো যে, সে পিতৃহীন। অনেকেরই তো পিতৃপরিচয় থাকে না—যাদের জন্ম হয় প্রাকৃতিক প্রেমঘন কোনো মুহূর্তে।—এই বইটিও তাই।

বইখানিতে যে সকল কবিতা স্থান পেয়েছে তার বেশির ভাগই আমার নির্বাসিত জীবনে লেখা। ১৯৫২ সালে নেপলসে প্রকাশিত হয় বইখানি—বেনামে। পর পর অনেকগুলি সংস্করণও বের হয় ঐ একইভাবে। কবিতাগুলির মধ্যে বেশিরভাগই ছিলো চিলির জন্য আমার মনোবেদনা, ম্যাটিলডের প্রতি আমার প্রেম এবং তদানীন্তন সমাজ আর অর্থনৈতিক অবস্থার বিশ্লেষণে ভরা ছিলো আমার কবিতাগুলি। বইটির প্রথম মুদ্রণে ছিলো শিল্পী পাওলো রিকির আঁকা প্রচ্ছদ আর ভিতরের অলংকরণে ছিলো পম্পেই-এর মৃৎশিল্পের অনুকরণ। প্রথমে প্রকাশিত হয়েছিলো পঞ্চাশখানি বই। বইটির প্রথম প্রকাশের দিন বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে কাপ্রিতে আনন্দোৎসবের আয়োজন হয়েছিলো।

সন্দিগ্ধচিত্ত কয়েকজন সমালোচক বইটির প্রকাশনার পিছনে রাজনীতির গন্ধ পেয়েছিলেন। তাঁদের মতে—রাজনৈতিক দল আত্মগোপনকারী শিল্পীকে স্বীকার করেনি, তাই কাব্যগ্রন্থটিকে তাঁরা রাজনৈতিক-শিল্পীর আদর্শচ্যুতি বলে মনে করেন।

কিন্তু আমার দল তো সৌন্দর্য-বর্ণনা বিরোধী নয়। আসল কারণ হচ্ছে—আমার এই কবিতা আমার পত্নী ডেলিয়া পড়ুক এবং জানুক এ আমি চাইনি, তাই বেনামীতে প্রকাশিত হয়েছিলো। মিষ্টি মেয়ে ডেলিয়া ইস্পাত আর মধু দিয়ে তৈরি সুতোর মতোই দীর্ঘ আঠারোটি বছর আমার সবচেয়ে দুঃখ আর কষ্টের সময়ে আমার সঙ্গে কাটিয়েছে—তখন আমার কবিতা আর গান সবচেয়ে উচ্ছ্বসিত। তারপর আমার জীবনে হঠাৎ আসা প্রেম আর ম্যাটিলডের উদ্দেশে লেখা রোমাঞ্চকর এই কবিতা যদি ডেলিয়ার হাতে পৌঁছায় তাহলে তার নরম মনে একটি প্রস্তরখণ্ডের মতো গিয়ে তা আঘাত করতো। শুধুমাত্র এই একটি কারণেই তখন বইটিকে ছদ্মনামে প্রকাশ করতে হয়েছিলো। পরে অবশ্য স্বাভাবিকভাবেই এই বইখানি প্রকাশিত হয়েছে এবং তাতে আসল সেনাধ্যক্ষের নাম ও সই দুই-ই উপস্থিত রয়েছে।

নির্বাসনের শেষ

আমার নির্বাসিত জীবন প্রায় শেষ অঙ্কে। ১৯৫২তে সুইজারল্যান্ড ছেড়ে ক্যানিসের শহর পেরিয়ে আমরা মন্‌টিভিডিওতে পৌঁছলাম। এবারে ফ্রান্সে একমাত্র আমার অনুবাদক এলাইস গ্যাসকর ছাড়া আর কারুর সঙ্গেই দেখা করার কথা ছিলো না। কিন্তু আমাদের জন্য অপেক্ষায় ছিলো অচিন্তনীয় এক ঘটনা। পল্‌ এলুয়্যারর্ড ও তাঁর স্ত্রী ডমিনিক আমাদের সঙ্গে দেখা করার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তাঁরা জেনেছিলেন আমরা আসছি, তাই মধ্যাহ্নভোজের আমন্ত্রণ নিয়ে আমাদের কাছে উপস্থিত হলেন তাঁরা। শুনলাম পিকাসোও সেখানে থাকবেন। তাছাড়া চিলির শিল্পী নেমেসিও এ্যান্তিনেজ্‌ আর তাঁর স্ত্রীও থাকবেন।

পলের সঙ্গে এই শেষ সাক্ষাৎ আমার। কান্‌ শহরের আলোয় এলুয়ার্ড শক্ত কঠিন চেহারা গভীর নীল চোখ আর ছোটো ছেলের মতো মুখভরা হাসি নিয়ে সেণ্ট ট্রোপেজ থেকে ছুটে এসেছেন এখানে—আমাদের জন্য নিমন্ত্রণ নিয়ে, ওঁদের সঙ্গে আছেন পিকাসো। পিকাসো এসেছেন আমায় বিদায় সম্ভাষণ জানাতে। কিন্তু ছোট্ট একটি ঘটনা সমস্ত দিনটাই নষ্ট করে দিলো আমার। ম্যাটিলডের কোনো ভিসা ছিলো না উরুগুয়ে যাবার। উরুগুয়ের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে দেখা করতে তখনি দৌড়তে হলো আমাদের। দূতাবাসে পৌঁছে অপেক্ষা করতে হলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই গুন্‌গুন্‌ করে গ ন গাইতে গাইতে বালকসুলভ হাসিতে মুখ ভরিয়ে তিনি আসতেই ম্যাটিলডে তাঁর দিকে তাকিয়ে আশাবাদী হয়ে উঠলেন। কিন্তু তাঁর ব্যবহারে আমরা আশাহত হলাম। সারাটা সকাল অযথা ঘোরাঘুরি করালেন আমাদের।—এর ফলে দুপুরের খাবার বিস্বাদ লাগলো আমাদের কাছে।—সেই ভিসা পেতে বেশ কয়েক ঘণ্টা লেগেছিলো। ছবি তুলতে হলো ম্যাটিলডের এবং ভিসার জন্য মূল্য দিতে হলো একশো কুড়ি ডলার। এর মধ্যে এক সময়ে মনে হয়েছিলো যে, হয়তো আমার সঙ্গে ম্যাটিলডের যাওয়া হয়ে উঠবে না। অবশ্য ওকে রেখে একা একা যেতাম না আমি। আমার জীবনে সবচেয়ে তিক্ত ছিলো সেই দিনটি।

এলোমেলো সমুদ্র-বর্ণনা

আমি এখন যাচ্ছি চিলি। আমার জাহাজ আফ্রিকার উপত্যকার পাশ দিয়ে সমুদ্রের উপর চলেছে। হারকিউলিসের স্তম্ভ যা বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদীর অস্ত্রের কারখানা তাকে ছাড়িয়ে চলেছে! কবির দৃষ্টি দিয়ে নয়, যেন একজন সমুদ্রবিজ্ঞানীর মতো সমুদ্রকে দেখছি—তার রং, তার গভীরতা আমার কাছে বিরাট তিমির ত্বকের মতো মনে হচ্ছে। সমুদ্রের অসংখ্য জীবাণু—যা সমুদ্রকে রঙীন করে রাখে—আমায় আকৃষ্ট করে। শুনেছি তিমি মাছ এই অসংখ্য জীবাণু ভক্ষণ করেই বেঁচে থাকে। চলতে ফিরতে সিন্ধু-নীল তিমিরা তাদের ক্ষুধা মেটায়—বিশেষতঃ দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের তিমিরা। এই সব জলপথেই বিরাট বিরাট দাঁতওলা তিমিরা এক সমুদ্র থেকে অন্য সমুদ্রে যায়। দাঁতালো তিমিদের গল্প উপকথার মতোই চিলিতে ছাড়িয়ে রেখেছে এখানকার নাবিকেরা। এই জাতীয় তিমির দাঁতের ফাঁকে মৃত নাবিকের ছেলে-মেয়ের ছবি বা কোনো নাবিকের প্রেমপত্র নাকি পাওয়া গেছে সময় সময়। অবশ্য চিলির সেই বীর তিমি শিকারীরা শুধুমাত্র দাঁতের খোঁজেই এই তিমি মাছ শিকার করতে যেতেন—তাঁরা যেতেন তিমির অন্ত্রের মধ্যে যে মোমজাতীয় পদার্থ থেকে মহামূল্যবান সুগন্ধি তৈরি হয় তারই খোঁজে। Ambergris

আমি এসেছি এখন অন্যখানে। মেডিটেরিয়ানের শেষ ঘন নীল আবাস ছাড়িয়ে চলেছি—কাপ্রির শরীরের নানান্ অঙ্গকে আশেপাশে ফেলে রেখে যেখানে সমুদ্রধৌত শুভ্র প্রস্তরখণ্ডের উপর সমুদ্রের দানবীরা তাঁদের অবিন্যস্ত নীলাভ কেশগুচ্ছকে বিন্যস্ত করতে উঠে আসেন—গুনগুন করে সম্মোহিত সঙ্গীতে আকৃষ্ট করেন নিঃসঙ্গ নাবিকদের—আমি চলেছি তারই সন্ধানে।

সমুদ্রের 'শুশুক' এক রহস্যময় প্রাণী। মধ্যযুগে এর খোঁজে মানুষ ছুটে গেছে সমুদ্রে। সমুদ্রের এই 'শুশুক' এক সময়ে রাজা-মহারাজাদের নিজেদের মধ্যে উপহার বিনিময়ের বস্তু হিসেবে গণ্য ছিলো। এক মহারাজা তাঁর সাম্রাজ্যের এক 'শুশুক শৃঙ্গ' উপহার দিলে আর এক মহারাজা খুঁজে বেড়াতেন তাঁর সমুদ্রের আরও বড়ো একটি 'শুশুক শৃঙ্গ' যাতে আর এক মহারাজাকে চমক লাগানো যায়।

একবার ডেনমার্কে একটি দোকানে গিয়েছিলাম—সেখানে শুধু সমুদ্র আর প্রকৃতির জীবজন্তুর ভগ্নাবশেষ বিক্রী হয়। সেখানে দেখেছিলাম অনেকগুলি বড়ো বড়ো 'শুশুক-শৃঙ্গ'। আমি যখন অবাক হয়ে সেদিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে শৃঙ্গের গায়ে হাত বুলোচ্ছিলাম তখন দোকানদারটি আমার দিকে আরও অবাক হয়ে তাকাচ্ছিলেন।

অতবড়ো 'শুশুক-শৃঙ্গ' কেনার মতো পয়সা আমার কাছে ছিলো না—তাই ছোট্ট একটি 'শুশুক-শৃঙ্গ' কিনে আমার বাক্সে খুব যত্ন করে রেখে দিয়েছিলাম।

তারপর একদিন সুইজারল্যাণ্ডে আমার খুব ইচ্ছে হয়েছিলো বাক্স থেকে বার করে সেটিকে দেখি। আমার সেই অদম্য ইচ্ছাকে চেপে রাখতে পারিনি, বাক্স খুলে

সেটিকে বার বার শুধু দেখেছিলাম।

এখন আর সেটাকে দেখতে পাই না!
কোথায় যেন হারিয়ে গেছে!
আমি কি তাকে আমার বাড়ীতে ফেলে এসেছি
না কি সে আমার বালিশের তলা থেকে
গড়িয়ে পড়ে গেছে!
না কি সে কোন্ অজানা রাস্তা ধরে একরাত্রে
ফিরে গেছে তার আপন মরু বৃত্তে!
আমি কিন্তু দেখেছি ছোটো ছোটো ঢেউ তুলে
আত্লান্তিকের উপর দিয়ে এগিয়ে আসছে
'নতুন দিন'।
কোন্ ক্রুদ্ধ জলরাশি এসে বার বার আঘাত করছে
জাহাজের দু'পাশকে! এ কি ঘন নীল জলের
চারপাশে ক্রুদ্ধ ফেনিল জলরাশি!
সমুদ্রের পাপ্ড়িতে লেগেছে কম্পন!
তারই উপর দিয়ে ছোট্ট উড়ন্ত মাছের দল
এঁকে যায় এক আশ্চর্য রুপোলি রেখা!
আমার নির্বাসন যাত্রা শেষ করে ফিরে চলেছি।
তাকিয়ে ছিলাম সেই নীল সমুদ্রের দিকে—
হঠাৎ দেখলাম আমার দেশ 'চিলির' অশান্ত
ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে শান্ত সমুদ্রে!
একটা বিরাট আকাশের দিগন্ত রেখা আবৃত করে
সমুদ্রতীরে অপেক্ষমান!
রাত্রি আবারো আসবে—ঘন কালো তার দেহ
দিয়ে জড়িয়ে ধরবে এই ঘন নীল প্রাসাদকে!
ঢেকে দেবে তার উজ্জ্বল জীবন্ত রুপোলি ফেনরাশিকে।

১০

ভ্রমণ ও স্বদেশে প্রত্যাবর্তন

আমার বাড়িতে ভেড়া

এক আত্মীয় বিধানসভায় নির্বাচিত হয়ে ইস্‌লানেগ্‌রায় আমার বাড়িতে কিছুদিন ছুটি কাটাতে এলেন। খবর পেয়ে তাঁর এক বন্ধু এক ভোজসভার আয়োজন করলেন আমার বাড়িতে। দু'টি ভেড়া আনা হলো, তার একটিকে পুড়িয়ে সুরা আর গীটার-সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে খাওয়ার আনন্দ উপভোগ করলাম সকলে সে রাত্রে। অন্য ভেড়াটিকে রাখা হলো পরবর্তী ভোজসভায় ব্যবহারের জন্য। সারা রাত্রি ওর চীৎকার আর গোঙানিতে ঘুম হলো না। ভোরে উঠে গাড়িতে চাপিয়ে একশো কুড়ি কিলো মিটার পথ অতিক্রম করে ভেড়াটিকে নিয়ে এলাম আমার সান্তিয়াগোর বাড়িতে।—নিয়ে এলাম শাণিত ছুরির আঘাত থেকে তাকে বাঁচাবো বলে। এখানে এনে তার বাঁধন খুলে দিলাম। ছাড়া পেয়ে আমার বাগানে ঢুকে প্রথমেই খেয়ে শেষ করলো তুলিপ ফুলের গাছগুলিকে। তারপরে, কাঁটার ভয়ে একমাত্র গোলাপ ছাড়া আর সব ফুলের গাছই সে নিশ্চিহ্ন করে দিলো নিমেষে। বাগানে ঘাসের কোনো অভাব ছিলো না, কিন্তু সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপই নেই! আবার তাকে বাঁধলাম। এরপর শুরু হলো

তার কান ফাটানো চিৎকার আর কান্না। আমিও মরিয়া—বাঁধন আর খোলা হবে না। এখানেই শুরু হলো জুনাইতো আর আমার সেই ভেড়াটির গল্প। এই সময়ে ভূমিহীন কৃষকদের ধর্মঘট চলছিলো। জমির মালিকরা নিজেদের জমিতে দৈনিক চার আনা মজুরীর বিনিময়ে তাঁদের খাটাতো। মালিক শ্রেণী খুব সহজেই ডাণ্ডা আর জেলখানার দৌলতে এই ধর্মঘট ভেঙে দিলেন।

গ্রামের এই পরিস্থিতিতে ভয় পেয়ে একটি ছেলে একদিন শহরগামী ট্রেনে চড়ে বসলো। চেকার এসে যখন তার কাছে টিকিট দেখতে চাইলেন তখন সে অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলো, ভাবটা এমন—যেন, স্বদেশের গাড়িতে চড়তে গরীবদের পয়সা লাগে নাকি? যাইহোক, শেষ পর্যন্ত সহৃদয় যাত্রীদের চাঁদায় সে যাত্রায় সে মুক্তি পেয়ে গেল।

সানতিয়াগো শহরে নেমে ছেলেটির চক্ষু একেবারে ছানাবড়া! গ্রামে থেকে এতদিন সে শুনে এসেছে—শহরে কেবল চোর-ছ্যাঁচড়দের বসবাস। তাই কাপড়-জামার পোঁটলাটিকে সযত্নে সে আগলে রেখেছে। দিনের বেলায় যেখানে বড়ো বড়ো বাড়ি, রাস্তা আর মানুষের ভীড় সেই সব জায়গাতেই সে ঘোরাফেরা করে রাত্রিটা রাস্তায় শুয়ে কাটাতো। কাছে পয়সাকড়ি না থাকায় ক'দিন খাওয়া জোটেনি। খিদের জ্বালায় একদিন জ্ঞান হারিয়ে সে রাস্তায় পড়ে গেল। এই দেখে অনেক লোক জড়ো হলো, কেউ বললো, 'আহা. পিত্তদোষ'। কেউ বললো, 'মৃগী রোগ'। কেউ আবার বললো, 'বোধহয় হৃদ্‌রোগ'! এর মধ্যে এক রেস্তোরাঁর মালিক ওকে দেখে বললো—'না না, আসলে ওর পেটে কিছু নেই'। কিছু খাবার খাওয়ানোর পর জ্ঞান ফিরে এলো তার। শেষ পর্যন্ত সেই রেস্তোরাঁতেই একটা কাজ জুটলো ছেলেটির, কাপ-ডিস ধোওয়া কাজ। অল্প পয়সায় দু'বেলা দু'মুঠো খাবারের বিনিময়ে পর্বতপ্রমাণ কাপ-ডিস ধোওয়া ঐ একজনের দ্বারা হয়ে যাচ্ছে দেখে মালিক খুব খুশি। কিন্তু বেশিদিন নয়। একদিন রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে শহরের সীমানা পেরিয়ে ছেলেটি শেষে পথ হারিয়ে ফেললো।—ক্লান্ত হয়ে শেষে এক জায়গায় বসে সে কাঁদতে শুরু করলো। ছেলেটি যেখানে বসে কাঁদছিলো সেখান থেকে আমার বাড়ি বেশি দূর নয়। ছেলেটির ওই অবস্থা দেখে লোকজন তাকে আমার বাড়ির রাস্তাটা দেখিয়ে দিয়ে আমার কাছে আশ্রয় নিতে বললো। এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার। আমি লক্ষ্য করেছিলাম—যখনই এ ধরনের কোনো ঘটনা ঘটতো তখন লোকেরা আমার বাড়িটাই সব মুস্কিল আসানের জায়গা বলে মনে করতো। যাইহোক, মেষপালক ওই ছেলেটি শেষ পর্যন্ত আমার বাড়িতে আশ্রয় পেলো। ছেলেটির নাম জুনাইতো। জুনাইতোর হাতে ভেড়ার দড়িটা তুলে দিয়ে বললাম দেখো যাতে বাগানের ঘাসই ভেড়াটা খায়। ক্রমে ওদের দু'জনের বন্ধুত্ব বেশ ভালোভাবে জমে উঠলো। সব সময়েই ভেড়াটির গলায় একটা ফিতে বেঁধে তাকে সঙ্গে নিয়ে সে ঘুরতো। অল্পদিনের মধ্যে খাওয়া, বেড়ানো আর বিশ্রাম পেয়ে ওরা দু'জনেই বেশ ফুলে ফেঁপে উঠলো।

সবই চলছিলো ভালো। হঠাৎ একদিন ছেলেটি বায়না ধরলো তার গ্রামের বাড়িতে ফিরে যাবার জন্য। অগত্যা টিকিট কিনে দিলাম।—সেদিন জুনাইতো আর ভেড়াটির বিদায় মুহূর্তটি অত্যন্ত মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছিলো। ভেড়াটিকে সঙ্গে নিয়ে গ্রামে

ফেরার কোনো উপায় ওর ছিলো না। কিন্তু আমার হলো মুশকিল। ভেড়াটিকে দেখাশোনার সময় তো আমার নেই। আমার উপর তখন রাজনৈতিক আর সামাজিক নানান্ কাজের চাপ। তাছাড়া সামরিক শাসনে আমার বাড়ির আসবাবপত্তর সবই তছনছ, ভগ্নপ্রায়। শেষ পর্যন্ত ভেড়াটিকে আমার এক বোনের কাছে রেখে এলাম। এছাড়া শাণিত ছুরি থেকে ওকে বাঁচানোর আর কোনো উপায়ই খুঁজে পেলাম না।

আগস্ট ১৯৫২ থেকে এপ্রিল ১৯৫৭

আগস্টের ১৯৫২ থেকে এপ্রিল ১৯৫৭—এই ক'টা বছরে বিশেষ কোনো রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটেনি। তবে আমার ব্যক্তিগত জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ঘটনা ঘটেছিলো। এই সময়েই আমার কবিতার বই "ঝড়ো হাওয়া আর দ্রাক্ষাকুঞ্জ" এবং তিনখানি গীতি-কবিতার বই লেখার কাজ শেষ করলাম, বইগুলি প্রকাশিত হলো। চিলিতে একটি য়ুরোপীয় সংস্কৃতি সভার আয়োজন করেছিলাম, সেই সভায় য়ুরোপের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু কবি ও সাহিত্যিক যোগদান করেছিলেন। আমার নিজের পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হওয়ায় পঞ্চাশতম জন্মদিনের উৎসব পালন করার আয়োজনও হয়েছিলো এবং এতে অনেকেই এসেছিলেন। চীন থেকে এসেছিলেন আই চিঙ ও সিয়াও ইমি, রাশিয়া থেকে ইরেনবুর্গ, চেকোশ্লোভাকিয়ার দারদা কুৎভালেক এবং লাতিন আমেরিকার মিগ্যুয়েল এস্তুরিয়া, এলভিয়া রোমিরো প্রমুখ বহু কবি আর সাহিত্যিক। আমি আমার ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার ও অন্যান্য অনেক সম্পত্তি চিলি বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করলাম। 'লেনিন পুরস্কার'—সে সময়ে যেটা 'স্তালিন পুরস্কার' নামে দেওয়া হতো, তার বিচারকমণ্ডলীর অন্যতম একজন সভ্য হলাম। এর আগের বছরে আমি ঐ পুরস্কার পেয়েছিলাম। এই সময়েই স্ত্রী ডেলিয়ার সঙ্গে আমার বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়। তখন ম্যাটিলডে-কে নিয়ে নতুন বাড়ী লা চাশকোনাতে উঠল্যাম। সেই সময়ে 'চিলির আওয়াজ' নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনার ভার নিলাম এবং সেই সঙ্গে নিলাম চিলির কম্যুনিস্ট পার্টীর নির্বাচন-সভায় সক্রিয় অংশ। এই সময়েই প্রকাশিত হলো আমার একখানি কবিতা সংকলন গ্রন্থ।

ব্যুয়েনস্ এয়ারসের জেলে

১৯৫৭-র এপ্রিলে আমার নিমন্ত্রণ এলো শান্তিসভায় যোগদানের। এ সভা অনুষ্ঠিত হবে কলম্বোয়, এখানে এর আগে আমি বেশ কয়েক বছর কাটিয়েছি।

এমনিতে সরকারী সাদা পোশাকের পুলিসের সঙ্গে দেখা হওয়াটা খুব একটা বিপজ্জনক নাও হতে পারে, কিন্তু সেই পুলিস যদি আর্জেন্টিনার হয় তবে তাঁদের সম্বন্ধে কোনো ভবিষ্যদ্বাণীই করা সম্ভব নয়, সেক্ষেত্রে অনেক কিছুই ঘটতে পারে। সেদিন চিলি থেকে কলম্বোর পথে আর্জেন্টিনার ব্যুয়েনস্ এয়ারসে আমার এক বন্ধুর বাড়িতে রাত্রিবাসের জন্য যখন পৌঁছলাম তখন দীর্ঘ ভ্রমণ আর অসুস্থতায়

আমি অত্যন্ত ক্লান্ত। সেই ক্লান্তির মাঝে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না। হঠাৎ কয়েকজন পুলিসের দাপাদাপি আর চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলে অবাক হলাম—ঘরের সমস্ত আসবাবপত্তর এবং বইপত্রাদি তছনছ হয়ে চারধারে ছড়ানো! আলমারীগুলো সব খোলা, এমন কি অন্তর্বাস সরিয়েও তল্লাসী চলছে! বন্ধুটিকে পুলিস ধরে নিয়ে গেছে। বাড়ির পিছনের ঘর থেকে তারা আমাকেও ঘুম থেকে টেনে তুললেন। জিজ্ঞাসা করলেন—'আপনি কে?'

—'আমার নাম পাব্লো নেরুদা।'

এরপর আমার স্ত্রীকে প্রশ্ন করলেন—'আপনার স্বামী কি অসুস্থ?'

—'হ্যাঁ, খুবই ক্লান্ত। আজই আমরা এখানে এসেছি এবং কাল সকালেই য়ুরোপ যাবো।'

—'আচ্ছা, আচ্ছা'। এই বলে পুলিসরা চলে গেলেন। কিন্তু দেখা গেল ঘণ্টা-খানেকের মধ্যে একটা অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে হাজির হলেন ওঁরা।

কিছুই বুঝতে পারছিলাম না আমি।

আর্জেন্টাইন থেকে পেরণ তখন বহিষ্কৃত। জেনারেল আরামবুরু হাতে ক্ষমতা। আরামবুরু ক্ষমতা দখল করে সারা দেশে নিপীড়ন ও অত্যাচার চালাচ্ছেন।

যাই হোক, আমাকে স্ট্রেচারে তোলা হলো। কোন্ অপরাধে আমাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার একশো দশ কিলো ওজনের শরীরটার প্রায় সবটাই সোয়েটারে মোড়া, তার সঙ্গে ছিলো কম্বল ইত্যাদি। দেখলাম সবশুদ্ধ বয়ে নিয়ে যেতে চারজনেরই বেশ অসুবিধে হচ্ছিল। ম্যাটিলডে ওদেরকে আমার শরীরের অবস্থাটা বোঝানোর ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলো।

জেলখানায় এনে প্রাথমিক নিয়মকানুনগুলি দেখলাম পালন করা হলো। এরপর আমার ব্যক্তিগত যা কিছু পেলো তা সবই বাজেয়াপ্ত করা হলো, এমন কি সঙ্গের 'গোয়েন্দা গল্পের বইখানি পর্যন্ত।

জেলখানার ভিতরের দরজা খুলে প্রথমে আমাকে যে বন্দীশালায় পাঠানো হলো—সেখানে দেখি জনারণ্য! প্রায় হাজার দুয়েকের উপরে মানুষ সেখানে বন্দী হয়ে আছেন। তাঁরা সকলেই প্রায় কম্বলের তলা থেকে হাত বাড়িয়ে আমায় অভ্যর্থনা জানালেন। কিন্তু আদেশ আছে যে, নিভৃতে—সকলের দৃষ্টির আড়ালে রাখতে হবে আমাকে। মনে হয় নির্দেশানুসারেই উপরের তলার একটি ছোট্ট ঘরে, যে ঘরটির পাঁচিলের কাছে ছোট্ট একটি জানালা সেখানে আমাকে পুরে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হলো। যদিও তখনো চোখ থেকে ঘুম ছাড়েনি, কিন্তু ঘুম আর এলো না। ভোর হতেই বন্দীদের চিৎকার শুনে মনে হলো—যেন দু'টি দলের ফুটবল খেলা শুরু হয়েছে!

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে অর্জেনটিনা, চিলি, এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাহিত্যিক কবি আর বুদ্ধিজীবীদের তরফ থেকে অবিলম্বে আমার মুক্তির জন্য সোচ্চার দাবী উঠলো—ফলে আমি মুক্তি পেলাম। জেলখানা থেকে বেরুবার ঠিক আগে একজন রক্ষী প্রায় দৌড়ে এসে আমার হাতে একটা কাগজ দিলেন, তাতে দেখলাম আমারই উদ্দেশে লেখা তাঁর একটি কবিতা। কবিতাটি যদিও কাঁচা-হাতে লেখা তবু

কবিতার শিশুসুলভ সরলতা সেদিন আমায় মুগ্ধ করেছিলো। পৃথিবীর আর কোনো কবির ভাগ্যে জেল থেকে বেরুবার সময় জেলরক্ষী সৈনিকের লেখা কোনো কবিতা জুটেছে বলে মনে হয় না।

পুলিস ও কবিতা

একদিন ইস্‌লানেগ্রাতে 'আমাদের পরিচারিকা মেয়েটি এসে বললো, ম্যাডাম ও ডন্‌ পাব্‌লো, আমি গর্ভবতী।—এর কিছুদিন পরে তার একটি ছেলে হলো। ছেলেটির প্রকৃত পিতা যে কে জানা ছিলো না মেয়েটির। সে আমাদের অনুরোধ করলো শিশুটির ধর্ম মা ও বাবা হবার জন্য। আমরা রাজি হলেও কিন্তু সেদিন আমাদের জানা ছিলো না—এটা আমাদের পক্ষে কোনোদিনও সম্ভব হবে না।—পরে এটা প্রমাণ হয়েছিলো, যখন আমরা পরিচারিকা এবং তার নবজাত সন্তানটিকে স্টেশন ওয়াগনে নিয়ে কাছাকাছি গীর্জা এল্‌টেবোতে হাজির হলাম। শিশুটি আমার কোলেই ছিলো। আমাকে দেখেই পাদ্রীসাহেব সজারুর কাঁটার মতো তাড়া করলেন, বললেন—'নেরুদা! ব্যাটা কম্যুনিস্ট, ও এসেছে গীর্জায়! ওকে এখানে ঢুকতে দেওয়া হবে না।—গীর্জাতে ঢোকার অধিকার কোনো কম্যুনিস্টের নেই। বেরিয়ে যাও।'

পরিচারিকাটি আহত, বিস্মিত ও হতাশ হয়ে সেই দিনেই ফিরে গিয়েছিলো তার গ্রামে।

আর একবার ভালপারাইসোর বিখ্যাত ঘড়ি-মেরামতকারী বৃদ্ধ ডন্‌ এস্‌টারিওকে ঠিক এই রকম যন্ত্রণাই পেতে দেখেছিলাম। ডনের আঙুলগুলিতে এমনই যাদু ছিলো যা দিয়ে যে কোনো ঘড়ি তিনি অতি সহজেই মেরামত করতে পারতেন। তাঁর পঞ্চাশ বছরের বিবাহিত জীবনের সঙ্গিনী স্ত্রী তখন মৃত্যুশয্যায়। আমার কাছে খবরটা যখন এলো, আমি ভাবলাম—ওই মৃত্যুপথযাত্রিনীকে শোনাবার জন্য ডনকে একটি কবিতা পাঠাই। একথা ভেবে ভালো-মন্দ কোনো কিছুই না ভেবে কবিতাটি লিখলাম। কবিতাটিতে তাঁদের সুন্দর আর সুখী জীবনের বর্ণনা করতে গিয়ে লিখলাম—একটি পুরনো ঘড়ির শাশ্বত টিক্‌টিক্‌ শব্দের মতোই তাঁদের জীবন। সারিতা ভয়াল আমার ওই কবিতাটি লা ইউনিয়ন কাগজে প্রকাশের জন্য নিয়ে গেলেন। কাগজটি সম্পাদনা করতেন এক ধর্মযাজক, নাম সিনর পাসকেল। সরাসরি তিনি জানিয়ে দিলেন যে, কম্যুনিস্ট পাব্‌লো নেরুদার কবিতা তাঁর কাগজে ছাপা হবে না। বিশেষ করে নেরুদাকে যখন চার্চ থেকে একঘরে করা হয়েছে।

ডন্‌ এস্‌টারিওর জীবন-সঙ্গিনী মারা গেলেন।

যাজক-সম্পাদক আমার সেই কবিতাটি তাঁর কাগজে প্রকাশ করলেন না।

আমি এমন এক পৃথিবীতে বাস করতে চাই বাঁচতে চাই যেখানে একঘরে বা অচ্ছুৎ বলে কোনো কথা নেই। আমি কোনও দিন কাউকে একঘরে করবো না, আমি কোনও দিন কাউকে বলবো না যে—ওহে ধর্মযাজক, যেহেতু তুমি সাম্যবাদ-বিরোধী, তাই তোমার অধিকার নেই খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করার। আমি এমন একটি পৃথিবী

চাই যেখানে একমাত্র মানুষই হবে মানুষের পরিচয়—এছাড়া অন্য কোনো সংজ্ঞা বা পরিচয় থাকবে না মানুষের, যেখানে থাকবে না কোনো অসম্মানজনক অনুশাসনের বিকৃত পরিচয়। আমি চাই এমন একটা পৃথিবী যেখানে সব মানুষই বিনা বাধায় যেতে পারবে গীর্জায়, ছাপাখানায়। আমি এমন পৃথিবী চাই না যেখানে কোনো মানুষকে ধরে জেলে পুরে রাখার জন্য মোটর সাইকেলে, লঞ্চবোটে বা গাড়িতে চড়ে তার পিছন পিছন তাড়া করে যাবো। আমি চাই সমস্ত মানুষ ইচ্ছামতো পড়াশোনা করবে, গান গাইবে গান শুনবে, কবিতা আবৃত্তি করবে আর সবাই সমানভাবে সমাজের সম অংশীদার হয়ে বেঁচে থাকবে। সংগ্রামের কোনো অর্থই আমি জানি না, আমি শুধু জানি—সর্ব সংগ্রামের অবসান। আমি কোনো রূঢ় শাসন জানি না, আমি শুধু জানি সমস্ত রকমের রূঢ়তার অবসান। তাই তো আমি এমন রাস্তা বেছে নিয়েছি যা শুধু বিশ্বভ্রাতৃত্বের দিকে এগিয়ে চলেছে। আমার সংগ্রাম সর্বব্যাপী, প্রশস্ত—অক্লান্ত ভালোবাসার সংগ্রাম।

'আমার কবিতা আমার জীবন।—এদের মাঝখানে পুলিসের আনাগোনা এবং সেই সব ঘটনার পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। আমার জীবনে যা ঘটেছে কিম্বা অন্যের জীবনে যা ঘটেছে অথবা ঘটতে চলেছে, যা হয়তো আরো ভয়ঙ্কর—সে সব কিছুই বলতে চাই না আমি। তবু মানবজাতির ভবিষ্যতের উপরে আমার বিশ্বাস আছে; প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে আমার সেই বিশ্বাস দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হচ্ছে। আমি বিশ্বাস করি মানুষের কোমলতর সুখের দিনগুলি আসন্ন। এই অনুস্মৃতি লেখার মুহূর্তে, আমি জানি মাথার উপরে পরমাণু বোমার সর্ববিধ্বংসী অশুভ শক্তির ছায়ার নীচে মানুষ অপেক্ষমান—যা হয়তো এই যুগের সভ্যতা বা ইতিহাসের কোনো কিছুই অবশিষ্ট রাখবে না। তবু তাতেও আমার বিশ্বাস বদলায়নি। মুহুর্মুহু নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণার চরমতম সংকটের এই মুহূর্তে আমরা জানি সত্যালোকে উদ্ভাসিত সদা সতর্ক চোখের দৃষ্টি মানুষকে আগলে রয়েছে। আমরা সবাই একদিন সবাইকে বুঝবো—সবাই আমরা এক সঙ্গে হেঁটে এগিয়ে যাবো, মানুষের প্রতি আমার এই বিশ্বাস কোনোদিন ভাঙতে পারে না।

অপ্রত্যাশিত—আবারো সিংহল

সার্বজনীন ইচ্ছা শুধুমাত্র একটিই—এই মনুষ্য-সভ্যতা-বিধ্বংসী পরমাণু বোমার যুগ শেষ হোক। পৃথিবীতে শান্তি আসুক—এই আশা নিয়েই কলম্বোর শান্তি-সভায় যোগ দেবার জন্য রওনা হলাম।

সোভিয়েত টি. ইউ ১০৪ বিমানে ভারতবর্ষের হিমালয়ের উপর দিয়ে যাবার সময়ে হিমালয়ের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলাম। তুষার স্তূপের উপর সূর্যের রশ্মি নানান্ রঙে ছোটো বড়ো সব পাহাড়কে রাঙিয়ে দিয়েছে, অসীম এক নীরবতা ছড়িয়ে আছে চারপাশে। যেতে যেতে মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল তুষারদানবের দল ঐ ছায়ার উপর দিয়ে অজানা কোনো গুহার দিকে চলেছে। এন্‌ডিসের উপর দিয়ে

বহুবার গিয়েছি, কিন্তু সেখানকার রুক্ষতা, প্রাণহীন অসম পাহাড়ের বৈচিত্র্য আমাকে তেমন আকৃষ্ট করে না—যেমন আকৃষ্ট করে এশিয়ার এই পর্বতমালা।—এ যেন মনে হয় কোনো একজন বড়ো শিল্পী এর প্রতিটি চূড়া আর সানুদেশকে সমানভাবে সাজিয়ে রেখেছেন, যেন কোনো প্রাসাদ বা মন্দিরের চূড়া।

পুনর্বার সিংহলকে দেখার জন্য মন তখন ছটফট্ করছিলো। দিল্লী থেকে ভারতীয় উড়ো জাহাজে করে কলম্বো রওনা হলাম।

আমার বিশ বছরের নিঃসঙ্গ জীবন সিংহলদ্বীপেই কেটেছিলো। তখন আমার কলম থেকে বেরিয়ে এসেছিলো চরম তিক্ততার স্মৃতিগুচ্ছ—কবিতা, যার চারপাশ ঘিরে ছিলো এই দ্বীপের প্রকৃতির স্বর্গীয় সৌন্দর্য।

আমি আজ আবার এসেছি, সঙ্গে এনেছি সর্বোত্তম বাণী—শান্তির বাণী, যাতে বিশ্বাস রয়েছে এখানকার সরকারেরও। গৈরিক বসনে আবৃত কয়েকশো বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে দেখলাম, মিছিল করে চলেছেন তাঁরা গৌতম বুদ্ধের শান্তি আর সমন্বয়ের বাণী ছড়িয়ে দিতে। আমাদের আমেরিকা বা স্পেনের ধর্মযাজকদের সঙ্গে এঁদের কতো তফাৎ! স্পেনীয় গীর্জার যাজকরা সরকারীভাবে যুদ্ধরত। কিন্তু খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের কাছে সেই দিন সেই মুহূর্ত যে কতো সুন্দর কতো আনন্দের হবে যেদিন যে মুহূর্তে সেখানকার ধর্মযাজকরা সর্বধ্বংসী এই পরমাণু বোমা আর যুদ্ধের বিরুদ্ধে একমত হবেন, রুখে উঠবেন।

পুরোনো বাড়িটিকে খুঁজে বের করার জন্য ওয়েলাওয়াতির রাস্তা ধরে এগুলাম। প্রায় সব কিছুই দেখলাম বদলে গেছে। গাছগুলি বেশ বড়ো হয়ে উঠেছে, রাস্তাঘাটও দেখলাম প্রশস্ত আকার ধারণ করেছে। আমার এক সময়ের সেই বাড়িটি এখন জীর্ণ, ভগ্ন প্রায়, সমুদ্রের লোনা জল-হাওয়ায় বাড়িটির দেওয়াল আর দরজা জানালাগুলির ভগ্নদশা—এই অবস্থায় বাড়িটি তবু এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে আমাকে শেষ অভিবাদন জানাবার জন্য! কেবলমাত্র এই বাড়িটি ছাড়া এখানকার কোনো পুরোনো বন্ধুর দেখা পেলাম না। এখানে এসে মনে হলো সমুদ্রের সেই পুরোনো সুরই ধ্বনিত হচ্ছে—তীরে আর পাহাড়ের কোলে। নজরে পড়লো সেই জঙ্গল, হাতির দলের মন্থর অথচ তেজোদৃপ্ত সেই গতি। নাকে পেলাম ম ম করা সেই গন্ধ।—সবই আগের মতোই রয়েছে, বিশ বছর বয়সের নিঃসঙ্গ জীবনে সেদিন যেমনটি ছিলো।

বুদ্ধের পাদদেশে প্রণতি রাখলাম। সিংহল ছেড়ে আসার সময়ে বুঝেছিলাম—এই দ্বীপের সঙ্গে সেই আমার শেষ দেখা। জানিয়ে এসেছিলাম আমার শেষ বিদায় অভিবাদন।

চীনদেশে দ্বিতীয়বার

ব্রেজিলিয়ান বন্ধু সাহিত্যিক জোর্জে আমাদো এবং তাঁর পত্নী জিলিয়ার সঙ্গে আমরা কলম্বো ছেড়ে চীন রওনা হলাম। মাদ্রাজ হয়ে কলকাতা, সেখান থেকে রেঙ্গুন।

১৯২৭ সাল রেঙ্গুনে প্রথম যখন আসি তখন আমি তেইশ বছরের যুবক। রঙীন সবুজ মন-ভোলানো চমৎকার দেশ এই রেঙ্গুন, তবে এখানকার ভাষা বোঝা আমার অসাধ্য। আমার অনেক কবিতাই তখন এখানে বসে লিখেছিলাম। ইংরেজ শাসনে তখন সারা দেশ তটস্থ, ভীত ও শোষিত।

আজ সেই দেশে জাতীয়তাবাদ, সমাজবাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়েছে। শহর প্রায় ফাঁকা, চতুর্দিকে জঞ্জালের স্তূপ। দোকানগুলিতে প্রায় কিছুই নেই। আমি জানি নব-গণতন্ত্রের শুরুতে অতীতের ছায়া এখনও মানুষকে নিপীড়ন করে।

'ট্যাঙ্গো' কবিতার নায়িকা জোসি ব্লিস, যিনি আমার পিছু ধাওয়া করেছিলেন আজ আর তাঁর কোনো চিহ্নই খুঁজে পেলাম না, যে পাড়াতে থাকতাম সেই পাড়াটিও নেই।

বর্মা ছাড়িয়ে চীনের পথে পাড়ি দিলাম। বর্মা-চীন সীমান্তের প্রথম শহর ক্যুনমিঙ-এ কবি-বন্ধু আই চিং আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। হো-চি-মিনের লেখার মতো বন্ধু চিঙের কবিতাতেও ছিলো প্রাচ্যের প্রতি পাশ্চাত্যের ঔপনিবেশিক অত্যাচারের সুর। আর ছিলো প্যারির কণ্টকর জীবনের অধ্যায়। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে এঁরা পালিয়ে এসে হোটেল পরিচারকের দুঃসাধ্য জীবন কাটিয়েছেন। তবু বিপ্লবের প্রতি আস্থা কোনো সময়েই হারিয়ে ফেলেন নি।

ক্যুনমিঙ শহরের উদ্যানের দিকে তাকিয়ে মনে হলো তার উপরে প্লাস্টিক সার্জারী হয়েছে। ফুল ফল আর অন্যান্য সমস্ত রকম গাছের উপর দিয়ে বয়ে গেছে নানান্ পরীক্ষা-নিরীক্ষার ঝড়, এর ফলেই সম্ভবত বিকৃতি ঘটেছে ওদের। ছোটো ছোটো লেবুর গাছগুলিতে ততোধিক ছোটো ছোটো লেবুগুলিকে দেখে মনে হচ্ছিল গমের দানা। এরপর আমরা গেলাম এক উদ্ভট পাথরের জঙ্গল দেখতে, দেখলাম পাথরগুলির কোনোটা সরু, কোনোটি তিনকোণা, আবার কোনোটি বিরাট আকারের, বিচিত্র রঙের। শোনা গেল দূরে অতীতে নাকি চীনা সম্রাটকে এই সকল পাথর ভেট পাঠাতেন তৎকালীন শাসকবর্গ। হাজার হাজার ক্রীতদাস এই পাথর বওয়ার কাজ করতো।

চীন আমার কাছে কোনো সময়েই হেঁয়ালী মনে হয়নি বরং এই বিরাট দেশ জুড়ে যখন মুক্তি সংগ্রামের খবর পেয়েছি তখন আমার মনে হয়েছে—শতাব্দীর পর শতাব্দী কতই না বিচিত্র অবস্থার মধ্য দিয়ে চলতে হয়েছে এই দেশটিকে, এখনও হয়তো সে যাত্রার অবসান ঘটেনি বটে তবে একদিন এই দেশটি সুদৃঢ় এক মহীরুহে পরিণত হবে। বিরাটকায় প্যাগোডা, দেশের মানুষ আর তার উপকথা, যোদ্ধা, কৃষক আর ভগবানের এই বিরাট দেশের পথের মধ্যে আনাগোনা—কোনো কিছুই আমাকে বিস্মিত করেনি।

সব কিছুর মধ্যেই যেন নিখুঁৎ করে গড়ে তোলার, গড়ে ওঠার এক অস্বাভাবিক আগ্রহ—এমন কি তাঁদের হাসিটুকুও যেন কৃত্রিম উপায়ে তৈরি।

একবার স্থানীয় একটি দোকানে প্রবেশ করে অবাক হলাম, খাঁচা ভরা ঘুরঘুরে পোকা দেখে। বাঁশ কেটে বোনা খাঁচাগুলির কোথাও কোনো খুঁৎ নেই। এক একটি খাঁচা প্রায় তিন ফুটের মতো লম্বা। খাঁচাগুলিতে ভরা অসংখ্য সেই ঘুরঘুরে পোকার ডাক শুনে মনে হচ্ছিল যেন শব্দের এক সাম্রাজ্য। আমার বিস্ময়াবিষ্ট দৃষ্টি দেখে দোকানি ভদ্রলোকটি সম্ভবত মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং সেই কারণেই পোকাভর্তি একটি খাঁচা তিনি আমাকে দিলেন, কোনো দাম নিলেন না! মনে পড়লো এমনি করেই শৈশবে এমন কতই না অদ্ভুত দান আমার দেশের জঙ্গল থেকে আমি দু'হাত ভরে গ্রহণ করেছি।

এরপর কৃষক, শ্রমিক, জেলে প্রভৃতি মিলিয়ে প্রায় হাজারখানেক যাত্রীর সঙ্গী হয়ে আমরা 'ইয়াংৎসে নদীর উপর দিয়ে জাহাজে 'নানকিঙ-এর উদ্দেশে রওনা হলাম। প্রশস্ত শান্ত এই নদীটি সময় সময় ভয়ংকর হয়ে ওঠে তার গতিপথের বাঁকের মুখে। নদীটির দু'পাশ ঘিরে রেখেছে সুদীর্ঘ সুউচ্চ প্রাচীর, এই প্রাচীরের উপর দিয়ে সময় সময় খণ্ড খণ্ড ভাসমান মেঘ দেখা যায় আকাশের বুকে, আর মাঝে মধ্যে বসুন্ধরার বুকে দেখা যায় কিছু কিছু বাড়ি—এমন সুন্দর ভূ-শোভা পৃথিবীর খুব কম জায়গাতেই দেখা যাবে।

হঠাৎই আমার চোখে পড়লো, প্রায় পাঁচ বছর পরে দ্বিতীয়বার চীনে এসেছি—দেখলাম দেশটির কোথায় যেন একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে।—কি হলো, এমন কেন হলো? প্রথমে যখন এদেশে এসেছিলাম তখন দেখেছিলাম সর্বত্র মানুষ আর মানুষ—তবে এর মধ্যে যে জিনিসটি সবচেয়ে বেশি আমাকে আকর্ষণ করেছিলো তা হচ্ছে অধিকাংশ ছেলে-মেয়ের পরণেই নীল রঙের বড়ো মাপের জামা-প্যাণ্ট। যেন এক সুশৃংখল শান্ত নীল সেনার দল। জানা গেল—বিগত পাঁচ বছরে এদেশের কাপড়-কলগুলিতে অকল্পনীয় উন্নতি ঘটেছে। বহু বিচিত্র পোশাকে সজ্জিত মানুষজনও কিছু কম নয়। এই সব বাহারী-পোশাক পরা অসংখ্য মানুষের ভীড় সেখানকার রাস্তাঘাটকে রামধনু রঙে রাঙিয়ে তুলেছে। অবাক লাগে এই ভেবে চীনারা এমনই এক জাতি যে, হাজার হাজার বছর ধরে এঁরা 'কুৎসিত' কথাটির কোনো অর্থই জানে না—এঁদের স্পর্শে সব কিছুই যেন সুন্দর হয়ে ওঠে। আদিম যুগে চন্দনকাঠে এঁরা ঘাস-ফুল তৈরি করতেন। এখানে 'মৃত্তিকা মা' তাঁর সন্তানদের শিখিয়েছেন দেশ-প্রীতি, অপরিসীম শ্রম, অবিশ্রান্ত কঠোর জীবন-সংগ্রাম আর নিখুঁৎ সৌন্দর্যবোধ। ইতিহাসের এই শেষ অধ্যায়ে সমস্ত রকম অবিচার আর অসাম্যের মৃত্যু ঘোষণা করে একদিন চীন মহত্তম দেশ হয়ে অনন্তকাল বেঁচে থাকবে।

ইয়াংৎসের যাত্রাপথে বন্ধু আমাদো হঠাৎ কেমন বিষণ্ণ হয়ে পড়েছিলেন। অবশ্য তাঁর স্ত্রী শান্তভাবেই বন্ধুটির বিষণ্ণতা লাঘবের চেষ্টা করছিলেন। এ বিষয়ে আমাদের কিছু অনুযোগ ছিলো। সম্মানীয় অতিথি সুলভ আপ্যায়ন এবং সেই সঙ্গে জাহাজটির অন্যান্য সাধারণ যাত্রীদের কাছ থেকে আলাদা করে রাখার ব্যবস্থাটা আমাদের ভালো লাগছিলো না।—এই পৃথকীকরণটা ব্রেজিলিয়ান সাহিত্যিক

আমাদোকে এতই বিরক্ত করে তুলেছিলো যে, তিনি তাঁর জ্বালাটা প্রায়শঃই আমার উপরে নিক্ষেপ করতে লাগলেন—ব্যাঙ্গাত্মক দৃষ্টি আর তিক্ত কথার বাণ নিক্ষেপ করে।

সত্যি বলতে কি, স্তালিন-যুগের সমস্ত ঘটনা একে একে যখন প্রকাশ হতে লাগলো তখন চাবুকের মতোই সেটা আমাদের মনকে আঘাত করেছিলো। আমরা পুরোনো বন্ধু, বহুকাল একত্রে নির্বাসনে কাটিয়েছি। একটা সাধারণ আদর্শ আর বিশ্বাস আমাদের বন্ধুত্বকে দৃঢ় করে তুলেছিলো। চিলি সুলভ মনোবৃত্তি আমাকে যেমন অনেকটা নরম ও সহজ করে রেখেছিলো, আমাদোর ক্ষেত্রে সেটা ছিলো উল্টো। উনি ছিলেন একগুঁয়ে। তাঁর গুরু লুই কারলোসকে পনেরো বছর জেলে কাটাতে হয়েছিলো।—এই সব ঘটনা স্বাভাবিকভাবেই তাঁর মনকে কঠোর করে তুলেছিলো।

বিংশতি মহাসভার কার্যাবলী প্রকাশের পর আমরা অর্থাৎ সব বিপ্লবীই নতুন পথ ও আদর্শের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম। আমাদের মধ্যে অনেকেই ভেবেছিলেন—এই যে নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণাময় আর দুঃখদায়ক ঘটনাবলী প্রকাশিত হয়ে গেছে এর ফলে অনেকেই আবার নবজন্ম লাভ করবেন, অত্যাচার ও অন্ধকার কেটে গিয়ে এই নবজীবন আমাদের চলার পথকে সুগম করবে।

কবি আই চিং আমাদের পথ প্রদর্শক।

ম্যাটিলডে, আমাদো, জেলিয়া ও আই চিঙের সঙ্গে আমাদের ছোট্ট খাবার ঘরটিতে একসঙ্গে আমরা রাতের খাবার খেতাম। নিত্য নানান্ সুখাদ্য চীনা খাবার খেতে খেতে মাঝে মাঝে ক্লান্তি লাগলেও কিছু বলার উপায় ছিলো না, তবে শেষ পর্যন্ত একটি উপায় পাওয়া গেল।

আমার জন্মদিন এসে গেল। ম্যাটিলডে আর জেলিয়া ঠিক করলেন জন্মদিনে ওঁরা চিলির রান্নার মতো রেঁধে মাংসের রোস্ট খাওয়াবেন। ওঁরা অন্যান্যদের কিছু না জানিয়ে কেবল আই চিংকে অনুরোধ জানালেন প্রয়োজনীয় উপকরণাদি জোগাড় করে দেবার জন্য। আই চিং বললেন যে, এ বিষয়ে সমিতির সঙ্গে কথা বলে পরে সব জানাবেন। এবং আই চিং সমিতির সঙ্গে কথা বলার পর যা জানালেন তাতে আমরা খুবই বিস্মিত হয়েছিলাম। সমিতির প্রায় সকল সদস্যের অভিমত হচ্ছে এই যে, সারা চীন এখন অনাড়ম্বর এবং সংযমের মধ্য দিয়ে চলেছে, এমন কি স্বয়ং মাও-সে-তুংও নিজের জন্মদিন পালন করতে দেন না। সুতরাং পাবলোর ক্ষেত্রে এ রকম অনুমতিদান আদর্শ-বিরোধী কাজ হিসাবেই গণ্য হবে। কিন্তু এর পরেও ম্যাটিলডে ও জেলিয়া আই চিংকে বোঝালেন যে, প্রতি দিন আমাদেরকে যে আহার্য দেওয়া হয় তার তুলনায় আমাদের প্রস্তাবিত নতুন ব্যবস্থাটি একেবারেই অনাড়ম্বর ও অল্প খরচে হবে। আই চিং শুনলেন এবং উত্তরে পরদিন জানালেন যে, জাহাজে কোনো চুল্লী কিংবা খোলা উনুন নেই। ওঁরা বললেন যে, এ বিষয়ে রাঁধুনীর সঙ্গে আগেই কথা হয়েছে—জাহাজে সুন্দর একটি উনুনও আছে। আই চিং শুনলেন তারপর আড়চোখে ইয়াংৎসের জলের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

শেষ পর্যন্ত বিতর্কিত এক স্বর্ণাভ-ফলের মতোই ১২ই জুলাই তারিখে আমার জন্মদিনে ম্যাটিলডে ও জেলিয়ার মনোমতো তৈরি মুরগির রোস্ট আমার খাবার টেবিলে পৌঁছে গেল।

১৯২৮এ যখন প্রথম হঙকঙ ও সাংহাইতে এসেছিলাম এবং যার বর্ণনা আগে দিয়েছি তখন এই শহরগুলিকে দেখে মনে হয়েছিলো গলিত বিকৃত শবদেহের মতো। ইংরেজের ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থায় তখন দেখেছিলাম চোর-ডাকাত-খুনে, আর দেখেছিলাম গণিকা—স্থল ও জলদস্যুদের আধিপত্য। কিন্তু চীনা-বিপ্লবের পরে এসে দেখলাম—এ যেন এক স্বর্গপুরী, স্বর্গীয় পরিবেশ এখানকার আকাশ-বাতাসকে পরিশুদ্ধ করেছে। যা কিছু সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি এই অনুস্মৃতিতে স্থান পাচ্ছে সেটা খুবই নগণ্য—এক বিরাট শুভ সূচনার জন্মলগ্নে এটা কিছুই নয়। আমাকে যেটা কষ্ট দিয়েছে সেটা মাওবাদ, তবে মাও-সে-তুঙ নয়। মাওবাদ, স্তালিনবাদ, সমাজবাদী দেবতার উপাসনা। মাওয়ের অবদান—তাঁর সংগ্রাম, তাঁর আদর্শ, তাঁর সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা—তাঁর কবি সুলভ মনোভাব এবং জাতির অগ্রগতির জন্য তাঁর অমূল্য আর অদ্বিতীয় অবদান।—এসব কেউই অস্বীকার করবে না। কিন্তু তবু যখন দেখেছি হাজার হাজার দরিদ্র শ্রমিক সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনির শেষে ঘরে ফেরার সময় কপালের ঘাম মুছতে মুছতে মাও-সে-তুঙের বিরাট প্রতিকৃতির সামনে নতজানু হয়ে প্রণাম করছেন তখনই মনটা আমার বিষাদে ভরে উঠেছে। দেখেছি হাজারে হাজারে মানুষ হাতে হাতে ছোটো ছোটো লাল-বই (রেড-বুক) নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে—পিং পং খেলায় জেতা থেকে শুরু করে সংসারের জটিল প্রশ্ন এমন কি এ্যাপেনডিক্সের ব্যথা পর্যন্ত—সব কিছুরই সমাধান সেই বই থেকে নির্ণয় করার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছেন। দেখেছি মাও-এর মুখনিঃসৃত বাণী ও উপদেশ প্রতি মুহূর্তে রেডিও টেলিভিশন পত্র পত্রিকা এমন কি স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের খাতায় লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে। প্রতিটি নাট্যশালা, সংস্কৃতি পরিষদ—প্রতিটি শিল্প প্রতিষ্ঠানেও মাও—মাও আর মাও!

স্তালিনযুগে আমিও আমার বিশ্বাস ও আদর্শকে স্তালিনের নির্দেশেই চালনা করতাম, কারণ তখন দেখেছিলাম হিটলারের দুর্দমনীয় বাহিনী ও ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে তিনিই শেষ আঘাত করেছিলেন। সমগ্র মানবজাতিকে তখনকার সেই অন্ধকার অবস্থা থেকে স্তালিনই বাঁচিয়েছিলেন। তাই তাঁর অধঃপতনটা আমাদের অনেকের কাছেই আজও রহস্যময়।

আজ এই বিশাল চীন দেশের দিকে তাকিয়ে দেখেছিলাম।—এ যুগে আমাদের চোখের সামনে একজন মানুষ উপকথায় পরিণত হতে চলেছেন! যে সমাজতন্ত্রে সমস্ত মানুষের অধিকার—সেখানে মাত্র একজন ব্যক্তি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ভাগবত রূপ নিয়ে আবির্ভূত হতে চাইছেন—এই তেতো বড়ি বার বার গলাধঃকরণটা অসাধ্য। যাক সে সব কথা।

যে হংকং শহরটি দীর্ঘকাল একাকী, বিষণ্ণ দিনগুলি কাটিয়েছে তাকে অন্যান্য উন্নত শহরের সঙ্গে জুড়ে দেবার জন্য চমৎকার যে সেতুটি চীনা ও সোভিয়েত ইঞ্জিনীয়ারদের যুগ্ম প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছে—সেটিকে দেখার জন্য নিয়ে যাওয়া হলো আমাদের। যে কোনো সেতুর প্রতি আমার দুর্বলতা ছেলেবেলা থেকেই। যখন দেখেছি কোনো নদীর বুকে দু'কূল জোড়া বন্ধুত্বের বন্ধন কোনো সেতু গড়ে উঠেছে তখনই আমাকে আকৃষ্ট করেছে সেই সেতু।—এ রকম সেতু বহু রয়েছে চীনেতে।

কাজেই এক্ষেত্রেও কোনো ব্যতিক্রম হলো না। তবে এই সেতুর উপরে অনবরত ওঠা এবং নামার ফলে পা আমার অবসন্ন হয়ে পড়েছিলো।

সন্ধ্যায় আই চিং আমাদের নিয়ে গেলেন শহরের সর্বশ্রেষ্ঠ রেস্তোরাঁয়। বাড়িটি বাঁশের কারুকার্য করা, ভালো লাগলো, তার চেয়ে ভালো লেগেছিলো চৎমকার সুস্বাদু চীনা খাবার। ভালো খাবারের যে তিনটি গুণ অত্যাবশ্যক—স্বাদ, সৌরভ ও রং তার সব ক'টিই উপস্থিত ছিলো প্রতিটি খাবারেই। তাছাড়া ভাজা চিংড়ি মাছগুলোকে যখন একের পর এক বড়ো পোর্শিলিন পাত্রে রাখা হচ্ছিল তা থেকে উদ্ভূত অপরূপ এক সঙ্গীতধ্বনি আমার কানে এসে লাগছিলো।

পিকিং-এ আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন তিঙ লিঙ। সাহিত্য-সভা থেকে ইনি মনোনীত হয়েছিলেন জরজে আমাদো ও আমায় অভ্যর্থনার জন্য। আমাদের পুরোনো বন্ধু কবি সিয়াও এমিও তাঁর জার্মান স্ত্রীকে নিয়ে উপস্থিত ছিলেন। বেশ আনন্দময় পরিবেশের সৃষ্টি হলো। মিউজিয়াম, প্যাগোডা, শিল্প-প্রতিষ্ঠান, প্রকাশন সংস্থা প্রভৃতি দেখে বেড়ালাম সকলে মিলে—খুব ভালো লাগলো। আরো ভালো লাগলো চৈনিক-সাহিত্যিকদের বাড়ি-বাড়ি বেড়ানো, সেখানে নিমন্ত্রণ-খাওয়া ; এছাড়া নামী-দামী চাইনিজ রেস্তোরাঁতেও খানাপিনা হলো।

আমার দোভাষীকে খবরের কাগজ পড়ে শোনাতে বলতাম। তিনি তাঁর ভাঙা ভাঙা স্পেনিশ ভাষায় খেত-খামারের খবর, মাও-এর জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলী সহ তাঁর সাঁতারের খবরও শোনাতেন। শুনতে শুনতে সময় সময় তাঁকে থামিয়ে দিয়ে খবরের কাগজের কোনো একটা জায়গা দেখিয়ে বলতাম—এখানটা পড়ে শোনান। এমনিভাবেই এমন একটা খবরে হাত পড়লো যেটা শুনে বিস্মিত হলাম। খবরটি এক রাজনৈতিক বিচারের। খবরে যাঁদের নাম প্রকাশ করা হয়েছে তাঁরা সকলেই আমার খুব পরিচিত।—এঁদের সঙ্গে প্রতিদিনই দেখা হচ্ছে, এঁদের মধ্যে অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যও আছেন! বেশ কিছুকাল যাবৎ এই বিচার চলছে, কিন্তু এ বিষয়ে ওঁদের কাছ থেকে কিছুই আমরা জানতে পারিনি—এমন কি কোনো ক্রমেই ওঁরা বুঝতে দেননি যে, ওঁদের ভবিষ্যৎ পলকা একটি সুতোর উপর ঝুলছে!

যে ফুল ফুটেছিলো তা এখন শুকনো, বাসি। নতুন ফুল ফোটার দিন এসেছে এবং সেই ফুল ফুটছে এখন মাও-এর নির্দেশে। কলে-কারখানায়, বিদ্যালয়-কলেজ-ইউনিভার্সিটী—সব জায়গাতেই মাও বিরাজিত। আদেশ হয়েছে—সর্বক্ষেত্রে দক্ষিণ-পন্থীদের চিহ্নিত করে গ্রেপ্তার করো।—এই আদেশ কার্যকরীও হচ্ছে দ্রুততালে! প্রতিটি চীনা তাঁর প্রতিবেশীর উপর তীক্ষ্ন নজর রেখেছেন যাতে দক্ষিণপন্থী কার্যকলাপ ধরা পড়ে।

কবি তিঙ লিঙ-এর অপরাধ—তিনি চিয়াং কাইশেক-এর সেনাবাহিনীর একজনের প্রতি আসক্ত, কিন্তু এটা বিপ্লবের আগের ঘটনা। বিপ্লবের সময় প্রেমিককে ছেড়ে একটি শিশুপুত্রকে কোলে নিয়ে তিনি ইয়েমেন থেকে লংমার্চ-এ যোগ দিয়েছিলেন,—এতেও অপরাধ মার্জনা করা হয়নি তাঁর। সাহিত্য-সভার সভাপতির পদ থেকে তাঁকে সরানো হয়। এর পর একটি রেস্তোরাঁয় পরিচারিকার কাজ যখন তিনি গর্বের সঙ্গেই করছিলেন তখন এক দূরে দেশের এক রান্নাঘরে তাঁকে বদলি করা হলো। তাঁর সম্বন্ধে

আমার এটাই ছিলো সর্বশেষ খবর। কিন্তু এটা ঠিক যে, তিঙ লিঙ হচ্ছেন সাম্যবাদী চীনা-সাহিত্যের অন্যতম পুরোধা।

সিয়াও এমি-র কি হলো জানি না। তবে আই চিঙের জন্য মনটা খুব খারাপ লাগে। তাঁকে প্রথমে পাঠানো হয়েছিলো গোবি মরুভূমিতে, তারপর লেখার অনুমতি মেলে তাঁর, কিন্তু শর্ত হয় যে, কোনো লেখাতেই নাম ব্যবহার করতে পারবেন না তিনি। আই চিঙ নামটি পৃথিবীখ্যাত, তাই এ আদেশনামা সাহিত্যিকের অপমৃত্যু ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না।

তিক্ত স্বাদ মুখে নিয়ে জরজে আমাদো ব্রেজিলে ফিরে গেলেন। আমিও কয়েক দিন পরে চীন ছাড়লাম।—আমার সে তিক্ততা আজও কাটেনি।

শুখুমির বাঁদর

সোভিয়েত দেশে ফিরে এবার দক্ষিণ সোভিয়েতে যাবার নিমন্ত্রণ পেলাম। ককেশিয়ান পর্বতমালার সানুদেশে ব্ল্যাক-সী—কৃষ্ণ-সাগর তার নীল জামা পরে অভ্যর্থনা জানালো আমাকে। কমলালেবুর গাছ আর তার সৌগন্ধে সমস্ত জায়গাটা ভরপুর।

সোভিয়েত গণতন্ত্রের ছোটো এক প্রদেশ আবখাজিয়ার-এর রাজধানী এই শুখুমি শহরটি। গ্রীক পুরাণে বর্ণিত এই শহর হলো 'কলচিস্' অর্থাৎ সোনালী লোমওয়ালা ভেড়ার মরুভূমি এটা। খ্রীষ্ট জন্মের ছ'শো বছর আগে জেসুন এই ভেড়াগুলি চুরি করতে এসেছিলেন। গ্রীকরা এই দেশের নাম রেখেছিলেন 'ডিওসক্যুরি'। মিউজিয়মে ব্ল্যাক-সীতে পাওয়া বিরাট এক গ্রীক্ প্রস্তরলিপিও দেখেছিলাম।—সেই সব রহস্য আজ আর নেই, তার পরিবর্তে এখন দেখা যায় সহজ সরল আর কর্মঠ কৃষক-শ্রমিকদের। —এঁরা কিন্তু লেনিনগ্রাদের মানুষদের মতো দেখতে নয়।—এখানকার মানুষরা ভিন্ন ধরনের, চলনে বলনে এঁরা স্বতন্ত্র। এঁদের মেয়েদের চোখ আর হাতগুলো অনেকটা ইতালিয়ান ও গ্রীকদের মতো। এই সূর্য-গম আর দ্রাক্ষাকুঞ্জের দেশে ভূমধ্যসাগরের সুর শোনা যায়।

সোভিয়েত ঔপন্যাসিক সিমোনভের সঙ্গে তাঁর বাড়িতেই থাকতাম। ব্ল্যাক-সী-তে সাঁতার কাটতে যেতাম আমরা। সিমোনোভ তাঁর ফলের বাগানে বেড়াতে নিয়ে যেতেন এবং বাগানটির সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত করার জন্য একের পর এক যখন নাম বলতে উদ্যত হতেন ঠিক সেই সেই মুহূর্তেই আমি বলে উঠতাম—এটা চিনি, এটা আমার জানা ইত্যাদি।—চিলিতে এরকম অনেক রয়েছে—এমন কি ওটাও।

ঈষৎ হেসে সিমোনভ যখন আমার দিকে তাকাতেন তখন বলতাম, দুঃখ এই যে—সানতিয়াগোতে আমার বাড়ির বাগানের দ্রাক্ষাকুঞ্জটি কোনোদিনও আপনাকে দেখাতে পারবো না!—এমন সোনা আর কোথাও নেই। চেরী-ফুলের জঙ্গল যদি একবারের জন্যও দেখাতে পারতাম—সুগন্ধী সব গাছের ঘ্রাণ যদি আপনার হৃদয়ে প্রবেশ করতো, একবার যদি আপনি দেখতেন আমাদের দেশের কৃষকরা মেলিপিলা রাস্তার ধারে, বাড়ির ছাদে সোনালী শষ্যকণার বীজ কেমন করে বোনে—তাহলে মুগ্ধ হতে হতো আপনাকে।

আমাদের পবিত্র ইস্‌লানেগ্রার পরিষ্কার আর শীতল জলের স্পর্শ যদি আপনি একবারের জন্যও নিতেন—এক অনাস্বাদিত অনুভূতি ও আনন্দে ভরে উঠতো আপনার হৃদয়। কিন্তু বন্ধু, এক দেশ থেকে আরেক দেশে যাওয়ায় কতো যে বাধা-নিষেধ! —বিরাট প্রাচীরের দু'পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হয় এক দেশের মানুষকে আর এক দেশের মানুষের সঙ্গে মিলনের আশায়। মানুষ আজ রকেট-যাত্রী হয়ে মহাকাশ পরিক্রমা করে আসছে ঠিকই, কিন্তু দুঃখের কথা হচ্ছে—পৃথিবীর অনগ্রসর মানুষদের কাছে বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের মিলনের সুদৃঢ় হার্তাটিকে বাড়িয়ে দিতে অনেকেই কুণ্ঠিত।

আমার কথা শোনার পর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সিমোনভ বলছিলেন, হয়তো একদিন সব কিছুই—মানুষের প্রতি মানুষের সব বাধা-নিষেধই বদলে যাবে! কথা শেষ করে বন্ধু সিমোনভ ছোটো একটা সাদা পাথরের টুকরো তুলে সেটা কৃষ্ণ-সাগরের বুকে ছুঁড়ে মেরেছিলেন।

শুখুমির গর্বের বস্তু তার 'ওষধি গবেষণাগার', গবেষণার কাজে ব্যবহারের জন্য এখানে রাখা আছে নানা জাতের নানান্ রকমের বাঁদর—যাদের উপর দিয়ে চলেছে মানুষের স্নায়বিক আর বংশানুক্রমিক ব্যাধি নির্ণয়ের কাজ।—এদের মধ্যে কোনোটা সাদা, কোনোটা ধূসর—কোনোটা কালো, কোনোটা তামাটে; কোনোটা শান্ত, কোনোটা বা রাগী, কারো কারো আবার একাধিক পত্নী, পুরুষটি নিজের খাওয়া শেষ হলে তবে সে তার পত্নীদের খেতে দিতো। একটা ছোটো স্ত্রী বাঁদরকে দেখলাম—দু'টি বাচ্ছা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে, একটি বাচ্ছা তার পিছন পিছন চলেছে আর অন্যটিকে সে দু'হাত দিয়ে বুকে আঁকড়ে ধরে চলেছে।

গবেষণাগারের অধ্যক্ষ বললেন, যে বাচ্ছাটি দেখছেন ওর বুকে রয়েছে সেটি ওর পালিত-সন্তান। গর্ভজাতটিকে দেখুন পিছনে পিছনে চলেছে। তিনি আরও বললেন, আরও কয়েকটি বাচ্ছাকে ঐ বানরীটি যদি মাতৃ-স্নেহে পালন করে ভালো হয়, কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, আর কোনো বাচ্ছাকেই ও গ্রহণ করেনি।—অন্য সব বাচ্ছাই ওর কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। বানরীটির মনোভাবে বোঝা গেছে জীবনের মৌল নিয়মই শুধু নয়, সমস্ত জননীই যে মূলতঃ এক এই মনোভাবেরও পরিচয় দিয়েছে সে।

আরমেনিয়া

এবারে চলেছি ইতিহাস প্রসিদ্ধ আরমেনিয়াতে। শোনা যায় নোয়ার সেই বিখ্যাত জাহাজটি এখানেই নোঙর ফেলেছিলো, শুরু হয়েছিলো মানুষের বসবাস। পাথুরে দেশ এই আরমেনিয়া, এদেশে আগ্নেয়গিরিও প্রচুর। কঠোর শ্রম আর ত্যাগের বিনিময়েই গড়ে উঠেছে এখানকার সভ্যতা ও স্থাপত্য। এক সময়ে তুর্কী-বর্গীরা এসে প্রায় অবাধেই লুটপাট চালিয়েছিলো এখানে; আর ছিলো তাদের অবর্ণনীয় অত্যাচার—এ সবের স্বাক্ষর এখনও বহন করছে এখানকার প্রতিটি পাথর আর মর্মরস্তূপ, এখনও দেখতে পাওয়া যায় অত্যাচারিত আরমেনিয়ার মানুষের রক্তের দাগ প্রস্তর গাত্রে।

লোক মুখে শোনা যায় আরমেনিয়া নাকি সোভিয়েত সাম্রাজ্যের অধীন, কিন্তু

সোভিয়েতবাসী মানুষ এখানে তেমন একটা নজরে পড়েনি আমার। একদিন গেলাম সোভিয়েতের গড়া বিরাট একটি সুতাকলে, কয়েক হাজার আরমেনিয়ানের সঙ্গে দু'চারজন রাশিয়ান বিশেষজ্ঞকে কাজ করতে দেখলাম। সেভান হ্রদের উপরে রাশিয়ানদের তৈরী বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে গিয়ে অবাক লাগলো। সোভিয়েত সাম্যবাদী সমাজ-ব্যবস্থার যা কিছু উন্নতি তার প্রায় সবই আরমেনিয়াতে পুরোপুরি দেখা গেল। কয়েকজন সাংবাদিক আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—আরমেনিয়ার এতো গীর্জা ও মন্দিরের মধ্যে কোন্‌টি বেশি ভালো লেগেছে আমার।

উত্তরে জানিয়েছিলাম, সেভান হ্রদের উপরে তৈরী জল-বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির কথা। হ্রদের ধারে মন্দিরের মতো মাথা উঁচু করেই সেটি দাঁড়িয়ে রয়েছে।

আরমেনিয়ার সমস্ত শহরের ভিতর যে শহরটি আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছিলো সেটি হচ্ছে এরিভান।—যেন একগুচ্ছ উজ্জ্বল গোলাপ! বিনাকন শহরে বিরাট তারামণ্ডল দেখে আমি সেদিন প্রথম তারামণ্ডলের ভাষা জেনেছিলাম, তারামণ্ডলের কম্পমান বিচ্যুত আলোকরশ্মি দেখে মনে হয়েছিলো যেন আকাশের হৃদস্পন্দনের ধ্বনিকে হৃদ্‌যন্ত্রে মাপা হচ্ছে!

এরিভানের চিড়িয়াখানায় যে প্রাণীটির সঙ্গে আমার পরিচয় হয় তা হচ্ছে চিলির বিরাটকায় শকুন। সে আমাকে দেখলো কিন্তু স্বদেশবাসীকে চেনার জন্য তার কোনো উৎসাহই দেখা গেল না। শুকনো কর্কশ-দৃষ্টি নিয়ে এক পাশে বসে সে শূন্যে তাকিয়ে থাকলো, দেখে মনে হলো—ঘরে ফেরার জন্য সে বুঝি আকুল হয়ে উঠেছে। ঐ চিড়িয়াখানাতেই এক তাপিরকে দেখে বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে তার দিকে তাকিয়ে ছিলাম। এ্যামাজোন থেকে আসা এই জীবটির সঙ্গে আমার দেহগত কি অদ্ভুত মিল! ষাঁড়ের মতো দেহ, তার লম্বা নাকে ভরা মুখের উপরে দু'পাশে ক্ষুদে ক্ষুদে আর জ্বলজ্বলে দু'টি চোখ।—আমি নিশ্চিত যে, আমার সঙ্গে ওর দেহের অমিল কোথাও নেই। এরিভানের তাপিরটিকে পুকুর পাড়ে বসে ঝিমোতে দেখে মনে হলো—যেন হাতে কলম তুলে নেবার আগে কিছু ভাবতে হচ্ছে!—সেই সময়েই চিড়িয়াখানার অধ্যক্ষ এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন তাপিরটির সাঁতার দেখার ইচ্ছে আমার আছে কিনা। বললাম, নিশ্চয়ই। এরপর অধ্যক্ষ মহাশয় পুকুর সংলগ্ন দরজা খুলে দিলেন।—সঙ্গে সঙ্গে তাপিরটি পুকুরের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে কখনও ডুবে কখনও ভেসে ডিগবাজী দিয়ে সাঁতার শুরু করলো সমুদ্র-শুশুকের মতো।

স্বয়ং অধ্যক্ষ সেদিন অবাক হয়েই আমায় বলেছিলেন যে, এর আগে তিনি কোনদিনই তাপিরটিকে এতো খুশি হতে দেখেন নি।

আরমেনিয়ান সাহিত্যিকদের দ্বারা আয়োজিত একটি ধন্যবাদজ্ঞাপক ভোজসভার শেষে ধন্যবাদ জানাতে গিয়ে আমি তাঁদের কাছে আমার দেখা সেদিনকার তাপিরের গল্পটা শুনিয়েছিলাম। বন্যপ্রাণীদের প্রতি আমার আসক্তি ও ভালোবাসার কথা জানাতে গিয়ে বলেছিলাম, আমার জীবনে যেখানে যখনই সুযোগ হয়েছে চিড়িয়াখানা দেখার লোভ আমি কখনও সামলাতে পারিনি।

এর উত্তরে সাহিত্য-সভার সভাপতি সেদিন আমায় বলেছিলেন: 'নেরুদা, চিড়িয়াখানায় কেন যান? আমাদের এই সব সাহিত্য-সংস্কৃতি-সভার মধ্যে আপনি

কি নানান্ বন্যপ্রাণী দেখতে পান না ? এখানেই তো আমরা কেউ সিংহ ! কেউ ব্যাঘ্র ! কেউ বা শেয়াল, আর কেউ বা সীল মাছ ? যদি লক্ষ্য করেন—নেরুদা, দেখতে পাবেন এখানেই রয়েছে ঈগল, সাপ, শকুন—উটের দল আর ম্যাকাও পাখীর কর্কশ চীৎকার।

সুরা ও সংগ্রাম

আরমেনিয়া থেকে ফেরার পথে মস্কোতে থামলাম। সেই মস্কো যেখানে আমার জীবনের অনেক সফল স্বপ্নের বুনিয়াদ গড়ে উঠেছে, সেই শহর—যেখানে আছেন আমার প্রিয়তম অনেক বন্ধু, আর আছেন এই শহরের অধিবাসীরা—কর্মঠ, দক্ষ, এবং ভ্রাতৃত্ববোধে ভরপুর। আমার দেখা সেই সব রাস্তা যেখানে রয়েছে আইসক্রীম, কাগজের ফুল আর পুতুল, আর আছে দোকানের আলোয় ভরা জানলাগুলো—রোজই যেখানে নতুন নতুন সামগ্রী এসে আশ্রয় পাচ্ছে।

আমার প্রিয় বন্ধু ইরেনবুর্গের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তিনি খাওয়ালেন এক দুষ্প্রাপ্য সুরা।—এ ধরনের দুষ্প্রাপ্য বা বিখ্যাত সুরার প্রতি দুর্বলতা আমার চিরকালের। প্রতিটি দেশ প্রতিটি শহরেই দুষ্প্রাপ্য সুরার প্রতি এই দুর্বলতা আমায় লোভী করে তুলতো।—এর একটা কারণ মনে হয় আমার পূর্ব-পুরুষদের প্রায় সকলেরই ছিলো আঙুর-চাষ, সেই আঙুরে তৈরি হতো নানান্ রকমের সুরা আর সেই সুরা স্বাদে গন্ধে বর্ণে এমন কি নামেও বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়ে উঠতো।

প্যারীতে এ্যারাগোঁ আর এল্সা এ্যয়োলের বাড়িতেও সুরার স্বাদ উপলব্ধি করেছিলাম—এই সুরার নাম ছিলো ম্যতোঁ রথস্চাইল্ড।—এই সুরা তৈরি হতো এক অভিজাত গৃহীর বাড়িতে, তৈরি হতো কেবল নিজেদের জন্যই।—বোতল খুলতে খুলতে এ্যারাগোঁ বলেছিলেন—'এই সবে মাত্র এটি পেয়েছি এবং তোমার জন্যই খুললাম।' তারপরে এর্যাগোঁর কাছে সেই সুরার গল্প শুনলাম। সুবিখ্যাত কবি এ্যারাগোঁ ছিলেন ফরাসীবাহিনীর একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, এছাড়াও তিনি সে দেশের স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীর প্রধান। জার্মানবাহিনী তখন ফরাসী-সীমান্ত পেরিয়েছে। তিনি একদল স্বেচ্ছাসেবীর সঙ্গে স্থানীয় একটি বাড়িতে যখন প্রবেশ করছিলেন সেই সময়ে সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন কাউন্ত আলফোঁ্যাসেঁ দ্য রথস্চাইল্ড তাঁর পথরোধ করলেন, বললেন—'আর এগোবেন না ! জার্মানবাহিনী এগিয়ে আসছে।' আলফোঁ্যাসেঁর বাধাদানের উত্তরে এ্যারাগোঁ বললেন—'আমার ওপরে আদেশ আছে সামনের ঐ বাড়িতে যাবার জন্য।'

ক্যাপ্টেন বললেন, 'আমার আদেশ—যেখানে আছেন সেখানেই থাকুন, আর একটুও এগোবেন না।'

কবি এ্যারাগোঁর দৃঢ়চেতা মনটিকে আমি ভালোভাবেই চিনতাম। দেখা গেল ওঁদের দুজনের মধ্যে বেশ বাক্যুদ্ধ লেগে গেছে ! একজন বাধা দিচ্ছেন অন্যজন তা মানতে রাজী নয়। কিন্তু এ যুদ্ধের অবসান শীঘ্রই হয়ে গেল জার্মানবাহিনীর মর্টারের আঘাতে—ধূলিসাৎ হয়ে গেল সেই বিতর্কিত বাড়িটি।

ক্যাপ্টেন আলফোঁসেকে ধন্যবাদ—তাঁর তৎপরতায় সে যাত্রায় রক্ষা পেয়েছিলেন ফ্রান্সের প্রথম যোদ্ধা কবি এ্যারাগোঁ এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীরা।—এবং সেই নির্দিষ্ট দিনটির স্মরণেই ঐ বিশেষ সুরার বোতলটি কবির কাছে এসেছিলো প্রতিবারের মতোই রথস্‌চাইল্ডের ভাণ্ডার থেকে।

এখন আমি কবি ইরেনবুর্গের বাড়িতে বসে আরো এক নতুন জাতের দুষ্প্রাপ্য সুরা পান করছি।—এরও ইতিহাস আছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কয়েক মাস পরেই শোনা গেল যে, রেড আর্মি অধিকৃত গোয়েবলসের পানশালার বিশেষ সুরার বোতলগুলি শীঘ্রই বিক্রীর ব্যবস্থা হবে। রাজনীতিক সমতাবাদী সমাজব্যবস্থার প্রথানুসারে দুষ্প্রাপ্য ফরাসী মদ মস্কোর মদের দোকানগুলি থেকে বিক্রী হতে শুরু করলো রাশিয়ার দামেই। অনেকেই লাইনে দাঁড়িয়ে একটি করে বোতল কিনলো। সুরা-রসিক ইরেনবুর্গও তাঁর পরিবারের সকলের জন্য কয়েক বোতল ঐ দুষ্প্রাপ্য বস্তু কিনেছিলেন। আজ গোয়েবলসের পানশালায় সেই দুষ্প্রাপ্য ফরাসী সুরা আমি ও আমার বন্ধু—দু'জনেই কবিতা ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জয়ের সম্মানে পান করে চলেছি।

পুনঃ অধিকৃত প্রাসাদ

বিশেষ বিত্তবানদের প্রাসাদে কোনো রকম নিমন্ত্রণ আমার কপালে কোনোদিন জোটেনি। চিলির প্রাসাদোপম বাড়িগুলির মধ্যে অনেক বাড়িই নীলাম হতে দেখেছি। এখানকার সাধারণ মানুষ অবশ্য ঐ সব প্রাসাদের আসবাব আর শিল্পবস্তুর তেমন সমঝদার ছিলেন না। নীলামের সময় তাঁরা বেশিরভাগ সময়েই অবাক হয়ে কেবল দেখতেন প্রাসাদস্থিত ক্রুশবিদ্ধ যীশুর ছবি, বড়ো বড়ো প্রতিকৃতি, বিভিন্ন চিত্রাবলী; আর মাঝে মধ্যে আঙুল দিয়ে স্পর্শ করে দেখতেন রুপোর কাঁটা-চামচ ও টুকিটাকী সামগ্রী। এরপরে বিক্রী হয়ে যাওয়া প্রাসাদগুলি ভাঙা হলে দেখতেন কুলিদের মাথায় করে নিয়ে যাওয়া এক একটি প্রাসাদের চোখ অর্থাৎ জানলা-দরজা, তার নাড়িভুঁড়ি অর্থাৎ সিঁড়ি আর পা—মেঝের বস্তুগুলি।—য়ুরোপে আবার উল্টো ব্যাপার ঘটে, সেখানের বড়ো বড়ো বাড়ি, প্রাসাদ, ম্যানসন দেনার দায়ে বিকিয়ে গেলেও সেগুলি স্মৃতিসৌধ হিসাবে বজায় রাখা হয়।—এই ধরনের স্মৃতিসৌধগুলি মাঝে মাঝে দেখতে যেতাম, গিয়ে দেখতাম কতো ডিউক আর তাঁদের পত্নীদের প্রতিকৃতি, দেখেছি রং-বেরঙের অজস্র চিত্রাবলী। আবার অনেক বাড়ি বা প্রাসাদের গুপ্ত কক্ষে দেখেছি অপরাধমূলক চিত্ররাজী। অনেক অনেক দেওয়ালে দেখতে পেয়েছি নোংরামির অনেক চিহ্ন। আরও দেখেছি কোনো কোনো বাড়ির কক্ষে কক্ষে ভবিষ্যৎ মানুষদের জন্য সঞ্চিত কতো না বিকৃত-আলাপনীর ইতিহাস।

রুমানিয়ান সাহিত্যিক সংস্থার অফিসটি গড়ে তোলা হয়েছে ট্র্যানসেলভিয়ান জঙ্গলের মাঝে মনোরম পরিবেশযুক্ত এক বাগান-বাড়িতে। নিমন্ত্রণ উপলক্ষে সেখানে গিয়ে শুনেছি বাড়িটি ছিলো রাজা ক্যারলের প্রাসাদ। কিংবদন্তি-চরিত্র রাজা ক্যারল

রাজ-রক্তের বাইরে বহু প্রণয়ের অধিকারী হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিলেন। সেই রাতটিতে মহারাণীর পরিত্যক্ত বিছানায় ঘুমিয়েছিলাম আমি। পরদিন সকালে রুমানিয়ান সাহিত্যিকদের সঙ্গে জঙ্গলটিতে বেড়াতে বেড়াতে ছোটো-বড়ো আরো কিছু প্রাসাদ এবং কোনো কোনো প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দেখেছিলাম। ফ্যাসিবাদী সম্রাটের সঙ্গে সংগ্রামে জয়ী হয়ে মুক্ত রুমানিয়ার কবিরা এখন সেখানে কবিতা লিখে, সাম্যের গান গেয়ে আনন্দ আর প্রাণচাঞ্চল্যের জোয়ার তুলেছেন—সেই জোয়ারের স্রোতে আমিও সেদিন গা ভাসিয়েছিলাম।

আমার দেখা আর একটি প্রাসাদের গল্প বললাম রুমানিয়ান সাহিত্যিকদের কাছে সেদিন, মাদ্রিদে যুদ্ধের সময়ে দেখা লিবিয়ার প্রাসাদ সেটি। হাতে স্বস্তিক চিহ্ন আর সঙ্গে মুরবাহিনী নিয়ে স্পেনের লক্ষ লক্ষ মানুষকে খুন করতে করতে ফ্রাংকো মাদ্রিদ শহরে পেঁছেই এই প্রাসাদটি দখল করেন। ১৯৩৪-৩৫ সালে আরগুলিয়েসের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অনেকবার ঐ প্রাসাদটিকে আমি দেখেছিলাম। যুদ্ধ লাগার পরেই এলবার ডিউক পত্নী সহ সমস্ত মূল্যবান সম্পত্তি নিয়ে ইংলন্ডে পালিয়েছিলেন এবং সেখানেই থেকে যান—আর ফিরে আসেন নি।

রুমানিয়ান সাহিত্যিক বন্ধুদের সেদিন কনফুসিয়াসের গল্পও শুনিয়েছিলাম আমি। চীন বিপ্লবের পর কনফুসিয়াসের শেষ উত্তরাধিকারী—যিনি মন্দির আর এই মৃত দার্শনিকের হাড় বিক্রী করে প্রচুর মুনাফা লুটেছিলেন—তাঁকেও কনফুসিয়াসের প্রাসাদ ছেড়ে ফরমোসায় পালিয়ে যেতে হয়েছিলো। যাবার সময় অমূল্য চিত্রাবলী, চীনামাটির কারু-খচিত নানান্ আসবাব-পত্তর—এমন কি মৃত দার্শনিকের শেষ ক'টি অস্থিকেও সঙ্গে নিয়ে নিয়েছিলেন। শোনা যায় ওখানেও তিনি দর্শনী বাবদ মুদ্রা উপায় করে বহাল তবিয়তেই রয়েছেন।

সেদিন, আমার মনে আছে—ফ্রাংকো যখন মুর সৈন্যদের নিয়ে মাদ্রিদে উপস্থিত হয়েছিলেন তখন স্পেন থেকে সারা পৃথিবীতে বেতার মারফৎ যে মিথ্যা বিবরণী বার বার প্রচার করা হচ্ছিল তা হচ্ছে—'এলবার ডিউকের ঐতিহাসিক প্রাসাদ কম্যুনিস্টরা লুট করেছে, আমরা সেই অমূল্য সম্পদ্ বাঁচাতে এগিয়ে চলেছি—।'

গিয়েছিলাম সেই প্রাসাদ দেখতে। প্রহরারত সামরিকবাহিনীর লোক আমায় জানালেন পা মুছে ভিতরে যাবার জন্য। ঘরে ঢুকে মেঝেতে পা দিতেই মনে হলো—লক্ষ লক্ষ আয়নার বুকের উপর আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি। ঝকমকে দেয়ালগুলির সবটাই প্রায় ফাঁকা—শোনা গেল ডিউক পালবার আগে অমূল্য সব চিত্রগুলি নিয়ে গেছেন। রেখে গেছেন সব ঘর ভর্তি নানান্ ধরনের নানান্ রকমের হাজার হাজার জুতো। ছাদ থেকে মেঝে পর্যন্ত বিরাট বিরাট আলমারী ভর্তি জুতো—এতো জুতো আমি আগে কখনও দেখিনি। জুতো স্পর্শ করা বারণ—সঙ্গে সঙ্গে রক্ষীদের হুংকার—'ছোঁবেন না—ওগুলি সভ্যতা ও সংস্কৃতির ঐতিহাসিক নিদর্শন, ওগুলির গায়ে হাত দেবেন না!' তখনই আমার মনে হলো—সুদূর তুষারাবৃত কোন্ পাহাড়ের সানুদেশে ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে মাটি আর তুষারস্তূপের মধ্যে পড়ে থাকা নগ্নপদ দরিদ্র যুবকদের মৃতদেহ।

ডিউকের পরিত্যক্ত শয্যাপাশ্বে' হঠাৎ চোখে পড়লো 'রাড্ইয়ার্ড কিপলিঙ'-এর একটি

কবিতা। যতদূর মনে পড়ে কবিতাটির নাম ছিলো 'যদি।' 'রাডইয়ার্ড কিপলিঙ' বা 'রিডারস্ ডাইজেস্ট'-এর কিপলিঙ-এর বোধশক্তিটা প্রায় ক্ষেত্রেই আমার কাছে ডিউকের ওই পরিত্যক্ত জুতোর মতই মনে হয়েছে যদিও আমার এই উক্তির জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কাছে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

ঘুরতে ঘুরতে ডিউক-পত্নীর স্নান-ঘরও দেখলাম। বিরাট রাজহাঁসের মূর্তি শোভিত 'বাথ-টব'টির দিকে তাকিয়ে কেমন একটা নোংরা বিস্বাদ অনুভূত হয়েছিলো।

প্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে আসার সময় নিজেকে প্রতারিত মনে হয়েছিলো। সেদিনের একটি মাত্র ঘটনার ছাপ আমার মনে চিরদিনের জন্য দাগ রেখে গিয়েছিলো। আমি প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে আসার পর প্রাসাদের রক্ষী ও ভৃত্যরা প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশজন মিলে আমাকে খাওয়ালেন—ওঁরা কেমন করে জানি না সেদিন বুঝতে পেরেছিলেন আমি ওঁদেরই এক আপনজন।

এর এক সপ্তাহ পরে জার্মানরা বিমান থেকে চারটি আগুনে-বোমা লিরা-প্রাসাদের উপরে ফেললো। আমার বাড়ির বারান্দা থেকে প্রাসাদের অন্তিম মুহূর্ত প্রত্যক্ষ করলাম।

রুমানিয়ান সাহিত্যিকদের এই গল্প শোনানোর সময় বলেছিলাম—'আমি যখন অপরাহ্নে সেই ধ্বংসস্তূপের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম তখন দেখলাম কয়েকজন রক্ষী ও ভৃত্য এবং সাদা একজোড়া ভাল্লুকের মূর্তি ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। অতি সুন্দর এই ভাল্লুকের মূর্তি দু'টি ধ্বংসস্তূপের মধ্যে যেন হাত দুটোকে সামনে মেলে দিয়ে প্রাসাদের বাগানে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়েছিলো।

মহাকাশচারীর যুগ

আবার মস্কো। ৭ই নভেম্বরের সকাল। সুশৃঙ্খল সারিবদ্ধ মিছিল চলেছে রেড স্কোয়ারে। অসীম শূন্য থেকে পৃথিবীর বুকে এগিয়ে চলা এই মিছিলটির উপরে যাঁর দু'জোড়া চোখের ভালোবাসার দৃষ্টি এসে পড়ছিলো তিনি হলেন অমর লেনিন আর ভ্লাদিমির ইলিয়েচ উলিয়ানোভ। এই ধরনের মিছিলের সঙ্গে এই প্রথম চলেছে আণবিক ক্ষেপণাস্ত্র। অস্ত্রটিকে দেখে মনে হচ্ছিল বেশ বড়ো মাপের একটি চুরুট কিন্তু কি অপরিসীম ক্ষমতাই না রয়েছে এই অস্ত্রটির মধ্যে!—এটি এক গ্রহে অবস্থান করে আর এক গ্রহকে সহজেই ধ্বংস করতে পারে।

আজ সেই দিন, প্রথম মহাকাশচারী দু'জনকে সম্মান জানানোর দিন। আমার কবি মন কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে উঠেছিলো এই ভেবে যে, দু'টি পাখী আকাশ পরিক্রমা শেষে নীড়ে ফিরেছে। ককেশাশ পর্বত শ্রেণীর মধ্যে চিলির পাখিদের উড়ে যেতে দেখেছি কতদিন। আর আজ বিশেষ দু'টি সোভিয়েত পাখী বিশ্ববাসীকে বিস্ময়ে হতবাক করে নভোলোকে বেড়িয়ে সেখানকার অজানা অনেক খবর নিয়ে ফিরে এসেছে তাদের মাতৃসমা পৃথিবীর বুকে। সমগ্র সোভিয়েত জাতির পক্ষ থেকে সেই দুই বীরকে সম্বর্ধনা জানালেন মহান নেতা নিকিতা ক্রুশ্চভ। গর্বে দেশবাসীর বুক ফুলে উঠলো,

আনন্দাশ্রু দেখা দিলো অনেকের চোখে। এরপর মহাকাশচারীদ্বয়ের সঙ্গে আবার দেখা হলো 'সেণ্ট জর্জ' হলে। দু'জনের মধ্যে কনিষ্ঠ শ্রীখারমেন টিটোভের সঙ্গে পরিচয় হবার পর সাগ্রহে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম—'বলুন তো, নভোলোকের বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহের মধ্য দিয়ে যখন পৃথিবীকে দেখছিলেন তখন চিলি দেশটা আপনাদের দৃষ্টিতে পড়েছিলো কিনা?'—ভেবেছিলাম আমার প্রশ্ন শুনে তিনি হাসবেন হয়তো। কিন্তু না, তিনি অতি সরলভাবেই বললেন—'হলুদে রঙের বেশ উঁচু উঁচু কতকগুলো পাহাড় দেখেছিলাম মনে হচ্ছে দক্ষিণ আমেরিকার দিকে,—ওটাই হয়তো আপনার দেশ চিলি হবে।'

উত্তরটি শুনে আমার সমস্ত শরীর সেদিন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিলো—চীৎকার করে বলে উঠেছিলাম—'ঠিক। ঠিকই বলেছেন কমরেড্—ওটাই আমার দেশ—আমার জন্মভূমি 'চিলি'।'

বিপ্লবপূর্তির চল্লিশতম উৎসবের দিনে আমি মস্কো শহর ছেড়ে ট্রেনে করে ফিনল্যাণ্ডের উদ্দেশে রওনা হলাম। ট্রেনে যাবার সময় রাত্রে দেখলাম সমস্ত আকাশ জুড়ে নানান রঙ-এর হাউই বাজির খেলা—মনে হলো বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের জন্য যেন হাতছানি দিয়ে সারা পৃথিবীকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে বাজিগুলি।

গোটেনবার্গ থেকে জাহাজে উঠলাম আমেরিকা রওনা হওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে। যদিও ক্রজিল্লো ও সামোজা আমাদের যাওয়ার পথ রোধ করার জন্য বহু চেষ্টাই করেছিলেন, তবু আমরা শেষ পর্যন্ত ভালপারাইসোয় পেঁছিতে পেরেছিলাম।

ভালপারাইসোয় পেঁছানর পর সেদিন কে জানতো যে, যে মানুষটি জাহাজে আমার কেবিনের দরজায় ধাক্কা দিয়ে আমার ঘুম ভাঙাবেন তিনি হচ্ছেন সোভিয়েত ঔপন্যাসিক সিমোনভ—যাঁকে আমি আসার সময় 'ব্ল্যাক সী'তে সাঁতার দিতে দেখে এসেছিলাম।

১১

আমার পেশা কবিতা

কবিতার ক্ষমতা

আমাদের এই যুগটা অর্থাৎ যে যুগে যুদ্ধ-বিপ্লব এবং সমাজ-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন—অনেক কিছুই ঘটেছে বা এখনও অনেক কিছুই ঘটতে চলেছে এমন একটা সময়কে কবিতার স্বর্ণযুগ বললে বোধকরি বেশি বলা হয় না, এরকম অবস্থা অনেক কবিকেই বোধহয় এর আগে দেখতে হয়নি—বর্তমানের কবিরা যা নিয়ত প্রত্যক্ষ করছেন। পৃথিবীর সাধারণ ও দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ আজ কোনো না কোনো প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন এবং সেই সকল প্রতিকূলতার প্রতিবাদ ধ্বনিত হচ্ছে এখনকার অনেক কবিতায় আর মিছিলে।

আমি যখন আমার প্রথম কবিতার বইটি লিখেছিলাম তখন ভাবতেই পারিনি যে, রাস্তাঘাটে, কলে-কারখানায়, গ্রামে-গঞ্জে, শহরে, থিয়েটারে, সভাসমিতি কিম্বা প্রায় প্রতিটি প্রতিবাদ সভায় আমার কবিতা আমাকেই পাঠ করতে হবে—শোনাতে হবে সাধারণ মানুষের কাছে। আমার দেশ চিলির সর্বত্রই ছুটে যেতে হয়েছে আমাকে—আমার দেশবাসীর কাছে আমার কবিতার বীজ ছড়াবার জন্য।

ভেগা সেণ্ট্রালের একটি ঘটনার কথা এই প্রসঙ্গে জানাচ্ছি। ভেগা সেণ্ট্রাল সানতিয়াগো হচ্ছে চিলির সবচেয়ে বড়ো বাজার। সারা পৃথিবীর অনেক কিছুই এই বাজারে কেনা-বেচা হয়। সব সময়েই বাজার সরগরম থাকে। বাজার-শ্রমিকদের বিরাট ইউনিয়নও আছে। বেশিরভাগ শ্রমিকই দরিদ্র।—এঁদের পায়ে জুতো জোটে না বললেই চলে, অর্ধভুক্ত অবস্থায় কোনরকমে এঁদের দিন কাটে। এঁদেরই কয়েকজন একটি গাড়ি যোগাড় করে আমার কাছে এলেন, বললেন ওঁদের সঙ্গে যেতে। কোনো কৈফিয়ৎ ব্যতিরেকেই গাড়িতে উঠলাম। 'আমার হৃদয় জোড়া স্পেন' কবিতার বইটি আমার পকেটেই ছিলো। কিছুদূর যাবার পর সঙ্গীদের মধ্যে একজন বললেন—ভেগা সেণ্ট্রালে বাজার কর্মচারী সমিতিতে কবিতা পাঠ করে শোনাতে হবে। কিছুক্ষণ পরে নির্দিষ্ট জায়গায় পেঁছে ভাঙাচোরা এক বাড়ির স্যাঁতসেঁতে ছোটো একটি ঘরে প্রবেশ করতেই হাড়-কাঁপানো শীতে আমার সারা শরীরটা আহত সিম্ফনির মতো কেঁপে উঠলো। ঘরের ভিতরের ভাঙা টেবিল এবং সেই টেবিলের চারপাশে কাঠ আর ভাঙা বেঞ্চিগুলিতে দেখলাম প্রায় জনাপঞ্চাশেক মানুষ সাগ্রহে অপেক্ষা করছেন আমার জন্য, আমার কবিতা শোনার জন্য। এঁদের কারোর গায়েই গোটা একটা জামা দেখতে পেলাম না! দেখলাম কারুর গায়ে রয়েছে আধ-ছেঁড়া পাতলা শার্ট, কেউবা জুলাই মাসের চিলির প্রচণ্ড ঠাণ্ডাকে উপেক্ষা করে দিব্যি খালি গায়ে রয়েছেন, কেউ কেউ আবার ছেঁড়া চট গায়ে জড়িয়েছেন। চিলির যা বৈশিষ্ট্য কয়লার মতো কালো চোখ, সেই সব কালো চোখের দৃষ্টি আমার উপর নিবদ্ধ। আমার লাফারতের কথা মনে পড়ে গেল। একবার একটি রসায়নাগারের শ্রমিক-অফিসে কবিতা পড়তে গিয়ে দেখেছিলাম এমনি কয়েকশো চোখের প্রায় অপলক দৃষ্টি আমার উপরে নিবদ্ধ, এমন কি তাঁদের মুখমণ্ডলের পেশিগুলি পর্যন্ত অচঞ্চল! লাফারতে সেদিন আমাকে বলেছিলেন—'দেখ, দূরে থামের পাশে ওই যে দু'জোড়া চোখ দেখা যাচ্ছে—ওঁরা মুসলমান। তোমার কবিতা যেন তপ্ত মরুভূমির মতো ওঁদের মনকে স্পর্শ করতে পারে!' কিন্তু আজ! আজ এই অর্ধভুক, অর্ধনগ্ন শ্রমিকদের আমি কোন্ কবিতা শোনাবো? আমার সংগ্রামী জীবনের কোন্ ঘটনার ব্যাখ্যা এখানে আমি করবো। শেষ পর্যন্ত পকেটে করে আনা আমার কবিতার বইটি বার করে তাঁদের বললাম—এই সদ্য সদ্য আমি স্পেন থেকে ফিরেছি—সেখানে অনেক যুদ্ধ আর অসংখ্য মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করে এসেছি। স্পেনের এই ব্যথাতুর সংগ্রামী মুহূর্তের উপরে আমি যে কবিতাগুলি লিখেছি তারই কিছু কিছু আপনাদের পড়ে শোনাচ্ছি।—আমার এই কবিতার বইটিতে অনেক কবিতাই আমার নিজের কাছেও দুর্বোধ্য ছিলো—কারণ তীব্র ব্যথার মুহূর্তেই বেশির ভাগ কবিতাই রচিত। তাই ঠিক করলাম কিছুটা অদল-বদল করে কিছু কবিতা পাঠ করে তাড়াতাড়ি বিদায় নেবো।

শুরু করলাম কবিতা-পাঠ। সুগম্ভীর নীরবতা ও পলকহীন চোখের দৃষ্টি আমায় যেন হঠাৎ জানিয়ে দিলো আমি ওঁদের হৃদয়ে প্রবেশ করতে পেরেছি। কবিতার পর কবিতা পড়ার সময় হঠাৎই এক সময়ে আমার কবিতার শব্দগুলি আমার নিজেরই কানে আঘাত করতে শুরু করলো। সেদিন মনে হয়েছিলো অদৃশ্য এক চুম্বকশক্তি দিয়ে আমি ও আমার হতভাগ্য শ্রোতার দল কখন যেন একাত্ম হয়ে গেছি।

প্রায় একঘণ্টা পরে কবিতা পাঠ শেষ করে যখন বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে উঠতে যাচ্ছি, এমন সময় চটের থলি গায়ে পরা শ্রমিকটি উঠে এসে আমায় বলেছিলেন, 'ধন্যবাদ পাবলো, আপনাকে অনেক—অনেক, ধন্যবাদ—কবিতার দ্বারা এমন সম্মোহিত আমরা কখনও হইনি।' বলেই তিনি কাঁদতে শুরু করলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মধ্যে আরো কয়েকটি কান্নার আওয়াজ আমার কানে এলো। ভেজা চোখের পাতা আর কর্কশ হাতের সঙ্গে হাত মিলিয়ে পথে নামলাম।

আগুন আর বরফের এই পরীক্ষার শেষে কোনো কবি কি আর স্থির হয়ে বসে থাকতে পারেন?

যখনই 'তিনা মদত্তি'কে মনে করার চেষ্টা করি তখনই আমার মনে হয়—আমি যেন এক আঁজলা কুয়াশা অতি কষ্টে কুড়িয়ে নিলাম। ও যে কি তা কখনও চিনি নি! দীর্ঘায়ত কালো দু'টি চোখ, মাথায় পশমের মতো চুলগুলি ঘাড়ের কাছে গোল করে বাঁধা। দৃষ্টিটা ছিলো ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত।

দিয়েগো রিভেরা তাঁর এক মুরালে তিনার সেই মনোমুগ্ধকর ভাবটি ফোটাতে গিয়ে উদ্ভিদ আর লতাগুল্ম দিয়ে তাঁর মাথার মুকুট আর ধানের শীষ দিয়ে বর্শাফলক এঁকেছিলেন।

ইতালিয়ান বিপ্লবী এই যুবতীটি কাঁধে ক্যামেরা ঝুলিয়ে সোভিয়েত দেশে গিয়েছিলেন—সেখানকার পর্বতমালা, বন্যপ্রাণী আর পুষ্পরাজির ছবি তুলতে। কিন্তু সে দেশের সমাজতন্ত্র, মার্কসীয় দর্শন, সাম্যবাদ এবং সেখানকার সমাজব্যবস্থা তাঁকে এমনভাবে মুগ্ধ করলো যে, তিনি ক্যামেরাটি মস্কোর নদীর জলে ফেলে দিয়ে কম্যুনিস্ট পার্টীর একজন সক্রিয় সভ্য হয়ে সাম্যবাদ প্রচারে মেতে উঠলেন। তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় মেক্সিকোয়, তখন সেখানে তিনি পার্টীর কাজে ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু একদিন রাত্রে তাঁর মৃত্যু সংবাদ আমায় অত্যন্ত শোকাহত করে। কার্লোস বাহিনীর কমাণ্ডেণ্ট ভিত্তোরিও ভিদালি ছিলেন তিনা মদত্তির স্বামী।

১৯৪১ সাল। তিনা মদত্তি রাত্রে বাড়ি ফেরার সময় হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে ট্যাক্সির মধ্যেই মারা যান। তিনি অবশ্য জানতেন যে, তাঁর হৃদ্‌যন্ত্রের অবস্থা মোটেই সুবিধার নয়, কিন্তু পাছে এর জন্য তাঁর বিপ্লবী কাজ করার পথে বাধার সৃষ্টি হয় সেই জন্য কাউকেই তিনি এই রোগের কথা বলেন নি। সব সময়েই সব রকমের কাজ করার জন্য তিনি প্রস্তুত থাকতেন। স্প্যানিশ-গৃহযুদ্ধে তাঁকে আহত বিপ্লবী সেনাদের সেবা করতে দেখেছিলাম। কিউবার বিখ্যাত যুবনেতা বিপ্লবী জুলিও এন্তনিও মেলার সঙ্গে মেক্সিকোতে অবস্থানকালে তিনাকে এক হৃদয়বিদারক ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়েছিলো। কিউবাতে তখন অত্যাচারী জেরারডো মাচাদোর শাসন চলছে। তিনি হাভানা থেকে কয়েকজন ভাড়াটে গুণ্ডা পাঠালেন মেক্সিকোতে—জুলিও এন্তনিও মেলাকে খুন করার জন্য। তিনা ও মেলা এক সন্ধ্যায় সিনেমা দেখে ফিরছিলেন। দু'জনে হাত ধরাধরি করে যখন হাঁটছিলেন তখন হঠাৎ এক ঝাঁক গুলি এসে মেলার দেহটিকে ঝাঁঝরা করে দিলো। দু'জনেই উপুড় হয়ে রাস্তায় পড়ে

গেলেন। তিনার কোলে মেলার মৃতদেহ এবং মেলার রক্ত তাঁর সর্বাঙ্গে। আততায়ীরা তৎক্ষণাৎ নিখোঁজ। পুলিসের তৎপরতায়ই আততায়ীরা নিরাপদে পালাতে পেরেছিলো। তবে মজার কথা এই যে, পুলিসের তরফ থেকে মেলার মৃত্যুর জন্য তিনাকেই দায়ী করা হয়েছিলো।

দীর্ঘ বারোটি বছরের অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে তিনার প্রাণশক্তি প্রায় ফুরিয়ে এসেছিলো। এরই ফলস্বরূপ এক রাতে ট্যাক্সির মধ্যে তাঁর প্রাণবায়ু একেবারেই নিঃশেষ হয়ে গেল। মেলার মৃত্যুর মতোই মেক্সিকোর প্রতিক্রিয়াশীলগোষ্ঠী তিনার মৃত্যুকেও কলঙ্কিত করতে কসুর করেনি।

সেদিন আমি ও তিনার স্বামী কম্যাণ্ডণ্ট কারলোস তিনার মোমের মতো শরীরটা যখন কফিনে তুলে দিচ্ছিলাম তখন আমরা গভীর শোক ও কান্নায় ভেঙে পড়েছিলাম। এ সেই শোক যা পৃথিবীর কোনো কিছুকেই কলঙ্কিত করে না—যা শোকাহত মানুষের অস্ফুট চীৎকারকে সিংহ-নিনাদে ভরিয়ে তোলে।

পরের দিন বুর্জোয়া সব খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় অনেক রকমের নোংরামি জুড়ে দিয়ে আদিরসাত্মক পরিভাষায় তিনার মৃত্যু সংবাদ ছাপা হয়েছিলো।—সস্তা আদিরসাত্মক ভাষায় যা কিছু লেখা যায় সে চেষ্টার ত্রুটি হয়নি। কোনো কাগজ লিখলো: 'মস্কোর রহস্যময়ী নারীর রহস্যজনক মৃত্যু।' কোনো কাগজে লেখা হলো: 'মেয়েটি মরলো, কেন না মেয়েটি অনেক কিছু জানতো।' ইত্যাদি ইত্যাদি। —এ সমস্ত খবর পড়ে স্থির থাকতে পারলাম না, ঠিক করলাম কারলোসের এই দুঃসময়ে কিছু একটা আমাকে করতেই হবে। তাই লিখলাম একটি কবিতা—মদাত্তির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে যে সকল কাগজ কলঙ্ক ছড়াচ্ছে তাদের জন্য। সত্য সহ জোরালো প্রতিবাদপূর্ণ ঐ কবিতাটি কলঙ্কলেপনকারী কাগজগুলির সম্পাদকদের কাছে পাঠালাম। যদিও জানতাম—আমার এই কবিতা কোনো কাগজেই ছাপা হবে না, কিন্তু আশ্চর্য—কবিতাটি পাঠানোর পরদিনই দেখলাম তিনার কুৎসার পরিবর্তে আমার কবিতা অনেক কাগজেই প্রকাশিত হয়েছে—সবগুলিরই প্রথম পৃষ্ঠায়। কবিতাটির নাম দিয়েছিলাম: 'তিনা মদাত্তি আজ মৃত'। তিনাকে সমাধিস্থ করার সময়েও এই কবিতা পাঠ করেছিলাম, তাঁর কফিনের ফলকে আজও লেখা রয়েছে কবিতাটি। এরপর মেক্সিকোর কোনো কাগজেই আর তিনার উপরে কোনো বিরূপ মন্তব্য বের হয়নি।

বেশ কয়েক বছর আগে লোটায় গিয়েছিলাম সেখানকার কয়েক হাজার শ্রমিকের আমন্ত্রণে—কবিতা শোনাতে। দারিদ্র্য অবহেলা আর অত্যাচারই হচ্ছে লোটা-খনি শ্রমিকদের নিত্যসঙ্গী। রাজনীতিকদের গালভর্তি আশ্বাস শুনে শুনে দারিদ্র্য ও অবিচারের সঙ্গে ঐ সকল শ্রমিক এক সখ্যের সম্বন্ধকে স্বীকার করে নিয়েছেন। সামনে সমুদ্র তারপরেই টানেল—সেই দেওয়ালের পাশে অন্ধকারের ভিতর নীরবে তাঁদের কাজ করেন ঐ সকল শ্রমিক একমুঠো গ্রাসাচ্ছাদনের আশা নিয়ে। সেদিন ভরদুপুরে তাঁরা সবাই জড়ো হলেন আমার কবিতা শোনার জন্য। উঁচু

পাটাতনটিতে দাঁড়িয়ে দেখলাম কয়লা-কালো পোশাক আর খনির কাজের সময় ব্যবহৃত টুপী পরা হাজার কয়েক খনি-শ্রমিক আগ্রহ সহকারে অপেক্ষা করছেন আমার কবিতা শোনার জন্য। যে কবিতাটি পাঠ করবো তার নামটি (নতুন প্রেম : স্তালিনগ্রাদের জন্য একটি গান) জানানো মাত্রই এক অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটলো—শুরু হলো অকল্পনীয় এক অনুষ্ঠান পর্ব যা ভুলবার নয়। আমার এবং আমার কবিতাটির নাম শুনেই মাথা থেকে তাঁরা টুপীগুলি খুলে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কবিতা-পাঠ শেষে আমি বেশ বুঝতে পারলাম যে, কবিতাটি তাঁদের হৃদয়কে স্পর্শ করতে পেরেছে। কবিতা পাঠের তালে-তালে নিঃশব্দ প্রতিজ্ঞায় তারই স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছিলো কয়েক হাজার মুষ্টিবদ্ধ হাতের ওঠা নামার মাঝে।—আমার কবিতা নবজন্ম লাভ করলো। সংগ্রাম ও মুক্তির শপথে সেদিন আমার কবিতার ভবিষ্যৎ রচিত হয়েছিলো।

আর একদিনের আরো একটা ঘটনার কথা জানাই। অবশ্য তখন আমার বয়স অল্প, সবে মাত্র কবিতা লিখতে শুরু করেছি এবং যে কোনো দরিদ্র কিম্বা অর্ধাহারী কবির মতোই তখন আমার চেহারা—ওজনহীন কোনো পাখীর পালকের মতোই বলা চলে। অন্যান্য কবির মতোই কালো রঙের টুপী পরতাম। "ক্রিপাসকিউলারিও" নামক আমার কবিতার বইটি তখন সবে প্রকাশিত হয়েছে। এই উপলক্ষে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে সস্তা-দরের এক হোটেলে গেলাম আনন্দ করতে। সেই সময়ে এই জাতীয় হোটেল বা নৈশ-আড্ডায় সমাজবিরোধীদের দৌরাত্ম্য ছিলো খুব।—এদের মধ্যে প্রায়ই গোলমাল লাগতো এবং এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হতো নিরীহ মানুষ আর দরিদ্র-শ্রেণীর নাচিয়ে মেয়েরা।

আমরা সবাই বসেছি। নাচ-গান শুরু হয়েছে। এমন সময় দু'টি গুণ্ডা সেখানে নিজেদের মধ্যে মারামারি লাগিয়ে দিলো। ভীত আতঙ্কিত গাইয়ে-নাচিয়েরা হোটেলটির পিছনে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচালো। কিন্তু সহ্য হলো না আমার, উঠে গুণ্ডা দু'টির সামনে গিয়ে শারীরিক অক্ষমতাটিকে গলার আওয়াজে চাপা দিতে চীৎকার করে বললাম, 'অসভ্য নোংরা বাঁদরের দল—এখানে মানুষ এসেছে আনন্দ করতে, তোমাদের বাঁদরামি দেখতে নয়!'

আমার চীৎকারে যে ওরা শুধু অবাক হয়েছিলো তাই নয়, ওদের দেখে মনে হচ্ছিল —ওরা যেন এটা বিশ্বাসই করতে পারছে না। ওদের মধ্যে বেঁটে-খাটো বক্সিং জানা লোকটি আমার দিকে এগিয়ে আসতেই সজোরে একটা ঘুসি মারলাম তাকে এর ফলে সে মাটিতে পড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তার বিরোধীটি তাকে তুলে আরও কিছু উত্তমমধ্যম লাগিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

এই ঘটনার পর অন্য সবাই খুব হৈ-চৈ করে আমাকে আর আমার বন্ধুদের ধন্যবাদ জানালেন এবং মদ খাওয়াতে চাইলেন। হোটেল-মধ্যস্থ অন্য গুণ্ডাটি আমাদের সঙ্গে আনন্দ করতে চাইলো, কিন্তু তাকে হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে যেতে বললাম। রাগে কাঁপতে কাঁপতে সে হোটেল থেকে বেরিয়ে গেল।

আনন্দোৎসব শেষে ঘরে ফেরার পথে একটা সরু গলির মুখে এসে স্তম্ভিত হলাম আমরা। দেখলাম হোটেল থেকে বিতাড়িত দ্বিতীয় বদমাসটা তার দৈত্যের

মতো চেহারা নিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে লোকটা আমাকে বললো, 'আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি!' বলেই সে একটা ধাক্কা দিয়ে রাস্তার এক কোণে আমাকে নিয়ে যেতেই বন্ধুরা ভয়ে খরগোসের মতো কাঁপতে শুরু করলো। আমিও ভয়ে কাঠ হয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলাম—আঘাত করার মতো যদি কিছু একটা হাতের কাছে পাই, কিন্তু তেমন কিছুই পেলাম না।—প্রতিশোধের সম্মুখীন হয়ে আমি সেদিন সব দৃঢ়তাই হারিয়ে ফেলেছিলাম।

—'আসুন একটু আলাপ করি!' লোকটা হুঙ্কার দিলো।

ভয় পেয়েছি ভাবটা দেখানো ঠিক হবে না। তাই বেশ জোরে একটা ধাক্কা মারলাম তাকে, কিন্তু সেই বিশাল দেহের বিন্দুমাত্রও নড়াতে পারলাম না। মনে হলো আমার সামনে যেন ইঁটের একটি প্রকাণ্ড দেওয়াল দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেই সময়ে সে তার মাথাটাকে পিছন দিকে হেলিয়ে আমার দিকে তাকালো, দেখলাম তার মুখ থেকে বন্য ভাবটা একেবারে উবে গেছে। বেশ নম্রতার সঙ্গেই সে প্রশ্ন করলো, 'আপনি কি পাবলো নেরুদা?' এরপর আমার উত্তর শুনে লজ্জায় নত হয়ে সে বললো—'ছিঃ ছিঃ, কী নীচ আমি!—আমি একজন অপরাধী, আপনাকে অপমান করেছি! ক্ষমা করুন আমাকে।—আপনি বিশ্বাস করুন নেরুদা—যে মেয়েটিকে আমি ভালোবাসি সে আপনার ভীষণ ভক্ত। আমরা দু'জনে আপনার কবিতা পড়েই আপনাকে ভালোবাসতে শিখেছি। আর আমি সেই মেয়েটির কাছে যে ভালোবাসা পেয়েছি—সে কেবল আপনার কবিতার জন্যই, আপনার কবিতাই আমাদের দু'জনকে ভালোবাসতে শিখিয়েছে।' এই পর্যন্ত বলেই সে বুক পকেট থেকে তার প্রিয়তমার একখানি ছবি বের করে আমার হাতে দিয়ে বললো—'আপনি এই ছবিটি একবার স্পর্শ করুন, আমি তাকে এটি দিয়ে বলবো পাবলো নেরুদার হাতের স্পর্শ আছে এই ছবিতে!'

ছবিটি স্পর্শ করে তার হাতে দেবার সঙ্গে সঙ্গে সে আবৃত্তি শুরু করলো:

'একটি বিষণ্ণ বালক হাঁটু-মুড়ে বসে আছে
তোমার অন্তরে
দৃষ্টি তার আমাদেরই 'পরে—'

ইতিমধ্যে বন্ধুরা অকুস্থল থেকে চলে গিয়েছিলেন। এই কবিতা আবৃত্তির সময়ে তাঁরা লোকজন নিয়ে আমাকে উদ্ধার করতে এসে হতবাক হলেন। এরপর আমি আস্তে আস্তে এগিয়ে চললাম। কিন্তু লোকটি তখনও সেই জায়গাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই আপন মনে আবৃত্তি করে চললো:

'যে জীবন তার ধমনীতে
জ্বলন্ত প্রবহমান—
তাকে যদি নিতে চাও
তবে হত্যা করো—
আমার এই বাহু দু'টি!'

আর কতো চিত্রকলা—পৃথিবীতে আর ঘর কোথায়—এবার তো ঘরের বাইরে টাঙাতে হবে—আর কতো বই—আর কতো পড়বো—কে পারে এতো পড়তে?—যদি এগুলি খাদ্যবস্তু হতো তাহলে স্যালাড্ সহযোগে খাওয়া যেতো। বইয়ের বন্যায় পৃথিবীটা ডুবতে বসেছে।

রেভারডি বললেন—'পোস্ট অফিসে বলে দিয়েছি আর যেন চিঠি বিলি না করে,—চিঠির পাহাড়, চিঠি জমে জমে দেওয়াল পর্যন্ত উঠেছে।—এবার বোধহয় ছাদ শুদ্ধ ভেঙে পড়বে মাথায়!'

এলিয়টকে সবাই চেনে—বিখ্যাত পণ্ডিত, নাট্যকার ও সমালোচক হবার আগে তিনি আমার কবিতা পড়তেন—প্রশংসায় বিগলিত হয়েছিলাম—তারপর তিনি একদিন আমায় তাঁর কবিতা পড়তে বললেন—স্বার্থপরের মতোই প্রতিবাদ করতে করতে পালিয়ে গিয়েছিলাম সেদিন। এলিয়ট নিজেই পড়ে শোনাবার চেষ্টা করলেন। বললাম—না না, পড়বেন না—কবিতা পড়বেন না আপনি! আমি স্নান-ঘরে পালিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে বসে রইলাম, কিন্তু বন্ধ-দরজার ওপার থেকে এলিয়ট তাঁর কবিতা পড়ে শোনাতে লাগলেন—আমি বিষণ্ণ বোধ করলাম—স্কটিশ-কবি ফ্রেজার সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি আমার উপর রেগে চীৎকার করে বললেন—কেন তুমি এলিয়টের সঙ্গে এমন ব্যবহার করছো! উত্তর দিলাম—আমি পাঠকহারা হতে চাই না, অনেকদিন ধরে অনেক চেষ্টায় আমার পাঠককুল গড়ে তুলেছি, তাঁদের আমি হারাতে চাই না—আমার কবিতার পাঠকরা আমার কোন্ কবিতার কোথায় কতটুকু কুঞ্চন-রেখা আছে তা সহজেই বলে দিতে পারেন।—এলিয়টের প্রতিভা বহুমুখী। তিনি লিখতে পারেন, আঁকতে পারেন এবং সমালোচনা করতেও দক্ষ। আমি আমার পাঠকদের বাঁচিয়ে রাখতে চাই, সযত্নে লালিত কোনো বিদেশী ফুলের মতো তাঁদের পরিচর্যা করতে চাই, বুঝলে ফ্রেজার। কারণ এই রকম যদি ঘটতে থাকে তাহলে হয়তো এমন দিন আসবে যখন একজন কবি শুধু অন্য আর একজন কবির জন্যই তাঁর কবিতা লিখবেন, এক কবি তাঁর কবিতার বইটি বের করে আর এক কবির পকেটে পুরে দেবেন, হয়তো বা ক্যুয়োভেদো একদিন তাঁর কবিতাকে সম্রাটের ন্যাপকিনের তলায় লুকিয়ে রাখবেন!—শহরের মাঝে ভরদুপুরে-কবিতা অথবা ঝুরঝুরে কবিতার বইয়ের পাতাগুলি সমগ্র মনুষ্য-সমাজের উপরে ছড়িয়ে দেওয়া একজন কবি আর একজন কবির জন্য সৃষ্ট হবে!—এটা ভালো লাগে না আমার, বরং ইচ্ছে করে প্রকৃতির ঐ পাহাড়ের ধারে অথবা সমুদ্রের ঢেউএ—অথবা জঙ্গলে এই প্রকাশক আর ছাপাখানা থেকে অনেক—অনেক দূরে কোথাও গিয়ে লুকিয়ে বসে থাকি।—কবিতা তার পাঠকের সঙ্গে সম্বন্ধ হারিয়ে ফেলেছে—পাঠক চলে গেছেন কবিতার বাইরে, পাঠককে ধরে আনতে হবে কবিতার মাঝে—কবিতাকে অন্ধকারের মধ্য দিয়ে পথ খুঁজে পৌঁছতে হবে মানুষের প্রাণের মধ্যখানটিতে—মেয়েদের দৃষ্টির সম্মুখে—গোধূলিতে তারকাখচিত

আলো-আঁধারি আকাশের পানে তাকিয়ে কোনো এক পঙ্‌ক্তি কবিতার আশায় যাঁরা রয়েছেন তাঁদের সাথে অপ্রত্যাশিত দেখা হওয়াটা এতই মূল্যবান হয়ে উঠবে যে, দীর্ঘ পথ পাড়ি—এতো পড়া, এতো শোনা, তার সমস্ত মূল্যটুকু ফেরৎ পাওয়া—আমাদের হারিয়ে যেতে হবে সেই সব অপরিচিতের কাছে যাঁরা হঠাৎ একদিন রাস্তা থেকে কুড়িয়ে তুলে নেবেন আমাদের—তুলে নেবেন ধুলোবালি থেকে—কিম্বা হাজার হাজার বছর ধরে যে সকল ঝরাপাতা অবহেলিত হয়ে পড়ে রয়েছে তার ভিতর থেকে ঈপ্সিত বস্তুকে পাওয়ার মতো অতি সন্তর্পণে—সেদিনই সত্যিকারের কবি হয়ে উঠতে পারবো আমরা—কবিরা। ঐ হারিয়ে গিয়ে খুঁজে পাওয়া ঈপ্সিত বস্তুর মধ্যে কবিতা লাভ করবে তার অনন্ত জীবন!

ভাষা ও জীবন

আমার জন্ম ১৯০৪এ। ১৯২১এ প্রথম প্রকাশিত হয় আমার কবিতা—একটি পত্রিকায়। আমার প্রথম কবিতার বই "ক্রিপাসকিউলারিও" প্রকাশিত হয় ১৯২৩ সালে। আমি ১৯৭৩য় শুরু করেছি এই অনুস্মৃতি লেখা—মাঝে চলে গেছে পঞ্চাশটি বছর—এই সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস অনেক উত্থান-পতনের বর্ণনায় পরিপূর্ণ। এই সময়ের মধ্যে কবি তার নবজাতকদের হৃদস্পন্দন, তাদের ক্রন্দন, তাদের প্রতিবাদধ্বনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন।

আপনি কোনো ভাষাকে আড়াআড়ি বা লম্বালম্বিভাবে ধরে তার চুল টেনে বা পেটে তার সুড়সুড়ি দিয়ে জীবনভর তার সঙ্গে কাটাতে পারবেন না—যদি না তাকে নিজের জীবনের অন্যতম একটি অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করতে পারেন। স্প্যানিশ ভাষার ক্ষেত্রে তাই-ই ঘটেছিলো আমার।—সে ভাষাকে অলঙ্কার নয়, আমার এক অঙ্গ হিসাবেই মেনে নিয়েছিলাম—পরিধেয় হিসাবে তাকে গায়ে চড়িয়েছিলাম, তার বোতাম তার রঙ তার বাহারী রূপ—এমন কি তাতে আমার শরীরের ঘামের চিহ্ন পর্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছিলো। ভুলেও কোনো সময়ে অন্যের গায়ের কোনো দাগ আমি লাগতে দিইনি তাতে।

ফরাসী সাহিত্যে সে সময়ে বিপ্লবের জোয়ার বইছে, সারা য়ুরোপ আমেরিকা তখন সেই সাহিত্যের প্রভাবে প্রভাবান্বিত। চিলির কবি হুইদোব্রো ফরাসী সাহিত্যের প্রভাবেই অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর কবিতা লিখে চলেছেন।—কিন্তু কেন জানি না, ওই জামাটি ঠিক আমার শরীরে মাপ-মতো হয়নি। আমার আমেরিকার মৃত্তিকান্তরে ছিলো তীক্ষ্ণ পাথুরে-ফলক, জ্বলন্ত লাভা আর রক্তে ভেজা কাদা। স্ফটিকের উপরে ভর করতে শিখিনি আমরা। তাই মারতেঁ্য ফোরো-র মদ অথবা গাব্রিয়েলা মিস্ত্রাল-এর ঘন মধু দিয়ে তৈরি কোনো রচনা দেখলেই মনে হতো—আমার বৈঠকখানা ঘরটি সাজিয়েছি অপরের বাগান থেকে ধার করা ফুলে!

আমার সাফল্য এখানে। আমার কবিতার যদি কোনো অর্থ থাকে তার কারণ নিজেকে আমি শূন্যে প্রসারিত করতে চেয়েছি।—সেখানে আমি কোনো বাধা মানিনি,

কোনো একটি ছোট্ট ঘরে আবদ্ধ রাখিনি নিজেকে। যে মাটিতে জন্মেছি সেই মাটির উপরে থেকেই আমি আমার শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে দিয়েছি আমার দেশমাতৃকার বুকে। —এ কাজে যিনি সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছিলেন আমাদেরই গোলার্ধ থেকে তিনি মানহাটানের কবি কমরেড ওয়াল্ট হুইটম্যান।

সমালোচকের যন্ত্রণাভোগ

'মালডোরোর গান' একটি গল্পের ভগ্নাংশ। নিজের জীবনের চরমতম অ-সুখী মুহূর্তে মালডোরো স্বর্গের সঙ্গে বিয়ে দিলেন নরকের। মহোল্লাস, ক্রোধ আর যন্ত্রণা দিয়ে সৃষ্টি হলো অলংকারবহুল কবিতা—'মালডোরোর—মালডোরোর'! লত্রেআমন্ত একটি নতুন পদ্ধতিতে এই কবিতা রচনার চিন্তা করে নতুন আশাবাদী এক কবিতার জন্য ভূমিকা লিখলেন, কিন্তু সেই কবিতা লেখার সময় পেলেন না তিনি—উরুগুয়ের এই তরুণ কবির অকালমৃত্যু ঘটলো প্যারিতে। তবে তিনি কবিতায় যে নবদিগন্ত সৃষ্টির প্রয়াসী হয়েছিলেন, যে কবিতায় শুভ কামনা ও সুস্থ জীবনের প্রতিশ্রুতি ছিলো—সেই কবিতাকে শেষ পর্যন্ত অভাবিত সমালোচনার সম্মুখীন হতে হলো—দুঃখবোধের ক্ষেত্রে জুটলো সমবেদনা আর আনন্দের ক্ষেত্রে তিরস্কার। অর্থাৎ কবি-জীবনে থাকবে কেবল দুঃখ, কেবল যন্ত্রণা—হতাশাপূর্ণ জীবন নিয়ে কাল যাপন করবেন কবি, তিনি শোনাবেন কেবল হতাশারই সঙ্গীত। কবিদের সম্বন্ধে এই ধরনের মত পোষণ করতেন সমাজের এক অংশের মানুষ, তাঁদের আশা হচ্ছে—কোনো অদৃশ্য আইনানুসারে কবিরা বাস করবেন গোয়াল ঘর বা খোঁয়াড়ে কিম্বা ঐ জাতীয় কোনো স্থানে, কবিদের পায়ে শোভা পাবে ছেঁড়া জুতো, দেহে নগণ্য আচ্ছাদন, আর হাসপাতাল কিংবা শেষ পর্যন্ত মর্গ-ই হবে তাঁদের অন্তিম মুহূর্তের উপযুক্ত স্থান।—কবিদের এই ধরনের জীবনই নাকি অনেককেই খুশি করবে, তাঁর স্মৃতিচারণের সময়ে কারো কারো চোখ দিয়ে দু'চার ফোটা জল অথবা আনন্দঘন বেদনাশ্রু গড়িয়ে পড়ার সুযোগ পাবে। কিন্তু পৃথিবীর চেহারা বদলের সাথে সাথে এ সকল চিন্তাধারারও পরিবর্তন ঘটতে শুরু করলো, আমরা কিছু কবি এর সুযোগ নিতে শুরু করলাম। অ-খুশি বা ক্রুশবিদ্ধ সাহিত্যিকগণ ধনতন্ত্রবাদের গোধূলিলগ্নে আনন্দানুষ্ঠানের এক শাস্ত্রাচারে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ উপলব্ধিবোধকে এমনভাবে গড়ে তোলা হয়েছিলো যেন দুর্দশাগ্রস্ত জীবনই হচ্ছে মৌলিক রচনার অধিকারী। অধঃপতিত জীবন ও যন্ত্রণা ছিলো কবিতার প্রাণ-সঞ্চারের ব্যবস্থাপত্র। অ-সুখী পাগল হোল্ডারলিন, তিক্ত আর ভবঘুরে র‍্যাঁবো—ছোট্টো একটি গলির আলোকস্তম্ভে ঝুলন্ত জ্যের্দ্য-দ্য নেভ্রালের মৃতদেহ—এসব গত শতাব্দীতে সভ্যতা ও সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে ছিলো শিহরণ বিশেষ, যন্ত্রণার জাজ্বল্য সাক্ষ্য—অর্থাৎ কবি জীবনের কণ্টকাকীর্ণ পথের প্রধান উৎস, এ সবই ছিলো কবিদের আত্মা গঠনের শর্ত বিশেষ। ডাইলান টমাস হচ্ছেন শেষ ব্যক্তি যিনি এই মনোভাব, এই পথের শেষ শহীদ হয়েছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য লাগে যে, এখনও এই জাতীয় বদমেজাজী মধ্যবিত্ত মনোভাব কিছু কিছু মানুষের মন থেকে

মুছে যায়নি!—সেই সব মন যে মন পৃথিবীর হৃদ্‌স্পন্দন পৃথিবীর কান দিয়ে শুনতে চায় না, সে মন জানে না যে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ রয়েছে পৃথিবীরই নাসারন্ধ্রে। কিন্তু এমন কিছু কিছু সমালোচক রয়েছেন যাঁরা কুমড়োগাছের মতো নিজেদের শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে সেই কায়দাদুরস্ত দীর্ঘশ্বাস শোনার জন্য আগ্রহী, অথচ এই সমালোচকরা আদৌ জানেন না যে, তাঁদের শিকড় রয়ে গেছে মাটির গভীরে—অতীতে! তাই একথা না জানিয়ে পারছি না যে, যতক্ষণ আমরা মানুষের কাছে রয়েছি, তাদের সুখী রাখার সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছি ততক্ষণ আমাদের অর্থাৎ কবিদের সম্পূর্ণ অধিকার আছে সুখী থাকার।

ইলিয়া ইরেনবুর্গ তাঁর কোনো একটি রচনায় লিখেছিলেন: 'পাবলোর মতো সুখী মানুষ আমি খুব কমই দেখেছি।'—হ্যাঁ, আমি সেই পাবলো, ইরেনবুর্গ কিছু ভুল বলেন নি। এই কারণেই আমার সমালোচকরা বিশেষ ব্যথিত!—আমার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, আমার ভালো থাকা—কিছুই তাঁদের মনঃপূত নয়, যদিও কারোর ব্যক্তিগত বিষয়ে অন্যের নাক-গলানোটা অশোভন। তবে এটা সত্য যে, আমি খুবই সুখী।—এও বলতে দ্বিধা নেই যে, আমার বিবেক অত্যন্ত পরিষ্কার। আর বুদ্ধি আমার বেশ প্রখর এবং গতিশীল।

কয়েকদিন আগে এক তরুণ সমালোচক আমার কবিতার সমালোচনা করে লিখেছিলেন: আমার কবিতায় আনন্দের মাত্রাধিক্য এবং সে কারণেই পাবলোর কবিতাকে অত্যন্ত দুর্বল লাগে! এক কথায়—সমালোচকটি আমার জন্য যন্ত্রণা-পত্রের বিধান দিলেন! অর্থাৎ তাঁর মতে এ্যাপেনডিক্সের ব্যথা উঠলে প্রয়োজন কিছু ভালো গদ্য-রচনা, আর পেটের যন্ত্রণায় সুন্দর কিছু কবিতা সৃষ্টি করা যেতে পারে।

আমার নিজস্ব সংগ্রামী সত্তা, পারিপার্শ্বিক প্রবহমান ঘটনাবলী—এর সব কিছুই স্থান পেয়েছে আমার কবিতাতে। আমি একজন সর্বভুক—আমার ইচ্ছা করে গোটা পৃথিবীটাকেই গিলে খেয়ে ফেলি অথবা সমস্ত সমুদ্রকে আকণ্ঠ পান করি।

ছোটো ও বড়ো লেখা

আমার যৌবনে আমি অনেককেই বলতে শুনেছি—পাবলো একজন ক্ষুধার্ত, ভিক্ষুক। অবশ্য তাঁদের মধ্যে আজ আবার অনেকেই বলেন আমি একজন ঐশ্বর্যশালী বিত্তবান কবি।

ওঁদের পরিমাপ মতো ঐশ্বর্য আমার থাকলে আমি খুশিই হতাম, কিন্তু মুস্কিল হতো তাতে ওঁরা আবার হতাশ হয়ে পড়তেন। অনেকেই আমার কবিতার দৈর্ঘ্য মাপার পর তাকে ছোটো করে ছেঁটে ফেলার উপদেশ দিতেন। অবশ্য তাতে আমার বিশেষ কিছু হতো না। কোন্ লেখা ছোটো হবে—কোন্‌টা বড়ো হবে, কার রঙ হবে লাল—কার বা হলুদে এসব আইনের স্রষ্টাটি কে? যে কবি লেখেন—একমাত্র তাঁরই অধিকার আছে এই আইন তৈরী করার। তাঁর রক্ত, নিঃশ্বাস, জ্ঞান ও অজ্ঞান দিয়ে তিনিই তৈরী করবেন 'কবিতা' নামে রুটি।

যে কবি বাস্তব অস্বীকার করেন তিনি মৃত—আবার যে কবি শুধুমাত্র বাস্তবকেই স্বীকার করে লেখেন তিনিও মৃত! এটা খুবই দুঃখের ব্যাপার যে, বিচার-বুদ্ধিহীন কবিকে একমাত্র তিনি নিজে আর তাঁর প্রেমিকা ছাড়া কেউই বুঝবে না। আবার প্রখর বিচার সম্পন্ন কবিদের একমাত্র গর্দভ ছাড়া কেউ বুঝবে না। পৃথিবীর কোনো শক্ত আইনের নির্দেশে কবিতা জন্মলাভ করে না—ভগবান বা শয়তান কারুরই কোনো নির্দেশনামা মেনে কবিতা চলে না—যদিও এই দু'জনের প্রচণ্ড প্রভাব কবিতার মধ্যে বিদ্যমান, কিন্তু কবিতা এঁদের কারুর কাছেই পরাজিত নয়।

মানুষের গভীরতম অন্তরের অভিব্যক্তি কবিতা। ধর্ম, প্রার্থনা-সঙ্গীত ও প্রার্থনা সভার জন্ম এখানেই। প্রকৃতির সঙ্গে প্রথম সংঘাতে কবি এসেছিলেন। প্রাচীনকালে কবিই ছিলেন পুরোহিত। পরবর্তীকালে কবিতাকে রক্ষা করতে গিয়ে কবি এসে দাঁড়ালেন মানুষের পাশে—মানুষের ভাষায় অলংকৃত হলো কবিতা। আজকের দিনের 'গণ-কবিয়াল' সেই আদিম যুগের পুরোহিতেরই বংশধর। পুরাকালে যে কবি অন্ধকারের সঙ্গে সমতা স্থাপন করেছিলেন আজ তিনিই বসেছেন আলোর ব্যাখ্যায়।

মৌলিকতায় বিশ্বাস আমার নেই, আমি মনে করি এটা একটা অন্ধভক্তি—যার পতন অবশ্যম্ভাবী। আমি বিশ্বাস করি ব্যক্তিত্বে—যে ব্যক্তিত্ব যে কোনো ভাষা বা যে কোনো রূপে নবতম শিল্পের সৃষ্টিকে জন্ম দেবে, যা হবে প্রতিভাত।

আমার কাছে মনে হয় 'মৌলিকতা' হচ্ছে অধুনা যুগের আবিষ্কার এবং মনে করা যেতে পারে এটি হচ্ছে একটি নির্বাচিত প্রতারণা। কেউ কেউ আছেন যিনি তাঁর দেশের 'সর্বশ্রেষ্ঠ কবি' এই খ্যাতি লাভ করার জন্য কবিতা লিখে থাকেন এবং সেইভাবেই নির্বাচকমণ্ডলী খুঁজে বেড়ান। সমস্ত কবিতাটিই তখন প্রহসনে পরিণত হয়।

বোতল আর মাস্তুলের মূর্তি

খ্রীস্টমাস এগিয়ে এলো। প্রতিটি খ্রীস্টমাস আমাদের সন ২০০০-র দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। আমরা—সমস্ত কবিরা সংগ্রামরত—গান গেয়ে চলেছি ভবিষ্যৎ সুখের জন্য, আগামীকালের শান্তির দিনগুলির জন্য, আন্তর্জাতিক সুবিচারের জন্য—অপেক্ষা করে রয়েছি সন ২০০০-র ঘণ্টাধ্বনি শোনার জন্য।

শান্ত নরম সেই মানুষটি—সক্রেতিস এগুয়াইরি—যিনি ত্রিশ সালে বুয়েনস আয়ারসে আমার উপরওলা রাষ্ট্রদূত ছিলেন। ডিসেম্বরের ২৪ তারিখে তাঁর বাড়িতে আমায় 'সান্তা ক্লস' হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন তিনি। আমি যখন খেলনাগুলি বাচ্চাদের দিচ্ছিলাম তখন একগাদা সাদা তুলো আমার দাড়ি থেকে বার বার খসে পড়েছিলো। অনেক চেষ্টা করেও আমার গলার স্বরটা যখন সান্তা ক্লসের মতো নকল করতে পারলাম না তখন নাকি ভাঙা ভাঙা ইংরাজীতে বাচ্চাদের সঙ্গে কথা বলতে

শুরু করলাম, কিন্তু বাচ্ছারা কেমন যেন সন্দেহের দৃষ্টিতে বার বারই আমার দিকে তাকাচ্ছিলো।

সেদিন কি আমি জানতাম যে, ওই বাচ্ছাগুলির মধ্যেই আমার একজন প্রিয়তম বন্ধু—পরবর্তীকালের একজন প্রখ্যাত সাহিত্যিক এবং আমার সর্বশ্রেষ্ঠ জীবনীকারও রয়েছেন—তিনি হচ্ছেন মারগারিটা এগুয়াইরি।

খেলনা ছাড়া আমার কাছে জীবনটাকে নিরর্থক মনে হয়। আমার বাড়িতে ছোটো-বড়ো নানান খেলনা সাজানো আছে। যে শিশু খেলনা নিয়ে খেলে না সে শিশুই নয়—কিন্তু যে মানুষটি খেলনা ভালোবাসে না—সে চিরদিনের জন্যই তার অন্তরের শিশুটিকে হারিয়ে ফেলেছে। নিশ্চয়ই সে তাকে খুঁজে বেড়ায়। আমার বাড়িটিকে আমি খেলনাঘরের মতো করেই তৈরি করেছি এবং সেখানেই আমার সকাল থেকে রাত্রি কাটে।

সারা জীবনের সঞ্চয় আমার এই খেলনাগুলি আমার নিজস্ব আনন্দের জন্যই। এই খেলনার মধ্যে আমার সবচেয়ে প্রিয় হচ্ছে জাহাজগুলি। এর বেশির ভাগই কারলস্ হলানভারের তৈরি—প্রতিটি জাহাজের জেটি, মাস্তুল ও পতাকা এতো নিখুঁৎ কারুকার্য দ্বারা তৈরি যা দৃষ্টিকে বিস্ময়াবিষ্ট করে রাখে। আমার সবচেয়ে অবাক লাগে দেখতে—যখন দেখি বোতলের জলের মধ্যে ছোট্ট ছোট্ট নিখুঁৎ জাহাজগুলি ভেসে বেড়াচ্ছে! জাহাজের মাস্তুলের উপর খোদাই-করা সব উদ্ভট মূর্তিগুলিই আমার কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয়।

আমার বাড়ির অন্যান্য অনেক জিনিসের মতো আমার এই খেলনাগুলিরও ছবি তোলা হয়েছে—পত্র-পত্রিকায় সেই সব ছবি ছাপাও হয়েছে। অনেকেই বলেছেন—কি উদ্ভট এই লোকটা—যতো সব উদ্ভট জিনিসে বাড়ি সাজিয়ে রেখেছে!

ইসলানেগ্রায় আমার বাড়ির ছাদে মাছের ছবি আঁকা একখানি নীল পতাকা আছে। সেটি দেখে একবার একজন আমায় বলেছিলেন—ছাদে পতাকাও নেই, ঘরেতে কোনো মাস্তুলের মূর্তিও নেই। লোকটির কথা শুনে আমার মনে হয়েছিলো তিনি ঈর্ষান্বিত—যেমন দেখা যায় একটি ছোটো ছেলে আরেকটি ছেলের খেলনাকে দেখে ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠে। উনি যখন বলছিলেন তখন আমি লক্ষ্য করেছিলাম আমার মাস্তুলের মূর্তিগুলি ওঁর দিকে তাকিয়ে হাসছিলো।

মাস্তুলের অগ্রভাগে খোদাই করা এই মূর্তিগুলির কোনটায় ছিলো একজোড়া বুক, কোনটায় সমুদ্রের দেব-দেবীর মূর্তি—কোনটায় আবার সমুদ্রের তলায় হারিয়ে যাওয়া কোনো মূর্তির প্রতিলিপি। মানুষ যখন প্রথম জাহাজ তৈরি করে তখন এই সব মূর্তি ও প্রতিলিপির পিছনে ছিলো মানুষের অজানা রহস্যবোধ ও তার গোড়ার কোনো অর্থ। প্রথম যুগে এই মূর্তিগুলি ছিলো বেশির ভাগই সামুদ্রিক কোনো পাখী বা আদিম কোনো পাখীর প্রতিলিপি। উনবিংশ শতাব্দীর জাহাজগুলিতে দেখা যায় অর্ধনগ্ন সামুদ্রিক দেব-দেবীর মূর্তি।

আমার কাছে নারী-পুরুষ—সব রকমেরই মূর্তি আছে। সবচেয়ে ছোটো অথচ আশ্চর্য-সুন্দর যে মূর্তিটি—যেটিকে আমার বন্ধু সালভাডোর এলিন্দে আমার কাছ থেকে নেবার জন্য বহু ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলেন—সেটি হচ্ছে মারিয়া সিলেস্তের মূর্তি।

ফ্রান্সের একটি ছোটো জাহাজ, যে জাহাজটি হয়তো সিয়েনের বুকেই ঘুরে বেড়িয়েছে—তারই মাস্তুলের উপর খোদাই করা এই মূর্তিটি। ওক কাঠের তৈরি—ময়লা রঙ-কাচের মতো স্বচ্ছ তার চোখের দৃষ্টি—যা তার টোল-খাওয়া গালের সীমানা পেরিয়ে নিঃসীম শূন্যে আবদ্ধ। প্রতি শীতে দেখেছি ওই চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ে অশ্রু, হয়তো বা কাঠের ফাঁকে জমে থাকা বর্ষার জল। কিন্তু এটা সত্য যে, ওই ফরাসী মেয়ে মারিয়া সিলেস্তের চোখের জল আমি প্রতি শীতেই ঝরতে দেখেছি।

এই সব আদিমতম দেব-দেবীর মূর্তি মানুষের মনে ধর্মের ভাব জাগিয়ে তোলে। একবার এমনিই একটি মূর্তিকে আমার বাড়ির বাইরে সমুদ্রের দিকে তার মুখটাকে ঘুরিয়ে রেখে দিয়েছিলাম। একদিন হঠাৎ দেখি অনেক মহিলা হাতে মোমবাতি নিয়ে আমার ঘরের বেড়া ডিঙিয়ে এসে মূর্তিটিকে পুজো করতে বসলেন। দেখে আমার মনে হয়েছিলো—নতুন কোনো ধর্মের জন্ম হলো।

পরদিনই মূর্তিটিকে সরিয়ে নিয়ে আমার ঘরের উনুনের পাশে রেখে দিলাম।

বই আর ঝিনুক

গরীব পড়ুয়াদের অনেক কষ্টই পোয়াতে হয়। তাঁদের হাত থেকে বই কখনও মাটিতে পড়ে যায় না বরং দাম শুনে বই তাঁদের আশপাশ দিয়ে পাখীর মতো উড়ে পালিয়ে যায়। তবু অনেক চেষ্টার পর মাঝে মাঝে মুক্ত হাতে উঠে আসে।

আমার মনে আছে, আমি যেবার গান গোরাসের গ্রন্থাবলীটা পুস্তক বিক্রেতা গারসিয়া রিকোর দোকান থেকে কিনেছিলাম তখন তিনি অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়েছিলেন। উনি দাম বলেছিলেন একশো পেসো—যা দামের তুলনায় অতি নগণ্য, কিন্তু সেদিন সে পয়সা দেবার ক্ষমতাও আমার ছিলো না। মাসে মাসে কুড়ি পেসো দিয়ে পাঁচ মাসে দামটা শোধ করেছিলাম। স্পেনের স্বর্ণযুগের সাহিত্য-সম্ভারে ভরা এই গ্রন্থাবলীতে কুইভেদোর কবিতাগুলি আমি প্রায় সব সময়েই পড়তাম।

তারপর একদিন বই-এর জঙ্গলে নিজেকে হারিয়ে ফেললাম। অলি-গলি-বড়ো রাস্তা—সারা য়ুরোপ-ফ্রান্স-ইংলণ্ডএ যখনই যেখানে যেতাম নতুন বা পুরাতন বইএর দোকান দেখেছি, ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেখানে অতিবাহিত করেছি। ধুলোয় ভরা হাত দিয়ে কতো না অমূল্য সম্পদ সংগ্রহ করেছি—যা আমার কাছে থাকার আনন্দানুভবেই আমি শিহরিত হয়ে উঠতাম।

সাহিত্যে পুরস্কার প্রাপ্তির টাকা আমায় অনেক বই-ই কিনতে সাহায্য করেছে। আমার নিজস্ব গ্রন্থাগারটি প্রায় সব বিষয়ের উপরেই লেখা বিভিন্ন লেখকের বিভিন্ন ধরনের বইতে ভরে গিয়েছিলো। অনেক দুষ্প্রাপ্য বইও সংগ্রহ করেছিলাম—যেমন ইবারার ছাপা 'ডন্ কুইকসোট্'—বদনির অক্ষরে ছাপা দান্তের গ্রন্থ, মলিয়ঁরের সংরক্ষিত সংস্করণ ইত্যাদি।

আমার আরেকটি জিনিসের সুন্দর সংগ্রহশালা ছিলো সেটি হচ্ছে ঝিনুকের। ঝিনুকের স্বচ্ছতা—চাঁদের মতো শুভ্র তার রঙ—নানান্ আকারের—কোনোটা ছোটো—

কোনোটা মোটা—কোনোটা সরু আর চ্যাপ্টা—আমি অবাক বিস্ময়ে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। কিউবার বিখ্যাত শম্বুক-বিশারদ তাঁর নিজস্ব সংগ্রহশালা থেকে আমায় অনেক ঝিনুক উপহার দিয়েছিলেন। তাছাড়া সাত সমুদ্রের যেখানে যখনই গিয়েছি দু'হাত ভরে কুড়িয়ে এনেছি নানান্ ধরনের ঝিনুক। আমার মনে হতো সমুদ্রের কবিতা হচ্ছে ঝিনুক।

চীনদেশ আমায় তাঁদের বিখ্যাত সংগ্রহশালা থেকে অতি দুষ্প্রাপ্য ঝিনুক 'থেচোরিয়া মিরাবিলিস'—যা সমগ্র পৃথিবীতে মাত্র দু'টি আছে—তার একটি আমায় উপহার দিয়েছিলেন। চীনদেশের প্যাগোডা আর মন্দিরের কারুকার্যে যে অবর্ণনীয় সুন্দর নক্সা দেখা যায় তার উৎস হচ্ছে এই থেচোরিয়া মিরাবিলিস।

তিরিশ বছর লেগেছিলো আমার বিরাট গ্রন্থাগারটি তৈরি করতে। কুইভেদো, সারভানতেস, গনগোরা, লাফরগ, রেবেঁ্যা এবং লত্রিয়ঁ্যাসের প্রথম সংস্করণের প্রায় সব বইগুলিই আমার গ্রন্থাগারে ছিলো। আমার কেন জানি না মনে হতো—প্রথম সংস্করণের বইতে লেখকের আঙুলের ছাপ তখনও লেগে রয়েছে। রেবেঁ্যার পান্ডুলিপিও আমার কাছে আছে। এছাড়া পল এলুয়ারড্ আমার জন্মদিনে ইসাবেলা রেবেঁ্যার দু'খানি চিঠি উপহার দিয়েছিলেন। এই দু'খানি চিঠিই হাসপাতাল থেকে লেখা। এই চিঠি দু'খানি এতই অমূল্য যে, প্যারিসের বিবলিয়োথেক্-এ এর উল্লেখ আছে।

সারা পৃথিবী ঘুরে জড়ো করা আমার এই অতি প্রিয় নিজস্ব গ্রন্থাগার ও ঝিনুকের সংগ্রহশালাটিকে চিলির বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করে দিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকটর প্রশংসা ও সম্মানের সঙ্গে আমার এই দান গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু কেউ কেউ আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার এই দান ভালো চোখে দেখেন নি। একজন বললেন—আমি কম্যুনিজম্ অর্থাৎ সাম্যবাদ প্রচার করার জন্য এই দান করেছি। একজন পারলামেণ্ট সদস্য পারলামেণ্টে জ্বালাময়ী ভাষায় বিশ্ববিদ্যালয়কে সতর্ক করে দিয়ে বললেন—সমস্ত খয়রাতী সাহায্য বন্ধ করে দেওয়া হবে। চিলির ছোট্ট পৃথিবীতে আমার এই দান একটা অভূতপূর্ব ঠান্ডা ঝড়ের সৃষ্টি করেছিলো এবং রেকটর বেচারী বহু নিদ্রাহীন রাত্রি কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন।

এখানে জানিয়ে রাখা ভালো যে, আজ কুড়ি বছর হয়ে গেল—আমার এই গ্রন্থাগার বা ঝিনুকের সংগ্রহশালা কেউ-ই দেখতে পান নি। হয়তো বা সমুদ্রগর্ভের গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালায় ফিরে যাবার জন্য তারা দিন গুনছে।

ভাঙা কাচের টুকরো

মাত্র তিনদিন হলো ভালপারাইসোয় আমার পুরোনো বাড়িতে বহুদিন বাদে ফিরে এসেছি। দেওয়ালের ফাটলগুলিকে বিরাট ক্ষতের মতো দেখাচ্ছিলো। মেঝেতে ভাঙা কাচের টুকরো ইতস্ততঃ ছড়ানো—মাটিতে পড়ে থাকা ভাঙা ঘড়ির কাঁটাটা ভূমিকম্পের সময়টাকে ধরে রেখেছে। ম্যাটিলডে তার হাতের ঝাঁটা দিয়ে হাজারো সুন্দর ভাঙা জিনিস আর দুষ্প্রাপ্য বস্তুকে ঝেঁটিয়ে ফেলে দিচ্ছে।

সব কিছু পরিষ্কার করে নতুন করে আবারো সব সাজাতে হবে। ঘরের ধুলো ময়লার মধ্যে কাগজ খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন আবার তার মধ্যে চিন্তার সমন্বয় সাধন আরো কঠিন।

আমার শেষ রচনা ছিলো 'রোমিও-জুলিয়েত'এর অনুবাদ। এছাড়া চেয়েছিলাম প্রাচীন পদ্ধতি ও ছন্দে একটি দীর্ঘ প্রেমের কবিতা লিখতে—যা আমি কোনদিনও সম্পূর্ণ করতে পারিনি।

এসো—উঠে এসো—হে আমার প্রেমের কবিতা—ওই ভাঙা ছড়ানো কাচের টুকরোর মধ্য থেকে বেরিয়ে এসে গান গেয়ে ওঠো!—ওগো আমার প্রেমকাব্য, তুমি আমায় সাহায্য করো!—আবার সব কিছুকে জোড়া লাগিয়ে যাতে তীব্র বেদনার মধ্যেও আমি গান গেয়ে উঠতে পারি!

আমি জানি, পৃথিবী থেকে যুদ্ধের দাগ—রক্তের দাগ আর হিংসার দাগ মোছা যায় না। জানি যে, এটাই সত্য।

তবু এটাও তো সত্য যে, আমরা সুষ্ঠুভাবে সব কিছুকে উপলব্ধি করার দিনের দিকে এগিয়ে চলেছি! হিংস্র মানুষের ছায়া আজ পৃথিবীর আয়নায় ধরা পড়েছে—তাদের মুখাবয়বে যে কোনো সৌন্দর্যেরই চিহ্ন নেই তাও তো আমরা দেখতে পাচ্ছি! তারাও আজ আমাদেরই মতো তাদের হিংস্র মুখের ছায়া নিজেরা দেখতে পাচ্ছে।

ভালোবাসার সম্ভাবনাময় নবীন আশায় গর্ভবতী আসন্ন যুগের প্রতি আমার বিশ্বাস প্রতি নিয়তই বেড়ে চলেছে। সব রকমের দুঃখ, কষ্ট, অত্যাচার, নিপীড়ন, রক্ত আর এই ভাঙা কাচের টুকরোর মধ্য দিয়ে সেই দিন আগতপ্রায়—যেদিন মানুষ নিশ্চয়ই একদিন পরস্পর পরস্পরকে বুঝতে পারবে!

আমার স্ত্রী ম্যাটিলডে উরুতিয়া

আমার স্ত্রীর জন্ম হয়েছিলো ভূমিকম্প আর কুমোরের কাজের জন্য বিখ্যাত দক্ষিণের একটি গ্রামীণ শহরে—সেও ছিলো আমারই মতো গ্রামের মানুষ। আমার সমস্ত অনুভূতিই ছিলো শুধু ওর জন্য—তা প্রকাশ করেছি "একশোটা প্রেমের কবিতা"

নামক কাব্যগ্রন্থে। মৃত্তিকা আর জীবন আমাদের নিবিড় করে তুলেছিলো—ও ছিলো আমার অমূল্য সম্পদ্।

অনেকেরই হয়তো শুনতে ভালো লাগবে না যে, আমরা দু'জনেই ছিলাম খুব সুখী। গ্রীষ্মকালে যখন সমগ্র চিলির উপকূলটা মরুভূমির মতো হয়ে ওঠে অথবা শীতের দিনে যখন বর্ষা এসে কখনো সবুজ কখনো বা নীল আবার কখনও লাল শাড়ীতে ঢেকে দেয় চিলির সমুদ্রোপকূল—আমি আর ম্যাটিলডে সব সময়েই ঘুরে বেড়িয়েছি উপকূল ধরে। যখন আবহাওয়ার মতো জীবনে জটিলতা এসেছে তখন ছুটে বেড়াতে গিয়েছি সান্তিয়াগোর জঙ্গলে। তার ভারী গলা দিয়ে ম্যাটিলডে আমার লেখা গান গায়। আমার সব কিছুই তারই জন্য। যদিও জানি আমার সব কিছুই অতি সামান্য, সামান্য সে দান।

আমি দেখতে পাচ্ছি ওর পায়ের ছোটো জুতো মাটিতে বসে গেছে আর ও ওর হাত দু'টি চালিয়ে দিয়েছে মাটির গভীরে যেখানে শুরু হয়েছে ওই পাশের গাছটির শিকড়।

মাটির ভিতর থেকে ও ওর হাত পা দৃষ্টি আর গলার সুর দিয়ে তুলে আনছে সেই শিকড়, ফুল আর সুখ নামক ফলটির মিষ্টি গন্ধ—শুধু আমারই জন্য।

একটি তারকার উদ্ভাবক

'প্যারি'র একটি হোটেলে এক ব্যক্তি নিদ্রামগ্ন। যদিও এখন দুপুর ১২টা কিন্তু তিনি গভীর ঘুমে অচেতন। আপনারা অবাক হবেন না—এই ব্যক্তিটি রাত্রির পেঁচা। এঁকে ঘুম থেকে উঠতেই হবে। হঠাৎ তাঁর ঘরের পাশের দেওয়ালটা ধ্বসে পড়লো। তার পরেই সামনের দরজাটা বিরাট একটা শব্দ করে খুলে গেল। একদল শ্রমিক—হাতে তাদের হাতুড়ি—বিদ্রূপের সুরে ঘুমন্ত মানুষটিকে উঠিয়ে বললেন, ওহো, বুর্জোয়া—আর কেন ঘুমোও—চলো বাইরে গিয়ে দু'পাত্র পান করা যাক্!

শ্যাম্পেনের বোতল খোলা হলো, শুরু হলো মার্শেয়াইলের সঙ্গীত। মেয়র এলেন। তিনরঙা পতাকা উত্তোলন করা হলো ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এ সবের কারণ কি? কারণ ওই যে মানুষটি হোটেলের যে ঘরটিতে স্বপ্নালু নিদ্রায় আচ্ছন্ন ছিলেন তারই ঠিক মাটির তলায় প্যারির মেট্রো রেলের দু'টি নতুন লাইন সংযোজিত হলো।

যে মুহূর্তে ওই ব্যক্তিটি আমায় এই গল্পটি শোনালেন পর মুহূর্তেই আমি মনস্থ করলাম এঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব করতেই হবে।—শুধুমাত্র বন্ধুত্ব নয়, এঁর একজন শিষ্য ও উপাসক হতেই হবে।

এমন অসাধারণ ঘটনা যাঁর জীবনে ঘটেছিলো তাঁর জীবনের কোনো অংশকেই আমি বাদ রাখতে চাই না। তাঁকে অনুসরণ করে আমি বহু দেশ ঘুরে বেড়িয়েছি মোহাবিষ্ট হয়ে শুনেছি তাঁর বুনো কল্পনাপ্রসূত এই সব গল্প। ফ্রেদেরিকো গারসিয়া লোর্কার অবস্থাটাও প্রায় আমারই মতো হয়েছিলো।

মাদ্রিদের একটি কাফেতে আমি আর ফ্রেদেরিকো বসে রয়েছি—হঠাৎ সেখানে

প্যারীর সেই ঘুমন্ত মানুষটির আবির্ভাব। মোটাসোটা চেহারাটা সেদিন কেমন যেন অসুস্থ দেখাচ্ছিলো। নিশ্চয়ই আবার কোনো ঘটনা ঘটেছে! প্রসঙ্গতঃ বলে রাখা ভালো এই বীরপুরুষটি সঙ্গীত রচনা করতেন এবং সঙ্গীতের একজন রসজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। শুরু হলো তাঁর গল্প ঃ

হোটেলে আমার পাশের ঘরটায় গত রাত্রে এক ব্যক্তি এসেছেন। তাঁর আসার কিছুক্ষণ বাদেই নাক ডাকার শব্দ শুনতে পেলাম। আস্তে আস্তে সেই শব্দ তীব্র হতে তীব্রতর হলো এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখলাম ঘরের দেওয়াল, দরজা, জানালা নাক ডাকার সেই শব্দে থেকে থেকে কেঁপে উঠছে।

আমি মনে মনে ভাবলাম নিশ্চয়ই কোনো শিঙওলা বরাহ ওই ঘরে ঢুকেছে! তা না হলে এ আওয়াজ কিসের? আমি তো জানি এই তীব্র শব্দ একদিন রাস্তার মুখকে বন্ধ করেছে, বুলেটের গতিপথকে দিয়েছে ঘুরিয়ে—ক্রুদ্ধ সমুদ্রকে জাগ্রত করেছে। এ কোন্ অতিকায় দৈত্য ছুটে এসেছে সারা য়ুরোপের শান্তি ভঙ্গ করতে, কোন্ গ্রহ থেকে এর আবির্ভাব ঘটলো—!

প্রতিদিন আমি, ফ্রেদেরিকো, র‍্যাফেল ও মিগুয়েল এই অদ্ভুত মানুষটির আসার জন্য অপেক্ষা করতাম। যখন বিদায় জানিয়ে উনি চলে যেতেন তখন একটা উৎকণ্ঠা বুকে নিয়ে আমরা বসে থাকতাম।

একদিন তিনি হঠাৎ এসেই হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়লেন। আমাদের জানালেন যে, এই ভয়ংকর নাক ডাকা সমস্যার সমাধান হয়েছে। বললেন—জার্মান জেপেলিন রাজী হয়েছেন যে, এই শিঙওলা বরাহটিকে ব্রেজিলের জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে আসবেন। বিশাল একটি মহীরুহের তলায় তিনি থাকবেন—গোটা 'এম্যাজোন'কে তিনি শুষে নিয়ে পান করবেন তারপর একদিন তাঁর নাক ডাকার শব্দ শুনিয়ে পৃথিবীকে তিনি বধির করে দেবেন।

তাঁর গল্প শুনে ফ্রেদেরিকো হাসতে হাসতে চোখে হাত দিয়ে বসে থাকতেন। ওদিকে তিনি বলে চলতেন—একবার নাকি টেলিগ্রাম করতে যাবার সময় টেলিগ্রাফ অফিসের কেরানীটি ওঁকে বলেছিলেন যে, 'বহু লোকেই নাকি টেলিগ্রাম পড়ার আগেই বিপদাশংকায় হার্টফেল করে মারা যান—কাজেই টেলিগ্রাম না পাঠিয়ে চিঠি লেখাই ভালো। একদিন উনি গল্প শোনালেন কোথায় নাকি একটা ঘোড়ার নীলাম দেখতে গিয়ে সেখানে এক পরিচিত বন্ধুকে দেখে যেই হাত তুলেছেন—ঠিক সেই সময়েই একটি ঘোড়ার দাম তখন নিলামে আগা খাঁ মহাশয় ৯,৫০০ পাউন্ড হেঁকেছেন—ওঁর হাত তোলা দেখেই নীলামদার ১০,০০০ পাউন্ড দাম হেঁকে বসলেন। বাধ্য হয়ে সেদিন রাত্রে ঘোড়াটিকে তিনি হোটেলে রেখে পরের দিন সকালে নীলামদারের কাছে ফেরৎ দিয়ে আসেন।

উপকথাসুলভ এই সব গল্প আর শোনা যাবে না। এই চিলিতেই তিনি মারা যান। চিলির এই মানুষটির নাম ছিলো একারিয়া কোটাপোস। কোটাপোস রচিত প্রচুর লোক-সঙ্গীত, উপকথা, নীতি গল্প সারা চিলিতে এক অদ্বিতীয় স্থান অধিকার করে রয়েছে। যাঁর স্মৃতিকে সমাহিত করা এক অসম্ভব ও অকল্পনীয় ব্যাপার তাঁরই অন্ত্যোষ্টিক্রিয়ার সময় আমায় তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলার জন্য অনুরোধ জানানো

হয়েছিলো। আমি শুধু বলেছিলাম—আজ যাঁকে আমরা ছায়ার রাজত্বে নির্বাসিত করলাম জীবিতাবস্থায় তিনি প্রতিদিন আমাদের একটি করে আকাশের তারা উপহার দিয়ে গেছেন।

মহৎ ইলুয়ার্ড

কয়েক সপ্তাহ আগে আমার প্রিয় কমরেড পল ইলুয়ার্ড মারা গেলেন। উজ্জ্বল স্বাস্থ্যের অধিকারী কঠিন এই মানুষটি আর নেই এ কথাটা আমার কাছে যতখানি বেদনাদায়ক ঠিক ততখানিই অবিশ্বাস্য মনে হয়েছিলো। ১৯১৪ সালে বিশ্বযুদ্ধের সময় বিষাক্ত গ্যাসের প্রকোপে পড়ে একমাত্র হাত দু'টি মাঝে মাঝে কেঁপে ওঠা ছাড়া তাঁর শরীর বা মনে অন্য কোনো অসুস্থতা ছিলো না। তাঁকে দেখলেই আমার মনে হতো—আকাশের নীল রঙ—গভীর শান্ত জলের তলায় নরম, ভদ্র অথচ কঠিন একটি মানুষ। তাঁর কবিতায় ছিলো বসন্তে বর্ষণের স্বচ্ছতা, মনে হতো তিনি অরাজনৈতিক, কিন্তু সেটা সত্য নয়। ফ্রান্সের মানুষ আর তাঁদের সংগ্রামের সঙ্গে ছিলো তাঁর নিবিড় যোগসূত্র।

যেদিন স্ত্রীর মৃত্যু তাঁকে নিঃসঙ্গ বিষণ্নতায় ভরিয়ে দিলো আমরা সেদিন তাঁকে জোর করে নিয়ে গেলাম মেক্সিকোয়।

পল ইলুয়ার্ড আমায় প্রায়ই বলতেন, 'জানো পাবলো—আমাদের জীবনের প্রতিটি অংশকে আরো একজনের সঙ্গে বসে দেখতে হয়, বিচার করতে হয়। আমার এই একাকীত্ব আমার কাছে অসহনীয় হয়ে উঠেছে।'

তাঁকে নিয়ে আমার বন্ধুদের সঙ্গে মেক্সিকোর রুক্ষ, কঠিন রাস্তায় আমরা ঘুরে বেড়িয়েছি। এই রাস্তাতেই একদিন তিনি তাঁর জীবনের শেষ প্রিয়তমা 'ডমিনিকে'র দেখা পেয়েছিলেন।

যে মানুষটিকে আমার পাশে প্রতি মুহূর্তেই দেখতে পাই—যাঁর দৃষ্টির রোমাঞ্চনাময় ঘন নীল আভা আমার সামনে আজও প্রাণ-প্রাচুর্যে পূর্ণ তাঁর সম্বন্ধে কিছু লেখা আমার পক্ষে সত্যিই দুঃসাধ্য!

ফ্রান্সের যে মাটি তাঁকে শিকড় দিয়ে গেঁথে মাথায় পরিয়েছিলো শিরোমাল্য, তাকে ছেড়ে দিয়ে চলে আসেন পল ইলুয়ার্ড। তাঁর সুদীর্ঘ দেহটি শুধু জল আর পাথর দিয়ে তৈরি—যাকে জড়িয়ে ধরে বেড়ে উঠেছে সুপ্রাচীন দ্রাক্ষালতা, ফুটেছে ফুল—পাখিরা বেঁধেছে নীড়—হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে ভেসে এসেছে স্বচ্ছ সঙ্গীত যা ভরিয়ে দিয়েছে তাঁর হৃদয়, পূর্ণ করেছে তাঁর জীবনবেদ। তাঁর কবিতা পড়তে গিয়ে আমার মনে হয়েছে ঝর্ণার জল যেন হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে আর স্বচ্ছ স্ফটিকের মতই কাঠিন্য নেমে এসেছে তার সর্বাঙ্গ জুড়ে।

মধ্যাহ্নের সূর্য আর স্বর্গের প্রেম—এই ছিলো তাঁর কবিতার ভাষা। ফ্রান্সের সেই সর্বনাশা দিনটিতে তিনি তাঁর হৃদপিণ্ডকে বার করে নিয়ে মাটিতে পুঁতে দিয়েছিলেন তারপর সেখান থেকে যে অগ্নিময় আভা ছড়িয়ে পড়েছিলো তাতেই নিষ্পত্তি হয়েছিলো

ফ্রান্সের সেদিনের সেই সর্বনাশা সংগ্রামের।

একজন প্রকৃত সাম্যবাদী হিসাবে তিনি মনুষ্যত্ব ও মানবধর্মের মূল্যায়ন করতে পেরেছিলেন বলেই এটা খুবই স্বাভাবিক যে, তিনি কম্যুনিস্ট পার্টীতে যোগ দেবেন। এটা ঠিক নয় যে, ইলুয়ার্ড কবিতার চেয়ে রাজনীতিকে হেয় জ্ঞান করতেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো পরিষ্কার জলের মতই স্বচ্ছ এবং তাঁর অস্তি ও নাস্তির ন্যায়সঙ্গত বিশ্লেষণ আমাকেও চমৎকৃত করেছে।

বিচার-বুদ্ধিহীন অধিবাস্তববাদে তিনি বিশ্বাস করতেন না। কারণ তিনি নিজে ছিলেন একজন স্রষ্টা—যিনি অনুকরণে বিশ্বাস করতেন না। কাজেই তাঁর তীক্ষ্ন যুক্তিগুলি গিয়ে প্রবেশ করতো অধিবাস্তববাদের মৃতদেহের মধ্যে।

তাঁর কাছে পাওয়া স্নেহ যা আমার প্রতিদিনের রুটি ছিলো তাঁকে আমি হারালাম। তাঁর ভ্রাতৃত্ববোধ ছিলো আমার অমূল্য সম্পদ যা আর কেউ কোনদিনও দিতে পারবে না।

ওগো আমার প্রিয়তম ভাইটি—তোমার বুজে আসা চোখের উপর ভর দিয়ে আমি দাঁড়িয়ে আছি। তুমি তো ছিলে ফ্রান্সের সর্বনাশা দিনের এক কঠিন সুমহান দুর্গ! তুমি আমায় আলো দাও। তোমার মহত্ত্ব আমায় দান করো। যে সরলতা, তোমার যে স্বচ্ছ-সৎ প্রবৃত্তিগুলিকে মাটিতে বপন করলে—ওগো আমার প্রিয় ভাইটি, তার ফলগুলি তুমি আমায় দাও।

পিয়্যের রেভারেডি

পিয়্যের রেভারেডির কবিতায় যাদু আছে একথা আমি কোনো সময়েই বলবো না। আমি যদি তা বলি, অনেকেই ভাববেন—কোনো মেলায় বসে এক ঐন্দ্রজালিক তাঁর ফাঁকা টুপির গর্ত থেকে পায়রা ওড়াচ্ছেন।

রেভারেডি ছিলেন প্রকৃতির কবি। আকাশ আর মাটি ছিলো তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু, নতুন নামকরণের সাথে সাথেই ছিলো তাঁর দীপ্তিশীল পৃথিবীর ঔজ্জ্বল্য বর্ণনা। স্ফটিকের ধমনীর মতই ছিলো তাঁর কবিতা—অন্তঃসলিলা, কিন্তু অক্লান্ত আলোকে উজ্জ্বল। তাঁর পাঠকরা তাঁর কবিতায় পেতেন রাস্তার একটা চেনা নাম যা কোনদিনও তার স্থান পরিবর্তন করবে না।

আজ তিনি নেই। তাঁর গর্বিত আত্মার চেয়েও একটি বিশাল নীরবতা তাঁকে ঘিরে রয়েছে। অনুপম একটি জ্যোতি আজ আকাশ আর মাটিতে সমাহিত হলো।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস একদিন তাঁর নাম কোনো এক স্বর্গ-পরীর মতই ওই মহাশূন্যের দরজায় গিয়ে করাঘাত করবে। তাঁর ছন্দময় অথচ নীরব আর দীর্ঘস্থায়ী এই কবিতাগুচ্ছের চারপাশে কোনো শঙ্খধ্বনি না করেই তিনি এক স্বর্ণবলয়ের মধ্যে বসে তাঁর শেষ বিচারের দিনটির জন্য অপেক্ষা করে থাকবেন। সেই প্রতিভাত ঔজ্জ্বল্যের দিকে আমরা দিক-হারার মতই তাকিয়ে থাকবো।

জারজি বোরেজসজা

আমার জন্য জারজি বোরেজসজা পোল্যাণ্ডে আর অপেক্ষা করে থাকবেন না। পোল্যাণ্ডকে নতুন করে গড়ে তোলার জন্য একজন সাধারণ যোদ্ধা হিসাবে তিনি পোল্যাণ্ডে ফিরে গিয়েছিলেন। ওয়ারশ তখন বালি, ভাঙা ইট্ আর ধূলোর স্তূপ। রাস্তাঘাট, গাছপালা বলতে কিছুই নেই সেখানে—জারজির জন্য সেদিন সেখানে কেউ অপেক্ষা করে ছিলেন না। এই অসাধারণ প্রগতিশীল মানুষটির মাথায় নানান্ কর্মযজ্ঞের আয়োজন চলতো আর কার্যক্ষেত্রে সেইসব কাজকে রূপ তিনিই দিয়েছিলেন। তাঁর তৈরি রোটারী মেশিনের ছাপাখানায় ছাপা হতো হাজার হাজার বই, পত্রিকা আর খবরের কাগজ। পোল্যাণ্ডের মাটির এই মানুষটি নতুন পোল্যাণ্ড গড়ে তোলার স্বপ্নে তাঁর সর্বস্ব নিয়োজিত করেছিলেন এই রোটারী মেশিনের ছাপাখানায়।

আমার সঙ্গে তাঁর প্রথম দেখা হয় উত্তর পোল্যাণ্ডের ম্যাসুরিয়ান হ্রদের ধারে। গাড়ী থেকে নেমে অদ্ভুত রঙ-বেরঙের জামা গায়ে মুখভর্তি দাড়িওলা যে লোকটির সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হলো এবং যিনি ভাঙা ভাঙা স্প্যানিশ ভাষায় আমায় বললেন—পাব্লো, তোমাকে বড্ড ক্লান্ত দেখাচ্ছে, তোমার এখনি বিশ্রামের প্রয়োজন—তিনিই জারজি বোরেজসজা।

তারপর তাঁর সঙ্গে যেখানেই গেছি তাঁরই রোটারী মেশিনে ছাপা পত্র-পত্রিকার উপর তাঁর জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা শুনেছি। সব কিছুর শেষে আমায় বলতেন, 'পাব্লো—তোমার বিশ্রামের প্রয়োজন!'

ভোর রাত্রে ঘুম ভাঙিয়ে তিনি আমায় বেড়াতে নিয়ে যেতেন। কোনো কোনো দিন ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ম্যাসুরিয়ান হ্রদের ধারে বসে মাছ ধরেছি—শ্রান্ত হয়ে বাড়ি ফিরেছি—রাস্তা দিয়ে ফেরার সময় তিনি বার বারই আমায় বলতেন, 'পাব্লো, তুমি পরিশ্রান্ত—তোমার বিশ্রামের প্রয়োজন!'

যেদিন তাঁর কাছ হতে বিদায় নিয়ে আসি সেদিন খুব বড়ো একটা 'ঈল' মাছ সিদ্ধ করে রাস্তায় আমার খাওয়ার জন্য দিয়েছিলেন। অতো বড়ো 'ঈল' মাছ নিয়ে আসার অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও আমি 'না' বলতে পারিনি তাঁর কাছে। পথেই অবশ্য মাছটি বিলিয়ে দিয়ে এসেছিলাম।

সর্বক্ষণের জন্য দুর্দমনীয় গতিশীল জারজি বোরেজসজা আজ তাঁর জীবনের প্রথম বিশ্রাম গ্রহণ করছেন।—যে অন্ধকার তাঁর খুব প্রিয় ছিলো আজ সেই অন্ধকারের মধ্যেই তিনি চিরবিশ্রাম নিচ্ছেন। তাঁর বিশ্রাম-ঘরের পাশে তাঁরই স্বপ্ন আজ বাস্তবে রূপায়িত হতে চলেছে।

গিয়েরগি সোম্‌লিয়ো

হাঙ্গেরীতে যা আমায় খুবই আকৃষ্ট করেছিলো তা হচ্ছে ওখানকার কবিকুল, কবিতার সঙ্গে ইতিহাস ও সময়টাকে নিজেদের সঙ্গে একাত্ম করে ফেলেছেন। অন্যান্য দেশে সাধারণতঃ এই সব বিষয় আলাদা আলাদাভাবে আলোচ্য বস্তু হয়ে থাকে।

হাঙ্গেরীতে প্রত্যেক কবি তাঁর জন্মের আগেই প্রতিশ্রুত। এ্যাটিলা জোজসেফ, এন্দ্রে এ্যাডি, গাইউল্লা ইল্লেয়স—এ'রা প্রায় সকলেই স্বভাবজাত কবি। স্বদেশ ও কর্তব্যবোধ, প্রেম বা বিরহ-বেদনা, সঙ্গীত ও অন্ধকার ইত্যাদি নানান্ অনুভূতির মধ্যে যে নিজস্ব একটা আদান-প্রদানের সম্বন্ধ আছে তার মর্মার্থটুকু এই সকল কবি যথাযথভাবেই অনুভব করতে পেরেছিলেন।

গিয়েরগি সোম্‌লিয়ো তাঁর কুড়িটি বছরের কবি-জীবনে যে দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের স্বাক্ষর রেখে গেছেন তা অতুলনীয়। তাঁর নিজের জীবনকে তিনি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন আরো হাজার জীবনের মধ্যে, তারপর হাজার-লক্ষ জীবনকে তিনি আঁকড়ে ধরেছিলেন নিজের জীবন দিয়ে—তাঁর প্রতিটি অস্থি-মজ্জায় ছিলো হাঙ্গেরিয়ান সভ্যতা—তার প্রতিটি রচনায় হাঙ্গেরীয় জীবনের স্বপ্ন বেহালার সুরের মতো ধ্বনিত হয়ে উঠেছে।

এই যুগকে এই নবীন চিন্তাশীল কবির বক্তব্যকে শুনতেই হবে। তাঁর স্বচ্ছ শান্ত কবিতায় আছে সুরার মাদকতা—যে সুরার জন্ম স্বর্ণাভ বালিতে।

কোয়াসিমোদো

ইতালির বিশুদ্ধ মাটির গভীরতম স্তরের মধ্যে লুকিয়ে আছে প্রাচীনতম কবিদের স্বর ও ভাষা। য়ুরোপের কবিতাকে ইতালি দিয়েছে রূপ, শব্দ, অলঙ্কার ও ভাবাবেগ। য়ুরোপীয় কবিতার মলিন গাত্রাবাসকে সরিয়ে দিয়ে সে তার সারা অঙ্গ জুড়ে পরিয়ে দিয়েছে হীরক-খচিত বর্ণোজ্জ্বল পরিচ্ছদ।

আমরা যারা ১৮৮০ শকাব্দের কবিতা বা সংস্কৃতির বর্তমান যুগে এসেছি—আমাদের আশ্চর্য লাগে যে, ১২৩০ বা ১৩০০—১৪৫০ শকাব্দের ইতালির কাব্য ও সংস্কৃতির স্বর্ণযুগকে দেখে—যে যুগে দান্তে, ক্যাভালকান্তি, পেত্রার্ক ও পলিজিয়ানোর মতো কবিরা বিরাজমান ছিলেন।

ইতালির এই উজ্জ্বল আলোর স্পর্শ লেগেছিলো বসকান, গংগোরা, কুইভেদো প্রভৃতি কবির স্বল্পান্ধকার জগতে। শেক্সপীয়রের সনেটকে দিয়েছিলো কাঠামো আর ফ্রান্সের বাগানে সেদিন গোলাপের মতো ফুটে উঠেছিলো কবি রসাঁর এবং দ্য বিল্লে। এই যেখানে অবস্থা—সেখানে এটা অতি স্বাভাবিক যে, পরবর্তী যুগের

ইতালিয়ান কবিদেরকে অত্যন্ত শক্ত কঠিন জমির উপরে তাঁদের নিজস্ব উজ্জ্বলতায় প্রকাশিত হতে হবে।

বেশ কয়েক বছর ধরে কবি সালভাদোর কোয়াসিমোদোকে আমি চিনি এবং তাঁর কবিতার নৈতিক চেতনাবোধ আমার কাছে এক অলীক ছায়ামূর্তির মতো মনে হয়েছে তাঁর অগ্নিগর্ভ প্রকাশের মাধ্যমে। বিশ্বমানবতা বোধের সবচেয়ে বড়ো উদাহরণ কোয়াসিমোদো, তিনি পূর্ব এবং পশ্চিমের জগতকে তরবারী দিয়ে দ্বিখণ্ডিত করেন নি বরং তাঁর কবিতায় সত্য, স্বাধীনতা, শান্তি ও সুখ—যা পৃথিবীর সমস্ত মানুষের সমভাবেই প্রাপ্য তারই সুর ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। পৃথিবীর শব্দ আর রঙ তাঁর কবিতায় এক বিষাদাচ্ছন্ন অথচ সুনিয়ন্ত্রিত ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে। মানুষের জন্য তাঁর গভীর দুঃখবোধ পৃথিবীর বুকে তিনি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন—তার গন্ধ, রূপ আর স্বরের মাধ্যমে। মনে হয় পৃথিবীর মাটিতে তিনি নতুন আশার বীজ বপন করছেন।

আরাউকোনিয়ার একটি সুরভিত বৃক্ষপত্রের মুকুট তৈরি করে এই সমুদ্র আর দূরত্বের উপর দিয়ে হাওয়ায় ভাসিয়ে দিলাম,—এই বাতাস, এই প্রাণ তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে কোয়াসিমোদোর মাথায় পরিয়ে দেবে। ফ্রানসিসকো পেত্রার ছবিতে এপোলোর যে শিরোমাল্য আমরা দেখতে পাই—এ সে মুকুট নয়, এটি আমাদের অনাবিষ্কৃত জঙ্গলের নামহীন সুরভিত বৃক্ষপত্রের মুকুট যার পাতাগুলি দক্ষিণের সুগন্ধি-শিশিরবিন্দুতে ভেজা।

ভেল্লিজো বেঁচে রয়েছেন

রাশভারি খাঁটি মানুষ ভেল্লিজো ছিলেন সম্পূর্ণ অন্য ধাঁচের। প্যারিসের দূষিত আবহাওয়া আর জল ভেল্লিজোর সহ্য হয়নি, প্যারিতেই তিনি মারা যান। যদি তাঁকে পেরুতে ফিরিয়ে আনা যেতো তাহলে পেরুর আবহাওয়ায় তিনি আরো কয়েকটা বছর বেঁচে থাকতেন, হয়তো আরো কিছু কবিতা তিনি লিখে যেতে পারতেন। আমার এই প্রিয় কমরেড বন্ধুটির জন্য দু'খানি কবিতা লিখেছিলাম। জীবনের কিছুটা সময় আমরা এক সঙ্গে কাটিয়েছিলাম। কবিতার গভীর রহস্যময় জগৎ বলতে কি বোঝায় আমি জানি না তবে কবিতার স্পষ্টতাকে আমি বুঝি। মানুষ আর তার সৃষ্টির মধ্যে অকৃত্রিম একটি যোগাযোগ রয়েছে, যেমন আছে চক্ষু, কর্ণ, অন্তরযন্ত্র ও রক্তের সঙ্গে শরীরের যোগাযোগ। আমি এর অন্তর্নিহিত তত্ত্ব জানি না—আমি আমার মতবাদকেও কারুর উপর চাপিয়ে দিতে চাই না। আমি আর সকলের সঙ্গে এটা বিশ্বাস করি যে, সোমবার সব কিছুকেই উজ্জ্বল দেখায় আর মঙ্গলবার সব কিছুই কালো মনে হয়। আমি বিশ্বাস করি যে, এখন আমরা অন্ধকার ও আলোর বছরের দিনগুলির মধ্য দিয়ে চলেছি—আগামী কালটা চমৎকার নীলাভ আলোয় ভরে যাবে। কাজেই আজ ভেল্লিজো মৃত ও নেরুদা বেঁচে রয়েছেন—আবার এমন দিনও আসতে পারে যখন নেরুদা হবেন মৃত আর ভেল্লিজো বেঁচে থাকবেন।

গেব্রিয়েলা মিস্ত্রাল

আগেই আমি লিখেছি যে, গেব্রিয়েলা মিস্ত্রালের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয় আমার গ্রামের তেমুকো শহরে। পরে অত্যন্ত অসম্মান ও দুঃখজনক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে তাঁকে চিরদিনের মতো এই শহর ছেড়ে চলে যেতে হয়। সেদিন তাঁকে একজন 'খ্রীষ্টান সন্ন্যাসিনী'র মতো দেখতে হয়েছিলো।

কুমারী অবস্থাতেই তিনি তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ "মা ও সন্তান" বইটি লেখেন—তাঁর লেখনীর অনবদ্য সৌন্দর্য, আর অলঙ্কার এবং ভাষার স্বচ্ছতা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ছিলো। তাঁর গদ্য রচনাও ছিলো কবিতার মতই মর্মস্পর্শী। কিন্তু তখনকার সময়ে একজন কুমারী মেয়ের পক্ষে 'মা ও সন্তানের' এই স্পষ্ট বর্ণনাকে অনেক উন্নাসিকই ভালো চোখে দেখেন নি। এবং এই নিয়ে তাঁর সম্বন্ধে সে সময়ে অনেকই নোংরা আলোচনা হয়েছিলো।

কয়েক বছর পরে তাঁর কাব্যগ্রন্থের যখন দ্বিতীয় সংস্করণটি প্রকাশিত হলো তখন বইটির ভূমিকায় তিনি সেই সমস্ত নোংরামির তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন যদিও সেই নোংরা আলোচনা পৃথিবীর একপ্রান্তে এই পর্বতমালার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো।

মিস্ত্রাল যেদিন "নোবেল পুরস্কার" পেলেন তারপর থেকে তেমুকোর সব মানুষই জানতো যে, তিনি তেমুকো শহর পেরিয়েই পুরস্কার আনতে যাবেন। তাই প্রায় প্রতিদিনই স্কুলের ছেলে-মেয়েরা দক্ষিণের সবচেয়ে সুন্দর ফুলের গুচ্ছ হাতে তাঁকে সম্বর্ধনা জানানোর জন্য বৃষ্টি, জল, কাদা উপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে থাকতো তেমুকোর রাস্তার ধারে। কিন্তু বৃথাই ছিলো সে প্রতীক্ষা, একদিন কখন সকলের অজান্তে তিনি তেমুকো শহরকে ফেলে রেখে চলে যান।

এই ঘটনা কি তাঁর সম্বন্ধে কোনো খারাপ ধারণার সৃষ্টি করে? না—তা নয়, যে অপমান ও অপবাদের ক্ষত তেমুকো শহরে শুরু সেই ক্ষত তাঁর জীবন থেকে তখনও শুকিয়ে যায়নি। এতে আরেকটি জিনিস প্রমাণিত হয় যে, এই অপরূপ স্বর্গীয় কাব্যের স্রষ্টার মনে ভালোবাসা ও বিদ্বেষ দুই-ই স্থান পেয়েছিলো।

আমি যখনই তাঁর কাছে গিয়েছি তখনই দেখেছি আমার জন্য স্মিত হাসিতে তাঁর মুখটি ভরা থাকতো যেমন দেখায় কালো রুটির উপরে ময়দার গুঁড়ো ছড়িয়ে দিলে।

কি প্রাকৃতিক সম্পদে ভরা ছিলো তাঁর কবিতা—কোন্ আগুনে তা জ্বলে উঠে দিগন্তকে আলোকিত করে তুলেছিলো—কি ছিলো তাঁর গুপ্ত ক্ষমতা যা দিয়ে তিনি বেদনাময় করে তুলতেন তাঁর কবিতাগুচ্ছকে—এসব জানার চেষ্টা বা তা নিয়ে কোনো আলোচনা আমি করবো না—জানলেও তা আমি প্রকাশ করবো না।

সেপ্টেম্বর মাসের এই সময়টায় বুনো সর্ষে ফুলের স্তরে সমস্ত গ্রামাঞ্চলকে দেখায় একটা হলুদ বর্ণের গালিচার মতো। গত চারদিন ধরে দক্ষিণের পাগলা ঝোড়ো

বাতাস বার বার এসে আঘাত করে চলেছে—রাত্রিটা তারই মর্মরধ্বনিতে ভরে থাকে। সমুদ্রকে দেখায় বিশাল শুভ্র তটরেখার পাশে স্বচ্ছ নীল স্ফটিকের মতো।

—এসো গেব্রিয়েলা, এখানে এসো। তুমি তো এই বুনো সর্ষে ফুল, এই পাথর আর এই পাগলা-ঝোড়ো হাওয়ারই প্রিয়তমা কন্যা। আমরা সবাই উল্লাসধ্বনি দিয়ে স্বাগত জানাবো—তোমার সেই কাঁটাগাছের গান আর চিলির তুষারপাতের সঙ্গীত কেউই ভুলতে পারবে না। তুমি তো চিলিরই মেয়ে, চিলির জনতার মধ্যেই তো তোমার স্থান। তোমার কবিতায় আমাদের শিশুদের 'নগ্ন পা'-এর যন্ত্রণা কেউ ভুলবে না। তুমি তো আমাদের ভ্রাম্যমান শান্তির দূত। সব কিছুর জন্যই তো তুমি আমাদের ভালোবাসার ধন বলবো: এসো গেব্রিয়েলা—এই বুনো সর্ষে ফুলের উপর পা রেখে তুমি এগিয়ে এসো। এই কণ্টকগুচ্ছের উপর দিয়ে হেঁটে তুমি চিলিতে ফিরে এসো। আমি এই কাঁটাগাছ আর সর্ষে ফুলের রাজত্বে তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছি। তোমার একজন অকৃত্রিম বন্ধু হিসাবে আমি তো জানি তুমি তাই-ই চাও। লোহা আর কাঠ দিয়ে তৈরি আমাদের এই সেপ্টেম্বরের দরজা তোমার জন্য খুলে রেখেছি। আর কোনো কিছুই আমায় তেমন করে খুশি করবে না—যদি তুমি তোমার মুখভরা ওই মিষ্টি হাসিটুকুকে সঙ্গে নিয়ে চিলির মাটিতে ফিরে এসে চিলির জনতার গান গাও। তোমার কবিতার আন্তর্জাতিক সম্মানের জন্যে এসো—আমি তোমার কপোলে একটি পবিত্র চুম্বন চিহ্ন এঁকে দিই।

ভিনসেন্তি হুইদিব্রো

বিখ্যাত এই কবি ভিনসেন্তি হুইদিব্রো যিনি পৃথিবীর সব কিছুকেই সন্দেহের চোখে দেখতেন, তিনি আমাকে প্রায়ই চিঠি লিখে এই বলে শাসাতেন যে—আমি নাকি সাহিত্যের চৌর্যবৃত্তি করি!

যদিও কালির খোঁচায় তিনি সারাজীবনই আমায় সম্মানিত করেছিলেন তবু আমার পক্ষে তাঁর নিন্দাবাদ করা খুবই দুষ্কর। তিনি তাঁর নিজের মাথায় নিজেই 'কবিতার ভগবান' নামক শিরোমাল্যটি পরিয়েছিলেন। প্যারিসের নতুন কায়দার কবিতা লেখাটা তিনি এবং তাঁর সঙ্গীরা আকণ্ঠ পান করার পর সৃষ্টি করতে শুরু করলেন 'অধিবাস্তবতাবাদ'। তাঁদের কাছে আমার পরিচয় ছিলো 'হতাশ-মুর্খ একটা গ্রামের ছেলে'!

কিংবদন্তিতে এই মানুষটির কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে তিনি যখন চিলিতে ফিরে এলেন তখন তাঁর জীবনের শেষ অংক প্রায় সমাগত। সেই সময়ে পুরোনো জঙ ধরা একটা টেলিফোন তিনি সবাইকে দেখিয়ে বেড়াতেন আর বলতেন: 'জানো হে, এটি হচ্ছে হিটলারের অতি প্রিয় নিজস্ব টেলিফোন—আমি নিজে তাঁর কাছ থেকে চেয়ে এনেছি।' একবার এক অনুষ্ঠানে তাঁকে একটি অতি

সাধারণ ভাস্কর মূর্তি দেখানো হয়। দেখার সাথে সাথেই তিনি বলে ওঠেন—'এঃ, এ তো দেখছি মাইকেল এঞ্জেলোর চেয়েও খারাপ—!'

এখানে ১৯১৯ সালের একটি বিস্ময়কর ঘটনার উল্লেখ করা একান্তই প্রয়োজন। হুইদিব্রো সে সময়ে প্যারিসে একটি প্রচার পুস্তিকা মুদ্রিত করলেন যার নাম ছিলো—'ব্রিটেনের শেষাবস্থা। তাতে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী ছিলো—এবার বৃটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংস হবে। তাঁর এই প্রচার পুস্তিকার যখন কেউ কোনো গুরুত্ব দিলো না এবং তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী যখন ফলপ্রসূ হলো না তখন ঠিক করলেন—তিনি হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যাবেন। পরদিনই খবরের কাগজের প্রথম পাতায় শিরোনামা বেরুলো: 'চিলির রাজদূতের রহস্যজনক অপহরণ—'।

কয়েকদিন পরে তাঁকে তাঁর বাসগৃহের দরজার সামনে পাওয়া গেল। পুলিসের জিজ্ঞাসাবাদের উত্তরে তিনি বলেছিলেন—কয়েকজন বৃটিশ 'বয় স্কাউট' তাঁকে ধরে নিয়ে গিয়ে বেঁধে রেখে তিনবার 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ দীর্ঘজীবী হোক' এই কথাটি বলানোর পর এখানে ছেড়ে দিয়ে গেছে। এই কথা ক'টি বলার পরই পুলিসের সামনে তিনি আবার অজ্ঞান হওয়ার ভান করেন। পুলিস তাঁর কাছ থেকে যে ব্যাগটি পায় সেটি খুলে দেখা যায় তার মধ্যে কয়েকটি নতুন পাজামা ও অন্তর্বাস রয়েছে মাত্র তিনদিন আগে প্যারিস থেকে যেগুলি কেনা হয়েছে। তবে এই সমস্ত ঘটনার আসল রহস্য যেদিন উদ্ঘাটিত হলো—সেদিন কবি তাঁর প্রিয় বন্ধু জুয়ান গ্রিসকে হারালেন। কারণ তাঁর এই মুদ্রাকর বন্ধুটি তাঁর অপহরণের কথা বিশ্বাস করেই খবরটা ছাপিয়েছিলেন। পরে অবশ্য এই মিথ্যা সংবাদকে তিনি কোনদিনও ভুলতে পারেন নি।

হুইদিব্রোর কবিতা স্বচ্ছ স্ফটিকের মতো, তাঁর কবিতার প্রতিটি ছন্দ সংক্রামক আনন্দে ভরপুর। য়ুরোপিয়ান কবিতার ঔজ্জ্বল্য তাঁর কবিতার প্রতিটি ছত্রে। আমার কাছে যা সবচেয়ে আশ্চর্যের মনে হয়েছে সেটি হচ্ছে তাঁর কবিতার স্বচ্ছ নির্মলতা। এই সাহিত্যিক কবি প্রকৃতি ও পৃথিবীর আর সব কিছুকেই অস্বীকার করে শুধুমাত্র জলপ্রপাতের সঙ্গীত শুনিয়েছেন আমাদের। ফরাসী সাহিত্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েও তাঁর কাব্যের চমৎকারিত্ব ও স্পষ্টতা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। তাঁর কবিতা পড়তে পড়তে মনে হয় ভিতরের হুইদিব্রোর সঙ্গে বাইরের হুইদিব্রোর তীব্র একটা সংঘাত চলেছে।

এটা অনস্বীকার্য যে, কবিতার গভীরতার প্রতি আমাদের একটা সংস্কার তাঁর রচনাকে আমাদের কাছ হতে দূরে সরিয়ে রেখেছে। যদিও মৃত্যু তাঁর নশ্বর দেহকে গ্রাস করেছে কিন্তু তাঁর জীবনের উজ্জ্বলতম দিকের একটি দরজাকে খুলে দিয়ে গেছে। তাঁর মৃত্যুর পর আমি সরকারের কাছে একটি প্রস্তাবে অনুরোধ জানিয়েছিলাম যে, রুবেনদারিওর মূর্তির পাশে তাঁর একটি মূর্তি স্থাপিত হোক। কিন্তু আমাদের সরকার বাহাদুর বহু গর্দভের মূর্তি তৈরি করতে এতই ব্যস্ত যে, একজন কবির প্রতিকৃতি তৈরি করার মতো পয়সা তাঁদের হাতে ছিলো না।

হুইদিব্রো বিপ্লবের সীমানা পর্যন্ত এলেও তাঁকে আমরা বিপ্লবী কবি আখ্যা দিতে পারি না বা তিনি রাজনীতি-সচেতন কবি এ কথাও বলতে পারি না তবে তাই বলে মুক্ত আকাশে ডানা মেলে তাঁর উড়ে বেড়ানো বন্ধ করতে ডানায় পিন ঢুকিয়ে নষ্ট করে দেবার অধিকারও আমাদের নেই। অক্টোবর বিপ্লব ও লেনিনের

উদ্দেশে লেখা তাঁর দুটি কবিতা গণসচেতনতা ও গণজাগরণের আবেদনে ভরপুর ছিলো।

ইস্‌লানেগ্রার কাছে কারটাজেনা শহরে ১৯৪৮ সালে হুইদিব্রো মারা যান। মৃত্যুর আগে লেখা তাঁর গভীর ভাবাপন্ন হৃদয়বিদারক কবিতাগুলি আমি জীবনেও ভুলবো না। মৃত্যুর কিছুদিন আগে, আমার বন্ধু ও প্রকাশক গনজালো লোসাদোকে সঙ্গে নিয়ে হুইদিব্রো আমার ইস্‌লানেগ্রার বাড়িতে এসেছিলেন। সেদিন আমরা দুজনে চিলির ঘনিষ্ঠতম বন্ধু হিসাবে শুধু কাব্য আলোচনা করেই কাটিয়েছিলাম।

সাহিত্যিক শত্রু

আমার মনে হয় কবি আর সাহিত্যিকদের মধ্যে ছোটো-বড়ো ঝগড়া-বিবাদ পৃথিবীর সর্বত্র সব সময়েই থাকবে।

আমেরিকাতে সাহিত্যের আত্মহত্যা এমন কোনো একটা ঘটনাই নয়, এটা ওখানে হামেশাই হয়ে থাকে। বিপ্লবোত্তর রাশিয়াতেও মায়াকভস্কিকে একদল হিংসুক লোক মেরে ফেলার জন্য টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত আত্মরক্ষার্থে নিজস্ব পিস্তল থেকে গুলি চালিয়ে কোনো রকমে তিনি রক্ষা পান।

সাহিত্যের এই হিংসা-বোধটা মাঝে মাঝে পেশাদারী হয়ে পড়ে। আমার নিজস্ব ধারণা—এটা আমরা স্পেন থেকেই পেয়েছি, সাহিত্যের হিংসা ও প্রতিশোধ প্রবৃত্তি যেখানে চরমে। কুইভেদো, গনগোরা প্রভৃতি অনেকেই নিজেদের মধ্যে যথেষ্ট কাদা ছোঁড়াছুড়ি করেছেন। বুদ্ধিদীপ্ত এই ঔজ্জ্বল্যের পিছনে স্পেনের স্বর্ণযুগ ছিলো প্রাসাদের দরজার বাইরের বুভুক্ষু যুগ।

গত কয়েক বছরের মধ্যে গভীর গর্জনধ্বনি সহ নিজেদের শিঙা ফুঁকতে ফুঁকতে বেশ কিছু ঔপন্যাসিক নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। যেমন গারসিয়া মারকুইজ, জুয়্যান রুলফো, সিবাতো ইত্যাদি অনেকেই। আমি এঁদের অনেকের লেখাই পড়েছি—ব্যক্তিগতভাবে এঁদের অনেকের সঙ্গে আমার পরিচয়ও হয়েছে। এঁদের অনেকের লেখার মধ্যে উদার ও স্বাস্থ্যকর আবহাওয়াটা আমার ভালোও লেগেছে। এঁদের মধ্যে অনেককেই রাজনৈতিক বা ব্যক্তিগত কারণে স্বদেশ ছেড়ে চলে যেতেও হয়েছে। এঁদের এই স্বেচ্ছা-নির্বাসনের যুক্তি যদিও অখণ্ডনীয় তবু আমার মনে হয় এঁদের মধ্যে অনেকের মনেই আমেরিকার স্বপ্ন লুকিয়ে আছে।

আমি যেমন চাই না যে, আমি শুধু নিজের কথাই লিখি তেমনি আমি নিজেকে আত্মকেন্দ্রিক করে তুলতেও অনাগ্রহী। কিন্তু আমি বহু রঙচঙে সুশ্রী মানুষের হিংসা, দ্বেষ ইত্যাদি অনেক কিছুই সংগ্রহ করেছি। ক্রমাগত জ্বালাতনের ছায়া মাঝে মাঝে আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়েছে—যদিও আমি জানতাম তাঁদের এই জ্বলুনি আমার প্রশংসাবৃদ্ধিতেই সাহায্য করেছে। এমনই একজনের গল্প আপনাদের জানাচ্ছি।

আকস্মিক এক মৃত্যু এসে আমার এমন একজন প্রতিপক্ষকে নিয়ে গেল যিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমাকে ধ্বংস করার জন্য বহু চেষ্টাই করেছিলেন। আজও

আমি অনেক সময়ে তাঁর অভাব অনুভব করি। দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে একজন সাহিত্যিকের নির্যাতন নিশ্চয়ই একটি স্মরণীয় ঘটনা। আমার শুধু একটাই দুঃখ যে, এই মানুষটি সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে নিজের ছায়ার বিরুদ্ধেই লড়াই করে গেলেন, সেই লড়াইতে আমি কোনদিনও কোনো অংশই নিইনি। পঁচিশটি পত্রিকার তিনি সম্পাদনা করে এসেছেন শুধুমাত্র আমাকে ধ্বংস করার জন্য। আমি এবং আমার রচনার বিরুদ্ধে তিনি যে বিষোদ্গার করতেন তার মূল কথা ছিলো—আমি বিশ্বাসহন্তা এবং সাহিত্য-জগতের ঘৃণ্যতম অপরাধী। আমি একজন নামকরা পাপী—আমার পাপাসক্ত ব্যক্তিগত জীবনকে জনজীবনে প্রচারিত করতে চাই এবং আমি একজন বিকৃত যৌন-জীবনের উপাসক ও প্রচারক। নানান্ প্রচার-পত্র ও পত্রিকা মারফৎ তিনি আমার বিরুদ্ধে এই সংগ্রামে নেমেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত একটি পুস্তিকাও তিনি প্রকাশ করলেন যার নাম দিয়েছিলেন 'আমি ও নেরুদা'।

আমাদের এই অক্ষরেখায় শীতার্ত সকালে আমরা দরিদ্র, ছিন্নবেশপরা নগ্ন পায়ের কবির দল এই সব ওগরানো বমির উপর দিয়ে হেঁটে বেড়িয়েছি। এই অবিশ্বাস ও নীৎসের মতো নিন্দাবাদের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে বহু দরিদ্র কবিরই অকালমৃত্যু ঘটেছে। এই ভদ্রলোক প্রথম দিকে বহু চেষ্টা করেছিলেন যাতে আমি তাঁর নির্ধারিত পথে চলাফেরা করি কিন্তু সুবিধাবাদের রাজনীতিতে আমি কোনদিনও বিশ্বাস করিনি।

এবার ভদ্রলোকের পরিচয়টা জানানো দরকার—ইনি হচ্ছেন 'জো রো', লোমশ এক ব্যক্তি যিনি ছন্দ আর শরীরের পেশী সঞ্চালন দেখিয়ে মানুষকে আকর্ষণ করতেন।

আমার তখন আঠারো-উনিশ বছর বয়স। সেই সময়ে তাঁর কাছ থেকে প্রস্তাব এলো—যাতে আমি এবং উনি মিলে যৌথ সম্পাদনায় একটি পত্রিকা বার করি। পত্রিকার বিষয়বস্তু হবে সাহিত্য সমালোচনা। শর্ত ছিলো যে, তিনি আমাকে একজন প্রতিভাবান, অদ্বিতীয় কবি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করবেন এবং আমি তাঁকে তীক্ষ্ণবুদ্ধি-সম্পন্ন, বহুমুখী এবং প্রতিভাবান একজন সাহিত্যিক ও সমালোচক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করবো। প্রস্তাবটা শুনে আমার ওই অপরিণত বয়সেও মনে হয়েছিলো এটা যেন সৎ-সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটা দালালি বৃত্তি।

আজ এই অনুস্মৃতি লেখার সময়ে মন আমার দ্বিধাগ্রস্ত ছিলো, এই ব্যক্তিটির সম্বন্ধে কিছু লেখা কি ঠিক হবে? শেষ পর্যন্ত ঠিক করলাম লেখাই উচিত কারণ এই অনুস্মৃতিই এর প্রকৃত স্থান।

আমার প্রতিপক্ষ মানুষটি শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধ বয়সে আত্মহত্যা করেন। এক ধরনের তীব্র ঘৃণা আর বিদ্বেষ সমগ্র স্প্যানিশ সাহিত্যকে আজ কলুষিত করে তুলেছে। সাহিত্যিকের সৃষ্টি আজ হিংসার আগুনে দগ্ধ। শুধু একটি মাত্র উপায়ে এর অবসান ঘটানো যেতে পারে যদি জনসমক্ষে এঁদের মুখের কালো মুখোশটিকে খুলে দেওয়া যায়।

প্রসঙ্গতঃ একজন উরুগুয়ের কবি যাঁর নামের শেষ অংশটাই "রিবোরো"—শুধু আমার মনে আছে—যিনি আমার রাজনৈতিক বিশ্বাস ও রচনায় এতই ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন যে, আমাকে অপদস্থ ও অপমান করার জন্য শুধু যে বহু চেষ্টাই করেছিলেন তাই

নয় প্রভূতে অর্থব্যয়ও করেছিলেন।

'অক্সফোর্ড' বিশ্ববিদ্যালয় যেবার আমায় 'ডক্টরেট' উপাধি দান করার সিদ্ধান্ত নেন সেবার তিনি ছুটে যান অক্সফোর্ডে যাতে আমাকে ওই সম্মানজনক উপাধি দান করা না হয় সেজন্য তদ্বির করতে।

আমি আজও অক্সফোর্ডের লাল গাউনটিকে গায়ে জড়িয়ে বসে আছি। আমার মনে পড়ছে সেদিন সেই সম্মানলাভের পর রাত্রের ভোজসভায় সেই কবির কীর্তিকলাপ বলতে বলতে অক্সফোর্ডের বিদগ্ধ ব্যক্তিরা কেমন ব্যঙ্গাত্মক হাসি হেসেছিলেন।

আরো ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটেছিলো স্টকহলমে। কিছুদিন ধরেই কানে আসছিলো যে, ১৯৬৩ সালের সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারের জন্য আমার নামই নাকি মনোনীত হয়েছে। এই খবরটা যখন তাঁর কাছে পেঁছালো তখন তিনি ছুটে গেলেন স্টকহলমে—কমিটির সভ্য-সভ্যাদের সঙ্গে দেখা করে আমার নামে নানান অপবাদ ও অপব্যাখ্যার পর তাঁদের জানিয়ে এসেছিলেন 'আমিই নাকি ট্রটস্কির হত্যাকারী'!

সময় অবশ্য পরে এই কথাটাই প্রমাণ করেছিলো যে, ভদ্রলোকের নেহাতই মন্দভাগ্য। অক্সফোর্ড ও স্টকহলম—দুজায়গাতেই তিনি শুধু শুধু প্রচুর অর্থের অপব্যয় করেছিলেন।

সমালোচনা ও আত্মসমালোচনা

এতে আমার বা কারুরই কোনো দ্বিমত নেই যে, আমার বহু শুভার্থী ও সু-সমালোচক আছেন—যাঁরা বিনা প্ররোচনায় আমার নিন্দাবাদ করে থাকেন তাঁদের আমি কিছু বলতে চাই না। যে ক'জন আমার সত্যিকারের সমালোচক আছেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ করে যুবক রাশিয়ান সমালোচক লেভ অসপোভাটকে আমার মনে পড়ে যিনি স্প্যানিশ ভাষা শিখেছিলেন আমার কবিতার মর্মার্থ বোঝার জন্য।

এমির রডরিগুয়েজ মনেগাল যিনি আমার সমালোচনা করতে গিয়ে "গতিহীন পর্যটক" নামে একটি বইও লিখেছিলেন। আপনারা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে, তিনি একজন সংতাদরের মনরাখা গোছের সমালোচক ছিলেন না।

আমাদো আলানসোর লেখা "নেরুদার কবিতা ও তার বৈশিষ্ট্য" এমন একটি গ্রন্থ যা সহজেই খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলো। আমার কবিতার ছায়ার মধ্যে তিনি অনুসন্ধান করেছেন আমার শব্দ সংযোজন ও পিচ্ছিল বাস্তবতাবোধের মধ্যে যে একাধিক চিন্তা বিদ্যমান তাঁর সমালোচনার প্রধান বিষয়ই এই। আমাদোর রচনা পড়ে আমার মনে হয়েছে যে, আমার সমসাময়িক ও সমকালীন কবি ও কবিতার উপরে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা এবং এতেই আমি নিজেকে সম্মানিত বোধ করেছি। আমার কবিতা পড়তে বা তার প্রকৃত ব্যাখ্যার জন্য বহু সমালোচকই আমার কাছে আসতেন—তাঁদের মধ্যে আমাদো আলানসোরও ছিলেন। তাঁর কঠিন প্রশ্নবাণের উত্তর দিতে গিয়ে আমার নিজের রচনাই আমার কাছে অনেক বিষয়ে আরো স্পষ্ট হয়ে গেছে।

কেউ কেউ ভাবেন আমি 'অধিবাস্তববাদে' বিশ্বাসী—কেউ মনে করেন আমি অতিমাত্রায় বাস্তববাদী, আবার কেউ কেউ আমাকে কবি বলে মানেন না। "মর্তের অধিবাসী" (Residencia eu la fierra) বা "ক্ষুদ্র মানুষের ঝুঁকি' (Tentatira del bombre imfinito) এই দু'টি কবিতাই আমার মনে হয় অধিবাস্তববাদ যুগের বহু আগেকার রচনা। বাস্তববাদ সম্বন্ধে আমি একটা কথাই বলতে পারি যে, আমি কবিতায় বাস্তববাদে বিশ্বাস করি না। কবিতাকে কখনই অধিবাস্তববাদ, বাস্তববাদ বা অনুবাস্তববাদের কোনো পর্যায়েই ফেলা যায় না। বরং কবিতাকে বাস্তব-বিমুখ বলাই শ্রেয়ঃ। এই বাস্তব-বিমুখতা কবিতার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত বা অযৌক্তিক যাই হোক না কেন এটা স্বীকার করে নিতেই হবে যে, এটাই কবিতার প্রধান অংশ। বই আমি ভালোবাসি কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ মারা বই আমার ভালো লাগে না। বিশ্ববিদ্যালয়, বিদ্যালয় বা যে কোনো শ্রেণীর মার্কা ছাড়া বই-এরই আজ প্রয়োজন—যার বিষয়বস্তু হবে জীবন।

ওয়ালট্ হুইট্‌ম্যান বা মায়কাভস্কির 'প্রকৃত বীরপুরুষ'দের আমার ভালো লাগে কারণ যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে জন্মলাভ করে তাদের কাটাতে হয়েছিলো দুর্দশাগ্রস্ত জীবন—বীরপুরুষ হবার জন্য আমাদের এই দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করতে হয়েছিলো তাদের এবং আমাদের সঙ্গে বসে রুটি আর স্বপ্নের সমভাগ নিতে হয়েছিলো।

যে গতিতে মানুষের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বস্তুর মূল্যায়ন হয় না সমাজবাদী সমাজকে সে গতিপথের অবসান করতেই হবে। একজন সাহিত্যিক সব সময়েই চান অন্ততঃ একটা ভালো বই লিখতে। ওয়ালট্ হুইট্‌ম্যান বা মায়কাভস্কি যেসব প্রকৃত বীরপুরুষদের সৃষ্টি করেছিলেন সেই সব বীরপুরুষরা গৃহযুদ্ধের বিভীষিকাময় রাত্রিকে অতিক্রান্ত করে তবেই ঊষালগ্নে নায়ক হতে পেরেছিলেন। কিন্তু আমার মনে লত্রে ম্যোরের দুঃখী নায়ক বা লাফোরগের দীর্ঘনিঃশ্বাসের যেমন স্থান রয়েছে তেমনি রয়েছে ব্যোদ্‌লেয়ারের নঞর্থক সৈন্যদের জন্যও! সাবধান! এই সৃষ্টির আপেলকে দ্বিধাবিভক্ত করার আগে সাবধান! এমনও তো হতে পারে—এই দ্বিধাবিভক্ত হৃদযন্ত্র নিয়েও আমরা বেঁচে রয়েছি! সাবধান! একদিন আমরা এই কবিরা এই দাবী তো করতে পারি যে, রাস্তার লড়াইতে আমরাও অংশ নেবো অথবা এই আলো আর অন্ধকারের মধ্যে আমরাও বেঁচে থাকবো। কবিতার সবচেয়ে বড়ো সম্মান হলো রাস্তার লড়াইতেও সে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে পারে। কাজেই ইতিহাসের কাছে কবি সব সময়ের জন্যই কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। কবিতা তো একটা সোচ্চার প্রতিবাদ—কাজেই কোনো কবিরই "বিধ্বংসী" আখ্যালাভের জন্য ভয় পাওয়ার কিছু নেই। জীবন সব রকমের অবয়বকেই অতিক্রম করে চলে এবং সকল সময়েই আত্মার জন্য নতুন আইন রচিত হয়। আমাদের সব কল্পনাই অদ্ভুত, প্রতি মুহূর্তে তারা পরিবর্তনের অপেক্ষায় রয়েছে। আমরা পৃথিবীর অধিবাসীদের ভিন্নতর অবস্থায় দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে রয়েছি। এমন দিন আসন্ন যেদিন কবিতা আর বসন্তকাল দু'জনকেই দেখতে পাবো বিদ্রোহমুখীন অবস্থায়।

আমার সর্বস্বই আমি কবিতাকে দান করে দিয়েছি। কবিতাকে নিয়ে আমি যখন সংগ্রাম ক্ষেত্রে গিয়েছি তখন তার রক্তপাতে আমার শরীর দিয়েও রক্ত ঝরে পড়েছে, আবার যখন এসেছে তার জয় গৌরবের মুহূর্ত বিজয়ীর আনন্দে আমার বুকও ফুলে উঠেছে। মাঝে মাঝে অবশ্য আমাদের মধ্যে এক-একবার ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে তাতে আমি বা আমার কবিতা কেউই খারাপ বোধ করিনি।

ইকুয়েডোরের একজন বিখ্যাত সমালোচক জুয়্যান মেরিনেল্লো আমার "মর্ত্যের অধিবাসী" (Residentia en la fierra) বইটি সম্বন্ধে আমায় ভুল বুঝেছিলেন এবং তাঁর ধারণা হয়েছিলো যে, আমার সমগ্র রচনাই রাজনীতি প্রভাবান্বিত। অবশ্য আমায় ভালোবেসে আমার রচনা তিনি নিশ্চয়ই পড়েন নি বা আমাকে সামান্য বোঝবার চেষ্টাও তিনি করেন নি। আমি নিজেও অনেক সময়ে আমার এই বইটির সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করেছি। সানতিয়াগো শহরের সেই ছেলেটির কথা আমি কোনদিনও ভুলতে পারবো না—যার আত্মহত্যা করার পর তার কোলের উপরে এই বইটির একটি কবিতা (এর অর্থ ছায়া—Significa Sombras) পাতা-খোলা অবস্থায় দেখা গিয়েছিলো।

আমার যে বইটিকে—"বাতাস ও দ্রাক্ষাকুঞ্জ" (Las nvas y el viento) অনেকেই ভুল বুঝেছিলেন—সেই বইটিই আমার নিজের কাছে সবচেয়ে প্রিয় গ্রন্থ। কারণ পৃথিবীর বুকে আমি যখন ঘুরে বেড়িয়েছি তখনকার যে সব অনুভূতি ও রোমাঞ্চ আমার সত্তাকে স্পর্শ করেছিলো তার বেশির ভাগ বর্ণনাই আমার এই লেখাগুলির মধ্যে রয়েছে। এর প্রতিটি ছত্রে রয়েছে পথের ধুলো, নদীর জলের শব্দ, বন্যপ্রাণীর আর্তনাদ—সময়ের অনুবর্তন বা সেই সব সমুদ্রপারের দেশ যা আমার এখনও দেখা হয়নি বা সবেমাত্র দেখে ফিরে এসেছি। আমি আবারও বলছি—আমার নিজের কাছে এই বইখানিই সবচেয়ে প্রিয় গ্রন্থ।

আমার সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে "একসট্রাভেগেরিয়ো" (Estravagario) শুধুমাত্র যে গান গেয়ে উঠেছে তাই নয় লম্ফনেও তার জুড়ি খুবই কম। এর উচ্চ লম্ফনের জোরে সমস্ত প্রশংসা, কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা প্রভৃতিকে লাফ দিয়ে পার হয়ে গেছে গ্রন্থটি। এই অশ্রদ্ধার জন্যই এটি আমার নিজস্ব প্রিয় গ্রন্থ। সরকার ও সরকারের সব রকমের নির্দেশনামা বা মানুষের মধ্যেকার শ্রেণীবিভাগকে এই কবিতাগুলি বরদাস্ত করতে পারেনি। আমি এর স্বাদ পেয়েছি যদিও সেই স্বাদের মধ্যে প্রতিটি সত্যের মধ্যে যে নোনতা আস্বাদন আছে তাকে আমি উপভোগ করেছি।

আমার "প্রাথমিক কাব্যগাথা" (Odas elementales) শুরু হয়েছে মানুষের জন্মের প্রথম লগ্ন থেকে। আমি বর্ণনা করেছি সেই সব সঙ্গীত যা বার বার গীত হয়েছে মানুষের জন্মের শুরু থেকেই। আমার ইচ্ছা ছিলো—যেমন করে স্কুলের সেই ছেলেটি তার পেনসিলটা ঠোঁটের ডগায় ধরে রেখে চিবুতে চিবুতে ভাবে আর লেখে তার দেখা সূর্য, স্কুলের ব্ল্যাকবোর্ড ঘড়ি আর তার সংসারের সব কথাগুলিকে। আমি চেয়েছি আমার কোনো কিছুই যেন অব্যক্ত না থাকে, স্পষ্ট ভাষায় আমি যেন সব কিছু জানিয়ে যেতে পারি।

আমি প্রস্তরখণ্ডকে হাঁসের সঙ্গে তুলনা করেছিলাম বলে একজন উরুগুয়ে

সমালোচক অবাক হয়েছিলেন। তাঁর মতে হাঁস বা কোনো ছোটো বন্যপ্রাণী কোনো রকমের কবিতায় তুলনামূলক বস্তুর মধ্যে আসতেই পারে না। তাঁদের মতে সৃজনধর্মী কবিতা শুধু অজ্ঞাত বস্তুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। তাঁরা ভুল করছেন! আমরা এমন কবিতা লিখতে চাই যার বস্তু বা প্রতিপাদ্য মানুষের অখাদ্য বা ঘৃণ্য হলেও মানুষের জীবনকেই স্পর্শ করবে, যদিও সুরুচিপূর্ণ লোকের তা ভালো নাও লাগতে পারে।

মধ্যবিত্ত সমাজ কবিতাকে চিরকালই বাস্তবাবস্থা থেকে দূরে রাখতে চেয়েছে। ক্ষয়িষ্ণু ধনতন্ত্রবাদের কাছে সত্যধর্মী কবি খুবই বিপজ্জনক। ভিনসেন্তি হুইদিব্রো যিনি নিজেকে ছোটখাটো একজন ভগবান বলে প্রচার করতে চেয়েছিলেন ধনতন্ত্রবাদীদের কাছে তাঁর মতো কবিই শ্রেয়ঃ। এই রকম কবি বা তাঁদের কবিতা শাসকবর্গের কাছে কোনো সমস্যা হয়ে দেখা দেয় না। কবি তাঁর নৈসর্গিক জীবনে আশ্রয় নিয়ে আধ্যাত্মিক তত্ত্বে ব্যস্ত থাকবেন—এটাই শাসকবর্গের কাম্য কারণ তাহলে কবিকে ঘুষ দিয়ে প্রলোভিত করা বা তাঁকে ধ্বংস করার জন্য কোনো ভাবনাই তাঁদের ভাবতে হয় না। এই সব কবি নিজেকেই নিজে ঘুষ দিয়ে স্বর্গরাজ্যে আশ্রয় নিয়েছেন। এদিকে তাঁর পায়ের তলায় পৃথিবীর মাটিতে উজ্জ্বল সূর্যালোকের কম্পন শুরু হয়েছে!

আমাদের লাতিন আমেরিকার লক্ষ লক্ষ মানুষ নিরক্ষর। আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে এটাই ছিলো সবচেয়ে বড়ো অভিশাপ যার সৃষ্টি হয়েছিলো সামন্তবাদী শাসন ব্যবস্থা থেকে। আমার দেশের এই বিপুল সংখ্যক নিরক্ষর দেশবাসীর মধ্যে বসে আমি শুধু এইটুকুই বলতে পারি যে, আমাদের পাঠকরা এখনও জন্মগ্রহণ করেন নি। আমাদের পাঠক সংখ্যা বাড়াতে হলে জন্মহার আমাদের বাড়াতেই হবে। লাতিন আমেরিকার গৌরবময় দীপ্তালোকের আলো বাইরে দেখাতেই হবে।

সাহিত্য সমালোচকরা বেশির ভাগ সময়েই তাঁদের সামন্ততান্ত্রিক প্রভুদের মন রক্ষা করে চলেন। যেমন ১৯৬১ সালে আমার যে তিনখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় তার একটিও আমার দেশের একজন সমালোচকও সমালোচনা করে কোনো লেখাই লেখেন নি। প্রায় পুরো একটা বছর আমার কোনো গ্রন্থের সমালোচনা করা থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন তাঁরা।

"মাকু-পিকুর উচ্চতা" (Alturas de Macchu Picchu) নামক কাব্যগ্রন্থটি যখন প্রকাশিত হলো তখন চিলির একটি মানুষও সাহস করে আমার কবিতার নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করেন নি! চিলির প্রায় দেড়শো বছরের পুরোনো একটি খবরের কাগজের অফিসে গিয়ে আমার প্রকাশক অনুরোধ জানিয়েছিলেন যাতে আমার গ্রন্থের একটি বিজ্ঞাপন অন্ততঃ বার করা যায় তাঁদের পত্রিকায়। কিন্তু তাঁরা একটি মাত্র শর্তে রাজী হয়েছিলেন যে, গ্রন্থকার হিসাবে আমার নাম কোথাও থাকবে না।

আমার প্রকাশক সেদিন প্রতিবাদ করে বলেছিলেন: কিন্তু নেরুদাই তো লেখক। তাঁদের উত্তর ছিলো—তাতে কিছু আসে যায় না।

কাজেই দেড়শো বছরের পুরোনো এই পত্রিকার ইতিহাসের কি মূল্য রইলো—যাঁরা সত্য, সত্য ঘটনা বা কবিতার যথার্থ সত্যকে কোনো মূল্য দিতে অপারগ

তাঁদের আর গুরুত্ব বা গর্বের কি থাকলো ?

রাজনীতি ছাড়াও আমার প্রতি এই বিদ্বেষ বা হিংসার আরো অনেক কারণই আছে। গত চল্লিশ বছর ধরে আমি কবিতা লিখেছি, পৃথিবীর বহু দেশ আমাকে বহু সম্মানে ভূষিত করেছে—এমন কি শেষ পর্যন্ত আমি 'নোবেল পুরস্কার'ও লাভ করেছি। পৃথিবীর বহু দেশে, বহু ভাষায় আমার কবিতা অনূদিত হয়েছে যার অর্ধেকই আমার অজানা। তবু ইসলানেগ্রায় আমার বাড়িতে বিদ্যুৎ বা জল সরবরাহের কোনো সরকারী ব্যবস্থাই নেই বা আমার ছোটো একটা পুরোনো মোটর গাড়ী—এসব জিনিস বহু লোকেই পছন্দ করতেন না। তাঁদের সমালোচনার একটাই বক্তব্য বিষয় ছিলো, 'কবি—সে থাকবে অভুক্ত, দারিদ্র্য আর অপমানের মধ্যেই কাটতে হবে তার জীবন, মানুষের সহানুভূতি আর অনুগ্রহই হবে তার পাথেয়। অর্থাৎ গাড়ী, বাড়ী এসব তো ব্যবসায়ী আর গণিকালয়ের দালালদের জন্য—কোনো কবির জীবনে এসব কখনই থাকতে পারে না। তাঁদের এই মনোভাবকে আমি আরো অনেক বেশি যন্ত্রণা দিয়ে যাবো—যেদিন আমার এই বাড়িটি চিলির জনতাকে দান করে দেবো, যেদিন আমার ঘরে সমিতির সভা বসবে, শ্রমিক আর কৃষকদের জন্য আমার ঘরগুলি তাঁদের বিশ্রামগৃহ হিসাবে ব্যবহৃত হবে—সেই দিনই হবে আমার কবিতার প্রতিশোধ গ্রহণের দিন।

আরো একটি বছর শুরু হলো

একজন সাংবাদিক আমায় জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'এই বছরের শুরুতে দাঁড়িয়ে পৃথিবী সম্বন্ধে আপনার কি মনে হয় ?'

উত্তর দিলাম—'আজ ৫ই জানুয়ারী, এখন সকাল ৯-২০মিঃ—ঠিক এই মুহূর্তে পৃথিবীকে গোলাপী আর নীলাভ দীপ্ত আভায় আলোকিত মনে হচ্ছে আমার।'

আমার এই উত্তরের পিছনে রাজনৈতিক, সাহিত্যিক বা ব্যক্তিগত কোনো মতাদর্শই নেই। ঠিক এই মুহূর্তে জানালার বাইরে দৃষ্টি মেলে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম ফুলে ফুলে সারা মাঠ ঘাট প্রান্তর ঢেকে রয়েছে আর সামনে প্যাসিফিক সমুদ্রের নীল রঙ দিগন্ত ছুঁয়ে প্রসারিত, প্রবহমান।

'—কিন্তু আমি জানি পৃথিবীর এই ভূখণ্ডে আরো অনেক রঙ আছে। তা হচ্ছে ঃ প্রতিদিন নিরর্থক কতো মানুষের লাল রক্ত ভিয়েতনামের মাটিকে রাঙা করে দিচ্ছে—সবুজ শান্ত কতো গ্রামকে নাপাম বোমার আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে ছাই রঙে ভরিয়ে দিচ্ছে।'

সাংবাদিকের আরো একটি প্রশ্নের উত্তর দিলাম ঃ 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই এই ৩৬৫টি দিন ধরে আমি কবিতা লিখবো, পৃথিবীকে আরো গান গেয়ে শোনাবো—মানুষকে ভালোবেসে আরো বেশি করে আঁকড়ে ধরবো।'

প্রশ্ন এলো—'কি বিষয় নিয়ে লিখবেন ?'

উত্তর দিয়েছিলাম—'কেমন করে বলবো ? পৃথিবী, পৃথিবীর অধিবাসীকে আরো

অনেক নতুন কিছু আমি দিতে চাই।'

মানুষ এখন মহাকাশচারীর স্বপ্নে বিভোর। সেই মহাকাশচারী উত্তর আমেরিকা বা সোভিয়েত দেশ যেখান থেকেই এসে থাকুন না কেন তাঁরা চন্দ্রের পিছনের জ্যোতিশ্চক্র দেখেছেন—তাঁরা চন্দ্রের মাটিতে বসে পান করেছেন নববর্ষের দ্রাক্ষারস।

আমরা কবি, সাহিত্যিক বা ঔপন্যাসিকরা আরো অনেক বড়ো উপহার প্রত্যাশা করি। 'জুল ভার্ন' মানুষকে অনন্ত মহাকাশে ওড়ার স্বপ্ন দিয়েছিলেন, প্রথম মহাকাশযানের কল্পনাও তাঁরই কৃতিত্ব। চাঁদের নেশায় মানুষকে নেশাগ্রস্ত করেছিলেন ল্যাফোরগ্, হাইনরিখ্ হাইনে, ব্যোদলেয়ার প্রভৃতি কবি। এই যে সাদা ফ্যাকাসে উপগ্রহ তার উপরে কবির আঙুলের ছাপই প্রথম পড়েছিলো।

ক্রমে ক্রমে বছর শেষ হয়ে আসে। আনন্দ, দুঃখ নয়তো জীর্ণতা দিয়ে বছরের দিনগুলিকে আমরা ফুরিয়ে দিই। বিদায় সম্ভাষণ জানানোর তালিকাটাও বাড়তে থাকে। কেউ জেলে ঢোকেন কেউ বা বেরিয়ে আসেন জেল থেকে। কেউ পালিয়ে যান য়ুরোপে, আবার য়ুরোপ থেকে ফেরার পর কারুর কারুর মৃত্যু হয়। যাঁরা দূরে থেকে মারা যান তাঁদের সম্বন্ধে মনে হয় হয়তো তিনি রয়েছেন। যে কবির ভাগ্যে লাভ হয় দীর্ঘজীবন তাঁর কবিতার খাতা শোকজ্ঞাপক কবিতায় ভরে উঠতে থাকে। আমার সব সময়েই ভয় হয়—হয়তো একদিন মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে মনুষ্যসুলভ আমার এই দুঃখবোধটাকে একঘেঁয়ে মনে হবে। ১৯২৮ সালে সিংহলে বসে আমার প্রিয় বন্ধু জ্যোয়াকিনের মৃত্যুতে শোকাহত হয়ে 'অনুপস্থিত জ্যোয়াকিন' (Ansencia de Joaquin) কবিতাটি লেখার সময়ে আমার মনে হয়েছিলো এ ধরনের কবিতা হয়তো আমায় বেশি লিখতে হবে না। কিন্তু তারপর একে একে অনেক প্রিয়তম বন্ধু ও শুভার্থী চলে গেলেন—তাঁদের উদ্দেশে লেখা কবিতায় আজ আমার কবিতার খাতা পূর্ণ।

এই বছরটা—যা সবেমাত্র শেষ হলো তা শেষ হওয়ার আগে আমার প্রিয়তম বন্ধু ইলিয়া ইরেনবুর্গকে নিয়ে গেল। সত্যের উপাসনা ও মিথ্যার প্রতি মৃত্যুর পরোয়ানা জারী করা যাঁর রচনার বিষয়বস্তু ছিলো তিনিও আমায় ফেলে চলে গেলেন। যে বাতাস এসে তাঁকে নিয়ে গেল সেই বাতাসই আমার ভ্রাতৃসম কবি নাজিম হিকমত ও সেমিয়ন কিরসানোভকেও নিয়ে উড়ে গেল।

বলিভিয়াতে 'চে গুয়েভারা'র হত্যা সংবাদ আমার প্রাণে একটা বড়ো আঘাত হেনে গেল। তাঁর হত্যার সংবাদ যেন একটা শীতার্ত কাঁপুনির মতো সেদিন পৃথিবীর সারা শরীরে কম্পন তুলেছিলো। হাজার লক্ষ কবিতা সেদিন সারা পৃথিবী থেকে এসে তাঁর শবদেহের পাশে জমা হয়েছিলো। কিউবা থেকে আমার কাছেও অনুরোধ এসেছিলো কবিতা লিখে পাঠানোর জন্য কিন্তু তাঁর এই বেদনাদায়ক মৃত্যুর পুরো খবরটা তখনও না জানতে পারার জন্য কোনো কবিতাই আমার পক্ষে লেখা সম্ভব হয়নি। আমি এখনও অপেক্ষা করে রয়েছি কবে আমার রক্তে আর আমার চিন্তার জগতে তাঁর জন্য কবিতা লেখার সময়টা এসে পেঁছবে।

এই গেরিলা বিপ্লবীর আত্মস্মৃতিতে আমার কবিতার উল্লেখ আমার হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিলো। আমার এখনও মনে পড়ে—একদিন সার্জেন্ট

রিটামারের সামনে চে আমায় বলেছিলেন যে, আমার কবিতা তিনি প্রায়ই তাঁর গেরিলা-বাহিনীকে পড়ে শোনাতেন। চে তাঁর ডায়েরিতে আমার লেখা কবিতার (Canto Para Bolivar : বলিভিয়ার সঙ্গীত) একটি ছত্র লিখে রেখেছিলেন—'তোমার ছোট্ট মৃতদেহটাকে মনে হয় যেন কোনো সেনাধ্যক্ষ—'।

নোবেল পুরস্কার

আমার নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পিছনে একটা বেশ বড়ো গল্প আছে। গত কয়েক বছর ধরেই আমি শুনতে পাচ্ছিলাম যে, আমার নাম নাকি নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছে—ব্যস্ এই পর্যন্তই। তারপর আর কিছু শুনিনি।

১৯৬৩ সালে রেডিও ইত্যাদি মারফৎ খবর পেলাম যে, সে বছর আমার নোবেল পুরস্কার লাভ প্রায় ঠিক হয়ে গেছে। এখন স্টকহলমে শুধু ভোটাভুটির জন্য অপেক্ষা করে থাকা। তাতে আমার জিতে যাওয়াটাও প্রায় পাকা। এই খবর শোনার সাথে সাথেই আমার বসত বাড়িটিকে মানুষের ভীড় থেকে বাঁচানোর জন্য সমস্ত ব্যবস্থা নিতে তৈরি হতে লাগলাম। একটা খুব বড়ো তালা এনে ইস্‌লানেগ্রায় আমার বাড়ির সদর দরজায় লাগিয়ে দিলাম আর ঘরের ভিতরে নানাবিধ খাবার ও সুরায় ভরিয়ে ফেললাম।

প্রথমেই যাঁরা এলেন তাঁরা হচ্ছেন সাংবাদিক—তাঁদের আমরা একটু দূরে দূরেই রাখলাম। তাঁরা আমার সদর দরজায় ঝোলানো ব্রোঞ্জের সুন্দর ওই বড়ো তালাটিকে পেরিয়ে আসতে পারলেন না। তাঁরা বাইরে থেকেই বাঘের মতো তর্জন-গর্জন শুরু করে দিলেন। তাঁরা কি চাইছিলেন? সুইডিশ এ্যাকাডেমির বিতর্কে কি স্থির হবে সে খবর আমি কি করে জানবো? তবু শালগম থেকে যতটুকু রক্ত নিঙড়ে নেওয়া যায় তাঁরা তাই-ই করলেন।

প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে বসন্ত এবার অনেক দেরীতে এলো। এই একলা স্বভাবের বসন্তকে আনন্দোৎসবের মধ্য দিয়ে বরণ করবো ভেবে তৈরি হচ্ছিলাম। খর গ্রীষ্ম এসে সমস্ত শ্যামলতাকে পুড়িয়ে দিয়ে মাটিকে করে গেছে রুক্ষ ও কর্কশ। শীতের সময় তার ক্রোধাগ্নি ঝলসে উঠবে ফেনিল সমুদ্রের ঢেউএ—লবণাক্ত ঝোড়ো হাওয়ায় প্রকৃতি হবেন উৎপীড়িতা। বসন্তে হলুদ হয়ে দেখা দেবেন প্রকৃতি। সারা মাঠ ঘাট বনপ্রান্তর ভরে যাবে লক্ষ কোটি হলদে ফুলের ঢেউএ। মাঝে মাঝে পথ চলতে হঠাৎ দেখা দেবে হলুদ ফুলের দল—সদর্পে জানিয়ে যাবে তাদের অস্তিত্ব। তারপর এক সময়ে এই হলুদ ফুলের হলুদ রঙটা ফ্যাকাশে হয়ে আসবে—তার সর্ব অঙ্গ ঘিরে দেখা দেবে বেগুনী রঙ—বেগুনি-নীল আভায় তখন পথ-প্রান্তর ভরে উঠবে। বসন্ত তার হৃদয় পরিবর্তনের সময়ে হলদে থেকে বেগুনী-নীল রঙ নেওয়ার পরে নেয় লাল রঙ।

এই সময়ে আসমুদ্র ছড়ানো ক্যাকটাস গাছে দেখা দেয় ফুলের সমারোহ। সমগ্র

এন্ডিয়ান পর্বতমালা ধরে লম্বা লম্বা কাঁটাওলা দৈত্যের মতো বিরাট বিরাট এই ফুল-গুলিকে দেখলে মনে হবে যেন শত্রু-সৈন্যের ছাউনির বড়ো বড়ো এক একটা স্তম্ভ। আবার সমুদ্রের ধারে ক্যাকটাস গাছে দেখা দেবে ছোট্ট ছোট্ট সাদা ফুল—দূরে থেকে দেখলে মনে হবে সমুদ্রের পাড় যেন তার মাথায় পরিয়েছে সাদা টুপি।

এমনি অনেক অনেক নাম না-জানা ছোটো-বড়ো নানান্ রঙ-এর ফুল আর গাছপালায় আমার সমস্ত দেশটাই ভরে রয়েছে। কৃষক আর জেলেরা তাদের নামগুলি কখন জানি না ভুলে গেছে আর ফুল হারিয়ে ফেলেছে তার নামের গর্বটুকু। কৃষক, জেলে আর চোরাচালানিদের রুক্ষ, কর্কশ জীবন ও তাদের ক্রমাগত মৃত্যু আবার পুনরুজ্জীবিত কর্তব্যবোধ ও তাদের কঠোর জীবন সংগ্রামে পরাজয় বরণ—সবই হয়ে চলেছে এই অজানা ফুল আর গাছের জঙ্গলে—তাদের জীবনের সঙ্গীত, তাদের অপ্রকাশিত জীবনের রক্ত সবই হারিয়ে গেছে ওই অজানা ফুল আর জঙ্গলের রাজত্বে।

বসন্তের দিনটিতে আমার ঘর ভরে যায় এমনিই একটা নাম না-জানা নীল ফুলে। এমন মহিমান্বিত নীল রঙ আর কেউ দেখেছেন কিনা জানি না, মনে হয় স্বর্গ থেকে নীল রঙ-এর কোনো দেবতা নেমে এসেছেন আমার ঘরে—আমার সঙ্গে বসন্তোৎসবে যোগ দিতে।

এইমাত্র রেডিওর সংবাদ মারফৎ জানা গেল আমি নয়—একজন গ্রীক কবি এবারের 'নোবেল পুরস্কার' লাভ করেছেন। বাইরে অপেক্ষমান সাংবাদিকরা বিদায় নিলেন। আমি আর ম্যাটিলডে এক মহাশান্তিকে বুকে নিয়ে ঘরের ভিতরে গেলাম। বাইরের দরজায় লাগানো বড়ো ব্রোঞ্জের তালাটা খুলে ফেললাম যাতে প্রতিদিনের মতই আমার অতিথিরা আসতে পারেন বসন্তের আগমনের মতই বিনা ঘোষণায়।

অপরাহ্নে সুইডিশ রাষ্ট্রদূত ও তাঁর স্ত্রী ভালো ভালো খাবার আর পানীয় নিয়ে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তাঁরা অবশ্য আশা করেছিলেন যে, এই খানা-পিনাটা আমার নোবেল পুরস্কার লাভের আনন্দ উৎসব হিসাবে পালিত হবে। অবশ্য এতে আমরা কেউই খুব একটা দুঃখপ্রকাশ করিনি বরং গ্রীক কবি সেফেরিস্ যিনি এই পুরস্কার পেয়েছিলেন তাঁরই স্বাস্থ্য কামনা করে সেদিন আমরা ভালোভাবেই খানাপিনাটা শেষ করেছিলাম।

বিদায় নেবার সময়ে রাষ্ট্রদূত আমায় বললেন—'আগামীকালই তো সাংবাদিকরা এসে নোবেল পুরস্কার প্রাপক হিসাবে মনোনীত গ্রীক কবি সেফেরিস্ সম্বন্ধে আমায় প্রশ্ন করবেন, আমি তো ওঁর সম্বন্ধে কিছুই জানি না। কি উত্তর দেবো বলুন তো?'

অত্যন্ত সততার সঙ্গে তাঁকে সেদিন বলেছিলাম, 'বিশ্বাস করুন মশায়, ওঁর বিষয়ে আমিও কিছুই জানি না।'

পৃথিবীর এই গ্রহটিতে বসে প্রায় সমস্ত সাহিত্যিক আর কবিই তো লোভনীয় এই 'নোবেল পুরস্কার' পাওয়ার স্বপ্ন দেখে থাকেন।

লাতিন আমেরিকার দেশগুলি চায় যে, তাদের দেশের প্রার্থী এই পুরস্কার লাভ করুক, এবং তার জন্য যতো রকমের চেষ্টা সম্ভব সবই করা হয়, ফলে পুরস্কার পাবার যোগ্য ব্যক্তি এই পুরস্কার থেকে বঞ্চিতও হয়েছেন। যেমন রমুলো গেলিগোসের

কথাই ধরা যাক্। তাঁর রচনা-সম্ভার প্রচুর এবং বেশ সম্মানজনক সেই সব রচনা। ভেনেজুয়েলা হচ্ছে তেলের দেশ—প্রচুর অর্থ তার আছে—সে দেশের অনেকেই স্থির করলেন যে, নোবেল পুরস্কারটা যেমন করে হোক্ রমুলো গেলিগোসকে পাওয়াতেই হবে। সুইডেনে ভেনেজুয়েলার একজন নতুন রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত করা হলো, তাঁর কাজই হলো যেমন করেই হোক্ তদ্বির করে গেলিগোসকে নোবেল পুরস্কারটা পাইয়ে দেওয়া। সুইডিশ এ্যাকাডেমির সভ্য-সভ্যাদের প্রায়ই খানাপিনায় নিমন্ত্রণ করা, তাঁর রচনাবলী ষ্টকহলমের প্রকাশকদের দিয়ে স্পেনিশ ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করা ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু সুইডিশ এ্যাকাডেমির সভ্য-সভ্যাদের কাছে গোটা ব্যাপারটাই বেশ বাড়াবাড়ি ও দৃষ্টিকটু ঠেকেছিলো। বেচারা রমুলো গেলিগোস জানতেও পারলেন না যে, তাঁর দেশ কর্তৃক বিশেষভাবে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূতটির বাড়াবাড়ির জন্যই 'নোবেল পুরস্কার' পাওয়া তাঁর আর হলো না!

প্যারিসে এমনই একটা ঘটনার গল্প আমি শুনেছিলাম যা কেবল দুঃখজনকই নয় নির্দয় পরিহাসকরও বটে। এটি শুনেছিলাম 'পল ভেলেরি' সম্বন্ধে। ফ্রান্সে প্রায় সকলেরই নিশ্চিত বিশ্বাস ছিলো যে, সেই বছরের 'নোবেল পুরস্কার' পল ভেলেরি ছাড়া আর কেউ পেতেই পারেন না। সেদিন সকালে ষ্টকহলমে যখন সুইডিশ এ্যাকাডেমির বিতর্ক-সভা বসেছে এবং ফ্রান্সের মানুষ রেডিওর সামনে বসে রুদ্ধনিঃশ্বাসে অপেক্ষা করছেন সংবাদ শোনার জন্য তখন পল ভেলেরি তাঁর গ্রামের বাড়িতে বসে উত্তেজনা সহ্য করতে না পেরে প্রিয় কুকুর ও বেতের ছড়িটি নিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়লেন।

মধ্যাহ্নভোজের আগে বাড়ি ফিরে ঘরে ঢুকেই তাঁর একান্ত সচিবকে জিজ্ঞাসা করলেন: 'আমার কি কোনো ফোন এসেছিলো?'

একান্ত সচিব উত্তর দিলেন—'হ্যাঁ, ষ্টকহলম থেকে একটি ফোন আপনার জন্যে এসেছিলো।'

রোমাঞ্চনায় উত্তেজিত পল ভেলেরি প্রশ্ন করলেন—'হ্যাঁ হ্যাঁ, তাঁরা কি বললেন?'

একান্ত সচিব জবাব দিয়েছিলেন—'সেখানকার এক মহিলা সাংবাদিক মহিলাদের সমান ভোটাধিকারের দাবীতে যে আন্দোলন চলেছে সে বিষয়ে আপনার মতামত জানতে চাইছিলেন।'

একটা নিষ্ঠুর বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গীতে পল ভেলেরি নিজেই আমাদের এই গল্প শুনিয়েছিলেন। এটা খুবই সত্য যে, তাঁর মতো নিখুঁত একজন সাহিত্যিকের ভাগ্যেও এই পুরস্কার জোটেনি।

নিজের সম্বন্ধে কখনও আমি এই পুরস্কার নিয়ে মাথা ঘামাইনি। এ বিষয়ে নীরব থাকাটাই আমি বেশি পছন্দ করতাম। যখনই—অনেকবারই, শুনেছি 'নোবেল পুরস্কারপ্রার্থী' তালিকায় আমার নামও উঠেছে তখন থেকেই সুইডেনে ফেরার চিন্তা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলাম, যদিও সুইডেন দেশটা আমায় ছেলেবেলা থেকেই আকর্ষণ করেছে। তাছাড়া প্রতি বছরই আমার নামটা শুনতে পেতাম অথচ পুরস্কারের ধারকাছ দিয়েও যেতে পারতাম না—এই অবস্থাটা মানসিকভাবে আমায় ক্লান্তও করে তুলেছিলো। ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মতো প্রতি বছর নোবেল পুরস্কারের

খাতায় আমার নামের এই ওঠা-নামাটা আমার কাছে বিরক্তিকর হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। সমস্ত ঘটনাই একটা প্রহসনে পেঁাচেছিলো।

শেষ পর্যন্ত আপনারা সবাই জানেন ১৯৭১ সালে আমি নোবেল পুরস্কার পেলাম। আমি তখন প্যারিসে চিলির রাষ্ট্রদূত। আমার নাম সংবাদপত্রের পাতায় আবার আসা-যাওয়া শুরু করলো। পুরস্কার লাভের খবরটা শোনার পর আমি আর ম্যাটিলডে দু'জনেই দু'জনের দিকে ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে রইলাম। প্রতি বছরের হতাশাব্যঞ্জক সংবাদগুলি আমাদের চামড়াকে মোটা করে দিয়েছিলো।

অক্টোবরের এক সন্ধ্যায় আমার দূতাবাসের বাণিজ্যদূত কবি জোরজে এডওয়ার্ডস আমার ঘরে এসে বাজী ধরলেন যে, যদি এবার আমি নোবেল পুরস্কার পাই তবে তাঁকে সস্ত্রীক আমরা প্যারিসের সেরা রেস্তোঁরায় খাওয়াবো আর যদি আমি পুরস্কার না পাই তাহলে ম্যাটিলডে ও আমাকে ওঁরা খাওয়াবেন।

আমি সে প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়ে বলেছিলাম—'তথাস্তু! তোমার পয়সায় আমি আর ম্যাটিলডে বেশ ভালো করেই খানাপিনা করবো।'

পরে অবশ্য জোরজে এডওয়ার্ডসের এই বাজী ধরার গুপ্ত রহস্যটুকু জানতে পেরেছিলাম। জোরজের এক বান্ধবী স্টকহলম থেকে জোরজেকে ফোন করে নাকি আগেই খবর দিয়েছিলেন যে, এ বছর পাবলো নেরুদার নোবেল পুরস্কারলাভ প্রায় একরকম সুনিশ্চিত।

মেক্সিকো, বুয়েনস আয়ারস্ এমন কি স্পেন থেকেও সাংবাদিকরা ফোন করে আমার কাছে খবর নিতে শুরু করলেন। স্বাভাবিকতঃ তাঁদের প্রশ্নের বিশেষ কোনো উত্তর আমি দিলাম না যদিও সন্দেহটা এবার অনেকখানি কমে এসেছিলো।

সেদিন সন্ধ্যায় আমার সুইডিশ সাহিত্যিক বন্ধু ও সুইডিশ এ্যাকাডেমির একজন প্রাক্তন সভ্য আরতুর লুন্দভিস্ট আমার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খেতে এলেন। সেই সময়ে দক্ষিণ ফ্রান্সে একজন পর্যটক হিসাবে তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। খাওয়ার শেষে আমার মানসিক অশান্তি ও সাংবাদিকদের ক্রমাগত জ্বালাতন ও প্রশ্নবাণের কথা জানিয়ে এই বলে তাঁকে অনুরোধ করেছিলাম—'আরতুর, তোমার কাছে আমি একটি মাত্র অনুগ্রহ ভিক্ষা করছি—যদি আমার পুরস্কার পাওয়ার সংবাদটা সত্য হয় তাহলে দয়া করে সংবাদপত্রে সেই খবর প্রকাশ হওয়ার আগে আমি যেন জানতে পারি। কারণ আমার জীবনের সবচেয়ে প্রিয়তম বন্ধু সালভাদোর এলিন্দে যিনি আমার বহু সংগ্রামের সঙ্গী তাঁকে যেন সবার আগে আমি এই খবরটা পেঁাছে দিতে পারি। প্রথমেই তিনি যদি এই সংবাদটা আমার কাছ থেকে শোনেন তাহলে তাঁর চেয়ে খুশী আর কেউ-ই হবেন না।'

কবি ও বিদগ্ধ লুন্দভিস্ট আমার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে উত্তর দিয়েছিলেন—'পাবলো, আমি তোমায় কোনো খবরই দিতে পারবো না। কারণ এ খবর যদি সত্য হয় তাহলে সুইডেনের মহামান্য রাজা তোমাকে তারযোগে সে সংবাদ জানাবেন অথবা প্যারিস্থিত সুইডেনের রাষ্ট্রদূত এসে তোমার সঙ্গে দেখা করে খবরটি দেবেন।'

এটি ছিলো ১৯ অথবা ২০শে অক্টোবরের ঘটনা। ২১শে অক্টোবরের সকালে

আমার দূতাবাসের ছোট্ট ঘরটি সাংবাদিকে ভরে গেল। সুইডেন, আমেরিকা, ফ্রান্স ও লাতিন আমেরিকা থেকে আসা সাংবাদিক, ফটোগ্রাফার ও টেলিভিশনকর্মীরা আমার ক্রমাগত নিরুত্তরে অশান্ত হয়ে উঠেছিলেন। কোনো সংবাদ না এসে পেঁছানোর জন্য আমার দূতাবাসে প্রায় একটি ছোটখাটো বিদ্রোহের অবস্থা সৃষ্টি হচ্ছিলো। সকাল সাড়ে এগারোটায় সুইডেনের রাষ্ট্রদূত আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন—কি বিষয়ে কিছুই বললেন না। যদিও জানতাম আর মাত্র দু'ঘণ্টা পরে আমাদের দেখা হবে তবু উত্তেজনাকে আমি কিছুতেই দমিয়ে রাখতে পারছিলাম না। পাগলের মতো দূতাবাসের টেলিফোনগুলি একটানা কর্কশ আওয়াজ করে চলেছিলো।

এমন সময় প্যারিসের এক রেডিও সংস্থা হঠাৎ একটা দমকা সংবাদ ঘোষণা করলো : 'চিলির কবি পাবলো নেরুদা সাহিত্যে ১৯৭১ সালের নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন—।' সংবাদ শেষ হওয়ার মুহূর্তেই সাংবাদিকদের কোলাহলের সামনে গিয়ে উপস্থিত হলাম। সৌভাগ্যবশতঃ ঠিক এই সময়েই ভ্রাতৃসম আমার দু'জন সাহিত্যিক বন্ধু জ্যাঁ মারসিন্যেক ও এ্যারাগ্যে এসে পেঁছলেন এবং সাংবাদিক সম্মেলনের অনেকখানি বোঝা তাঁরা নিজেরাই কাঁধে তুলে নিলেন। সেদিন এ্যারাগ্যোর মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছিলো আমার চেয়েও যেন তিনি অনেক বেশী খুশী।

সেই সময়টায় আমার শরীরটাও ভালো যাচ্ছিলো না, সবেমাত্র শরীরের উপরে একটা অস্ত্রোপচার হয়ে গেছে তার উপর রক্তাল্পতাতেও ভুগছি—ভালো করে চলাফেরা করাটাও আমার পক্ষে কষ্টসাধ্য। বহু বন্ধু-বান্ধব ও বান্ধবী সেদিন রাত্রে আমার বাড়ীতে খানাপিনা করতে এলেন। চিলি, ইতালী, রোম, স্পেন এমন কি প্যারিস থেকেও অনেক জানা-অজানা সাহিত্যিক ও কবি সে রাত্রে আমার সাথে বসে খানাপিনা করেছিলেন।

পর্বতপ্রমাণ টেলিগ্রাম এসে জমা হলো ঘরে, অনেকেরই উত্তর আজও আমার দেওয়া হয়নি। বহু চিঠি এসেও জমা হলো পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে। এর মধ্যে একটি অতি ভয়াবহ ও বিপজ্জনক চিঠি এলো হল্যাণ্ড থেকে। একজন নিগ্রো তাঁর চিঠিতে আমায় লিখলেন—'জর্জটাউন, ব্রিটিশ গায়নাতে যে সাম্রাজ্যবিরোধী আন্দোলন শুরু হয়েছে তারই স্বপক্ষে আপনাকে এই কথাগুলো লেখা প্রয়োজন মনে করে আমি চিঠি লিখছি। ষ্টকহলমে আমি চিঠি লিখে তাঁদেরকে অনুরোধ জানিয়েছিলাম যেন পুরস্কার বিতরণী সভায় আমায় থাকতে দেওয়া হয়। এ্যাকাডেমি থেকে আমার চিঠির উত্তরে জানানো হয়েছে যে, এই সভায় থাকতে গেলে 'সান্ধ্য পোশাক' একান্তই প্রয়োজনীয়। আমার কাছে এমন অর্থ নেই যে, 'সান্ধ্য পোশাকের' মতো একটা দামী কোট কিনতে পারি। এও চাই না যে, আরেক-জনের কাছে ধার করা 'সান্ধ্য-পোশাকে' আমি সেখানে উপস্থিত হই। সুতরাং আমি জানিয়ে রাখছি, যেটুকু পয়সা যোগাড় হবে তা দিয়ে ষ্টকহলমে পেঁছে আমি এই সাম্রাজ্যবাদী ও অগণতান্ত্রিক পুরস্কারের বিরুদ্ধে সাংবাদিক সম্মেলন ডাকবো। আপনাকে আমি এও জানিয়ে রাখতে চাই যে, এই পুরস্কার যতবড়ো সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও লোকপ্রিয় সাহিত্যিক বা কবিই লাভ করুক না কেন…।'

নভেম্বরে আমি ও ম্যাটিলডে ষ্টকহলমে রওনা হলাম। কয়েকজন পুরোনো

বন্ধু-বান্ধবও আমাদের সঙ্গে রওনা হলেন। গ্রাণ্ড হোটেলের কয়েকটি বিলাস বহুল ঘরে আমাদের থাকতে দেওয়া হলো। ঘরের জানালা দিয়ে সামনে রাজপ্রাসাদ ও শীতার্ত শহরের রূপ চোখে পড়লো। এই হোটেলে সেই বছরের অন্যান্য বিষয়ে নোবেল পুরস্কার পাওয়া গণ্যমান্য ব্যক্তিরাও ছিলেন। কেউ পেয়েছেন পদার্থবিদ্যায়, কেউ লাভ করেছেন রসায়নশাস্ত্রে, কেউ বা আবার পেয়েছেন চিকিৎসাশাস্ত্রে। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ অতি বিনয়ী ও প্রগলভ। আবার কেউ কেউ এতই সরল ও সাধারণ বেশভূষা পরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন যে তাঁদের দিকে তাকালেই মনে হচ্ছিল তাঁরা সবেমাত্র তাঁদের কারখানা ও রসায়নাগার ছেড়ে এখানে এসেছেন। এ বছরের শান্তি পুরস্কার বিজয়ী জার্মানি উইলি ব্রান্ট অন্য একটি হোটেলে ছিলেন। তাঁর সঙ্গে আলাপ করার বিশেষ ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সে সৌভাগ্য আমার হয়নি। আমরা যেখানে যখনই গিয়েছি আমাদের মাঝখানে সব সময়ই চার-পাঁচজন ব্যক্তি বসে থাকতেন।

পুরস্কার বিতরণী সভায় যাবার আগে আমাদের নিয়মিত অনুশীলন করতে হতো। যে 'হল'এ পুরস্কার দেওয়া হবে সেই 'হল'এ বসে সুইডিশ আদব-কায়দা অনুযায়ী এই পুরস্কার গ্রহণের মহড়া আমাদের প্রায় প্রতিদিনই দিতে যেতে হতো। এতগুলো গম্ভীর স্বভাবের মানুষকে প্রতিদিন সকালে বিছানা থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে তাঁদেরকে 'লেফ্‌ট-রাইট' মার্চ করাতে করাতে সারিবন্ধভাবে চেয়ারে বসানো হতো—তাঁদের সকলের সামনে সাজানো থাকতো সুইডিশ-রাজ ও রাজপরিবারের বিভিন্ন ধরনের খালি চেয়ারগুলি—তার সামনে চলতো টেলিভিশনের উজ্জ্বল আলোর মহড়া—সব মিলিয়ে গোটা ব্যাপারটাই বেশ হাস্যকর মনে হয়েছিলো আমার কাছে। খালি হলে মহড়ার সময় টেলিভিশনের উপস্থিতির রহস্যটা আমি আজও বুঝতে পারিনি।

যেদিন পুরস্কার দেওয়া হবে সেদিনটা শুরু হলো সেণ্ট লুশিয়ার উৎসবের মধ্য দিয়ে। মিষ্টি গলায় গানের আওয়াজে ঘুমটা ভেঙে গেল। ঈষৎ স্বর্ণাভ-কেশ সুন্দরী স্ক্যাণ্ডানেভিয়ান যুবতীরা মাথায় ছোটো ছোটো সাদা টুপি পরে আমার ঘরে এসে ঢুকলেন। তাঁদের হাতে ছিলো পুষ্পগুচ্ছ আর ছিলো খুব সুন্দর একটি উপহার—হাতে আঁকা একটি সমুদ্রের ছবি।

এর কিছুক্ষণ পরেই এমন একটা ঘটনা ঘটলো যার ফলে স্টকহলমের সমস্ত পুলিসবাহিনী খুব সতর্ক হয়ে উঠলেন। হোটেলের অভ্যর্থনা-ঘর থেকে একজন এসে আমার নামে লেখা একটি চিঠি আমায় দিয়ে গেলেন। চিঠিটির প্রথমেই আমার নজর পড়লো জর্জটাউনের উগ্র সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সেই নিগ্রো লোকটির সই। তাতে লেখা আছে—'আমি এইমাত্র স্টকহলমে এসে পৌঁচেছি—' তাঁর সাংবাদিক সম্মেলন ডাকার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু একজন বিপ্লবী হিসাবে তিনি মনে করেন তাঁর সক্রিয় কিছু একটা করা দরকার। তিনি এ কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারেন না যে, অপমানিত ও অত্যাচারিত মানুষের কবি পাবুলো নেরুদা দামী 'সান্ধ্য পোশাক' গায়ে চাপিয়ে নোবেল পুরস্কার আনতে যাবেন। সুতরাং একটি ধারালো কাঁচি নিয়ে তিনি অপেক্ষা করছেন পুরস্কার নিতে যাবার পথে আমার দামী কোটের যে কোনো অংশ বা পিছনের ঝোলানো অংশটা সেই কাঁচি দিয়ে কেটে নেবার জন্য।

এইভাবেই তিনি তাঁর মহান্ বৈপ্লবিক কর্তব্য পালন করবেন !

চিঠিতে তিনি আরো লিখেছিলেন—'আপনাকে সাবধান করে দেওয়াটা আমি কর্তব্য বলে মনে করি। যখনই লক্ষ্য করবেন যে, সবুজ রঙের একটা বড়ো ধারালো কাঁচি নিয়ে একজন নিগ্রো আপনার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে, তখনই আন্দাজ করে নেবেন আপনার ভাগ্যে কি হতে চলেছে।'

সুইডিশ নিয়মানুযায়ী যে রাজকর্মচারীটি আমার সঙ্গে সব সময়েই থাকতেন তাঁর হাতে আমি ওই চিঠিখানা তুলে দিয়ে তাঁকে জানিয়েছিলাম যে, প্যারিসেও আমি অদ্ভুত ধরনের আরো একটা চিঠি এই নিগ্রো মানুষটির কাছ থেকে পেয়েছিলাম। অবশ্য তাঁকে বলে দিয়েছিলাম যে, চিঠিগুলি পড়লে মনে হয় লোকটা ছিটগ্রস্ত। কাজেই এই নিয়ে চিন্তা করার কিছু নেই। সুইডিশ রাজকর্মচারীটি আমার সঙ্গে একমত হতে পারলেন না। তিনি বললেন—'এই সময়টায় স্টকহলমে নানান মতের নানান্ রকমের লোক এসে থাকে। কাজেই এই সময়ে যে কোনো ঘটনাই ঘটতে পারে। আমার কর্তব্য হচ্ছে স্টকহলমের পুলিসকে সমস্ত ব্যাপারটা জানিয়ে রাখা—' এই বলেই তিনি তাড়াতাড়ি রওনা হয়ে গেলেন।

প্রসঙ্গতঃ এখানে আপনাদের জানিয়ে রাখা ভালো যে, আমার অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু কবি ও ঔপন্যাসিক মিগুয়েল ওতেরো সিল্‌ভা আমার সঙ্গে স্টকহলমে এসেছিলেন। দুপুরে খাবার টেবিলে বসে কথা প্রসঙ্গে এই চিঠির এবং সেই সঙ্গে স্টকহলমের পুলিসকে সংবাদটা জানিয়ে রাখার ঘটনাটা মিগুয়েলকে বললাম।

আমার কথা শুনতে শুনতে হঠাৎ মিগুয়েল সিল্‌ভা খাওয়া বন্ধ করে নিজের কপালটা দু'হাত দিয়ে সজোরে চাপড়াতে চাপড়াতে প্রায় কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন—'কেন? তোমার সাথে মজা করার জন্যে আমি তো ওই চিঠি আমার নিজের হাতে লিখেছি। এখন আমি কি করবো? পুলিস তো ওই চিঠির লেখককে খুঁজে বেড়াবে। অবশ্য ওই নামে কোনো নিগ্রো লেখকের অস্তিত্বই নেই—।'

'—তুমি জেলে যাবে। ক্যারিবিয়ানের ওই মানুষটিকে নিয়ে এই নির্মম পরিহাসের শাস্তি হিসাবে জর্জটাউনের বদলে পুলিস তোমাকে জেলে পাঠাবে।' আমি উত্তর দিয়েছিলাম।

ঠিক এই সময়েই ওই রাজকর্মচারীটি ফিরে এসে আমাদের সঙ্গে খাবার টেবিলে যোগ দিলেন। আমি তখন তাঁকে সমস্ত ঘটনা জানিয়ে বললাম—'আসলে এটা আমার সঙ্গে মজা করার জন্য আমারই এক বন্ধুর কাণ্ড। ওই চিঠির লেখক আমাদের সঙ্গেই খাবার টেবিলে উপস্থিত রয়েছেন।'

এই কথা শোনার পরেই আবার তিনি ছুটে বেরিয়ে গেলেন। ইতিমধ্যে স্টকহলমের পুলিস বিভিন্ন হোটেলে জর্জটাউনের সেই নিগ্রোটির খোঁজে তল্লাসি শুরু করে দিয়েছে। এমন কি আমার নিরাপত্তার ব্যবস্থাও জোরদার করা হয়েছে। অনুষ্ঠান সভায় যাওয়ার সময় থেকে অনুষ্ঠান শেষে বেরিয়ে আসার সময় অবধি আমি আর ম্যাটিলডে লক্ষ্য করেছিলাম যে, সাধারণ পথ প্রদর্শকগণ ছাড়াও হলদে-কেশ বেশ শক্ত সমর্থ কয়েকজন যুবক কাঁচির অভেদ্য তাঁদের শরীর নিয়ে আমাদের পাশাপাশি রয়েছেন।

নোবেল পুরস্কারের শাস্ত্রাচার সভায় উপস্থিত শৃংখলাবদ্ধ ও শান্ত দর্শকরা খুবই আস্তে করতালি দেন তাও সময়মতো এবং যথাস্থানে। বৃদ্ধ রাজা আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে করমর্দনের সময় সম্মানপত্র, পদক ও চেক আমাদের হাতে তুলে দিলেন। আমরা ফিরে এসে যে যার আসনে বসলাম। এবার আর আসনগুলি নোংরা বা খালি ছিলো না—যেটা মহড়া দেবার সময়ে দৃষ্টিকটু লেগেছিলো। অনেকেই সেদিন আমায় বলেছিলেন হয়তো ম্যাটিলডেকে খুশি করার জন্যও বলে থাকতে পারেন, রাজা নাকি আমার সঙ্গে অনেকক্ষণ বেশি কথা বলেছিলেন এবং করমর্দনের সময় আমার হাত দুটো নাকি উনি সজোরে ধরে রেখেছিলেন। হয়তো সেই প্রাচীনকালের এই রাজপ্রাসাদ আমার দেশের লুণ্ঠনের সমবেদনায় ব্যথিত। নয়তো কই, আর কোনো রাজা বা সম্রাট সামান্যতম একটি মুহূর্তের জন্যও তো আমার সঙ্গে কখনও করমর্দন করেন নি।

কোনো সন্দেহই নেই যে, এমন ধরনের একটা অনুষ্ঠান বিরাট জাঁকালো ও শান্ত পরিবেশে অনুষ্ঠিত হবে। এইসব গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে যে ভাবগম্ভীর মুহূর্ত সৃষ্টির প্রয়োজন পৃথিবীতে তা হয়তো সব সময়েই থাকবে—হয়তো বা মানুষের কাছে এটা একটা প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিক অঙ্গ হিসাবে বিবেচ্য হবে। কিন্তু আমার কাছে এই অতি মাননীয় ব্যক্তিদের একের পর এক উঠে উপহার আনতে যাওয়ার গোটা অনুষ্ঠানটাই যে কোনো গ্রাম্য শহরের স্কুলের ছেলেদের প্রাইজ আনতে যাওয়ার মতই মনে হয়েছিলো।

সেপ্টেম্বরের পতাকা

এই সেপ্টেম্বর মাসটা গোটা দক্ষিণ আমেরিকার স্মৃতিচারণের মাস। প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে যে সব বীরযোদ্ধা ও বিপ্লবী মানুষ দক্ষিণ আমেরিকাকে দাসত্ব, উৎপীড়ন ও শোষণ থেকে মুক্ত করার জন্য আত্মদান করেছিলেন তাঁদেরকে স্মরণ করা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করার মাস।

ভিন্ন মতাবলম্বী এই সব নেতারা, যেমন ছিলেন বালিভিয়ার উজ্জ্বল দৈববাদী মহাপুরুষের মতই একজন যোদ্ধা ও রাজ সভাসদ—যেমন ছিলেন সান মারতিন যাঁর সংগঠন ও নেতৃত্বে গড়ে উঠেছিলো অপ্রতিরোধ্য দুর্জয় এক বিপ্লবী বাহিনী—যে বাহিনী দুর্ভেদ্য পর্বতমালা অতিক্রম করে চিলির মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন, যেমন ছিলেন জ্যোসে মিগুয়েল ও বারনারদো ও হিগিনস—যাঁরা চিলির সামরিকবাহিনীর প্রথম প্রতিষ্ঠাতা, যাঁরা দাসত্বের বিরুদ্ধে প্রথম আইন রচনা করেন এবং চিলিতে প্রথম ছাপাখানা তৈরী করেছিলেন।

ক্ষণিক বিদ্যুৎ-চমকের মতই ছিলো জ্যোসে মিগুয়েলের জীবন। অভিজাত বংশে জন্মেও দেশের স্বাধীনতা ও জাতীয়তাবাদকে তিনি সংগ্রামের রূপ দিয়েছিলেন। স্প্যানিশ উপনিবেশবাদকে ধ্বংস করার জন্য তিনি আর্জেন্টিনার ইণ্ডিয়ানদের নিয়ে বাহিনী গঠন করেছিলেন এবং বুয়েনস্ এয়ারসকে প্রায় ঘেরাও করে দখল করার

জন্য যখন আগুয়ান তখনই শত্রুর আঘাতে তিনি নিহত হলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিলো চিলিকেও মুক্ত করার। দক্ষিণ আমেরিকার এক চরমতম সংকটের মুহূর্তে দেশ সেদিন হারিয়েছিলো তার একজন বীরপুত্রকে।

ও'হিগিন্‌স ছিলেন আর এক দেশভক্ত যিনি শান্তিতে তাঁর জীবনটা কাটিয়ে যেতে পারতেন যদি না মাত্র ১৭ বছর বয়সে ডন্ মিরান্‌ডার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হতো। বিপ্লবী মিরান্‌ডা তখন আমেরিকার মুক্তি যুদ্ধের রসদ যোগাড় করার জন্য সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াচ্ছেন। মিরান্‌ডা এক গোপন সূত্রে ও'হিগিন্‌সের বংশ পরিচয় জানতে পেরে এক দুর্বল মুহূর্তে ও'হিগিন্‌সকে জানালেন যে, ও'হিগিন্‌স চিলির অত্যাচারী স্পেনিশ রাজ্যপালের অবৈধ সন্তান। কান্নায় ভেঙে পড়ে নতজানু হয়ে মিরান্‌ডার হাঁটু ছুঁয়ে সেদিন তিনি স্পেনিশ উপনিবেশবাদের অবসান ও চিলির মুক্তির জন্য তাঁর আমরণ সংগ্রামের অঙ্গীকার করেছিলেন। এই ও'হিগিন্‌সই শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে চিলিকে উপনিবেশীদের হাত থেকে মুক্ত করেন। চিলির গণতন্ত্রের তিনিই ছিলেন প্রথম প্রতিষ্ঠাতা।

মিরান্‌ডাকে স্পেনিয়ার্ডরা বন্দী করে কুখ্যাত কাদিজের কারাগারের একটি ছোট্ট ঘরে রেখে দেয়। সেখানেই তিনি মারা যান এবং তাঁর মৃতদেহ পাহাড়ের উপর থেকে সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলা হয়।

সান মারতিন তাঁর নির্বাসিত জীবনে নিঃসঙ্গ এক বৃদ্ধের মতই ফ্রান্সে মারা যান।

উপনিবেশবাদ থেকে চিলিকে যিনি মুক্ত করেছিলেন সেই ও'হিগিন্‌স মারা যান পেরুতে। লিমার যাদুঘরে দেখেছিলাম তাঁরই আঁকা চিলির বসন্ত আর ফুলের ছবি।

আমি আজ এই সেপ্টেম্বর মাসে বসেছি বিদ্রোহ-মুখর সেই গত শতাব্দীর বীর যোদ্ধাদের নাম, তাঁদের দুঃখ ও ভালোবাসায় ভরা সেই ঘটনাপঞ্জীর স্মৃতিচারণ করতে। আজ এক শতাব্দী পরে আবার এক নব জাগরণের শিহরণ শুরু হয়েছে, দুরন্ত একটা ক্রোধ আর বাতাসের আলোড়নে নতুন একটা পতাকা উন্মোচিত হতে চলেছে। ইতিহাস চলেছে তার নিজপথ ধরে সারা দক্ষিণ আমেরিকায় নব-বসন্তকে বরণ করে নিয়ে আসতে।

প্রেস্‌টিস

দক্ষিণ আমেরিকার কমিউনিস্ট নেতা এবং ব্রেজিলের একজন রাজনীতিবিদ সামরিক বীরপুরুষ লুই কারলস প্রেস্‌টিসের মতো ঘটনাবহুল অনিশ্চিত জীবন বোধহয় আর কারুরই ছিলো না। ইস্‌লানেগ্রাতে থাকার সময় যখন ব্রেজিলে যাবার ও প্রেস্‌টিসের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য নিমন্ত্রণ পাই তখনই আমি সেই নিমন্ত্রণ-পত্র গ্রহণ করি। এর আগে আর কোনো বিদেশীর কাছ থেকে এই ধরনের নিমন্ত্রণ পত্র লাভের সুযোগ ঘটেনি, সেই কারণে যখনই আমি সেই নিমন্ত্রণ-পত্র পেয়েছিলাম তখনই মনস্থির করি—যেমন করেই হোক্ মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত এই মানুষটিকে আমায় দেখতেই হবে।

দশ বছর কঠিন ও যন্ত্রণাদায়ক কারাবাসের পর প্রেস্‌টিস তখন সবেমাত্র মুক্তি পেয়েছেন। অবশ্য তথাকথিত "মুক্ত স্বাধীন দুনিয়াতে" এটা এমন একটা কিছু গুরুত্বপূর্ণ খবরও নয়। আমার বিশিষ্ট বন্ধু নাজিম হিকমত তুরস্কের কারাগারে চৌদ্দ বছর কারাযন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন। আবার এই অনুস্মৃতি লেখার এই মুহূর্তটিতে আমি জানি প্যারাগুয়ের কারাগারে ছ'সাতজন কমিউনিস্ট বন্দী বারো বছর ধরে কারাবাসের নরক-যন্ত্রণা ভোগ করছেন যাঁদের সঙ্গে পৃথিবীর কোনো যোগাযোগই নেই। প্রেস্‌টিসের জার্মান পত্নীকে জার্মানীর নাৎসীবাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া হয়। নাৎসীরা তাঁকে শৃংখলাবদ্ধ করে জাহাজে তুলে শহীদখানায় স্থানান্তরিত করে। নাৎসীদের কারাগারে তিনি একটি কন্যার জন্ম দেন—যাকে প্রেস্‌টিসের বীরমাতা বহু কষ্ট ও নির্যাতন সয়ে মুক্ত করে এনে প্রেস্‌টিসের হাতে তুলে দেন। বর্তমানে সে তার পিতার কাছেই আছে। বন্দীশালায় কন্যার জন্মলাভের পর নাৎসীরা প্রেস্‌টিসের পত্নীর মাথাটিকে শরীর থেকে আলাদা করে দেয়। শহীদ-জীবনে অমরত্বের এই ঘটনাগুলি প্রেস্‌টিসের সুদীর্ঘ কারাজীবনের কথা মানুষকে ভুলে যেতে দেওয়ার অবকাশ কোনদিনও দেয়নি।

প্রেস্‌টিসের মায়ের মৃত্যুর সময়ে আমি মেক্সিকোতে ছিলাম। এই বীরাঙ্গনা নিজের মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত তাঁর কারারুদ্ধ ছেলের মুক্তির জন্য পৃথিবীর দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। মেক্সিকোর রাষ্ট্রপতি লাজারো কার্ডেনাস ব্যক্তিগতভাবে ব্রেজিলের স্বৈরাচারী একনায়ক শাসনকর্তাকে অনুরোধ করেছিলেন যাতে করে মায়ের শেষকৃত্য সম্পাদনের জন্য প্রেস্‌টিসকে মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য মুক্তি দেন, এবং প্রেস্‌টিস যাতে শেষকৃত্য সম্পাদনের পর জেলে ফিরে যান সে দায়িত্বও তিনি নিতে চেয়েছিলেন কিন্তু ব্রেজিলের সেই স্বৈরাচারী একনায়ক গেতুলিয়ো ভারগাস মেক্সিকোর রাষ্ট্রপ্রধানের এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন!

সেদিন সমগ্র পৃথিবীর মানুষের ঘৃণা ও ক্রোধ আমাকেও স্পর্শ করেছিলো। আমি সেদিন সেই মহীয়সী মহিলার উদ্দেশে একটি শোক-সঙ্গীত রচনা করেছিলাম। আমার সেদিনের শোক-সঙ্গীত ছিলো—তাঁর শোকসভায় অনুপস্থিত সুযোগ্য সন্তানের মহিমা কীর্তন ও উৎপীড়ক শাসকের প্রতি অভিশাপ। যে বীরমাতা তাঁর সুযোগ্য সন্তানের মুক্তির জন্য বৃথাই পৃথিবীর দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়িয়েছিলেন তাঁরই সমাধিস্থলে দাঁড়িয়ে আমার স্বরচিত এই শোক-সঙ্গীত পাঠ করেছিলাম। আমার এই সঙ্গীতের আরম্ভ ছিলো অতি সংযত—

—"সিনোরা, তুমি আমার
এই আমেরিকাকে
দান করেছো 'গৌরব'
নামে এক দুরন্ত মহিমা।
তুমি এমনই একটি
পূর্ণ যৌবনা নদী দিলে
যার প্রাণবন্ত স্রোতে
রয়েছে প্রাচুর্যের জোয়ার।

এক বিশাল মহীরুহের
অন্তহীন শিকড়
তোমার সন্তান।
উর্বরা এই দেশ মৃত্তিকার
মহামূল্যবান
বিদ্যুৎ খচিত হীরক খণ্ড—।"

তারপর কবিতা যতই অগ্রসর হয়েছে ততই হিংস্রভাবে আঘাত করেছে, অভিশাপ দিয়েছে ব্রেজিলের উৎপীড়ক শাসকবর্গকে। আমার এই শোকজ্ঞাপক কবিতাটিকে কখনও প্রচার-পত্রে কখনও বা দেওয়ালের লিখনে, আবার কখনও একটি পোষ্ট কার্ডে এই উপ মহাদেশের সব প্রান্তেই দেখতে পেয়েছি ও পড়েছি।

একবার পানামাতে এক সভায় আমার প্রেমের কবিতা শোনানোর পর আমি এই শোকজ্ঞাপক কবিতাটি আবৃত্তি করতে শুরু করি। মাঝপথে আমার গলা শুষ্ক হয়ে ওঠার জন্য আবৃত্তি বন্ধ করে টেবিলের উপর রাখা জলের গ্লাসটি নিয়ে পান করতে আরম্ভ করি। এমন সময় লক্ষ্য করলাম সাদা পোশাক পরা এক ব্যক্তি বক্তৃতামঞ্চের দিকে এগিয়ে আসছেন।

আমি তাঁকে একজন সাহায্যকারী মনে করে জলের গ্লাসটি তাঁর দিকে বাড়িয়ে দিতেই তিনি এক ঝটকায় আমার হাত সরিয়ে দিয়ে মঞ্চে উঠে চীৎকার করে বলতে শুরু করলেন—'আমি ব্রেজিলের রাষ্ট্রদূত, প্রেস্‌টিস সম্বন্ধে যা বলা হচ্ছে সমস্ত মিথ্যা—আসলে প্রেস্‌টিস হচ্ছে একজন দাগী আসামী—।'

এই কথাগুলি শোনামাত্র সমবেত শ্রোতারা চীৎকার ও বিদ্রূপাত্মক ধ্বনি দিতে শুরু করে দিলেন। একটি নিগ্রো যুবক দু'হাতের আস্তিন গুটিয়ে এই রাষ্ট্রদূতের গলা চেপে ধরার জন্য মঞ্চের দিকে এগিয়ে এলেন। আমি তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে তাঁকে এই উন্মত্ত জনতার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য পিছনের দরজা দিয়ে বাইরে বার করে দিলাম।

এত সব পরিচয়-পত্র সঙ্গে নিয়ে ইস্‌লানেগ্রা থেকে ব্রেজিলের সেদিনকার এই গণ-উৎসবে আমার যোগদান করাটা ব্রেজিলের মানুষ খুব উৎসাহ ও আনন্দের সঙ্গেই গ্রহণ করেছিলেন। সাও পাওলোর পেসেম্বি ষ্টেডিয়াম সেদিন মানুষের ভীড়ে উপ্‌ছে পড়েছিলো। শুনেছিলাম এক লক্ষ ত্রিশ হাজারেরও বেশি মানুষ সেদিন সেখানে জমায়েত হয়েছিলেন। ওই বিশাল ষ্টেডিয়ামের উপর থেকে মানুষের মাথাগুলিকে আলপিনের মাথার মতো দেখাচ্ছিলো। মৃত্যুর দরজা থেকে ফিরে আসা বন্দীদের যেমন ফ্যাকাসে ও রুগ্ন দেখায় তেমনি দেখাচ্ছিলো প্রেস্‌টিসকে। আমার পাশেই তিনি সেই রুগ্ন ফ্যাকাসে শরীর নিয়ে বসেছিলেন। তবু যখন তিনি বক্তৃতামঞ্চের দিকে গিয়ে তাঁর বক্তৃতা শুরু করলেন তখন আমার মনে হয়েছিলো যুদ্ধ জয়ের শেষে যেন কোনো সেনাধ্যক্ষ বক্তৃতা করছেন।

স্প্যানিশ ভাষায় সেদিন একটি কবিতা লিখে নিয়ে গিয়েছিলাম। আমি যখন কবিতাটির আবৃত্তি শুরু করলাম তখন সমবেত হাজার হাজার ব্রেজিলিয়ান করতালি দিয়ে প্রতিটি ছত্রের শেষে আমায় অভিবাদন জানিয়েছিলেন। এক লক্ষ ত্রিশ হাজার

মানুষের অভিবাদন ও করতালি শোনার পর কোনো কবি কি আর স্থির থাকতে পারেন, না তাঁর লেখনীকে নিস্তেজ করে রাখতে পারেন।

পেঁয়াজের খোসার মতো স্বচ্ছ সাদা অথচ এক অবিশ্বাস্য প্রাণপ্রাচুর্যের অধিকারী মানুষ প্রেস্টিসের সঙ্গে একদিন আমার মুখোমুখি কথা বলার সুযোগ এলো। সেদিন একান্তে আমি একজন কবি আর প্রেস্টিস যিনি এক নব যুগের প্রবক্তা—দু'জনে অনেক আলোচনাই করেছিলাম, সেদিন আমার মনে হয়েছিলো যেন দু'জন চিন্তাশীল গুরু শিষ্য আলোচনায় বসেছি।

কোডোভিল্লী

সানতিয়াগো ছেড়ে আসার সময়ে খবর পেলাম বন্ধু ভিক্টোরিও কোডোভিল্লী আমার সঙ্গে দেখা করে কিছু আলোচনা করতে চান। তৃতীয় আন্তর্জাতিকের সভ্য এই কোডোভিল্লী সেই সময়কার অনিশ্চিত অক্ষমতার নিদর্শন যা সবটুকুই তাঁর ছিলো। নিজের মতবাদকে অপরের উপরে চাপিয়ে দেওয়া এবং অপরের মতবাদকে মাখনের মধ্যে ছুরী চালানোর মতো করে দ্বিখণ্ডিত করা এটাই ছিলো তাঁর স্বভাব। সব সময়ে সব কিছুতেই একটা তড়িঘড়ি অধৈর্য-বিনয়ের সঙ্গে অপরের মতামত শোনার পরেই তাঁর নিজস্ব আদেশনামা জারী হতো। তবু ঘটনাপ্রবাহের দ্রুত যোগফল করার একটা অসাধারণ ক্ষমতা তাঁকে একজন উচ্চ রাজনৈতিক নেতা হিসাবে স্বীকৃতি দান করেছিলো।

আমার সঙ্গে তাঁর যোগ ছিলো খুবই নিবিড় এবং অন্যান্য আর পাঁচজনের চেয়ে একটু অন্য ধরনের। এই ইতালিয়ান রাজনীতিবিদ্ জনজীবনে ছিলেন উপযোগবাদী—তাঁর তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি, শিল্পীসুলভ মনোভাব এবং তখনকার দিনের য়ুরোপীয় সংস্কৃতি-ঘেঁষা মানুষের দোষত্রুটি সহজে ধরে ফেলার ক্ষমতায় তিনি ছিলেন বেশ পোক্ত। রাজনৈতিক জীবনে এক এক সময়ে তিনি মারাত্মক হয়ে উঠতেন।

সেদিন যখন তাঁর সঙ্গে আলোচনায় বসেছিলাম তখন তাঁকে খুবই চিন্তামগ্ন দেখাচ্ছিলো। তিনি বলেছিলেন—প্রেস্টিস এখনও পেরনের একনায়কতাবাদকে ঠিকমতো উপলব্ধি করতে পারছেন না। প্রেস্টিস বুঝতে পারছেন না যে, পেরন ক্রমশঃই ক্ষমতা-পিপাসু হয়ে উঠছেন। পেরনের আন্দোলনকে তিনি সেদিন য়ুরোপিয়ান ফ্যাসীবাদেরই একটি অংশ হিসাবে বিশ্লেষণ করেছিলেন। কোনো ফ্যাসীবাদ-বিরোধী মানুষই পেরনের এই ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা ও দমনমূলক শাসন মেনে নিতে পারে না এবং আর্জেন্টাইনার কম্যুনিস্ট পার্টীর একমাত্র বিদ্রোহ করা ছাড়া পেরনের এই ক্ষমতালিপ্সু শাসনকে প্রতিরোধ করা যাবে না। সেদিন তিনি আমায় অনুরোধ করেছিলেন যাতে করে আমি প্রেস্টিসের সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে একটা গঠনমূলক আলোচনায় বসি। আমার সেদিন দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিলো—তাঁর এই চূড়ান্ত মতের পিছনে নিশ্চয়ই কোনো একটা উদ্দেশ্য আছে।

পিকান্দুর জনসভার শেষে এই বিষয় নিয়ে প্রেস্টিসের সঙ্গে আমার দীর্ঘ

আলোচনার ফলে সেদিন আমার এক নতুন অভিজ্ঞতা হয়, দু'টি সমধর্মী মানুষের যুক্তি ও মত যে কতখানি পরস্পরবিরোধী হতে পারে সেটা বুঝতে পারি। একজন দীর্ঘদেহী স্বাস্থ্যবান ইতালিয়ান—যিনি গলার আওয়াজ আর গায়ের জোরে ঘরের সব ক'টা টেবিলই দখল করে নিতে পারেন—আর একজন রুগ্ন-শীর্ণ-শান্ত ব্রেজিলিয়ান প্রেস্‌টিস যাঁকে যে কোনো সময়ে বাইরের দুরন্ত হাওয়ার একটি ধাক্কায় জানালা দিয়ে ঘরের বাইরে ঠেলে দিতে পারে—তাঁদের এই পরস্পর বিরোধী যুক্তিতে সেদিন আমি অবাক না হয়ে পারিনি। সেদিনই বুঝেছিলাম বাইরের আবরণটুকুর ভিতরে এ'রা দু'জনেই কতো কঠিন।

আমার প্রশ্নের উত্তরে প্রেস্‌টিস আমায় পাল্টা প্রশ্ন করলেন—'আর্জেন্টাইনার কোথায় আপনি বাদামী রঙের জামা পরা ফ্যাসীবাহিনী দেখলেন?—আর্জেন্টাইনার কোথাও ফ্যাসীবাদের অস্তিত্ব নেই এবং আমি কোনোমতেই পেরনকে ফ্যাসীবাদী মনে করি না। কোডোভিল্লীর জানা উচিত ছিলো যে, লেনিন বলেছেন বিদ্রোহ খেলার বস্তু নয়। সৈন্যসামন্ত কিছুই নেই—মাত্র কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে তো আর বিদ্রোহ ঘোষণা করা যায় না।'

এই দু'জন মানুষ—ভিতরে ভিতরে দু'জনেই নিজের যুক্তি ও ব্যাখ্যার কাছে একটা অনমনীয় মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন। হয়তো এ'দের মধ্যে প্রেস্‌টিসের যুক্তিতে সারবত্তা ছিলো। কিন্তু এই দু'জন বরেণ্য বিপ্লবীর যুক্তির অন্তর্দ্বন্দ্বের দেওয়ালের মাঝখানে থেকে আমার পক্ষে নিঃশ্বাস নেওয়াটা খুবই কষ্টকর হয়ে উঠেছিলো।

আমি আজ এই কথাটাও খুবই দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে চাই যে, কোডোভিল্লী ছিলেন জীবনীশক্তিতে পূর্ণ ও সম্পন্ন একজন পুরুষ। সাম্যবাদের অন্ধকারের দিনগুলিতে ভণ্ডামি ও নীতিবাগীশদের উপরে তাঁর ক্ষুরধার যুক্তিপূর্ণ আক্রমণ এক স্মরণীয় ঘটনা। চিলির কম্যুনিস্ট পার্টীর প্রধান কর্মী ও নেতা লাফ্যেরেত্‌ বিবাহের বাইরের প্রেম সম্বন্ধে যখন ঘোরতর আপত্তি তুলেছিলেন তখন কোডোভিল্লী তাঁর তীক্ষ্ন যুক্তি ও তর্কের মাধ্যমে লাফ্যেরেতের যুক্তিকে নস্যাৎ করে দেন।

স্তালিন

আমি জানতাম না, কেন যেন অনেকেই আমাকে একজন গুরুতর রাজনীতিবিদ্‌ বলে মনে করতেন। আমার সম্বন্ধে এই ধারণা যে তাঁদের কেন হয়েছিলো আমি আজও বুঝিনি। 'লাইফ্‌' পত্রিকা কর্তৃপক্ষ একবার একটি বিশেষ সংখ্যায় তাঁদের গ্রাহকদের কম্যুনিস্ট দুনিয়ার নামকরা নেতাদের সঙ্গে পরিচয় করে দেওয়ার জন্য বহু ছবির মধ্যে ডাকটিকিটের সাইজে আমারও একটি ছবি ছেপেছিলেন। আমার রাজনৈতিক মতবাদকে তাঁরা প্রেস্‌টিস ও মাও সে তুঙের মাঝামাঝি একটা পর্যায়ে এনেছিলেন। এই বিশেষ সংখ্যাটি পড়ার পর আমি খুব মজা উপভোগ করেছিলাম। একটা বিষয়ে আমার অবাক্‌ লেগেছিলো যে, লক্ষ কোটি ডলার খরচ করে সারা

পৃথিবীব্যাপী যে লক্ষ লক্ষ সি. আই. এ-র চর ছড়িয়ে রয়েছে তারা কতো মূর্খ, কতো ভুল খবরই না ওয়াশিংটনের জন্য সংগ্রহ করে।

পৃথিবীর সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দেশের নেতাদের মধ্যে একমাত্র মাও সে তুঙের সঙ্গেই আমার একটু বেশি সময় ধরে আলাপের সুযোগ হয়েছিলো। খাবার টেবিলে আমরা উভয়ে উভয়ের স্বাস্থ্যপান করেছিলাম, করমর্দনের সময় উনি আমার হাত দুটো একটু বেশি সময় চেপে ধরে রেখেছিলেন—তাঁর হাসিতে বন্ধুত্ব ও ব্যঙ্গাত্মক বিদ্রূপ দুটোর ছায়াই দেখেছিলাম, তারপর তিনি নিজের টেবিলে ফিরে গিয়েছিলেন।

সোভিয়েত রাশিয়াতে বহুবার গিয়েছি, কিন্তু কখনও মলোটভ, ভিসিনস্কি, বেরিয়া বা মিকোয়ান কারুর সঙ্গেই সাক্ষাৎলাভের সুযোগ আমার হয়নি। যদিও আমি জেনেছিলাম যে, তাঁরা অনেক বেশি সামাজিক ও অনেক কম রহস্যময় ব্যক্তি।

স্তালিনকেও আমি কয়েকবার একই জায়গাতে দেখেছি—তাও অনেকখানি দূরে থেকে—১লা মে ও ৭ই নভেম্বরে রেড স্কোয়ারের মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে। স্তালিনের নামাঙ্কিত 'স্তালিন পুরস্কার' কমিটির একজন সভ্য হিসাবে ক্রেমলিনে আমি বেশ কয়েক ঘণ্টা কাটিয়েছি কিন্তু কোনদিনও স্তালিনকে দেখার সুযোগ আমার হয়নি। কোনদিন কোনো ভোটাভুটির সময়ে বা দ্বিপ্রাহরিক আহারের আসনে এমনকি সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকার হিসাবেও স্তালিনের সঙ্গে আমার মুখোমুখি দেখা হয়নি। সাধারণতঃ 'স্তালিন পুরস্কার'টি সর্বসম্মতিক্রমেই দান করা হতো। অবশ্য মাঝে মাঝে এই নিয়ে প্রচুর তর্কবিতর্ক হয়। তখন আমার মনে হতো হয়তো অন্তিম মুহূর্তটিতে স্তালিন এসে হাজির হবেন এবং তাঁর সিদ্ধান্ত জানিয়ে আমাদের তাই গ্রহণ করতে নির্দেশ দেবেন। কিন্তু আমার মনে পড়ে না যে, কোনো সময়েই তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত বা মতের দ্বারা আমাদের প্রভাবিত করেছিলেন বা আমাদের কোনো সিদ্ধান্তকে তিনি অমান্য কিম্বা অসম্মান করেছেন। আমার কাছে আশ্চর্যের কথা—মাত্র কয়েকটি দেওয়ালের ব্যবধানে থেকেও তাঁর উপস্থিতিটা আজও তিনি আমাদের জানতে দেন নি। এই রহস্যময় মানুষটি সম্বন্ধে আমার মনে হতো—হয়তো তিনি খুব লাজুক, নয়তো নিজের রচিত রহস্যজালে তিনি নিজেকে সদা সর্বদাই আবৃত করে রেখেছেন। আবার মনে হয়েছে রহস্যের বেড়াজালে আবদ্ধ স্তালিনের জন্য বেরিয়াই হয়তো দায়ী। কারণ তখন দেখেছিলাম, একমাত্র বেরিয়াই যে কোনো সময়ে স্তালিনের ঘরে যাবার ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী।

মাত্র একবারই এই রহস্যময় মানুষটির সঙ্গে আমার অপ্রত্যাশিত এবং অপ্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার হয়েছিলো। সেবার আমি ও এ্যারাগোঁ-দম্পতি মস্কোতে 'স্তালিন পুরস্কার' সমিতির সভায় যাবার আগে ওয়ারশতে তুষার ঝড়ের মধ্যে আটকা পড়ে গেলাম। আমাদেরই সঙ্গী একজন রাশিয়ানকে আমাদের পরিচয় জানিয়ে অনুরোধ করলাম যাতে মস্কোতে তিনি টেলিফোন করে আমার ও এ্যারাগোঁর মনোনীত ব্যক্তিকে আমাদের 'ভোট' দেওয়ার জন্য সমিতিকে খবরটা দেন। এই রাশিয়ান ভদ্রলোকটি টেলিফোনে খবর পাঠিয়ে উত্তর পাবার পর আমায় একান্তে ডেকে নিয়ে যে কথাটি বললেন তা শুনে সেদিন স্তম্ভিত ও বিস্মিত না হয়ে পারিনি। তিনি বলেছিলেন—কমরেড্ স্তালিনের কাছে যখন এ বছরের 'স্তালিন পুরস্কার' দানের

সম্ভাব্য নামের তালিকা দেখানো হয়েছিলো তখন তিনি নাকি প্রশ্ন করেছিলেন, এই তালিকার মধ্যে 'পাবলো নেরুদা'র নাম নেই কেন ?

'পরের বছরই মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব এবং পৃথিবীতে শান্তির প্রচারের জন্য আমি এই পুরস্কার পেয়েছিলাম, এবং এই পুরস্কার প্রাপ্তিতে যদিও আমার মনে হয়েছিলো—এটি আমার যথার্থই প্রাপ্য তবু সেই রহস্যময় মানুষটি আমার অস্তিত্বকে না জেনেও কেন স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে পুরস্কারটি আমারই প্রাপ্য তা আজও আমার কাছে রহস্যাবৃত।

আরো কয়েকটি ব্যাপারে স্তালিনের নিজস্ব হস্তক্ষেপের সংবাদ আমি জানতে পারি। তখন বিশ্বজনীনতা বা আন্তর্জাতিকতাবাদের বিরুদ্ধে একটা আন্দোলন গড়ার চেষ্টা চলেছে এবং সেই দলের কিছু গোঁড়া লোক ইরেনবুর্গের মাথাটা কেটে ফেলার জন্য আগ্রহী।

এই সময়ে একদিন সকালে ইরেনবুর্গের বাড়িতে টেলিফোন বেজে উঠলো। লুবিয়া টেলিফোন তুলতেই টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে অস্পষ্ট একটা চেনা গলা শোনা গেল।

'ইলিয়া গ্রীগরিভিচ্ কি বাড়িতে আছেন ?'

লুবিয়া উত্তর দিলেন, 'আপনার পরিচয়ের ওপরই সেটা নির্ভর করছে।'

উত্তর এল 'আমি স্তালিন কথা বলছি।'

লুবিয়া টেলিফোনটি ইরেনবুর্গের হাতে তুলে দেওয়ার সময় বললেন, 'মনে হচ্ছে তোমার সঙ্গে কেউ রসিকতা করছে।'

কিন্তু ইরেনবুর্গ স্তালিনের গলা চিনতে ভুল করেন নি। স্তালিন বললেন, 'সমস্ত রাত ধরে তোমার লেখা উপন্যাস 'প্যারীর পতন' পড়েছি। আমার টেলিফোন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, প্রিয় বন্ধু গ্রীগরিভিচ্ তুমি এই ধরনের লেখা আরো অনেক অনেক যাতে লেখো সেজন্য অনুরোধ জানানো।'

হয়তো স্তালিনের সেদিন সকালের এই আকস্মিক টেলিফোনই ইরেনবুর্গকে দীর্ঘজীবন দান করেছিলো।

আরো একটি ঘটনা। মায়কাভস্কি তখন মৃত, কিন্তু তাঁর গোঁড়া সমালোচকরা সোভিয়েত সাহিত্যের মানচিত্র থেকে তাঁর নামটা মুছে দেবার জন্য প্রায় বদ্ধপরিকর। কিন্তু হঠাৎ কি যেন হলো দেখা গেল সব চুপচাপ। মায়কাভস্কির প্রণয়ী লিলি ব্রিক স্তালিনকে একটা চিঠিতে সব কিছু জানিয়ে অনুরোধ করেছিলেন যাতে মায়কাভস্কি সৃষ্ট সাহিত্য-সম্ভার এই মারাত্মক আক্রমণের হাত থেকে বাঁচানো হয়। উত্তরে সেই চিঠির এক কোণে স্তালিন নিজের হাতে লিখেছিলেন : 'সোভিয়েত সাহিত্যে মায়কাভস্কি সর্বোত্তম কবি'। এর ফলে মায়কাভস্কির কঠোর সমালোচকদের দলবদ্ধ অভিযান একটা প্রচণ্ড আঘাতে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। এর পরেই মায়কাভস্কির নামে প্রচুর স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি হলো এবং তাঁর অসাধারণ গ্রন্থাবলীর বহু সংস্করণও প্রকাশিত হতে থাকলো। যেহোভার বজ্র-আঘাতে মায়কাভস্কির শত্রুরা বোবা হয়ে গেলেন।

আমি শুনেছিলাম, স্তালিনের মৃত্যুর পর একটি গোপন ফাইল পাওয়া গিয়েছিলো

যার উপরে তাঁর স্বহস্তে লেখা ছিলো: 'গোপনীয় এই ফাইল কেউ খুলো না'। এই ফাইলের কাগজপত্রে যে কজনের নাম প্রথমেই ছিলো তাঁরা হলেন: সঙ্গীত রচয়িতা শস্টাকোভিচ, আইনস্টাইন, বরিস পাস্তারনেক, ইরোনবুর্গ ইত্যাদি।

অনেকেই আমায় বলেছেন আমি স্তালিনপন্থী। ফ্যাসিবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীলরা আমার সম্বন্ধে বলে থাকেন আমি নাকি স্তালিনের কাব্যময় ব্যাখ্যাতা। আজকের এই নারকীয় বিভ্রান্তির যুগে যে কোনো মন্তব্যই সম্ভবপর।

আমাদের—কম্যুনিস্টদের ব্যক্তিগতভাবে এটাই দুঃখের যে, স্তালিন সমস্যার সম্মুখীন হতে গিয়ে অনেক সময়ে আমরা উপলব্ধি করি শত্রুরাই ঠিকপথে চলেছেন। ঘটনার এই রহস্য উদ্ঘাটন আমাদের মনকে ব্যথিত করে তোলে। কেউ কেউ মনে করেন তিনি প্রবঞ্চিত হয়েছেন। কেউ কেউ শত্রুপক্ষের কথায় বিশ্বাস করে তাদের দ্বারাই প্রভাবিত হন। আবার কেউ কেউ বিংশ আন্তর্জাতিক সম্মেলনের কমিউনিস্ট একতার কথা চিন্তা করে পৃথিবীকে জানিয়ে দিতে চান এর সত্যাসত্য এবং আন্তর্জাতিক সামাজিক দায়িত্ব।

এই কথাটা খুবই সত্য যে, দায়িত্বটা আমাদের সকলকেই ভাগ করে নিতে হবে। যদি কোনো অপরাধের সমদায়িত্ব আমরা না নিতে শিখি; তাহলে আমাদের নিজস্ব সমালোচনা ও ব্যাখ্যায় আমাদের নিজেদেরই বসতে হবে এবং আমাদের সেই অস্ত্র খুঁজে বার করতেই হবে যাতে কম্যুনিস্ট জগতের বোঝাপড়ার মধ্যে একটা সমঝোতা থাকে।

আমি বিশ্বাস করে দেখেছি যে, স্তালিন বারবারই আমার সামনে এসে উপস্থিত হয়েছেন, আমার অজানিত অন্ধকারকে ভেদ করে তাঁর আলোকময় উপস্থিতি অনুভব করেছি। ঋষির মতই ছিলো আদর্শের প্রতি তাঁর আনুগত্য, সহজ ও সরল ছিলো তাঁর হৃদয়। এই মানুষটিই রাশিয়ার বিপ্লব ও বিপ্লবোত্তর আদর্শকে রক্ষা করেছেন, মর্যাদা দান করেছেন। তাঁর নাম মুখে নিয়ে রাশিয়ার লক্ষ কোটি মানুষ হিটলারের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন এবং জয়ী হয়েছেন।

একজোড়া বিরাট গোঁফ নিয়ে ছোটোখাটো চেহারার এই মানুষটি অপরাজিত এক দেবসেনার মতো রণাঙ্গনে উপস্থিত হয়ে হিটলারের হাজার-লক্ষ ফ্যাসিবাদী দৈত্যকে ধ্বংস করেছেন। অথচ আমি আমার মাত্র একটি কবিতা তাঁর জন্য উৎসর্গ করেছি। এই কবিতাটি আমি তাঁর মৃত্যুর সময়ে লিখেছিলাম যা আমার রচনাবলীর মধ্যে পাওয়া যাবে। ক্রেমলিনের এক চক্ষু এই দানবের মৃত্যু সেদিন সারা পৃথিবীকে কাঁপিয়ে দিয়েছিলো। মানুষের জঙ্গল সেদিন আতঙ্কে শিহরিত হয়ে উঠেছিলো, আমার কবিতায় পৃথিবীর সেদিনের সেই আতঙ্ককেই রূপ দিয়েছিলাম।

সরলতার একটি শিক্ষা

একবার গ্যাব্রিয়েল গারসিয়া মারকুইজ্ আমায় বলেছিলেন কেমন করে মস্কোর একজন প্রকাশক তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস "একশো বছরের নীরবতা"র কয়েকটি কামোদ্দীপক পরিচ্ছেদকে বাদ দিয়ে প্রকাশ করেছিলেন। প্রকাশককে তিনি প্রতিবাদ করে জানিয়েছিলেন—এটা ঠিক কাজ হয়নি। উত্তরে প্রকাশক তাঁকে জানিয়েছিলেন—ওই ক'টা পরিচ্ছেদ বাদ দেওয়াতে পুস্তকটির মূল বক্তব্যের কোনো ক্ষতি হয়নি। পরে তিনি যদিও জানতে পারেন যে, ঘৃণা বা অভক্তির জন্য ওই পরিচ্ছেদ বাদ দেওয়া হয়নি তবু এই সংশোধন ব্যবস্থাকে তিনি মেনে নিতে পারেন নি।

এই সমস্ত চিন্তাধারাকে কে ঠিক করতে পারেন? প্রতিদিন ধীরে ধীরে আমি সমাজ বিজ্ঞানীর সংজ্ঞা থেকে বিচ্যুত হচ্ছিলাম। ধনতন্ত্রবাদের প্রতি তীব্র বিতৃষ্ণা ও মার্কসীয় সমাজবাদের প্রতি আমার আনুগত্য ও বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও, মানুষের মধ্যে এই স্ববিরোধ আমার পক্ষে বোঝা খুবই কঠিন হয়ে পড়েছিলো।

আমাদের অর্থাৎ এই যুগের কবিদের কোনো একটাকে বেছে নিতেই হবে। এই বাছাবাছির ব্যাপারটা খুব সহজ নয়। এই যে প্রতিদিনের যন্ত্রণার জীবন, পারিপার্শ্বিক এই যে অত্যাচার, অবিচার আর শোষণের শাসন ব্যবস্থা, অর্থের প্রতি যুক্তিহীন এই মোহ ও ক্ষমতালিপ্সা, শর্তাধীন স্বাধীনতার প্রলোভনের আবরণে এই যে হিংস্র বীভৎসতা, বিকৃত যৌনতা ও ক্ষণস্থায়ী আনন্দ, মাসকাবারী অর্থব্যয়ে যা সহজলভ্য, এই লোভের জগৎ থেকে আমাদের বেছে নিতেই হবে প্রয়োজনীয় বস্তুটিকে।

এই যন্ত্রণাময় জগৎ থেকে আজকের যুগের কবিরা পথভ্রষ্ট বা পথের সন্ধানে ব্যস্ত। কেউ কেউ নিয়েছেন রহস্যবাদ ও স্বপ্নের আশ্রয়, আর যাঁরা বয়সে তরুণ তাঁরা খ্যাতিলাভের জন্য অস্থির হয়ে উঠেছেন,—এঁদের কেউই এই সত্য উপলব্ধি করতে পারছেন না যে, আজকের এই যুধ্যমান যুগে এই ধরনের অভিজ্ঞতা থেকে শুধুমাত্র শাসনমূলক অক্ষম যন্ত্রণাই জন্মলাভ করতে পারে।

আমি চিলির কম্যুনিস্ট পার্টীর মধ্যে অনেককেই দেখেছি যাঁরা তাঁদের স্বৈরতন্ত্র, নিজস্ব অহম্ বোধ ও বাস্তব বহু আকাঙ্ক্ষাকে ছেড়ে স্বার্থহীন সরলতার মধ্যে কাজ করে চলেছেন। আমার ভালো লাগতো যখন দেখতাম সুবিচারের আশায় সাধারণ মানুষ একটা দৃঢ় আপোষহীন শপথ ও নম্রতাকে সঙ্গে নিয়ে একসাথে সংগ্রাম করে চলেছেন।

কম্যুনিস্ট পার্টীকে নিয়ে আমায় কোনদিনও দুশ্চিন্তায় দিন কাটাতে হয়নি। তার একটাই কারণ ছিলো। যদিও চিলির কম্যুনিস্ট পার্টী বাইরের জগতের সঙ্গে স্বল্প পরিচিত ছিলো, কিন্তু আমার দেশের প্রতিটি মানুষের মনের মধ্যে তার শিকড় ছিলো ছড়ানো। এই পথ বাছাবাছির ব্যাপারে এর বেশি আমি আর কি বলতে পারি! আমার একটাই মাত্র স্বপ্ন,—আমি যেন ওই সব সহজ, সরল কম্যুরেড্‌দের মতই ভদ্র ও নম্র হতে পারি, ওঁদের মতো আদর্শের জন্য অটল ও অজেয় থাকতে পারি। নীচু ও

বিনয়ী হয়ে থাকতে শেখার কোনো শেষ নেই। আমি কোনো সময়েই আত্মকেন্দ্রিক গর্ববোধের শিক্ষা পাইনি যা সাধারণ মানুষের দুঃখ, যন্ত্রণা, অবিচার ও শোষণকে বুঝতে দেওয়ার সময়ে আমায় কোনো সন্দেহের জালে আবন্ধ রেখে দেবে।

ফিদেল কাস্ত্রো

ভেনেজুয়েলার জনতা নানানভাবে কিউবার স্বাধীনতা সংগ্রামকে সাহায্য করেছিলেন। হাভানাতে বিজয় গৌরবে প্রবেশের দু'সপ্তাহ পরেই ফিদেল এলেন ভেনেজুয়েলার কারাকাস শহরে, ভেনেজুয়েলার জনতাকে তাঁর কৃতজ্ঞতা জানাতে। যদিও সেখানকার নবনিযুক্ত রাষ্ট্রপতি বিটানকুরটের কিউবার এই স্বাধীনতা সংগ্রামে কোনো অবদানই ছিলো না। তাঁর পূর্বসূরী, বামপন্থী ও কম্যুনিস্টদের প্রতি সহানুভূতিশীল রাষ্ট্রপতি এড্মিরাল উলফ্গঙ লারজাবাল কিউবার এই রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় তাঁর নিজস্ব এবং ভেনেজুলিয়ান জনতার সক্রিয় সমর্থন ও সহানুভূতি জানিয়েছিলেন।

আমি খুব কমই রাজনৈতিক সম্বর্ধনা দেখেছি কিন্তু সেদিন ভেনেজুয়েলায় ফিদেল কাস্ত্রোকে ভেনেজুয়েলার জনতা যে সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন তা আজও আমার কাছে অবিশ্বাস্য এক স্বপ্নের মতো মনে হয়। কারাকাসের এল্ সিলেন সিওতে দু'লক্ষের উপর সমবেত মানুষ যাঁদের মধ্যে আমিও ছিলাম। সেখানে ফিদেল প্রায় চার ঘণ্টা ধরে বক্তৃতা করলেন। অবাক বিস্ময়ে দেখেছিলাম মানুষগুলি স্থাণুর মতো বসে সেই অগ্নিগর্ভ বক্তৃতা শুনছেন। আমাদের সকলের কাছেই ফিদেলের সেদিনের বক্তৃতা বহু রহস্যই উদ্ঘাটন করেছিলো। ফিদেলের দিকে তাকিয়ে আমার সেদিন মনে হয়েছিলো লাতিন আমেরিকায় নবযুগের সূত্রপাত হলো। অনেক নামকরা রাজনৈতিক নেতার বা কর্মীর বক্তৃতা শোনার সময় লক্ষ্য করেছি—তাঁরা খেই হারিয়ে ফেলেন অথবা প্রকৃত ভাবার্থবোধক শব্দকে ঠিক সময় মতো সাজাতে পারেন না বা তার ব্যবহারে তাঁরা অপটু। অনেক সময় তাঁদের বক্তৃতার মূলবস্তু ঠিক থাকলেও বারংবার একই শব্দের প্রয়োগে তার মূল্যায়নে ব্যাঘাত ঘটে। কিন্তু ফিদেলের ক্ষেত্রে এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁর ভাষায় প্রতিটি শব্দেই তাজা টাট্কা ভাব, নীতিমূলক হলেও স্বাভাবিক, শুনতে শুনতে সেদিন মনে হয়েছিলো যে, তাঁর কথা আমাদের শোনানোর সময়ে ফিদেল নিজেও যেন একজন ছাত্রের মতো জ্ঞান আহরণ করছেন।

রাষ্ট্রপতি বিটানকুর্ট সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। কারণ কারাকাস শহর সম্বন্ধে তাঁর একটা ভীতি ছিলো। তিনি জানতেন কারাকাসের মানুষ তাঁকে পছন্দ করে না। এমন কি ফিদেল তাঁর বক্তৃতার মাঝে যখনই বিটানকুর্টের নামোল্লেখ করেছেন সঙ্গে সঙ্গে সমবেত জনতার মধ্য থেকে নানান্ বিদ্রূপাত্মক ধ্বনি উঠেছে। ফিদেল বার বার হাত তুলে তাঁদের শান্ত হতে অনুরোধ করেছেন। তখনই আমি জেনেছিলাম কিউবার বিপ্লবীদের সঙ্গে বিটানকুর্টের একটি শত্রুতার সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে। ঠিক সেই সময়টায় ফিদেল মার্কসপন্থী বা কম্যুনিস্ট ছিলেন না। এমন কি তাঁর সেদিনের বক্তৃতার মধ্যে মার্কসীয় রাজনীতির কোনো উল্লেখও ছিলো না।

আমার মনে হয় ফিদেলের প্রতি লাতিন আমেরিকার মানুষের অকৃত্রিম ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধই সেদিন বিটানকুর্টের মনে আতঙ্কের একটা ছায়া বিস্তার করেছিলো।

পরদিনই বিটানকুর্টের গুপ্তসভা শুরু হলো এবং যেখানেই তিনি ফিদেল কাস্ত্রো বা কিউবার বিপ্লবের এতটুকু নাম গন্ধ পেলেন সেখানেই শুরু হলো তাঁর অকথ্য নির্যাতন ও অপ্রশম্য নিষ্ঠুরতা।

এই জনসভার এক সপ্তাহ পরে আমি আমার কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে বনভোজনে গিয়েছি, সেখানে হঠাৎ কিউবার দূতাবাস থেকে আমায় কয়েকজন খুঁজতে এলেন। তাঁরা এসেই আমায় জানালেন যে, সারা সকাল শহরের নানান্ স্থানে তাঁরা আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন শুধু এই খবরটা দিতে যে—সেদিনই সন্ধ্যায় কিউবার দূতাবাসে তাঁরা আমার অভ্যর্থনার আয়োজন করেছেন।

আমি ও ম্যাটিলডে সোজা দূতাবাসে হাজির হলাম। অতিথিদের ভীড়ে তখন দূতাবাসের প্রাঙ্গণ ছাপিয়ে উঠেছে। দূতাবাসের বাইরেও প্রচুর মানুষের ভীড়—যার মধ্য দিয়ে পথ করে দূতাবাসে ঢোকাটা বেশ কষ্টসাধ্য হয়ে উঠেছিলো। জনতার ভীড়ে ভরা দূতাবাসের প্রতিটি কক্ষ পার হবার সময় চোখে পড়েছিলো প্রতিটি মানুষের হাতের মুঠোতেই মিশ্র মদের গ্লাস। একজন পথ-প্রদর্শক আমাদেরকে পথ দেখিয়ে একতলার একটি ঘরে নিয়ে গেলেন যেখানে ফিদেলের বান্ধবী ও তাঁর একান্ত সচিব সিলিয়া আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। ফিদেলের সঙ্গে দেখা করার জন্য আমরা যে ঘরটিতে গিয়ে হাজির হলাম সেটি দেখেই আমার মনে হয়েছিলো যে, ঘরটি কোনো ভৃত্য বা মালির। ঘরের মধ্যে অগোছালো একটি বিছানা যার উপরের চাদরটা তখনও অবিন্যস্ত, দেখেই মনে হয় যেন এইমাত্র বিছানা থেকে কেউ উঠে গেছে। যখন মনে মনে ভাবছিলাম হয়তো এর পরেই একটি সুন্দর সাজানো ফিদেলের ঘর দেখতে পাবো, তখনই দেখলাম দরজা খুলে সুদীর্ঘ, সুদর্শন ফিদেল আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

আমাকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে ফিদেল প্রশ্ন করলেন, 'কেমন আছেন পাবলো?'

শিশুসুলভ তাঁর গলার স্বরে আমি চমকে উঠেছিলাম। সেদিন তাঁর দিকে তাকিয়ে আমার মনে হয়েছিলো একটি কিশোর বালক যার সদ্য ওঠা গোঁফ-দাড়ি আর কোমলতাকে ছাড়িয়ে যেন হঠাৎই তার দুটো পা লম্বায় খুব বড়ো হয়ে গেছে।

এমন সময় আমাকে ছেড়ে দিয়েই তিনি ঘুরে দাঁড়িয়ে ঘরের এক কোণে ছুটে গেলেন। আমি লক্ষ্য করিনি যে, সংবাদপত্রের এক ফটোগ্রাফার ছবি তোলার জন্য তাঁর হাতের ক্যামেরাটা তাক্ করে রেখেছেন আমাদের দিকে। ফিদেল তাঁর কাঁধটা ধরে সজোরে ঝাঁকুনি দেওয়াতে ক্যামেরাটা মাটিতে পড়ে গেল। আমি ছুটে গিয়ে ফিদেলকে জড়িয়ে ধরে টেনে আনার চেষ্টা করলাম। ফিদেল ধাক্কা মেরে ফটোগ্রাফারটিকে ঘর থেকে বার করে দিয়ে মাটি থেকে ক্যামেরাটি তুলে নিয়ে বিছানার উপরে ছুঁড়ে দিলেন।

এই ঘটনাটি নিয়ে ফিদেল বা আমি আর কোনো আলোচনাই করিনি, তবে সাংবাদিকতা ও সংবাদপত্র নিয়ে আমরা অনেক আলোচনাই করেছিলাম এবং আমার মনে হয় "প্রেনসা লেটিনা"র জন্ম সেদিনই হয়েছিলো। এর পর আমরা দুজনে দুটি দরজা দিয়ে অভ্যর্থনা-গৃহে উপস্থিত হয়েছিলাম।

সেদিন রাত্রে বাড়ি ফেরার সময়ে আমার দৃষ্টির সামনে দুটি ছবি কেবলই ঘোরাফেরা করছিলো—তার একটি হচ্ছে একজন ভয়ার্ত আতঙ্কিত প্রেস-ফটোগ্রাফারের মুখ আর অন্যটি একজন গেরিলা-যোদ্ধার সদা সতর্ক দৃষ্টি ও ক্ষিপ্রতা।

ফিদেল ক্যাস্ত্রোর সঙ্গে সেই আমার প্রথম সাক্ষাৎ। আমার কাছে আজও যে ঘটনাটি খুবই আশ্চর্যের মনে হয় সেটি হচ্ছে আমাদের সাক্ষাৎকারের মধ্যে এমন কি গোপনীয়তা ছিলো যার জন্য সেই ফটোগ্রাফারটির সঙ্গে ফিদেল অমন একটা রূঢ় ব্যবহার করেছিলেন।

চে গুয়েভারার সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ পর্বটি কিন্তু ছিলো সম্পূর্ণ বিপরীত ধরনের। হাভানার অর্থমন্ত্রকের দপ্তরে যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম তখন রাত প্রায় একটা। আমার ঠিক মনে নেই কিভাবে এবং কোন্ সূত্রে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার নিমন্ত্রণটি আমার কাছে এসেছিলো, তবে নানান্ অনুষ্ঠান শেষে যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম তখন মধ্যরাত অতিক্রান্ত। পায়ে বুট জুতো, দেহে সামরিক পোশাক, কোমরে ঝোলানো রিভলভারের যে চেহারা নিয়ে চে উপস্থিত হয়েছিলেন তার সঙ্গে অর্থমন্ত্রকের দপ্তরটা একবারেই বেমানান মনে হয়েছিলো। গায়ের রঙটা ছিলো তামাটে, আর্জেন্টিনার মানুষ চে'র গলার স্বর ও কথা বলার অভ্যাসটা ছিলো খুব ধীর, আলোচনা করার সময়ে লক্ষ্য করেছিলাম তাঁর প্রতিটি শব্দ ধারালো গোলাকার একটি বস্তুর মতো যা শেষ হলে আলোচনাটা শূন্যের দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

আমার লেখা "সেনাধ্যক্ষের কবিতা" বইটি সম্বন্ধে সেদিন রাত্রে তিনি আমায় যা বলেছিলেন তা শুনে আমি মুগ্ধ ও চমৎকৃত হয়েছিলাম। সিয়েরা মেস্ত্রার গেরিলা বাহিনীর যোদ্ধাদের কাছে তিনি আমার এই বইটির কবিতা পড়ে শোনাতেন। কয়েক বছর বাদে যখন জেনেছিলাম যে, আমার কবিতা তাঁর মৃত্যুকেও অনুসরণ করেছিলো তখন ভয়ে শিউরে উঠেছিলাম। রেগিস দেব্রে আমায় বলেছিলেন যে, বলিভিয়ার পর্বতের পাশে চে'র মৃতদেহের সঙ্গে পাওয়া গিয়েছিলো একটি অংকের বই, আর পাওয়া গিয়েছিলো আমার কবিতার বই "সেনাধ্যক্ষের কবিতা"।

চে'র সঙ্গে সেদিনের আলোচনার সময়ে তাঁর কাছে যা শুনেছিলাম তা যে আমায় শুধু চিন্তান্বিত করে তুলেছিলো তাই নয়, সেই কথাগুলির মধ্য দিয়ে আমি চে'র ভবিষ্যৎকেও সেদিন প্রত্যক্ষ করেছিলাম। আমাদের সামনের জানালা দিয়ে কালো আকাশের দিকে তাঁর দৃষ্টি সেদিন ঘোরাফেরা করছিলো। আমাদের আলোচনার বিষয় ছিলো—যদি উত্তর আমেরিকা কিউবাকে আক্রমণ করে? আমি তাঁকে বলেছিলাম হাভানার প্রতিটি রাস্তায় বালির বস্তা সাজিয়ে শত্রুর আক্রমণকে প্রতিহত করতে। বললেন, 'যুদ্ধ…আমরা তো যুদ্ধ-বিরোধী, কিন্তু যদি কোনো যুদ্ধ আমাদের করতে হয় বা করতে বাধ্য করা হয় তখন যুদ্ধ ছাড়া তো আর কোনো উপায়ই নেই, তখন সব সময়েই আমরা সেই যুদ্ধের মধ্যেই ফিরে যাবো…।' তাঁর কথা শুনে আমি চমকে উঠেছিলাম কারণ যুদ্ধ আমার কাছে সব সময়েই মনে হয়েছে বিভীষিকা, যুদ্ধকে আদর্শ বলে আমি স্বীকার করে নিতে পারিনি।

'শুভরাত্রি' জানিয়ে সেদিন তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিলাম, তারপর আর তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। বলিভিয়ার জঙ্গলে যুদ্ধের সময় তাঁর করুণ মৃত্যুর খবর

আমি পেয়েছিলাম। কিন্তু চে'র বিষাদাচ্ছন্ন সেই মৃত্যুর সঙ্গে তাঁর বীরোচিত যুদ্ধ এবং যুদ্ধাস্ত্র হিসাবে 'কবিতা'র ব্যবহারের কথা আমি কখনো ভুলতে পারবো না।

সমগ্র লাতিন আমেরিকায় একটি শব্দের প্রতি মানুষের প্রচণ্ড আসক্তি, সেই শব্দটি হচ্ছে 'আশা'। ভোটযুদ্ধ যখন শুরু হয় তখন সবাই বলে থাকেন 'তাঁরাই একমাত্র আশাপ্রদ প্রার্থী'। এই 'আশা' শব্দটি আমাদের জন্য স্বর্গবাস লাভের অঙ্গীকারবদ্ধ। স্বর্গের শপথ বয়ে আনে, শপথ স্থগিত হতে হতে ক্রমাগত পরবর্তী নির্বাচন, পরবর্তী প্রার্থী, পরবর্তী বিধানসভা, তারপর পরবর্তী মন্ত্রি-পরিষদের জন্য অনন্তকাল তোলা থাকে!

যেদিন কিউবা-বিপ্লবের সাফল্যের সংবাদ এসে পেঁছোলো সেদিন লক্ষ লক্ষ আমেরিকান ঘুম ভেঙে চমকে জেগে উঠেছিলেন। তাঁরা সেদিন বিশ্বাসই করতে পারেন নি যে, একটি উপ-মহাদেশ তাদের বেঁচে থাকার সমস্ত 'আশা' হারিয়েও আবার 'আশা'র মধ্যেই বেঁচে রয়েছে। কোথাকার কে এক কিউবান ছোক্‌রা যার নাম ফিদেল কাস্ত্রো সে নাকি 'আশা'র চুলের মুঠিটা ধরে দাঁড় করিয়ে তাকে তার টেবিলের উপরে এনে বসিয়েছে; যে টেবিল নাকি আমেরিকার লক্ষ মানুষের বিলাস-বহুল ঘরকে সাজিয়ে রাখে।

'আশা'কে বাস্তবে রূপায়িত করার যাত্রা সেইদিন থেকে আমরা শুরু করেছিলাম। কিন্তু আমরা বেঁচে আছি বড়ো ভয়ে ভয়ে। কিউবার পাশেই একটি সাম্রাজ্য ও শোষণবাদী বিরাট দেশ কিউবার সঙ্গে আমাদেরও সমস্ত 'আশা'কে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়ার জন্য প্রতি মুহূর্তে চেষ্টা করে চেলেছে। আমি জানি আমেরিকার প্রতিটি মানুষ সকালে ঘুম থেকে উঠে খবরের কাগজের শিরোনামা দেখা থেকে রাত্রে রেডিওতে শেষ সংবাদ 'কিউবা এখনও বেঁচে রয়েছে' শুনে নিঃশ্বাস ফেলে তবেই শুতে যান। আরো একটা দিন, আরো একটা সপ্তাহ, আরো একটা মাস, আরো একটা বছর, তারপর পাঁচটা বছর, আমাদের 'আশা'র মাথাটা কাটা যায়নি, হয়তো যাবেও না।

কিউবা থেকে আসা একটি চিঠি

পেরুর সাহিত্যিকরা একটা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, পেরুর পক্ষ থেকে আমায় তাঁরা পুরস্কৃত করবেন। এও ঠিক হয়েছিলো যে, তাঁরা আমায় একটি সম্মানসূচক পদকও দেবেন। এই ধরনের পুরস্কার বা পদকের প্রতি সব সময়েই আমার একটা অনীহা ছিলো। আমার দৌত্যগিরির জীবনে এমন বহু পুরস্কার ও পদক আমি পেয়েছিলাম যার পিছনে 'একজন সৎ রাজকর্মচারী'র স্বীকৃতি ছাড়া মানুষের কোনো ভালবাসা, শ্রদ্ধা বা স্নেহ কিছুই ছিলো না। আমার লেখা কবিতা "মাকুপিকু পাহাড়ের চূড়া" পেরুর মানুষকে খুবই আকৃষ্ট করেছিলো, তার কারণ বোধহয় আমার কবিতার মধ্য দিয়ে এলোমেলো ওই শক্ত পাহাড়ের তলায় সঞ্চিত শক্তির খবর তাঁরা জেনেছিলেন। তাই বোধহয় আমি আমার জীবনে এই প্রথম একটি পুরস্কার ও পদক সর্বান্তঃকরণে গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হয়েছিলাম। কারণ আমি

জানতাম এটি আমার দৌত্যগিরির উপঢৌকন নয়, এটি আমার কবিতা অর্থাৎ আমার সংগ্রামী সাহিত্য-জীবনেরই পুরস্কার।

প্রায় ঠিক এই সময়েই পি. ঈ. এন. ক্লাবের বার্ষিক সভায় যোগ দেওয়ার জন্য আমেরিকা থেকে আমার আমন্ত্রণ এলো। আমেরিকাতে আমার বন্ধু আরথার মিলার, আর্জেনটিনার আরনোস্টা সাবাতো ও ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো, উরুগুয়ের এমির রোজারিগুয়েজ, মেক্সিকোর কারলস ফুয়েনটিস সহ সমাজবাদী য়ুরোপের প্রায় সমস্ত সাহিত্যিকই সেবার নিমন্ত্রণ পেয়েছিলেন।

আমি আমেরিকাতে পৌঁছাবার পর জেনেছিলাম যে, কিউবার সাহিত্যিক ও কবিরাও আমন্ত্রিত হয়েছেন কিন্তু কিউবার কারপেনটিয়ারের অনুপস্থিতিটা আমার চোখে পড়লো। 'প্রেনুসা লেতিনা'র অফিসে গিয়ে কারপেনটিয়ারের কাছে তারবার্তা পাঠানোর পর উত্তর এলো যে, কিউবার সাহিতাকদের কাছে আমন্ত্রণ-পত্র অনেক দেরীতে পৌঁচেছে, এবং উত্তর আমেরিকার ভিসা সময়মতো না পৌঁছানোর জন্য কিউবার কোনো সাহিত্যিক বা কবি আসতে পারবেন না। আমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন যেন রহস্যময় মনে হয়েছিলো। আমরা সকলেই ভিসা ও আমন্ত্রণ-পত্র প্রায় মাস তিনেক আগেই পেয়েছিলাম। আমি জেনেছিলাম যে, কিউবার সাহিত্যিক ও কবিদের ক্ষেত্রেও আমন্ত্রণ-পত্র পাঠানোর কোনো দেরী হয়নি অথচ এই সম্মেলনে তাঁদের যোগ না দেওয়াটা আমার কাছে খুবই দুঃখজনক লেগেছিলো।

আর সব জায়গার মতো উত্তর আমেরিকাতেও আমাকে আমার কবিতা পড়ে শোনাতে হয়েছিলো। ন্যু ইয়র্কের মতো বিরাট শহরের ঝলমলে আলোর নীচে দাঁড়িয়ে যখন লক্ষ লক্ষ আমেরিকানের সপ্রশংস ও মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমার সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রবিরোধী সাম্যবাদী কবিতাগুলি পাঠ করে শুনিয়েছি তখন অবাক বিস্ময়ে উপলব্ধি করেছি যে, আমাদের শত্রুকে তাঁরা তাঁদেরও শত্রু বলেই মনে করেন।

'লাইফ' পত্রিকার স্প্যানিশ সংস্করণের প্রতিনিধির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকারের পর তাঁরা যে রচনাটি লিখেছিলেন সেটি যে সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বিকৃত তাই নয়, রচনাটি ছিলো উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। প্রতিবাদ করা সত্ত্বেও আমার প্রতিবাদে তাঁরা কোনো কথাই বললেন না। আমি যে সব কথা ভিয়েতনামের যুদ্ধের বিরুদ্ধে, নিগ্রোদের প্রতি অবিচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে বলেছিলাম তার একটি বর্ণও তাঁরা ছাপান নি! প্রায় এক বছর পরে জানতে পেরেছিলাম যে, আমার কথাগুলিকে কাঁচি চালিয়ে বাদ দেওয়া হয়েছিলো। এও জেনেছিলাম যে, আমার আদর্শ, আমার সাম্যবাদী, সংগ্রামী কবিতা ও আমার জোরালো মতামতের জন্য আমাকে আমন্ত্রণ পাঠানোর সময় উত্তর আমেরিকার পি. ঈ. এন. ক্লাবের সভ্যদের যথেষ্ট লড়াই করতে হয়েছিলো। উত্তর আমেরিকার কবি মেরিয়েন মুরকে পি. ঈ. এন. ক্লাবের তরফ থেকে বিশেষ পুরস্কার দেওয়ার পরে তিনি তাঁর ধন্যবাদসূচক বক্তৃতায় বলেছিলেন—কঠিন আইনের যুদ্ধের লড়াইতে জিতে তিনি যে আমাকে আমন্ত্রণ-পত্র পাঠাতে পেরেছিলেন এবং আমার উপস্থিতিকে যে সফল করতে পেরেছেন এতেই তিনি গর্ব বোধ করেছিলেন। তাঁর হৃদয়গ্রাহী সেই বক্তৃতার শেষে সমবেত শ্রোতৃ-

মণ্ডলীর কাছে বিপুল সম্বর্ধনা পেয়েছিলেন তিনি।

কিন্তু চিলিতে ফিরে আসার পর কিউবা থেকে আমার নামে যে চিঠিটা এসেছিলো তাতে আমি একটা প্রচণ্ড দুঃখ ও আঘাত পেয়েছিলাম। উত্তর আমেরিকায় পি. ঈ. এন. ক্লাবের যে ক'টি সভায় আমি আমার বক্তব্য রেখেছিলাম তার প্রতিটিই ছিলো ভূস্বামী, সামন্ততন্ত্র, ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী। শুধু তাই নয়, কিউবার বিপ্লব, তার সাফল্য ও মূল্যায়ন নিয়েও আমি অনেক কথাই বলেছিলাম।

পেরুর প্রদত্ত পদক, পি. ঈ. এন. ক্লাবের কাছে পাওয়া সম্মান, 'মাকু-পিকু'র শিখরের উপরে লেখা আমার কবিতা, ভিয়েতনামের যুদ্ধ, অসাম্য আর শোষণের বিরুদ্ধে আমার রচনা বা সংগ্রামের কোনো কিছুর উল্লেখ না করেই সেই চিঠিতে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছিলো যে, আমি নাকি সাম্রাজ্যবাদের দালাল। কিউবার যে সব সাহিত্যিক ও কবি আমার বিরুদ্ধে এই অন্যায় ও মিথ্যা অভিযোগ এনেছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই আমার চেয়েও বয়সে তরুণ, আবার কেউ কেউ ছিলেন কিউবান সরকারের মাসোহারা পাওয়া সরকারী সাহিত্যিক ও কবি।

কিউবা থেকে আসা এই চিঠিতে আরো অনেক কবি, সাহিত্যিক, অভিনেতা, নাট্যকার ও নৃত্যশিল্পীর স্বাক্ষর ছিলো। অবশ্য এঁদের মধ্যে অনেকেই আমায় পরে জানিয়েছিলেন যে, এই স্বাক্ষরগুলি তাঁদের নয়।

পরে জেনেছিলাম যে, মাদ্রিদ থেকে ফ্রাংকোর মূর্তি চিহ্নিত ডাকটিকিট দেওয়া খামের মধ্যে আমার নামে নানান মিথ্যা অপবাদে ভরা এই সব চিঠি নিয়মিত বিভিন্ন দেশে পাঠানো হয়েছে এবং বিভিন্ন সাহিত্য সংস্থা, সাহিত্যিক ও কবির কাছে সর্বতোভাবে আমায় একজন প্রতিবিপ্লবী বলে চিহ্নিত করার চেষ্টা হয়েছে!

আমার প্রতি এই অকারণ ক্রোধের কারণ খুঁজে বার করার চেষ্টা সম্ভবপর হয়নি। রাজনৈতিক প্রতারণা, আদর্শগত দুর্বলতা, চিরাচরিত আক্রোশ, ঈর্ষা ও পরশ্রীকাতরতা ইত্যাদি সব কিছুর বিরুদ্ধে এই সংগ্রামে আমি হয়ে পড়েছিলাম একঘরে। পরে জেনেছিলাম যে, রবারতো ফারনানদেজ রিতামার, এডমাণ্ডো ভেসনস ও লিসান্দ্রো ওতেরোর মতো সাহিত্যিক ও কবিরা আমার বিরুদ্ধে এই জঘন্য অপপ্রচারের নায়ক!

পরে এই কথা ভেবে আমার হাসি পেয়েছিলো যে, এই রিতামার হাভানা ও প্যারিসে আমাকে বহু তোষামোদ করেছেন এবং আমার লেখার প্রতি তাঁর যে কি তীব্র আকর্ষণ ও শ্রদ্ধা সে কথাটাও বার বার বোঝাতে চাইতেন। ওঁরা হয়তো ভেবেছিলেন যে, আমার সক্রিয় বিপ্লবী জীবন ও দৃষ্টিভঙ্গিকে ওঁদের নোংরা সমালোচনায় ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবেন। তাই সেদিন যখন সানতিয়াগোর, তিয়াতোনিস স্ট্রীটে অবস্থিত কম্যুনিস্ট পার্টীর অফিসে আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলির জবাবদিহি করার জন্য আমায় যেতে হয়েছিলো তখন পার্টীর তরফ থেকে আমায় বলা হয়েছিলো যে, সেই প্রথম চিলির কম্যুনিস্ট পার্টী একটি প্রচণ্ড আঘাতের সম্মুখীন।

অবশ্য এটাও ঠিক সেই সময়টায় আমরা একটা প্রচণ্ড স্বন্দেবর মধ্য দিয়ে চলেছি। ভেনেজুয়েলা, মেক্সিকো প্রভৃতি দেশের সাম্যবাদীরা কিউবার সঙ্গে একটা আদর্শগত বিরোধের মধ্য দিয়ে চলেছেন তার উপর বলিভিয়াও মর্মান্তিক অবস্থায় বিরোধের মুখোমুখি বিরোধিত করলো, যদিও নীরবে।

এই সময়েই চিলির কমিউনিস্ট পার্টী আমাকে তাঁদের প্রথম 'রেকাবারেন পদক' উপহার দেওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত নিলেন। এই পদকটি দেওয়া হতো পার্টীর সবচেয়ে সক্রিয় ও আদর্শবাদী ব্যক্তিকে। চিলির কমিউনিস্ট পার্টী অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে সাম্যবাদী ও সমাজবাদী জগতের এই সময়কার অন্তর্দ্বন্দ্বকে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করেছিলেন এবং এই সহজ ও সরল বিশ্লেষণ ও মন্তমন নিয়ে আলোচনার ফলেই মতানৈক্যের সমস্ত বাধা অতিক্রম করে লাতিন আমেরিকার দু'টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ সাম্যবাদী পার্টী পাশাপাশি দাঁড়াতে ও ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের কর্মসূচী গ্রহণ করতে পেরেছিলো।

আমার নিজের সম্বন্ধে শুধু এইটুকুই বলতে পারি যে, "সেনাধ্যক্ষের কবিতা" লেখা মানুষটির কোনো দিক দিয়ে কোনোখানেই এতটুকুও পরিবর্তন হয়নি। শুধু তাই নয়—আমি গর্ববোধ করি এই ভেবে যে, আমিই পৃথিবীর প্রথম কবি—যে কিউবার বিপ্লবের বন্দনাগীতি রচনা করেছিলো।

আমি বিশ্বাস করি যে, বিপ্লব বা বিপ্লবের যাঁরা সক্রিয় অংশীদার তাঁদের মধ্যে মাঝে মাঝে ভুল বোঝাবুঝি বা অচেতন আদর্শচ্যুতির ঘটনা ঘটতে পারে এবং সেই সব অবস্থায় তাঁরা নানান্ অজানিত অপমান ও মিথ্যাচারের শিকারও হতে পারেন। সমগ্র মনুষ্যজাতির উপরে যে অলিখিত আদর্শগত নীতি, রীতি বা বিশ্বাস রয়েছে তার মধ্যে বিপ্লবী বা প্রতিবিপ্লবীদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ থাকতেই পারে। ভুল সবাই-ই করেন এবং একটা বড়ো কারণের জন্য ছোট্ট একটা ভুল, বিপ্লবের মতো মহান্ আদর্শের বিন্দুমাত্র ক্ষতিও করতে পারে না। আমি কিউবার মহানায়ক ও তার সংগ্রামী যোদ্ধাদের জন্য চিরদিনই শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সঙ্গীত রচনা করবো। কিন্তু অনুভূতি, দুঃখবোধ ইত্যাদি সরল আবেগগুলি সব মানুষেরই আছে। আমি যেমন নিজেকে একজন সংগ্রামী বিপ্লবী বলে মনে করার গর্ববোধটুকু কোনো অবস্থাতেই বিসর্জন দিতে পারি না, তেমনই আমার মতো নগণ্যতম ব্যক্তির অন্তর্নিহিত এই গর্ববোধটুকুর সম্মানের জন্যই আমার বিশ্বাসবোধকে আঘাত করে সেই অসম্মানজনক চিঠিটি আমায় যাঁরা লিখেছিলেন, তাঁদের সঙ্গে কোনোদিনই করমর্দন করতে পারবো না। আমার বিশ্বাস, বিপ্লব ও আদর্শের প্রতি আমার যে অকৃত্রিম সম্মানবোধ তাকে আঘাত করে আমায় যে অসম্মান করা হয়েছিলো এই কথাটি আমি কখনও ভুলতে পারবো না।

১২

হায়রে ! আমার স্বদেশ !

চরমপন্থী ও গুপ্তচর

'বিগতদিনের' নৈরাজ্যবাদী এবং বর্তমান যুগের' নৈরাজ্যবাদীদের' ভাগ্যে যেটা ঘটবে সেটা হচ্ছে প্রায়শঃই তাঁরা 'আরামদায়ক চরমবিপ্লবী ও 'ধনতন্ত্রবাদের দিকে ঝুঁকবেন এবং সেই সুযোগে রাজনৈতিক গোলন্দাজরা প্রায় বামপন্থী এবং মিথ্যা উদারপন্থীদের আশ্রয়স্থল হয়ে দাঁড়াবেন। দমনমূলক 'ধনতন্ত্রবাদের প্রভুরা জানেন যে, 'কমিউনিস্টরাই তাঁদের একমাত্র মৃত্যুবাণ তাই কমিউনিস্টদের 'হত্যা করার সময়ে তাঁরা ভুল করেন না। এই সব আত্মকেন্দ্রিক নৈরাজ্যবাদীরা তখন খুবই আনন্দ পান যখন তাঁরা দেখেন যে, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির 'চোরাগোপ্তা আক্রমণে 'কমিউনিস্টরা ভীত ও 'সন্ত্রস্ত। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি এটাও খুব ভালোভাবেই জানেন যে, ব্যক্তি বিশেষের বিপ্লবে সমাজে কোনো পরিবর্তনই হয় না বরং প্রকৃত গণ-আন্দোলন এবং ব্যাপক শ্রেণীসচেতনতাই একমাত্র সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের পরিবর্তন ঘটাতে পারে। স্পেনে নিজের চোখে এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করেছি। কিছু ফ্যাসীবিরোধী উপদল হিটলার ও ফ্রাঙ্কোর মাদ্রিদাভিমুখে আগুয়ান ফ্যাসীবাহিনীর সামনে মুখোশ

পরে হুল্লোড় করেছেন। অবশ্য আবার নৈরাজ্যবাদী বিপ্লবী দারুতেকে দেখেছিলাম বারসিলোনাতে সিংহের মতো সংগ্রাম করতে। গুপ্তচরেরা চরমপন্থীদের চেয়ে হাজার গুণে ভয়াবহ। মাঝে মাঝে পুলিস, স্বদেশের এবং বিদেশের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ও ধনতন্ত্রবাদের দালালরা শত্রুপক্ষের দালালদের ভাড়া করে সক্রিয় বিপ্লবী দলের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়। ওরা ভিতরে ঢুকে হয় বিপ্লবীদের প্ররোচিত করে অথবা নির্বাক দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে।

আজেভের কথাই ধরা যাক। জারের পতনের সময় তিনি অনেক সন্ত্রাসমূলক কাজ করেছিলেন এবং তার জন্য তাঁকে অনেকবার জেলও খাটতে হয়। কিন্তু বিপ্লবের পরে যখন জারের গুপ্ত পুলিসবাহিনীর প্রধানের আত্মকাহিনী প্রকাশিত হলো তখন সবাই জানতে পেরেছিলেন আসলে আজেভ ছিলেন ওখরানার একজন পেশাদার গুপ্তচর। অদ্ভুত চরিত্রের এই মানুষটির মধ্যে সন্ত্রাসবাদ ও গুপ্তচরবৃত্তি ছিলো এবং তাঁরই কৌশলে গ্রান্ড ডিউকের মৃত্যু হয়। আরও একটি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছিলো আমেরিকায়। তখন আমেরিকাতে 'ম্যাকার্থিজিম'এর জোয়ার। লস্ এঞ্জেলস, ক্যালিফোর্নিয়া না সানফ্রান্সিস্কো ঠিক শহরটির নাম আমার মনে পড়ছে না, সেখানে একদিন পঁচাত্তরজনকে 'কমিউনিস্ট' বলে গ্রেপ্তার করা হলো। পরে জানা গেল এঁরা প্রত্যেকেই এফ্. বি. আই-র মাসোহারা পাওয়া লোক। অর্থাৎ এফ্. বি. আই. পয়সা খরচ করে একটি ছোটখাটো কমিউনিস্ট পার্টি তৈরি করে নিজেরাই চালাচ্ছে। শুধু তাই নয়, এই পঁচাত্তরজন লোকের মধ্যে কেউ কাউকে চিনতেন না। এফ্. বি. আই-এর কাজই ছিলো মাঝে মাঝে এদেরকে গ্রেপ্তার করে বাহবা কুড়োনো। এই ধরনের বহু ঘৃণ্য অপরাধের জন্য এফ্. বি. আই. দায়ী। বহু নিরপরাধ ব্যক্তির হত্যা ও ফাঁসী এঁদের কার্যাবলীতে কলঙ্ক লেপন করেছে। নিকৃষ্টতম যে হত্যাকাণ্ড সারা পৃথিবীকে সেদিন স্তম্ভিত করেছিলো সেই নিরপরাধ রোজেনবার্গ দম্পতির মৃত্যুর জন্যও এরাই দায়ী।

চিলির কমিউনিস্ট পার্টী তৈরি হয়েছিলো পুরোপুরি সর্বহারা নিপীড়িতদের নিয়ে এবং তার সংগ্রামী ইতিহাস ছিলো সুদীর্ঘ, কাজেই এই ধরনের অনুপ্রবেশ চিলির কমিউনিস্ট পার্টীতে প্রায় অসম্ভব ছিলো। আবার এই সময়কার লাতিন আমেরিকার গেরিলাযুদ্ধ, তার আংশিক সাফল্য ও গেরিলা নেতাদের জনপ্রিয়তা পার্টির মধ্যে বহু কোন্দলের সৃষ্টিও করেছিলো। তরুণ ও যুবক কর্মীদের পক্ষে গেরিলার মুখোশধারী গুপ্তচর বা সন্ত্রাসবাদীদের ঠিক মতো চিনে বের করা খুবই মুশকিল হচ্ছিল। গেরিলা যোদ্ধারা এতই সতর্ক থাকতেন যে, তাঁরা নিজেদের ছায়া দেখলেও চমকে উঠতেন। গেরিলা-জীবনের তীব্র দুঃখ, কষ্ট, নিঃস্বার্থ আত্মদান ও সদা সতর্ক দৃষ্টি—সব কিছু মিলিয়ে এক অভূতপূর্ব রোমাঞ্চ সারা লাতিন আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়ে। বৈপ্লবিক এই রোমাঞ্চময় মুহূর্তে সমগ্র লাতিন আমেরিকায় একটা শিহরণ তুলেছিলো।

হয়তো এই যুগটা আরনেস্টো গুয়েভারার বীরোচিত মৃত্যুর সঙ্গেই শেষ হয়ে যেতে পারতো, কিন্তু তাঁর সমর্থক ও সমালোচকদের গবেষণামূলক প্রবন্ধ, তথ্যবহুল লেখনী এবং প্রদীপ্ত আলোচনা সারা লাতিন আমেরিকার মস্তিষ্ককে এমনভাবে সুসিক্ত করলো

যে, তাঁরা তাঁদের ভাবী সরকার গঠন ও দপ্তর বণ্টনের সময় শ্রেণী-সচেতনতার কথা না ভেবে শুধুমাত্র গেরিলা যোদ্ধাদের মধ্যেই সেগুলি ভাগাভাগি করে দিলেন! রাজনৈতিক যুক্তি ও সিদ্ধান্তের এখানেই ছিলো ভয়ানক দুর্বলতা। চে'গুয়েভারার মতো রাজনীতি-সচেতন ও গেরিলা যুদ্ধের সংমিশ্রণসম্পন্ন পূর্ণ একটি মানুষ কখনো কখনো পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু তা হচ্ছে বিশ্ব-সংসারের মানুষের ইতিহাসে হঠাৎ ঘটা একটি ঘটনা। গেরিলা যুদ্ধের বিজয়ীরা কখনই কোনো সর্বহারা, বঞ্চিত মানুষে ভরা দেশের নেতৃত্ব দিতে পারেন না। কারণটা বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যাবে যে, সাহস বা ভাগ্য-জোর মৃত্যুকে জয় করা অথবা একজন ভালো গোলন্দাজ, এই ক'টি আখ্যা বা গুণ নিয়ে সর্বহারা বঞ্চিতদের সামগ্রিক নেতৃত্ব দেওয়া সম্ভব নয়।

এবার অন্য আর এক অভিজ্ঞতার কথা বলছি। একবার এক রাজনৈতিক সম্মেলনে একজন এসে আমায় তাঁর শুভেচ্ছা জানালেন। বেশভূষার পারিপাট্য, নাকের ডগায় প্যাশনে চশমার কালো ফ্রেম, মধ্যবয়সী অভিজাত এই ব্যক্তিটিকে দেখে আমার বেশ অমায়িক ভদ্রলোক বলে মনে হয়েছিলো। তিনি আমায় বললেন, 'পাবলো, বহুদিন ইচ্ছা হয়েছে আপনার সাথে দেখা করি, কিন্তু সাহস পাইনি। আমার নাম ক্যাটালান আর আমার আজকের এই জীবনটার জন্যে আপনার কাছে আমি চিরঋণী। সেদিন হিটলারের 'গ্যাস্-চেম্বার' ও কনসেনট্রেশন শিবির থেকে মুক্ত করে আপনিই আমায় চিলিতে স্থান দিয়েছিলেন আর আজ আমি এখানে একজন সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী—।' আমায় তিনি আরো জানালেন যে, আমার বিশিষ্ট বন্ধু বিখ্যাত টেনিস খেলোয়াড় ঈগ্লোসিয়াসের সান্তিয়াগোর বাড়ির পাশেই একটি সুন্দর বাড়িতে তিনি থাকেন। আমার বাল্যবন্ধু ঈগ্লোসিয়াস ও নিজের আমন্ত্রণ নিয়ে তিনি আজ আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়েছেন। আমি সেদিন এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলাম।

উচ্চ মধ্যবিত্তের সুন্দর সাজানো গোছানো বাড়ি, যে বাড়ির ভিতর ও বাইরের সর্বত্রই আভিজাত্যের ছোঁয়াচ আছে। দুপুরের খাওয়ার সময়টাতে ঈগ্লোসিয়াস আমার সঙ্গেই ছিলেন। দু'জনে বসে বাল্যজীবনের স্মৃতি রোমন্থন করেছিলাম। তেমুকোর সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের মাটির সোঁদা গন্ধ, তার প্রায়ান্ধকার গৃহের বাদুড়ের ডানাগুলি আমাদের দেহকে স্পর্শ করে শূন্যে উড়ে যাওয়া—এমনি সব আরো কতো ঘটনাকে আমরা টেনে এনেছিলাম বিস্মৃতপ্রায় অতীতের অন্ধকার থেকে সেদিনের স্বল্পালোকিত দ্বিপ্রাহরিক ভোজসভার আসরে। খাওয়া শেষে কাটাল্যান একটি সুন্দর নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন আর উপহার দিলেন আমায় অমূল্য দুখানি ছবি। ছবি দু'টির মধ্যে একটি ব্যোদলেয়ারের আর অন্যটি এড্গার এ্যালান প্যোর। এই ছবি দু'খানি আজও গ্রন্থাগারের শোভাবৃদ্ধি করছে।

একদিন ক্যাটাল্যান মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণজনিত পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হলেন। মুখের ভাবভঙ্গি বা কথা বলার সব ক্ষমতাই লোপ পেলো তাঁর। শুধুমাত্র চোখ দু'টি ছিলো খোলা এবং সেই চোখের নিস্তেজ দৃষ্টি দিয়ে তিনি তাঁর স্প্যানিশ সহধর্মিণী ও বন্ধু ঈগ্লোসিয়াসকে যেন কিছু বলবার বা বোঝাবার চেষ্টা করতেন।

কিন্তু কিছু বোঝানো বা বলার আগেই মৃত্যু তাঁকে গ্রাস করলো।

বাড়িতে তখনও অশ্রু, ফুলের তোড়া আর সমবেদনা। আত্মীয় বন্ধুদের ভীড়, ঠিক এমনি সময়েই আমার টেনিস খেলোয়াড় বন্ধু ঈগলোসিয়াস একটি টেলিফোন পেলেন। কে একজন যেন রহস্যজড়িত কণ্ঠে তাঁকে ধীরে ধীরে বলছেন: 'আমরা জানি মিঃ ঈগলোসিয়াস আপনি ক্যাটাল্যানের একজন ঘনিষ্টতম বন্ধু। আমরা তাঁর কাছ থেকে আপনার বহু প্রশংসাই শুনেছি। আপনি যদি সত্যিই আপনার বন্ধুর স্মৃতি রক্ষার জন্য কোনো কাজ করতে চান, তবে তাঁর লোহার আলমারি থেকে চাবিবন্ধ লোহার ছোট্ট বাক্সটা বার করে আপনার কাছে রেখে দিন। আমরা ঠিক তিনদিন পরেই আপনার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করবো।'

ক্যাটাল্যানের সদ্য বিধবা পত্নী এসব কথায় কোনো আমলই দিলেন না, এমন কি তখন তিনি এতই শোকাভিভূত ছিলেন যে, এ বিষয়ে কোনো কথা শুনতেও চাইলেন না। তিনি এই বাড়ি ছেড়ে সান্তা ডমিংগো স্ট্রীটে একটি ছোটো বাড়ি ভাড়া করে উঠে গেলেন। এই বাড়ির মালিক ছিলেন একজন যুগোশ্লাভিয়ান। ইনি রাজনীতিক চেতনাসম্পন্ন একজন শক্ত মানুষ। ক্যাটাল্যানের বিধবা পত্নী তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন যাতে তিনি ক্যাটাল্যানের সব আসবাবপত্র ভালো করে পরীক্ষা করে দেখেন। অনেক চেষ্টা করে চাবিবন্ধ সেই লোহার বাক্সটি খোলা হলো। অচেনা আগন্তুকের মতো বাক্সের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো একটি নরখাদক ব্যাঘ্র। বাক্সের মধ্য থেকে যে সব কাগজ ও দলিল-পত্র পাওয়া গেল, তা পড়ে জানা গেল যে, ক্যাটাল্যান ছিলেন ফ্যাসিস্ত দালাল। বাস্তুত্যাগী বহু স্পেনিশকে জার্মান কারাগারে পাঠানো এবং তাঁদের হত্যার জন্য তিনিই দায়ী। এমন কি জেনারেলসিমো ফ্রাঙ্কোর স্বহস্তে লেখা তাঁর প্রতি ধন্যবাদজ্ঞাপক চিঠিও পাওয়া গেল। ক্যাটাল্যানের পাঠানো গোপন সংকেত অনুসরণ করে চিলির উপকূল থেকে ছেড়ে যাওয়া সমর সম্ভারে ভর্তি বহু জাহাজকেই ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছিলো, তার মধ্যে ছিলো চিলির গর্বের জাহাজ 'লতারো'।

আমাদের সেদিনকার ভোজসভার সদাহাস্যময় নিমন্ত্রণকর্তা ক্যাটাল্যানের এই হলো আসল পরিচয়।

কমিউনিস্ট

বেশ কয়েকটি বছর চলে গেল। কমিউনিস্ট পার্টীর সক্রিয় সভ্য হিসাবে আমি আজ খুব সুখী। আমার মনে হয় আমরা, কমিউনিস্টরা যেন একটি একান্নবর্তী পরিবার। সব ক'টা মরশুমের স্পর্শে কঠিন হয়ে আসা চামড়ার তলায় একটি উষ্ণ হৃদয়। এর উপরের চামড়ায় সব চাবুকই এসে আঘাত করে আর আশ্চর্য লাগে কেমন করে সব চাবুকেরই আঘাতকে চামড়াটা সইয়ে নেয়। হে ঈশ্বরবাদী, হে রাজ-অনুগত ব্যক্তি, হে বিকৃতমনা, হে বংশানুক্রমে অপরাধীর দল আপনারা সবাই দীর্ঘজীবন লাভ করুন, যে কুকুর শুধু চেঁচায় না, কামড়ায়ও তারাও দীর্ঘজীবন লাভ করুক। হে লম্পট, হে জ্যোতিষী,

হে অশ্লীল সাহিত্যিক, হে বিশ্বনিন্দুকের দল আপনারা সবাই দীর্ঘজীবন লাভ করুন। ওহে কুচো চিংড়ীমাছের দল তোমরাও দীর্ঘজীবন লাভ করো। সবাই দীর্ঘজীবন লাভ করুক একমাত্র কমিউনিস্টরা ছাড়া।

কুমারীত্ব দীর্ঘজীবন লাভ করুক, রক্ষণশীল যে ব্যক্তি গত পাঁচশো বছরে আদর্শের ময়লা জমা পদযুগলকে একবারও ধৌত করেন নি, তাঁরা দীর্ঘজীবন লাভ করুন, দারিদ্র্যের গায়ের উকুন, বিনিপয়সায় সুদখোরের দখল করা কুম্ভকারের কারখানা, নৈরাজ্যবাদী ধনতন্ত্রবাদ, আঁদ্রে জিদ আর তাঁর সুগন্ধি ফুলের বাহার, সর্বপ্রকারের রহস্যবাদ—এ সবই দীর্ঘজীবন লাভ করুক। যা কিছু যায় বা যাঁরাই যান তাঁরা সবাই বীর ও বীরপুরুষ! সমস্ত সংবাদপত্রই নিয়মিত ভালোভাবে ছেপে প্রতিদিনই বার হবে একমাত্র কমিউনিস্টদের মুখপত্র ছাড়া। সমস্ত রাজনীতিক ও কর্মীদের মুক্ত বিহঙ্গের মতো সানতো প্রমিঙ্গোতে ঢুকিয়ে দাও, তাঁরা সবাই রক্তপিপাসু ক্রুজিল্লোর মৃত্যুতে উল্লসিত হয়ে আনন্দানুষ্ঠানে মত্ত হোক, কেবল একমাত্র তাদের বাদ দাও যারা এই মুক্তির লড়াইয়ে কঠিন সংগ্রাম করেছিলো। এই যে হুল্লোড়, আনন্দ-উৎসবের এই যে শেষের দিনটি এরা সবাই দীর্ঘজীবন লাভ করুক।

প্রত্যেকের পরিচিতির জন্য একটি করে মুখোশ রয়েছে। খ্রীষ্টানদের রয়েছে ধর্মের মুখোশ, চরমপন্থীদের বামপন্থী মুখোশ, ভালোমানুষ বৃদ্ধা আর রাশভারী প্রবীনা স্ত্রীলোকদের নিজস্ব মুখোশ—কিন্তু সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন যেন কমিউনিস্টরা কোনো মুখোশ পরে ঢুকতে না পারে, দরজা ভালো করে বন্ধ করে তালাচাবি দিয়ে আটকে রাখুন, ভুল করবেন না। মনে রাখবেন কমিউনিস্টদের কোনো কিছুতেই অধিকার নেই। অহংবাদী মানুষের বৈশিষ্ট্য এবং বৈশিষ্ট্যের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আমাদের চিন্তা করতে দিন, আমরা সবাই এতেই খুব সুখী, আমাদের কাছে 'স্বাধীনতা' নামক বস্তুটি রয়েছে, অহো! স্বাধীনতা কি মহান!

তাঁরা কিন্তু এই স্বাধীনতাকে কোনো শ্রদ্ধাই প্রদর্শন করেন না, এমন কি এই স্বাধীনতার অর্থও বোঝেন না। বৈশিষ্ট্যের চিন্তা, বৈশিষ্ট্যের মূলে উপাদান সংক্রান্ত স্বাধীনতার চিন্তা, স্বাধীনতার জন্য স্বাধীনতার চিন্তা, এমনি করেই বিগত বছরগুলি চলে গেল। 'জাজ' সঙ্গীত বিদায় নিলো। শোনা গেল 'সোল' সঙ্গীত। বিমূর্ত শিল্পের মৌলিক নীতি নিয়ে আমরা প্রাণপণ বিশ্লেষণে মত্ত হলাম, যুদ্ধ এগিয়ে এসে আমাদের হত্যা করলো, এই দিকটায় আমরা যেমন তেমনিই রইলাম, কি—তাই না? আত্মা সম্বন্ধে এতো কিছু ব্যাখ্যা ও বক্তৃতার পর, মস্তিষ্কে এতবার আঘাত হওয়া সত্ত্বেও, কোথাও কোনো কিছুর যেন অভাব ঘটলো। খুব খারাপ-ভাবেই সেই অভাব বোধটা দেখা দিলো, মনে হয় ওঁদের গণনায় কোথায় একটা ভুল হয়েছিলো। মানুষ তখন সংঘবদ্ধ হচ্ছে, গেরিলা যুদ্ধ আর ধর্মঘট শুরু হয়ে গেল, কিউবা আর চিলি ফিরে পেলো তাদের সত্যিকার স্বাধীনতা, লক্ষ কোটি মানুষের কণ্ঠে ধ্বনিত হলো 'ইন্টারন্যাশনাল' সঙ্গীত। কি বিশ্রী, কি হৃদয়-বিদারকভাবেই না ঘটনার পরিক্রমণ শুরু হলো। এখন তাঁরা আবার চীনা, বুলগেরিয়ান, পোলিশ ও স্পেনিশ ভাষায়, লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন ভাষায় এই সঙ্গীত গাইতে শুরু করেছেন। আমাদের এই বিষয়ে শীঘ্রই একটা কোনো ব্যবস্থা নেওয়া দরকার, এই সব

আচরণ ও সঙ্গীতের উপর এখনই নিষেধাজ্ঞা জারী করা হোক্, এ সবের বিরুদ্ধে এখনই জ্বালাময়ী জাতীয়তাবাদী কিছু জোরালো ভাষার বক্তৃতার বিশেষ প্রয়োজন, 'মুক্ত দুনিয়ার স্বাধীনতা' সম্বন্ধে ওদের আরো কিছু সঙ্গীত শোনানোর প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, আমাদের আরো কিছু ডলারের সঙ্গে কিছু চাবুক পাঠানোর প্রয়োজন মনে হচ্ছে, এই সব চলতে দেওয়া যায় না। 'স্বাধীনতা'র মাঝখান দিয়ে 'চাবুক' আর আতঙ্ককে পেঁছে দিতেই হবে, কি সর্বনাশ! এই কিউবা আমাদের মানচিত্রর মধ্যে থেকে, আমাদেরই আপেলের বুক চিরে এক মুখ দাড়ি নিয়ে এখন 'ইণ্টার-ন্যাশনাল' গান গাইছে! হায়! হায়! যীশুখ্রীস্ট, তুমি আমাদের কোন্ মঙ্গলটা করলে। এই যে এতো পাদ্রী আর পুরোহিতকে আমরা রাজার সম্মান দিয়ে এতো অর্থব্যয় করে রাখলাম তাঁরা আমাদের কি ভালোটা করলেন?—না না, আর কাউকেই বিশ্বাস করা যায় না, পাদ্রী আর পুরোহিতদেরও নয়, ব্যাটারা আজকাল আমাদের চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারে না, ওরা জানে না যে, শেয়ার বাজারে আজ আমাদের শেয়ারের দাম কোথায় নেমে চলেছে।

ইতিমধ্যে মানুষ সৌরমণ্ডলে উড়ে বেড়াতে শুরু করেছে, চাঁদের মাটিতে পড়েছে মানুষের পায়ের ছাপ।—সবই বদলাতে শুরু করেছে শুধু মাত্র এই জরাজীর্ণ সমাজ-ব্যবস্থা ছাড়া। মধ্য যুগের মাকড়সার জালের রেশ ধরে শুরু হয়েছিলো এই জীর্ণ সমাজ-ব্যবস্থা, এই মাকড়সার জাল ছিলো লোহার চেয়েও শক্ত। তবু এমন মানুষও ছিলেন যাঁরা পরিবর্তনে বিশ্বাস করতেন। যাঁরা পরিবর্তন করেছেন এবং পরিবর্তনকে এক বিরাট কর্মকাণ্ডে রূপায়িত করেছেন তাঁরা পরিবর্তিত মনুষ্য-সমাজের অবস্থাকে একটি ফুটন্ত ফুলের মতো তুলে ধরেছেন।

কারামুবা! কারুর সাধ্য নেই জাগ্রত সেই বসন্তকে আটকে রাখতে পারে!

কবিতা ও রাজনীতি

১৯৬৯ সালের প্রায় সারা বছরটাই আমি ইস্‌লানেগ্রাতে কাটিয়েছিলাম। সারাক্ষণ অশান্ত সমুদ্রের তটভূমির দিকে তাকিয়ে মনে হতো, কোন্ অতলের তল থেকে ফেনিল গ‍ঁ্যাজলা তুলে এনে মানুষের জন্য এক দিগন্তব্যাপী রুটি তৈরি করার জন্য যেন সব সময়েই সে ব্যস্ত।

একগাদা কুয়াশাকে সঙ্গে নিয়ে শীত এলো। শীতের রাতগুলিতে ঘরের উনুনে কেবলই জ্বালানি কাঠ ভরে আগুন জ্বালিয়ে ঘরকে গরম রাখার চেষ্টা চলতো। সমুদ্র পারের বালির সাদা রঙটা আমাদের মনকে নিঃসঙ্গ একাকীত্বে ভরিয়ে তুলতো। মনে হতো পৃথিবীতে গ্রীষ্মের ছুটির দিনগুলি শুরু হয়েছে। গ্রীষ্মের তাপদগ্ধ দিনগুলিতে ছেলে-মেয়েরা যখন নাচতে নাচতে সমুদ্রস্নানের জন্য ছুটে যেতো, তখন তাদের নৃত্যরত দেহের ভঙ্গিমা দেখে মনে হতো, এ যেন সেই আদ্যিকালের গ্রীষ্মঋতুর নিজস্ব নাচের ভঙ্গিমা।

শীতকালে একমাত্র আমার বাড়িটি ছাড়া রাত্রে আর সব বাড়িই অন্ধকারে ডুবে

থাকতো। মাঝে মাঝে অন্য বাড়ির কাঁচের জানালায় আমার বাড়ির আলোর প্রতিচ্ছবি দেখে মনে হতো, হয়তো ওই বাড়িতে আলো এসেছে, এখুনি প্রতিবেশীর মুখটা দেখতে পাবো।

আমি এখানেই বসে লিখতাম। আমার দু'টি কুকুর, 'পান্ডা' আর 'চাও'কে খুশি রাখার জন্য সব ব্যবস্থাই ছিলো। বহু বছর আগে চীনদেশ থেকে কিনে আনা 'রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার'এর চামড়া, তার মুখ আর দাঁত যা অতি জীর্ণ অবস্থায় এসে পেঁছেছিলো তা আমার বসবার ঘরের মেঝেতে পাতা ছিলো। আমার কুকুর-গুলি তাদের এই পুরোনো শত্রুর চামড়ার উপরে শুয়ে অতি নিশ্চিন্তে ঘুমুতো। তাদের ঘুম দেখে মনে হতো যেন তারা এই পুরোনো শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ-জয়ের শেষে গভীর ক্লান্তিতে নিদ্রামগ্ন।

সব সময়েই ইস্‌লানেগ্রায় আমার এই বাড়িটিতে কোনো না কোনো ঘটনা ঘটতো। বহুদূর থেকে ফোন এসেছে আমার বাড়িতে, উত্তর ছিলো—'না, উনি নেই'। বহুদূর থেকে আবারো ফোন এসেছে আমার জন্য, কেউ কোনো খবর পাঠাতে চান, উত্তর ছিলো ঃ 'হ্যাঁ, উনি রয়েছেন'। 'আমি আছি', 'আমি নেই', 'হ্যাঁ, আমি আছি ; না, আমি নেই', 'লোকালয় থেকে বহুদূরে কর্মরত এক কবির জীবনে দূরত্ব আর দূরে ছিলো না।

প্রায়শঃই সাংবাদিকরা আমাকে প্রশ্ন করতেন আমি কি লিখছি, কি বিষয় নিয়ে লিখছি ইত্যাদি। তাঁদের এই প্রশ্নে অবাক না হয়ে পারতাম না, কারণ আমি তো কবিতাই লিখি আর কবিতার বিষয়বস্তু—সে তো অনন্ত। আমার নিজেরই এই বিষয়টি বুঝতে অনেক সময় লেগেছিলো। আমি কবিতা লিখি, কারণ সংজ্ঞা বা পরিচয় সম্বন্ধে কোনো কৌতূহলই আমার ছিলো না। নন্দনতত্ত্ব সম্বন্ধে কোনো আলোচনা হলেই নিজেকে মৃতপ্রায় মনে হতো। এ বিষয়ে আমার কারুর বিরুদ্ধেই কিছু বলার নেই, তবে সাহিত্যের জন্ম তারিখের প্রশংসাপত্র বা তার শবদেহ পরীক্ষার জন্য আমার কোনো আগ্রহই ছিলো না। ওয়াল্ট হুইট্‌ম্যানের সেই অমর কথা ক'টি 'কোন বহিরাবরণেরই নির্দেশ আমি মানবো না—' এই ছিলো আমার মূলমন্ত্র। সমস্ত গুণসমৃদ্ধ হয়েও সাহিত্যের সাজ সরঞ্জাম যেন নগ্ন সৃষ্টির রূপ না পায়।

বহুবার, বহু সময়েই আমি আমার লেখা বদলেছি। নিজের হাতে পরিবর্তিত পরিবর্ধিত সেই সব রচনাবলী এই ঘরের মধ্যেই কোথাও ছড়িয়ে রয়েছে। অনেক কথা জড়ো করে তা এখন একটা পুস্তকে রূপান্তরিত হয়েছে। এক রূপ থেকে তারা আরও একটি রূপ নিয়েছে, নিশ্চল অবস্থা থেকে তারা সচল হয়েছে, নিষ্প্রভ পতঙ্গ থেকে তারা ঝলমলে জোনাকীতে পরিণত হয়েছে।

রাজনীতির বজ্র-কঠিন আহ্বান আমাকে আমার লেখা থেকে সমরক্ষেত্রে টেনে নিয়ে গেল। জনতার মাঝখানে আবার ফিরে এলাম। এই জনতার ভীড়েই আমার জীবনের সব শিক্ষা আমি পেয়েছি, জনতার মাঝখান থেকেই জীবনের পূর্ণতা লাভ করেছি। কবিসুলভ ভীরুতা নিয়ে যখন সেই ভীড়ের মধ্যে পেঁচেছি তখনই আমার সমস্ত দেহ আর মনে অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটেছে। মনে হয়েছে—মানুষ নামে একটি

বিশাল মহীরুহের আমি যেন একটি পত্র।

আমাদের এই যুগের কবিদের হয় একাকীত্ব অথবা বহুত্বের কাছে বশ্যতাকে স্বীকার করে নিতেই হবে। একাকীত্বের সংগ্রামে চিলির সমুদ্রোপকূলের ফেনিল জলোচ্ছ্বাস আমার জীবনে এনেছিলো এক ধরনের পূর্ণতা যা মুগ্ধ দৃষ্টি নিয়ে বিমোহিত হয়ে প্রত্যক্ষ করেছিলাম, পাহাড়ের সঙ্গে অবিরত সংগ্রামে মত্ত জলরাশির খেলা, পাখিদের ভীড়, উত্তাল সমুদ্রের সফেন জলরাশি আর তার সঙ্গে লক্ষ কোটি প্রাণীর ভেসে ওঠা, আবার অতলে মিলিয়ে যাওয়া।

কিন্তু আমার জীবনের পূর্ণতা তখনই সম্পন্ন হয়েছে, যখন বিশাল জনসমুদ্রের প্রাণোচ্ছল জোয়ারকে দেখেছি, হাজার লক্ষ দৃষ্টির গভীর মমত্ববোধ যখন আমার দৃষ্টিকে স্পর্শ করেছে। জনতার এই শ্রদ্ধা, ভালোবাসা আর মমত্ববোধের বার্তা হয়তো সব কবির জীবনে আসে না, কিন্তু যাঁদের জীবনে এসেছে তাঁরা চিরদিন তাঁদের হৃদয়ে এই রোমাঞ্চময় অভিজ্ঞতাকে সযত্নে রেখে দেবেন, সেই অনুভূতিকে কবিতায় রূপায়িত করার কাজে নিজেকে নিয়োগ করবেন। যদি অনেক মানুষের আশা আর স্বপ্নকে মাত্র একটি মুহূর্তের জন্যও বাস্তবে রূপায়িত করা যায়, তবে কবির জীবনে তা হবে গভীরভাবে মর্মস্পর্শী এক অবিস্মরণীয় ঘটনা।

রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী

১৯৬৯ সালের এক সকালে পার্টির সম্পাদক আমার ইসলানেগ্রার বাড়িতে উপস্থিত হয়ে, 'পপুলার ফ্রণ্টের আরো কয়েকজন প্রার্থীর সঙ্গে কয়েকটি শর্তসাপেক্ষে আমার নামও প্রজাতন্ত্রী চিলির রাষ্ট্রপতির পদের জন্য প্রস্তাব করার অনুমতি চাইলেন। তাঁদের ভবিষ্যৎ কার্যাবলীর বিবরণও তৈরি ছিলো। যেমন—কি রকম সরকার হবে, চিলির শোষিত, নির্যাতিত মানুষের বিভিন্ন দাবি দাওয়া কিভাবে মেটানো হবে, ইত্যাদি। অন্যান্য সব পার্টির নিজস্ব প্রার্থী আগে থেকেই ঠিক করা ছিলো একমাত্র কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়া। আমাদের উদ্দেশ্য ছিলো বামফ্রণ্টের সর্বসম্মত প্রার্থীকে এই নির্বাচনে দাঁড় করানো এবং তাঁর জয়ের জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করা। দক্ষিণপন্থী ও চরম জাতীয়তাবাদী পার্টিগুলি তাদের প্রার্থীর সর্বপ্রকারের শক্তিশালী প্রচারযন্ত্র নিয়ে সেই সঙ্গে বিদেশী অর্থপুষ্ট হয়ে এই নির্বাচনী লড়াইতে নেমে পড়েছে। আমরা যদি একটি ন্যূনতম কার্যসূচী ও সর্বসম্মত একজন প্রার্থীকে নিয়ে নির্বাচনী-লড়াইতে অবতীর্ণ না হই, তবে চিলির এই ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে আমাদের পরাজয় সুনিশ্চিত।

এখন একমাত্র পথ হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি থেকে একজন পার্থীকে মনোনয়ন দিয়ে তাঁর নাম ঘোষণা করা, যাতে অন্যান্য বামপন্থী দল আমাদের পার্টির সঙ্গে একটা আপোষ আলোচনায় বসে এবং সর্বসম্মত একজন প্রার্থী পেতে তখন কোনো অসুবিধাই হবে না। পার্টির এই প্রস্তাবে আমি রাজী হয়ে গেলাম। কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে আমার এই সম্মতিদান, অন্যান্য বামফ্রণ্টের সঙ্গে একটা আপোষে

আমার পক্ষে সহায়ক হলো এবং আমাদের শর্ত ছিলো যদি সর্বসম্মত একজন প্রার্থী না পাওয়া যায় তাহলে আমিই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবো।

আমাদের এই সাহসিক সিদ্ধান্ত যে অন্য সব পার্টীকে সচকিত করে তুলবে এ বিষয়ে আমি প্রায় নিঃসন্দেহ ছিলাম। আমরা জানতাম যে, কমিউনিস্ট পার্টীর মনোনীত প্রার্থীর পক্ষে অন্যান্য সব বামফ্রন্টের সমর্থন লাভ করা অসম্ভব ব্যাপার। অথচ অন্যান্য আর সব পার্টীর এমন কি খ্রীষ্টিয়ান ডেমক্রেটিক দলের প্রার্থীরাও আমাদের সমর্থন লাভের জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করছিলেন। যদিও তাঁরা কেউই আমাদের প্রার্থীকে সমর্থন করতেন না। কমরেড কোরভালিনকে তাই স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছিলাম যে, আমি যখনই পদত্যাগ করতে চাইবো তখনই যেন আমার পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়।

আমার নাম ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সারা চিলিতে যেন আগুন ছড়িয়ে পড়লো। হাজার-লক্ষ মানুষ এসে অশ্রুসিক্ত নয়নে আমায় বার বার আলিঙ্গন করে আমাকে চুম্বন করলেন, কয়েক হাজার মানুষ আনন্দের আবেগে আমায় জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললেন। বস্তির মানুষ, খনি-শ্রমিক, ছেলে কোলে চাষী রমণী, বিয়োবিয়ো নদী থেকে শুরু করে ম্যাগেলান প্রণালী ছাড়িয়ে লক্ষ লক্ষ দুঃখী, অধঃপতিত মানুষ তাঁদের চরমতম দুর্দশা, অবিচার, আর বর্ণনাতীত শোষণের অভিযোগ শোনানোর জন্য আমার সঙ্গে দেখা করার আশায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতেন। প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে কর্দমাক্ত রাস্তায় আর মাঠের ধারে দাঁড়িয়ে আমি তাঁদের কথা শুনেছি, তাঁরাও শুনেছেন আমার কথা, আমার কবিতা। দখিনা বাতাসের স্পর্শ লেগে যা আমাদের প্রত্যেককেই রোমাঞ্চময় শিহরণে শিহরিত করেছিলো।

ক্রমবর্ধমান উৎসাহের সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রতিটি সভায় মানুষের ভীড়ও ক্রমশঃ বেড়ে চলেছিলো। মুগ্ধ ও শঙ্কিত হৃদয় নিয়ে ভাবতে শুরু করলাম, নানান সমস্যা ও করের বোঝা, বিদেশী ঋণের আকণ্ঠ চাপে বিশৃংখল নিপীড়িত, অবহেলিত আমার এই দেশের, মানুষের কথা। নির্বাচনে সত্যিই যদি জয়লাভ করি, তবে একজন প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রপতি হিসাবে দেশের বা দেশের মানুষের কতটুকু উপকারই বা আমি করতে পারবো। তাছাড়া অকৃতজ্ঞ আমার এই দেশ, সেখানে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার পর তাঁর বরাদ্দে থাকে মাত্র একটি মাসের অনুষ্ঠানবহুল সম্মান এবং তারপর যে কোনো কারণেই হোক তাঁর বাকী পাঁচটা বছর কাটে শহীদের মতো।

আলেন্দির প্রচার অভিযান

সেদিনের সকালটা ছিলো আমার কাছে বড়ো আনন্দের। যখন খবর পেলাম সালভাদোর আলেন্দি সমস্ত বামপন্থী দলের সর্বসম্মত প্রার্থী হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন তখন পার্টীর সম্মতি নিয়ে পূর্ব শর্ত মতো পদত্যাগ করলাম এবং এক বিশাল জনসমাবেশের সামনে আলেন্দির সমর্থনে নাম প্রত্যাহার করে নিলাম। সেদিনের সেই জনসমাবেশের আয়োজন হয়েছিলো বিরাট এক ময়দানে, দুপাশের গাছপালা

ছাড়িয়ে মানুষের ভীড় উপচে পড়ছিলো।

আলেন্দে ছিলেন আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, আমার খুব কাছের মানুষ। এর আগে তিনবার তিনি রাষ্ট্রপতিপদ-প্রার্থী হিসাবে নির্বাচনী সংগ্রামে নেমেছিলেন, এবং এই তিনবারই আমি তাঁর প্রচার অভিযানে নেমেছি, আমার দেশের বিভিন্ন জনসভায় তাঁর নির্বাচনী প্রচারে আমার কবিতা পাঠ করে শুনিয়েছি। জানতাম, চতুর্থবারের এই নির্বাচনে তাঁর জয়লাভ সুনিশ্চিত।

ঠিক মনে পড়ছে না, আরনল্ড বেনেট্ বা সমারসেট্ মম-এর মধ্যে কোনো একজনকে উইনস্টন চার্চিলের সঙ্গে একবার একই ঘরে থাকতে হয়েছিলো। বিচক্ষণ ও ধূর্ত সেই রাজনীতিবিদের ঘুম থেকে উঠেই প্রথম কাজ ছিলো বিরাট লম্বা ও বেশ মোটা হাভানা চুরুট ধরিয়ে, পা দু'টি আরামকেদারায় ছড়িয়ে একটি সুখটানের সঙ্গে মুখ থেকে একরাশ ধোঁয়া ছাড়া—একমাত্র প্রস্তরযুগের একজন স্বাস্থ্যবান, লৌহকঠিন গুহামানবের পক্ষেই যেটা সম্ভব।

আলেন্দের মতো কঠিন পরিশ্রম করার ক্ষমতা আমাদের মধ্যে কারুরই ছিলো না। চার্চিলের মতই বহু গুণে সমৃদ্ধ ছিলেন আমাদের আলেন্দে, ইচ্ছা করলে সারা দিন-রাত জেগে থাকতে পারতেন আবার ইচ্ছা করলে সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়তেও দেখেছি তাঁকে। মাঝে মাঝে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন প্রচার অভিযানে বেরিয়েছি, গাড়ীতে যেতে যেতে দেখতাম গাড়ীর এক কোণে আলেন্দে ঘুমিয়ে রয়েছেন। কখনো কখনো দেখতাম রাস্তার ধারে ছোটো-খাটো জনতার ভীড়, দলের ছোট্ট ছোট্ট ছেলে-মেয়েরা, শিশু কোলে মায়েরা লাল পতাকা নিয়ে আমাদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আমরা গাড়ি থামাতাম, সদ্য ঘুম ভাঙা চোখ দু'টি রগড়াতে রগড়াতে আলেন্দে গাড়ী থেকে নেমে তাঁদের মাঝখানে দাঁড়াতেন, তাঁদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে জাতীয় সঙ্গীত গাইতে গাইতে তাঁদের সঙ্গেই নাচতে আরম্ভ করে দিতেন। ফিরে এসে আবার তিনি গাড়ীর মধ্যে ঘুমিয়ে পড়তেন। প্রতি পনেরো, কুড়ি বা পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর পর সারা চিলিতে আমাদের যাত্রাপথে এটাই ছিলো নিয়ম, ছোটো-খাটো জনতার ভীড়, সমবেত জাতীয় সঙ্গীত, নৃত্য—তারপরেই গাড়িতে ঘুমিয়ে নেওয়া।

গাড়ী থেকে ট্রেনে, ট্রেন থেকে এরোপ্লেনে, এরোপ্লেন থেকে জাহাজে, জাহাজ থেকে ঘোড়ার পিঠে করে চিলির বিশাল জনতার মাঝখানে আমরা ঘুরে বেড়িয়েছি। কার্যসূচীর সব কিছুই আলেন্দে আগে থেকেই ঠিক করে নিতেন, একটা দিনও তাঁকে নিয়মের ব্যতিক্রম করতে দেখিনি। তাঁর সঙ্গে কাজ করার সময় প্রায় প্রত্যেককেই দেখেছি পরিশ্রান্ত, একটু বিশ্রামে ইচ্ছুক—একমাত্র আলেন্দে ছাড়া। পরে তিনি যখন চিলির রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন তখন তাঁর এই অপ্রশম্য কর্মক্ষমতার জন্য তাঁর তিন-চারজন সুযোগ্য সহকর্মীকে করোনারী রোগে ভুগতে হয়েছিলো।

প্যারীর রাষ্ট্রদূত

প্যারিসে যেদিন দূতাবাসের কার্যভার গ্রহণ করতে এলাম সেদিন বুঝেছিলাম আত্মশ্লাঘার জন্য অনেক মূল্যই আমাকে দিতে হবে। আগুপেছু কোনো চিন্তা না করেই আমি এই পদ গ্রহণে স্বীকৃত হয়েছিলাম, আমার জীবনের মধ্যে যে একটা দুরন্তপনা রয়েছে সেটাই ছিলো তার জন্য দায়ী। ভেবেছিলাম বিগত কয়েক শতাব্দীর কলংকময় দাসত্বপূর্ণ অধ্যায়ের যে সব চিহ্ন আমার দেশের এই দূতাবাসগুলিতে অংকিত হয়েছে তার অপসারণ একান্তই প্রয়োজন এবং একটি নির্বাচিত, সভ্য ও প্রগতিবাদী সরকারের প্রতিভূ হিসাবে আমার এই নিয়োগকে স্বীকার করে নেওয়া উচিত। হয়তো আমার মধ্যে এই আকাঙ্ক্ষাও ছিলো যে, আমি সগর্বে ও সদর্পে প্যারিসের এই দূতাবাসে প্রবেশ করবো, যেখানে একদিন স্প্যানিশ উদ্বাস্তুদের স্বাধীনতালাভের জন্য আমাকে অনেক অবমাননাকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছিলো। আমার আসার আগে পর্যন্ত এই দূতাবাসে যাঁরা ছিলেন তাঁরা সবাই আমার প্রতি নির্যাতন, ঘৃণা ও অসম্মান প্রদর্শনের সম-অংশীদার ছিলেন। আমার সেদিন এই কথাই মনে হয়েছিলো যে, আজ সেই নির্যাতিত মানুষটি দখল করে নেবে নির্যাতনকারীর বসার চেয়ারটি, তাঁরই টেবিলে বসে রাত্রের খাবার খাবে আর তারই বিছানায় রাত্রে শুতে যাওয়ার আগে ঘরের সমস্ত জানালাগুলি খুলে দেবে যাতে করে নতুন হাওয়া এসে দূতাবাসের পুরোনো ঘরগুলিকে শুভ্রতায় ভরে দেবে। কিন্তু এই নতুন হাওয়া প্রবেশ করানোটাই ছিলো সবচেয়ে কঠিন। ঘরের মধ্যে চমক লাগানো আসবাবপত্র ও প্রকাণ্ড বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আমার ও ম্যাটিলডের দম সেদিন বন্ধ হয়ে উঠেছিলো। রাজদূতের রাজকীয় সেই বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আমাদের সেদিন মনে হয়েছিলো—এই বিছানাতেই হয় শান্তিতে নয়তো নিদারুণ যন্ত্রণায় কতো রাজদূত বা তাঁদের পত্নীকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে! এই দূতাবাসের এক একটি ঘরে বড়ো বড়ো আস্তাবল তৈরি হতে পারতো। বাড়িটির প্রতিটি দেওয়াল, থাম আর উঁচু গম্বুজের প্রতিটি খাঁজে ছিলো অমূল্য সব কারুকার্য। মেঝেতে পাতা প্রায় ষাট বছরের পুরোনো মহামূল্য কার্পেটের মূল্যবান সুতোগুলি ক্রমাগত মানুষের পদচারণায় বিবর্ণ রূপ নিয়ে ক্ষয়িষ্ণু সামন্তবাদ ও ধনতন্ত্রবাদের অন্তিম অবস্থাকে প্রমাণ করতে চাইছিলো।

আমাদের আসার খবর পেয়ে দূতাবাসের পুরোনো কর্মচারীরা সম্ভবত ঘাবড়ে গিয়েই ঘর গরম রাখার আগুন জ্বালাতে ভুলে গিয়েছিলেন। কাজেই প্যারিসের দূতাবাসে আমাদের প্রথম রাত্তিরটা কেটেছিলো ঠাণ্ডায় প্রায় জমে গিয়ে। পরের দিন যদিও আগুন জ্বললো কিন্তু ষাট বছরের পুরনো সেই উনুনগুলিতে আগুনের চেয়ে ধোঁয়াই বেশী হলো। বাধ্য হয়ে জানালাগুলি খুলে দিয়েছিলাম।

ঠিক করলাম এই বাড়ি ছেড়ে শহরের উপকণ্ঠে একটা বাড়ি নেবো যেখানে

থাকবে সবুজ ঘাস, ফুলের গন্ধ এসে ভরে দেবে ঘরগুলিকে। এই চিন্তাটা আমাদের এতই আবিষ্ট করে ফেললো যে, বন্দী যেমন মুক্ত জীবনের জন্য ছটফট করে আমরাও তেমনি প্যারী শহরের বাইরে মুক্ত হাওয়া খোঁজা শুরু করে দিলাম।

রাষ্ট্রদূতের চাকুরীটা ছিলো আমার কাছে নতুন ও অস্বস্তিকর, তবুও এটিকে একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক যুদ্ধ হিসাবে গ্রহণ করেছিলাম। চিলিতে তার নিজস্ব পদ্ধতিতেই এক বিপ্লব ঘটে গেল। চিলির রক্তপাতহীন এই বিপ্লবের শত্রুরা তাদের দন্তপাটিকে এরই মধ্যে শানাতে আরম্ভ করেছিলো। গত একশো আশি বছর ধরে নানান মুখোস পরে সেই একই শাসকগোষ্ঠী আমার দেশকে অপশাসনে জর্জরিত করে শোষণ করছিলেন। গত একশো আশি বছরে তাঁরা দেশের মানুষকে দিয়েছিলেন জরাজীর্ণ একটি কম্বল, নগ্ন পা, অস্বাস্থ্যকর ভাঙা কুঁড়েঘর যেগুলিকে ঘিরে থাকতো ততোধিক অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, ছোটো ছেলে-মেয়েদের জন্য ছিলো না কোনো বিদ্যালয়, তাদের পায়ে পরার জন্য ছিলো না কোনো জুতো, সামান্যতম সুবিচারের প্রত্যাশা ছিলো না, দরিদ্র অর্ধভুক মানুষের উপর চলতো মুগুর পেটানো। এখন অন্ততঃ আমরা নিঃশ্বাস নিতে পারবো, গান গাইতে পারবো, এই কারণেই সেই নতুন রাষ্ট্রদূতের পদটি আমার ভালো লেগেছিলো।

চিলিতে যাঁরা রাষ্ট্রদূতের জন্য মনোনয়ন পান, ব্যবস্থাপক সভা বা সিনেটের অনুমোদন নিয়ে নিয়োগপত্র দেওয়া হয় তাঁদের। চিলির দক্ষিণপন্থী রাজনীতিকরা আমার কবিতা পছন্দ করতেন এবং মাঝে মাঝে আমার কবিতার প্রশংসা করে বক্তৃতাও দিতেন। অবশ্য আমি এটা ভালোভাবেই জানতাম যে, আমার কবিতার জন্য তাঁদের এই প্রশংসা বা বক্তৃতাটা তাঁরা আমার অন্তিমকালের শোকসভায় দিতে পারলে আরো খুশী হতেন। সিনেটে আমার রাষ্ট্রদূত হিসাবে নিয়োগের অনুমোদন লাভের জন্য যে ভোটাভুটি হয় তাতে মাত্র তিনটি ভোট বেশি পেয়েছিলাম। দক্ষিণ-পন্থী এবং খ্রীষ্টান ভণ্ড সন্ন্যাসীরা গোপনে আমার বিরুদ্ধেই ভোট দিয়েছিলেন।

আমার পূর্ববর্তী যিনি রাষ্ট্রদূত ছিলেন, তিনি দূতাবাসের সারা দেওয়াল জুড়ে তাঁর আগে যাঁরা রাষ্ট্রদূত হয়ে ছিলেন তাঁদের ছবি, এমন কি তাঁর নিজস্ব ছবিও টাঙিয়ে রেখে গিয়েছিলেন। এই সব শূন্যগর্ভ, দাম্ভিক ব্যক্তিবর্গের মধ্যে মাত্র দু'একজন ছাড়া আর কেউ-ই আমার দৃষ্টিতে পড়েন নি। এঁদের মধ্যে একজন হলেন ব্লেস্ট গানা যিনি চিলির সাহিত্য-জগতে 'বালজাক' নামেই সুপরিচিত। আমি সেই সব ছবি দেওয়াল থেকে সরিয়ে ফেলবার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলাম এবং তার বদলে সত্যকার মানবদরদীদের ছবি টাঙাতে বলেছিলাম। এঁদের মধ্যে পাঁচজন ছিলেন চিলির বীর নায়ক যাঁরা চিলিকে দিয়েছিলেন তার নিজস্ব পতাকা, জাতীয় সঙ্গীত, স্বাজাত্যের গৌরব আর স্বাধীনতা। এঁদের মধ্যে আর যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রের নির্বাচিত প্রগতিশীল রাষ্ট্রপতি সালভাদোর আলেন্দে এবং চিলির কমিউনিস্ট পার্টীর প্রতিষ্ঠাতা লুই এমিলো রিকাবারেন, এাকুইরে সিরদা প্রভৃতি। দেওয়ালগুলি কিন্তু এরপর সত্যিই খুব সুন্দর দেখাচ্ছিলো।

দূতাবাসের প্রতিটি কর্মীই ছিলেন দক্ষিণপন্থী, এমন কি দ্বারোয়ানের নিয়োগ-

পরও আসতো তাঁর দক্ষিণপন্থী চিন্তাধারাকে বিচার করার পর। যে খ্রীশ্চান ডেমোক্রাটরা নির্বাচনের সময়ে বামপন্থীদের সঙ্গে আঁতাত করেছিলেন তাঁদের মধ্যেও সুপ্ত দক্ষিণপন্থী মনোভাব সব সময়েই বিদ্যমান ছিলো। এঁরাও সুযোগের অপেক্ষায় থেকে পরে অন্যান্য দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে এক হয়ে যান। আমলা, পুলিশ, সৈন্যবাহিনী, বিভিন্ন সরকারী অফিসের বাবু ও কেরানী এবং উপদেষ্টা—তাঁরা নিজ নিজ স্বার্থ ও দুর্নীতির আশ্রয়ে পুষ্ট দক্ষিণপন্থী বা চরম দক্ষিণপন্থী অথবা দুর্নীতিপরায়ণ শোষক দক্ষিণপন্থী প্রভু যাঁরা তাঁদের নিয়োগপত্র দিয়েছিলেন তাঁদের আজ্ঞাবহ ভৃত্য। চিলির এই রক্তপাতহীন বিপ্লব, বামফ্রণ্টের জয়লাভ, জনগণতান্ত্রিক নির্বাচনে সালভাদোর আলেন্দের জয় এবং সাম্যবাদী ও সমাজবাদী মন্ত্রিবর্গের বা এই বিরাট পরিবর্তন সম্বন্ধে এঁরা কেউই কোনো চেতনাবোধে উদ্বুদ্ধ হন নি কিম্বা এটাকে কোনো একটা ধর্তব্যের বস্তু বলে গ্রাহ্য করেন নি।

এই অবস্থার মধ্যে পড়ে আমায় পররাষ্ট্র দপ্তরকে বাধ্য হয়ে অনুরোধ জানাতে হলো যে, আমার দূতাবাসের উপদেষ্টা হিসাবে আমার সাহিত্যিক বন্ধু জোরজে এড্ওয়ার্ডসকে পাঠানো হোক। জোরজে এড্ওয়ার্ডস যদিও ক্ষমতাশালী দক্ষিণ-পন্থী এক বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তবু তাঁর প্রগতিশীল চিন্তধারার জন্য সকলের কাছেই তিনি সুপরিচিত ছিলেন। তিনি কোনো দলেরই সভ্য ছিলেন না। তখন একজন বিচক্ষণ, চতুর, নির্দলীয় প্রগতিশীল ব্যক্তির একান্তই প্রয়োজন ছিলো আমার—যাঁর উপরে আমি আস্থা রাখতে পারবো। জোরজে এড্ওয়ার্ডস তখন কিউবাতে চিলির রাষ্ট্র-প্রতিনিধি। লোকমুখে জেনেছিলাম কয়েকটি ব্যাপারে কিউবার সঙ্গে তাঁর মত পার্থক্য চলেছে, তবু একজন বামপন্থী মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি হিসেবেই তাকে চেয়েছিলাম।

জোরজে কিউবা থেকে এসে আমার সঙ্গে নতুন কাজে যোগ দিলেন। তাঁর উজ্জ্বল দীপ্ত বুদ্ধি, কাজ করার একনিষ্ঠ এবং সৎ প্রচেষ্টা ও আদর্শের প্রতি দ্বিধাহীন আনুগত্য আমায় মুগ্ধ করেছিলো। মাত্র দু'বছরেই প্রমাণিত হলো যে, এই বিরাট দূতাবাসের বিপুল সংখ্যক কর্মচারীর মধ্যে একমাত্র তিনিই যোগ্য।

উত্তর আমেরিকার এক বণিক সভা চিলি থেকে তামা রপ্তানির উপরে যখন নিষেধাজ্ঞা জারী করলো তখন সারা য়ুরোপে এই নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ উঠেছিলো। শুধু মাত্র যে খবরের কাগজ, রেডিও বা টেলিভিশনে এই প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছিলো তাই নয় য়ুরোপের প্রায় প্রতিটি সাধারণ মানুষের ধিক্কার সেদিন শোনা গিয়েছিলো। ফ্রান্স, হল্যান্ড প্রভৃতি দেশ প্রতিবাদস্বরূপ তাঁদের বন্দরে এই তামা খালাস করতে রাজী হলেন না, তাঁদের অনন্যসাধারণ এই দৃষ্টিভঙ্গি সেদিন সারা পৃথিবীকে সচকিত করে তুলেছিলো। অভূতপূর্ব এই সংহতি বা ঐক্য ইতিহাস সম্বন্ধে যে শিক্ষা আমাদের দেয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে সে শিক্ষা লাভ করা যায় না। তবে এর চেয়েও একটি করুণ ও রোমাঞ্চকর ঘটনার কথা আমার মনে পড়ে। একজন অতি সাধারণ দরিদ্র ফরাসী ভদ্রমহিলা তাঁর সযত্নে জমানো টাকা থেকে একশো ফ্রাঙ্ক আমায় পাঠিয়ে অনুরোধ করেছিলেন যাতে চিলির তাম্রশিল্পকে আমি রক্ষা করি। তাছাড়া সেদিন প্যারীর সাধারণ মানুষ, শ্রমিক, ছাত্র, শিক্ষক,

পাদ্রী, মেয়র ও খেলোয়াড়দের সই করা প্রতিবাদপত্রে উত্তর আমেরিকার এই নিষেধাজ্ঞাকে তাঁরা ধিক্কার জানিয়েছিলেন।

ইতিমধ্যে চিলি থেকে বহু তারবার্তা ও অভিনন্দন-পত্র এলো আন্তর্জাতিক দস্যু-বৃত্তির বিরুদ্ধে আমার এই সংগ্রামকে স্বাগত জানিয়ে। তামা-খনির এক শ্রমিক রমণী অভিনন্দনের সঙ্গে আমার নামে একটি প্যাকেট পাঠিয়েছিলেন যার মধ্যে ছিলো কুমড়ো আর কিছু কাঁচা লংকা।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চিলির সম্মান বৃদ্ধি পেলো। আমরা যারা পৃথিবীর মানচিত্রে এতদিন কোনো স্থানই পাইনি, এই ঘটনার পর কিছুটা স্থান আমরা করে নিতে পেরেছিলাম। এই প্রথম আমার স্বদেশের ভাগ্যে স্বীকৃতিটুকু জুটলো এবং আমাদের ভবিষ্যতের জন্য সংগ্রাম যে শুরু হয়েছে এটা আর কেউ অস্বীকার করতে পারলেন না।

আমার দেশের প্রতিটি ঘটনাই য়ুরোপে সাড়া জাগিয়ে তুলেছিলো। প্যারীতে ছাত্রদের প্রতিবাদ মিছিল, শ্রমিক ও সাধারণ মানুষের শোভাযাত্রা, বিভিন্ন ভাষায় নানান্ চিত্র সম্বলিত আমার দেশের সম্বন্ধে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও পুস্তকাবলী ক্রমশই আকর্ষণীয় ও জনপ্রিয় হয়ে উঠছিলো। প্রতিদিনই সাংবাদিকদের নানান্ প্রশ্নে জর্জরিত হচ্ছিলাম। আমাদের প্রিয় রাষ্ট্রপতি আলেন্দে ধীরে ধীরে বিশ্বের একজন অনন্যসাধারণ সাহসী নেতা হিসাবে খ্যাতি ও স্বীকৃতি অর্জন করছিলেন। চিলির সাধারণ মানুষ, শ্রমিক, ছাত্র ও কৃষকদের এই দৃঢ় ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন—স্বাধীনতা ও সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকা ও বাঁচিয়ে রাখার এই সংগ্রামকে বিশ্ববাসী প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করলেন। তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও আমাদের তাম্রশিল্পের জাতীয়করণ বিশ্বের অন্যান্য দেশ থেকে গভীর সহানুভূতি লাভ করেছিলো। এঁরা প্রত্যেকেই অনুমান করতে পেরেছিলেন যে, চিলির রক্তপাত-হীন বিপ্লব ও নবলব্ধ স্বাধীনতা শতাব্দীর অভিশাপে জর্জরিত, নিপীড়িত মানুষের জন্য সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের ইঙ্গিত বহন করে আনছে। কোনো কৌশল বা ছলের আশ্রয় না নিয়েই বা অন্য কোনো ব্যাক্তিগত স্বার্থের কথা চিন্তা না করেই, দেশ ও দেশের মানুষের সর্বাত্মক কল্যাণের জন্যই চিলির জনপ্রিয় সরকার সেদিন তাম্রশিল্পের জাতীয়করণ করেছিলেন।

চিলিতে ফিরে এলাম

আমরা যখন নিজের দেশ ছেড়ে অন্য কোনো দেশে থাকি, তখন নিজের দেশের শীতকালের দিনগুলির কথা মনে আসে না। চিলিতে ফিরে এসে, সান্তিয়াগোর রাস্তায় রাস্তায় আর উদ্যানগুলিতে সবুজের শোভা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। বসন্ত তখন দূরের জঙ্গলে তুলি দিয়ে সবে সবুজ রঙ লাগাতে শুরু করেছে। প্রবাসে থেকে প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম যে, তীব্র শীতে আমার দেশের মানুষের কণ্টকর জীবন আর তাদের ছেলে-মেয়েদের নগ্ন পায়ে তুষার-ঢাকা রাস্তায় চলার কথা। তখন প্রবাসের স্মৃতি শুধু আমার দেশের সবুজ গ্রাম্য প্রান্তর আর নীলাভ আকাশের

কথাই মনে আনতো, তাই প্যারিস থেকে স্বদেশে ফিরে তার আশপাশের এই সবুজ প্রাণচঞ্চল সৌন্দর্য আমার সমস্ত স্বপ্নকে বাস্তবে রূপান্তরিত করেছিলো।

চিলিতে ফিরে শহরের বাড়িগুলির দেওয়াল, রাস্তাঘাট আর উদ্যানের প্রাচীরে আরো একটি নরখাদক উদ্ভিদ চোখে পড়লো। কমিউনিস্ট-বিরোধী, কিউবা-বিরোধী, রাশিয়া ও চীন-বিরোধী আর শান্তি ও মানবতা-বিরোধী নানান অপমানজনক প্রচারপত্র এই সব দেওয়াল, প্রাচীর আর উদ্যানগুলিতে জন্ম নিয়েছে। জাকার্তার মতো সমস্ত কমিউনিস্টদের খুন করে নিশ্চিহ্ন করার হুমকিও এই প্রচারপত্রগুলিতে ছিলো। নরখাদক, বিশ্রী এই নতুন উদ্ভিদগুলি শহরের সমস্ত দেওয়ালকেই নোংরামিতে ভরে দিয়েছিলো।

হিট্‌লারের অভ্যুত্থানের আগে থেকেই আমি এ যুগে রয়েছি এবং হিট্‌লারের অভ্যুত্থানকে প্রত্যক্ষ করেছি। কাজেই জঘন্য মিথ্যা হুমকিতে ভরা এই সব প্রচারপত্র কে বা কারা লিখেছেন এবং তার মর্মার্থ যে কি এটা বুঝতে কোনো সমস্যাই হয়নি। হিট্‌লারের স্বৈরতন্ত্রী ও ফ্যাসীবাদি প্রচারপত্রগুলিও ছিলো ঠিক এই ধরনেরই। সীমাহীন মিথ্যা, মানুষের মনে আতঙ্ক আর ত্রাস সৃষ্টির জন্য অবিরত প্রতিশ্রুত সুখ ও শান্তিময় ভবিষ্যতের বিরুদ্ধে সর্বক্ষণ ঘৃণার অস্ত্রে শান দেওয়া ও চালনা করাই ছিলো হিট্‌লারের প্রচার যন্ত্রের নমুনা। আমাদের প্রতিশ্রুত জীবনধারাকে বদলে দেবার জন্যই এই প্রচার অভিযান। ভাবতেই অবাক লাগে, চিলিতে এমন মানুষ আছে যে জাতীয়তা বিরোধী প্রচারপত্র লেখার কথা চিন্তাও করতে পারে।

দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলরা যখন সন্ত্রাসবাদীদের হিংস্রতার উপর ভর করে দাঁড়িয়েছিলেন তখন তাঁদের নিজস্ব বিবেক নিয়ে চিন্তা করতে হয়নি কারণ বিবেক-বোধের কোনো বালাই-ই তাঁদের ছিলো না। সুতরাং বিবেকের তোয়াক্কা না করেই তাঁরা সন্ত্রাসবাদীদের নিজস্ব স্বার্থলাভের জন্য যথেচ্ছ আচরণ করছিলেন। সেনাবাহিনীর অধ্যক্ষ জেনারেল স্নিকনাইডার, যিনি সালভাদোর আলেন্দের বিরুদ্ধে সমসাময়িক অভ্যুত্থানকে প্রতিহত করেছিলেন, তাঁকে বিশ্বাসঘাতকরা গোপনে হত্যা করলো। তিনি যখন তাঁর বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছিলেন তখন বিদেশী অর্থপুষ্ট কয়েকজন বিশ্বাসঘাতক তাঁকে পিছন থেকে গুলি করে। গোটা ঘটনাটাই ছিলো একজন পূর্বতন সেনাধ্যক্ষের পূর্ব পরিকল্পিত এবং একাজে তাঁকে সাহায্য করেছিলো ভাড়াকরা কয়েকজন পেশাদার গুন্ডা যাদের জন্য ব্যবস্থা ছিলো প্রভূত বিদেশী ও স্বদেশী অর্থ।

অপরাধ প্রমাণিত হবার পর সামরিক আদালতের বিচারে ত্রিশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হলো আসামীর। কিন্তু চিলির সুপ্রীম কোর্ট সেই আদেশ কমিয়ে মাত্র দু'বছরের জন্য আসামীর জেল-হাজতবাসের নির্দেশ দিলেন। শুনলে আশ্চর্য হবেন, চিলির একজন ক্ষুধার্ত, দরিদ্র ব্যক্তি খিদের জ্বালা কমানোর জন্য যদি একটা মুরগী চুরি করে তবে সুপ্রীম কোর্টের বিচারে তার দণ্ডাদেশ হয় এর চতুর্গুণ। এই হচ্ছে শাসক-শ্রেণীর শ্রেণী-সচেতন আইনের চিরন্তন ব্যবস্থা।

নির্বাচনে আলেন্দের জয় শাসকশ্রেণীর মনে এনেছিলো একটা আতঙ্ক। এই প্রথম তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁদের রচিত আইনেই মানুষের কল্যাণের জন্য

একদিন তাঁদের সরে যেতে হবে। এই শোষক শাসকবর্গ যে একটা উল্টো ধাক্কা খেতে পারেন এ বিষয়ে তাঁরা চিন্তাই করেন নি। আলেন্দের নির্বাচনে জয়লাভের পরেই তাঁরা তাঁদের ধন-সামগ্রী, অলংকারাদি নিয়ে চিলি থেকে দ্রুত প্রস্থানের জন্য চিন্তা ও ব্যবস্থা করতে লাগলেন।

আর্জেন্টিনা, স্পেন এমন কি সুদূর অস্ট্রেলিয়ায় পর্যন্ত কেউ কেউ পালিয়ে গেলেন। জনতার দীর্ঘ দিনের জমাট রোষবহ্নিতে তাঁরা এমনই ভয় পেয়েছিলেন যে, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ভেবেছিলেন উত্তর মেরুতে পালাবেন।

অবশ্য পরে আবার সুযোগ এলে শোষণের জন্য স্বদেশে ফিরে আসার পরিকল্পনাও তাঁদের ছিলো।

ফ্রেই

সর্বত্র শয়তানি আর তথাকথিত আইনগত বাধার মধ্য দিয়ে চলতে গিয়ে চিলির রাস্তা হয়ে উঠেছিলো একটা কঠিন শাসনের আওতায় নিয়মতান্ত্রিক। ইতিমধ্যে সামন্ততান্ত্রিক শাসকবর্গ তাঁদের ছিন্নভিন্ন পোশাককে কোনোরকমে রিপু-সেলাই করে, ফ্যাসিস্ট শক্তিতে রূপান্তরিত করার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা চালালেন। চিলির তাম্রশিল্প জাতীয়করণের সাথে সাথে উত্তর আমেরিকার শত্রুতা ও নানান বিষয়ে বাধাসৃষ্টি আরো তীব্রতর হলো। ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি ফ্রেই-র সঙ্গে খ্রীষ্টান ডেমোক্রেটিক দল হাত মিলিয়ে একজোট হলেন।

ফ্রেই এবং আলেন্দের পরস্পরবিরোধী ব্যক্তিত্ব চিলির রাজনৈতিক আকাশকে মেঘাচ্ছন্ন করে রেখেছিলো। এঁরা দু'জনেই ছিলেন তীব্র আদর্শবাদী যদিও এঁদের পথ ছিলো সম্পূর্ণ বিপরীত। চিলির রাজনৈতিক জীবনে সর্বগুণসম্পন্ন দৃঢ়চেতা একজন প্রকৃত নেতার অভাব সব সময়েই বিদ্যমান ছিলো এবং সেখানে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী এই দু'জন শক্তিশালী নেতা বিতর্কের বস্তুতে পরিণত হয়েছিলেন।

ব্যক্তিগতভাবে আলেন্দেকে খুব ভালোভাবেই চিনতাম এবং তাঁর মধ্যে কখনও দ্বিধাগ্রস্ত বা বিভ্রান্তিকর কোনো মনোভাব কখনই দেখিনি। ফ্রেইকে সিনেটের সভায় দেখেছি এবং তাঁকে দেখলেই মনে হতো তিনি যেন সর্বদাই কোনো না কোনো পরিকল্পনার জন্য তৈরি হয়ে রয়েছেন যেটা আলেন্দের ক্ষেত্রে সব সময়েই ছিলো স্বতঃস্ফূর্ত। প্রায়ই দেখতাম উচ্চৈঃস্বরে বক্তৃতা করতে করতে ফ্রেই জোরে জোরে হেসে উঠছেন। আমি নিজে যদিও বিনা কারণে হাসি না তবু কাউকে শুধু শুধু চেঁচামেচি করে হাসতে দেখলে ভালোই লাগতো। কিন্তু হাসির ক্ষেত্রে মজাটা হচ্ছে, যেমন এক একটা হাসি আছে তেমনি তার সাথে অনেক অনেক হাসিও আছে। ফ্রেইর মুখের দিকে তাকালে বোঝা যেতো যে, সূচ-সুতো দিয়ে রাজনৈতিক জীবনের জামাটা ধীরে ধীরে তিনি সেলাই করে চলেছেন এবং তারই মধ্যে হঠাৎ আসা তাঁর এই হাসির ধাক্কাটা আমায় সচকিত করে তুলতো। সেই হাসি শুনে মনে হতো অন্ধকার রাত্রে কোনো এক হিংস্র পাখীর তীব্র চিৎকার।

বাহ্যিক ব্যবহারে তিনি ছিলেন বেশ সচেতন আর বিনয়ী। সন্দেহজনক এই জটিল ব্যবহারে আমি বিষণ্ণ বোধ করেছিলাম এবং তাঁর সম্বন্ধে আর কোনো মোহই আমার ছিলো না।

একবার সান্তিয়াগোয় আমার বাড়ীতে তিনি এলেন নির্বাচন বিষয়ে কথাবার্তা বলতে। তখন সবেমাত্র কম্যুনিস্ট পার্টী ও খ্রীশ্চিয়ান ডেমোক্রেটিক পার্টীর সঙ্গে ন্যূনতম কয়েকটি কার্যসূচীর ভিত্তিতে নির্বাচনকালীন আঁতাতের কথা হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। যদিও তখন খ্রীশ্টান ডেমোক্রেটিক পার্টী বলে কিছুই ছিলো না, তখনও তাঁরা 'ফালানজ্ঞে ন্যাশন্যাল' নামেই পরিচিত। দলের এই বিদ্ঘুটে নামটা এসেছিলো একজন তরুণ ফ্যাসিস্ট স্প্যানিশ নেতা প্রি মো দ্য রিভেরার কাছ থেকে। স্পেনীয় যুদ্ধের পরে ফ্যাসীবিরোধী মারিটেইনের নেতৃত্বে আসবার পর দলের নাম হয় খ্রীস্টান ডেমোক্রেটিক পার্টী।

আমাদের আলোচনা ছিলো খুবই সীমিত ও সংরক্ষিত। আমরা, কম্যুনিস্টরা সব সময়েই সবার সঙ্গেই আলোচনায় বসার জন্য প্রস্তুত ছিলাম যদি তাতে সাধারণ দরিদ্র মানুষের কিছু উপকার হয়। যদিও আলোচনার সময়ে কেমন একটা এড়িয়ে চলার মনোবৃত্তি নিয়েই ফ্রেই কথা বলছিলেন, তবে বামপন্থীদের সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব তাঁর সেই স্বভাবসুলভ উচ্চ হাসির মধ্য দিয়েই ব্যক্ত করে তিনি বলেছিলেন: আচ্ছা, পরে আবার আলোচনায় বসা যাবে। এই ঘটনার দু'দিন পরেই জানতে পেরেছিলাম আমাদের আলোচনা আর কোনদিনও হবে না।

আললেন্দির জয়লাভের পর ক্ষমতালিপ্সু ক্রূর ফ্রেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, একমাত্র প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সঙ্গে হাত না মেলালে তাঁর পক্ষে ক্ষমতালাভের কোনো সম্ভাবনাই নেই। একটি রাজনৈতিক মাকড়সার এই হচ্ছে ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া স্বপ্ন। সামরিক অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করে যে মাকড়সার জাল তিনি তৈরি করেছিলেন তাঁর নিজের পক্ষেও সেটা খুব সুখপ্রদ ছিলো না। ফ্যাসিস্টদের মূলমন্ত্র আপোষ রফায় নয়, বশ্যতা স্বীকারে। প্রতিটি বছর ধীরে ধীরে ফ্রেইর চরিত্রকে ঘন কুয়াশার মধ্যে ঠেলে নিয়ে যাবে তারপর এক সময়ে তাঁর স্মৃতি এই জঘন্যতম অপরাধের সমস্ত দায়িত্বটুকু বহন করে বেড়াবে।

টমিক

খ্রীশ্চান ডেমোক্রেটিক পার্টী যখন তাঁদের 'ফালানজ্ঞে' নামটি বদলালেন তখন থেকেই আমি এই পার্টীর কার্যাবলীর উপরে আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টি রেখেছিলাম। কয়েকজন ক্যাথলিক বুদ্ধিজীবী মারিটেইনের নেতৃত্বে এই পার্টীর ভিত্তি স্থাপন করলেন। এঁদের আভিজাত্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি কিন্তু মোটেই ভালো লাগেনি আমার। যে সব ব্যক্তি কবিতা, রাজনীতি ও যৌনতা সম্বন্ধে তাত্ত্বিক যুক্তিতে বিশ্বাস করেন তাঁদের সম্বন্ধে আমার অনীহা সব সময়েই ছিলো। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে এঁদের কয়েকটি কার্যকলাপ দলের জন্য অপ্রত্যাশিত ফল এনে দিয়েছিলো।

মাদ্রিদ থেকে ফিরে স্প্যানিশ গৃহযুদ্ধের সমর্থনে একটি জনসভার ব্যবস্থা করেছিলাম, এবং সেই মহতী সভায় বক্তৃতা করার জন্য এ'দের কয়েকজন তরুণ নেতাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। মাদ্রিদের সর্বত্র তখন গৃহযুদ্ধ চলেছে। এই তরুণ নেতারা সেদিনকার সভায় অংশ গ্রহণ করে স্প্যানিশ গৃহযুদ্ধের সমর্থনে জোরালো বক্তৃতা করেছিলেন।

ঘৃতে আহুতি প্রদান হলো। পার্টীর সংরক্ষণশীল নেতারা কাঁটার খোঁচা দিতে শুরু করলেন, গীর্জার বৃদ্ধ পাদ্রীরা দলটিকে প্রায় ভেঙে দেওয়ার উপক্রম করলেন। কিন্তু ঠিক এই সময়েই একজন ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ধর্মযাজকের চেষ্টায় রাজনৈতিক এই আত্মহত্যার হাত থেকে দলটি রক্ষা পেয়ে যায়। —টালকার সেই ধর্মযাজকের একটি বিবৃতি সেদিন এই দলটিকে চিলির অন্যতম জনপ্রিয় দলে পরিণত করেছিলো। কয়েক বছরের মধ্যেই এই দলের মত এবং আদর্শে প্রভূত পরিবর্তন ঘটেছিলো।

ফ্রেইর পরেই যে মানুষটি এই ডেমোক্রেটিক পার্টীর অন্যতম প্রধান নেতারূপে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন তিনি হলেন রাদমিরো টমিক। আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বে ভরা এই মানুষটির বক্তৃতা দেবার ক্ষমতা ছিলো অসাধারণ। বিভিন্ন সভা-সমিতি এবং সিনেটের সভায় বার বার এই মানুষটির সান্নিধ্যলাভের সুযোগ ঘটেছে আমার। উত্তর চিলি, তাম্রখনির শ্রমিক কৃষক ও সাধারণ দরিদ্র মানুষরাই ছিলেন চিলির কম্যুনিস্ট পার্টীর ঐকান্তিক ও সক্রিয় সমর্থক। খ্রীশ্চান ডেমোক্রেটিক পার্টীর সভ্য ও সমর্থকরা জানতেন যে, এ'দের সমর্থন বা সাহায্য ছাড়া তাঁদের পক্ষে কোনো কিছু করা সম্ভব নয়।

১৯৬৪ সালে খ্রীশ্চান ডেমোক্রেটিক পার্টীর জয় এবং ফ্রেই সভাপতি হবার পর থেকেই চিলির রাজনৈতিক জীবনে অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। আলেন্দি যে প্রার্থীর কাছে তাঁর হারকে স্বীকার করে নেন সেই প্রার্থীর সমর্থনে যে ঘৃণ্য প্রচার চলেছিলো তা অবর্ণনীয়। কম্যুনিস্ট-বিরোধী পত্র-পত্রিকা, খবরের কাগজ, রেডিও, টেলিভিশন এমন কি পথ-সভায় এই মিথ্যা বারে বারে প্রচারিত হয়েছিলো—যদি কম্যুনিস্টরা ক্ষমতায় আসে তাহলে প্রথমেই তারা ধর্মযাজক ও সন্ন্যাসিনীদের হত্যা করবে এবং সমস্ত গীর্জা ধ্বংস করা হবে। ফিদেল কাস্ত্রোর মতো দাড়িওলা কম্যুনিস্টরা তাদের তীক্ষ্ন বেয়নেটের ডগা ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েদের বুকে বসিয়ে তাদের হত্যা করে তবেই নতুন সাম্যবাদী সমাজ গড়বে, দরকার হলে বাবা-মা'র কাছ থেকে ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েদের ধরে নিয়ে এসে তাদেরকে সাইবেরিয়ার 'লেবার ক্যাম্পে' পাঠানো হবে মানুষ হবার জন্য। ইত্যাদি ইত্যাদি। এই ধরনের নানান মিথ্যা প্রচারে মানুষের গায়ের লোম আতঙ্কে দাঁড়িয়ে উঠেছিলো। এর অনেক পরে আমেরিকার সিনেটের এক বিশেষ সভায় সাক্ষ্য দেবার সময়ে আমরা জানতে পেরেছিলাম যে, সি. আই. এ. চিলির নির্বাচনে আলেন্দিকে হারাবার জন্য কুড়ি মিলিয়ন ডলার খরচ করেছিলো।

নির্বাচনে জয়লাভের পর ফ্রেই-র প্রথম কাজ হলো, দলে তাঁর একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী শত্রু টমিককে চিলি থেকে সরিয়ে তাঁর রাজনৈতিক জীবনকে ধ্বংস করা। কাজেই টমিককে আমেরিকাতে রাষ্ট্রদূত করে পাঠানো হলো। তখন সারা দেশ জুড়ে

তাম্রশিল্পকে জাতীয়করণ করার জন্য দাবী উঠেছে। ফ্রেই বললেন—জাতীয়করণ নয়, চিলির লোকদেরই নিয়োগ করতে হবে অর্থাৎ 'চিলি-করণ'। এবং তারপরেই এক নতুন চুক্তিতে আন্তর্জাতিক শক্তিসম্পন্ন এক ধনী সম্প্রদায় 'কেনাকোট ও এনাকোন্ডা'কে বিক্রী করে দিলেন। এই চুক্তিপত্রে টমিকও সই করলেন। ফলে চিলির জন-জীবনে এক ভয়াবহ অর্থনৈতিক দুরবস্থা নেমে এলো। টমিক এই অবস্থার কথা ভাবতেও পারেন নি, হতাশা ও দুঃখে তাঁর হৃদয় ভেঙে দু'টুকরো হয়ে গেল! ফ্রেই-র ক্রুর বুদ্ধির কাছে পরাজিত টমিক চিলির রাজনৈতিক মানচিত্র থেকে ধুয়ে মুছে গেলেন। চিলির একমাত্র প্রাণ-সম্পদ তামা নিয়ে এই জঘন্য অপরাধের কথা চিলির মানুষ ক্ষমা করেন নি, তাই পরবর্তী নির্বাচনে তিনি তৃতীয় স্থানে নেমে গেলেন।

১৯৬৮ সালে আমেরিকার রাষ্ট্রদূতের পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে 'ইস্‌লানেগ্রায়' আমার বাড়িতে টমিক এসেছিলেন আলোচনা করতে। তখনও তিনি রাষ্ট্রপতি পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কথা ভাবেন নি। রাজনৈতিক বহু ঝড় ও ঝঞ্ঝার মধ্যেও আমাদের বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ ছিলো এবং এখনও আছে। কিন্তু সেদিন তাঁর যুক্তিগুলি আমার মনঃপূত হয়নি। তিনি চেয়েছিলেন বামফ্রন্টকে আরো ব্যাপক করতে। কিন্তু তাঁর এই প্রস্তাব গ্রহণ করা সেদিন অসম্ভব ছিলো, কারণ তাম্রশিল্পের কেলেংকারীর পর তাঁকে বামপন্থী বলে চিলির মানুষ আর কিছুতেই বিশ্বাস করবে না। তাছাড়া বিগত কয়েক যুগ ধরে সমাজবাদী ও সাম্যবাদী দল বহু দুঃখ-কষ্ট ও অকথ্য নির্যাতন সহ্য করে তবেই চিলির মানুষের মনে স্থান করে নিতে পেরেছে। সুতরাং এখন তাঁদের নিজস্ব একজন প্রার্থী দাঁড় করানো খুবই প্রয়োজন।

ভগ্নমনোরথ টমিক সেদিন আমার কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় একান্তে ডেকে নিয়ে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গুপ্ততথ্য আমায় জানিয়ে গিয়েছিলেন। খ্রীশ্চান ডেমোক্রেটিক পার্টীর আন্দ্রেস জালভিডার তখন রাজস্ব ও অর্থ দপ্তরের সম্পাদক, তিনি টমিককে বিভিন্ন দলিল ও প্রমাণপত্র দেখিয়ে বলেছিলেন যে, চিলির রাজকোষ প্রায় শূন্য এবং আগামী চার মাসের মধ্যে চিলির গোটা আর্থিক কাঠামোটাই ভেঙে পড়বে। এই তথ্য জানিয়ে টমিক যাবার আগে আমার কাছে তাঁর সর্বশেষ যে কথাটি বলেছিলেন তা হলো—পাবলো, জালভিডারের কাছে এর প্রামাণ্য সমস্ত তথ্য ও দলিলই রয়েছে, এই দেউলিয়া অবস্থা থেকে আমাদের আর কেউ রক্ষা করতে পারবে না পাবলো—

এর এক মাস পরে আলন্দে জয়লাভ করে রাষ্ট্রপতি পদের দায়িত্ব নেওয়ার এক মাস আগের একটি জনসভায় এই আন্দ্রেস জালভিডার বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, আলন্দের জয়লাভ চিলির রাজনৈতিক জীবনে এমনই এক আন্তর্জাতিক সমস্যার সৃষ্টি করবে যাতে চিলির গোটা অর্থনৈতিক অবস্থা ভেঙে পড়বে। ইতিহাস এই-ভাবেই লেখা হয়। অন্ততঃ এইভাবেই জালভিডারের মতো সুযোগ-সন্ধানী লোকরা মিথ্যা ও বিকৃত ইতিহাস লিখে থাকেন। [illegible] — C I A.

আলেন্দি

আমার সময়কালে আমার দেশ যেভাবে প্রতারিত হয়েছে, তেমনভাবে বোধহয় আর কোনো দেশ হয়নি। মানুষের অবর্ণনীয় দুঃখ-দারিদ্র্য আর বঞ্চনা থেকে মুক্তির আশায় মরুভূমির ক্ষার শিল্প থেকে শুরু করে, কয়লাখনির অতল গহ্বর আর সুউচ্চ পাহাড়ের চূড়ার তাম্রখনি অবধি যে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়েছিলো, হঠাৎ একদিন তা বিরাট আকার নিলো। এই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে মানুষটিকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরা হয়েছিলো তাঁরই নাম সালভাদোর আলেন্দি। তাঁকে রাষ্ট্রপতি পদে আসীন করিয়ে আমাদের গোটা সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য ও শোষণের দ্রুত পরিবর্তন করে চিলিকে বিদেশীদের থাবা থেকে মুক্ত করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিলো।

আমাদের এই জনপ্রিয় রাষ্ট্রপতি যখনই যেখানে গেছেন, সে যে দেশই হোক্ না কেন, সর্বত্রই তাঁর এই নানাত্ববাদী সরকারের প্রশংসা তিনি লাভ করেছিলেন। ন্যুইয়র্কে রাষ্ট্রপুঞ্জের সভায় আমাদের এই রাষ্ট্রপতি তাঁর বক্তৃতার শেষে যে অসংখ্য করতালি ও সম্মান পেয়েছিলেন তেমন বোধহয় আর কোনো দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের ভাগ্যে জোটেনি। ইনিই ছিলেন আমাদের রাষ্ট্রপতি সালভাদোর আলেন্দি।

প্রচুর বাধা-বিপত্তি অগ্রাহ্য করে চিলিতে সবেমাত্র একটি সুস্থ সমাজ গড়ার কাজ শুরু করা হয়েছে, যে সমাজ চিলির সার্বভৌমত্ব, তার জাতীয় গৌরব এবং সংগ্রামী মানুষের বীরত্বের স্বীকৃতি দিয়ে গড়ে তোলা হবে। আমাদের দেশে বিপ্লবোত্তর সংবিধান, আইন, গণতন্ত্র ও সুস্থ আর সবল জীবনের আশা নিয়ে বেঁচে ওঠার দিনগুল দেখা দিচ্ছে তখন।

আর ওঁদের দিকে ওঁরা যা চান তার সবই ছিলো। ওঁদের ছিলো ভাঁড়, বিদূষক, সভাকবি, পিস্তল ও লোহার শিকল হাতে সন্ত্রাসবাদীর দল, ছিলো নকল সাধু, ভণ্ড গুরুদেব ও পদমর্যাদালোভী সামরিকবাহিনীর লোকরা। ওঁরা ওঁদের নগণ্য স্বার্থপরতা, লোভ আর হীন বিদ্বেষকে সঙ্গে নিয়ে একসঙ্গে নাগরদোলায় চড়ে বসলেন। ফ্যাসিস্ট জারপা তাঁর ভাইপো-ভাগ্নেদের হাত ধরে 'পিতৃভূমির স্বাধীনতা' বলে চীৎকার করতে করতে রাস্তায় বেরিয়ে এলেন এবং মানুষের মাথা আর আত্মাকে দ্বিখণ্ডিত করার হুমকি দিতে দিতে চিলির বৃহৎ ভূ-সম্পত্তি নিজেদের করতলগত করার কাজে লেগে পড়লেন।

এই দু'টি ঘটনা চিলিতে শ্রেণী-শাসনের সঙ্গে সঙ্গে রক্তাক্ত বিপ্লবের সূচনা করেছিলো। এই দুই ক্ষেত্রেই সামরিকবাহিনী রক্তপিপাসু উন্মাদ কুকুরের মতই কাজ করেছিলো। বাল্‌মাসেদোর সময়ে বৃটিশ বহুজাতিক বাণিজ্য সংস্থা এবং আলেন্দির সময়ে উত্তর আমেরিকার বহুজাতিক বাণিজ্য সংস্থা প্ররোচনা, অর্থ, কলাকৌশল এমন কি হত্যাকারী বুলেটটিও সামরিকবাহিনীকে সরবরাহ করেছিলো। দু'টি ক্ষেত্রেই আমাদের অভিজাত ধনী সম্প্রদায়ের নির্দেশে রাষ্ট্রপতির বাসগৃহকে

তছনছ করে ধ্বংস করা হয়। বালসামেদোর ঘরগুলিকে কুড়ুল দিয়ে ভাঙা হয়েছিলো। বর্তমান যুগের 'বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে আমি 'ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 'আলেন্দির বাসগৃহকে আমাদের 'বীর (?) 'বিমানবাহিনীর' সৈন্যরা আকাশ থেকে 'বোমা ফেলে 'ধ্বংস করেছিলো। ৫।৪

আশ্চর্যের কথা হচ্ছে যে, এই দু'জন রাষ্ট্রপ্রধানের চরিত্র ছিলো সম্পূর্ণ বিপরীত। বালসামেদো ছিলেন 'অসাধারণ বক্তা, তাঁর কর্তৃত্বপূর্ণ স্বভাব ক্রমে ক্রমে তাঁকে তাঁর নিজের পরিধির মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ করে ফেলছিলো। যদিও তাঁর চিন্তাশীল সিদ্ধান্ত ও দেশের জন্য ঐকান্তিক শুভ কামনা ও আদর্শের প্রতি আনুগত্যের জন্য তিনি নিজের প্রতি বিশ্বাস কখনও হারান নি, কিন্তু সব সময়ে শত্রুপরিবৃত অবস্থার মধ্যে বাস করতে করতে নিজেকে এক নিঃসঙ্গ অবস্থার মধ্যে এনে ফেলেছিলেন। এই একাকীত্বের যন্ত্রণা তাঁকে অস্থির করে তুলেছিলো। যে সকল মানুষ সেদিন সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে তাঁকে সাহায্য করতে পারতেন, তাঁরা তেমন কোনো সুযোগ পান নি। রাষ্ট্রপতি থাকবেন একটি স্বপ্নরাজ্যের মধ্যে এবং সে স্বপ্ন শুধু স্বপ্নই থেকে যাবে। এই হতাশা তাঁকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিলো। তাঁকে 'হত্যা করার পরের দিনই আনন্দে উল্লসিত আমাদের ক্ষার ব্যাবসার মালিকরা চিলির সমস্ত ক্ষার ব্যাবসায় বিদেশীদের কাছে বিক্রী করে দেয়। মাত্র ত্রিশটি রুপোর বাট বিনিময়ের সঙ্গে সঙ্গে আবার সব কিছুই স্বাভাবিক হয়ে এসেছিলো। কয়েক হাজার মানুষের রক্ত মাত্র কয়েকটা দিনের মধ্যেই শুকিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিলো। উত্তর চিলির সবচেয়ে অবহেলিত, নিপীড়িত শ্রমিকরা তাঁদের নবলব্ধ বৃটিশ প্রভুদের জন্য পাউণ্ড বা স্টার্লিং উৎপাদনের কাজ এতটুকুও ব্যাহত করেন নি।

আলেন্দির গুণ হলো—তিনি যে কোনো বিষয়েই তাঁর উপদেষ্টামণ্ডলীর সঙ্গে 'পরামর্শ না করে কোনো কাজ করতেন না। তিনি সামান্যতম কোনো বিষয়েও 'একনায়কত্ব বা স্বৈরতন্ত্রের ঘোরতম বিরোধী ছিলেন। যে দেশের ভার তিনি সেদিন গ্রহণ করেছিলেন, তিনি জানতেন সেই দেশটি রাজনৈতিক ঘাত ও প্রতিঘাত, বহু নির্যাতন ও 'রক্তের স্বাক্ষরে ভরা সংগ্রামী 'শ্রমিক ও 'কৃষকের দেশ, যার সম্যক অবস্থা তিনি মনে প্রাণে উপলব্ধি করতেন। আশ্চর্য লাগে এই কথা ভাবতে যে, যদিও আলেন্দি এই দরিদ্র নিপীড়িত শ্রমিক বা কৃষকশ্রেণী থেকে বেরিয়ে আসা কোনো নেতা ছিলেন না তবু তিনি বুঝেছিলেন এই শোষিতশ্রেণীর দুঃখ-দুর্দশা ও শোষণের ইতিবৃত্ত। এই সঙ্গে আর যে চিন্তা তাঁকে অস্থির করতো তা হচ্ছে—এই শোষকদের যুগোপার্জিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান। চিলির ইতিহাসে এমন একজন 'মহান দেশপ্রেমিকের এই মর্মোপলব্ধি এক নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছিলো। তাই 'তাম্রশিল্পের জাতীয়করণ সামাজিক অসাম্যের অবসানের সূচনা। কৃষিভিত্তিক ও অন্যান্য বাস্তব কর্মপন্থার কর্মসূচী, চিলির সাধারণ, শোষিত ও দরিদ্র মানুষের মধ্যে তাঁর এবং তাঁর সরকারের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা, আশা এবং নবতম এক উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলেছিলো। চিলির মানুষ বুঝেছিলেন যে, এটা শ্রেণীগত কোনো শাসনব্যবস্থা নয় বরং এ এক বিরাট সমষ্টিগত কর্মকাণ্ডের সূচনামাত্র।

আলেন্দির চিন্তা-ভাবনা ও তাঁর কল্যাণমূলক কার্যসূচীকে একটি জাতির

জীবন থেকে যে মুছে দেওয়া যায় না এটা স্বাধীনতাবিরোধী শত্রুরা ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন। এই অবস্থার দুঃখজনক পরিণতি হিসাবে তাঁর বাসভবনটিকে শত্রুরা তাই যখন বোমা মেরে ধ্বংস করে দেয় তখন আমার যা মনে পড়েছিলো তা হচ্ছে নাৎসীদের ঝটিকাবাহিনী দ্বারা স্পেন, লণ্ডন ও মস্কোর শহরগুলিকে বিমান থেকে বোমা মেরে ধ্বংস করার কথা।

সেই ফ্যাসিস্ট অপরাধই এই শতাব্দীতে আমার স্বদেশভূমি ছোট্ট এই চিলির উপরে সংঘটিত হলো। চিলির সাধারণ মানুষের সুখ ও স্বপ্নে ভরা তাঁদেরই জনপ্রিয় যে রাষ্ট্রপতিভবন সেটি চিলিরই নরখাদক বোমারু বিমান ধ্বংস করলো।

আজ তিনদিন হয়ে গেল আমার প্রিয়তম বন্ধু কমরেড সালভাদোর আললেন্দি তাঁরই স্বদেশবাসীর চক্রান্তে নিহত হয়েছেন। আমার এই অনুস্মৃতি দ্রুত শেষ করার জন্য আমি লিখে চলেছি। আললেন্দিকে হত্যা করার খবরটা সমস্ত বিশ্বের কাছে গোপন রেখে তাঁর অমর দেহকে গোপনে সমাধিস্থ করার সময়ে একমাত্র তাঁর পত্নী ছাড়া আর কাউকেই সেদিন কাছে থাকতে দেওয়া হয়নি। নির্লজ্জ, শয়তান হত্যাকারীরা প্রচার করতে লাগলো—আললেন্দি যে আত্মহত্যা করেছেন তার সমস্ত প্রমাণই নাকি তাদের কাছে রয়েছে। কিন্তু সেদিন স্তম্ভিত বিশ্ববাসী এটা ভালোভাবেই জেনেছিলেন যে, বোমা মেরে রাষ্ট্রপতিভবনকে ধ্বংস করার অব্যবহিত পরেই ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়াবাহিনী তাঁর বিধ্বস্ত বাসগৃহকে ঘেরাও করে সেখানে প্রবেশ করে। তখন সেখানে বিরাট-হৃদয় আর অসম সাহসের অধিকারী আমাদের সেদিনকার গণতান্ত্রিক চিলির সবচেয়ে জনপ্রিয় রাষ্ট্রপতি সালভাদোর আললেন্দি বারুদের গন্ধে ভরা ঘরে তাঁর শত্রুদের সাথে মুখোমুখি হবার জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

এমন একটা চমৎকার মুহূর্তকে ফ্যাসিস্ট দস্যুরা কি হাতছাড়া করতে পারে! মেশিনগানের এক ঝাঁক গুলি তাঁর দেহকে ছিন্নভিন্ন করে দিলো। তাঁর শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত এই ফ্যাসিস্ট শয়তানদের কাছে নতি স্বীকার করতে তিনি অস্বীকার করেছিলেন। এক অজানা অচেনা যায়গায় তাঁর ছিন্নভিন্ন দেহটিকে কবরস্থ করা হয়েছিলো। শোকাহত, স্তম্ভিত এক মহিলা বিশ্বের তীব্রতর শোক আর বিস্ময়কে সঙ্গে নিয়ে একা সেই শবদেহকে অনুসরণ করেছিলেন। মহিমান্বিত সেই শবদেহের সর্বাঙ্গে ছিলো বুলেটের চিহ্ন, যে বুলেট বেরিয়ে এসেছিলো চিলিরই সেনাবাহিনীর মেশিনগানের নল থেকে—চিলির যে সৈন্যবাহিনী বিদেশী প্রভুদের খুশী করতে তাদের নিজেদের স্বদেশকে আরো একবার প্রতারিত করলেন।

১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৩ সালে এক সামরিক অভ্যুত্থানে চিলির সেনাবাহিনীর হাতে রাষ্ট্রপতি সালভাদোর আললেন্দি নৃশংসভাবে নিহত হন। ফ্যাসিস্ট সেনাবাহিনীর হাতে আললেন্দির এই মৃত্যুর খবর যখন সান্তিয়াগোতে রোগশয্যায় শায়িত কবি পাবলো নেরুদার কাছে পৌঁছায় তখন তিনি বলেছিলেন, 'আর নয়! আর বেশীদিন আমি বাঁচবো না—' এর ঠিক বারোদিন পরে অর্থাৎ ২৩শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৩

সান্তিয়াগোর এক অখ্যাত হাসপাতালে প্রায় বিনা চিকিৎসায় পাব্‌লো নেরুদা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

নেরুদার মৃত্যুর কিছুক্ষণের মধ্যেই ফ্যাসিস্টবাহিনীর সেনারা ভালপারাইসো ও ইস্‌লানেগ্রার বাসগৃহ দু'টি লুটপাট করে এবং তাঁর সমস্ত অমূল্য সম্পদ, নথি-পত্র, পাণ্ডুলিপি, পিকাসোর দেওয়া ছবি ইত্যাদি সব কিছুই ধ্বংস করে দেয়। তারপর বাড়িগুলির জলের সমস্ত কল খুলে রাখা হয়—যাতে সেই জলে সব কিছু ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

এই খবরে সেদিন পৃথিবী স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলো। নয়া ফ্যাসীবাদের এই ভয়ংকর, বীভৎস মূর্তিকে সেদিন কোনো সুস্থ মানুষই তাঁদের কল্পনাতেও স্থান দিতে পারেন নি। কিন্তু এখানেই শেষ নয়, আরো আছে।

একটি সাধারণ কফিনের বাক্সে নেরুদার মৃতদেহটি ভরে তাঁর বাড়ীর সামনের জলে ডোবা কর্দমাক্ত রাস্তার উপরে রেখে আদেশ জারী করা হয়েছিলো—যেন পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির সমাবেশ তাঁর কফিনের সামনে না হয়। কোনো রকম শোকযাত্রা, বা শ্লোগান এমন কি 'কম্‌রেড' কথাটির উপরেও নিষেধাজ্ঞা জারী হয়েছিলো। তবু সেদিন সমস্ত বিশ্বজুড়ে এবং সমগ্র চিলির সাধারণ মানুষের বুক জুড়ে শুধু একটিমাত্র বেদনাহত অথচ দুর্জয় প্রতিজ্ঞায় ভরা নীরব যে শ্লোগানটি বেরিয়ে এসেছিলো তা হলো ঃ

'কমরেড পাব্‌লো নেরুদা দীর্ঘজীবন লাভ করুন!'

বিদায়! চিরবিদায়!
এক স্থান হতে
অন্য কোনো স্থানে
প্রতিটি দুঃখ
পরিচিত সেই সব মুখ
উদ্ধত, দুর্বিনীত চন্দ্র
যে সপ্তাহগুলি
দিনের আবর্তনে ঘুরে নিঃশেষিত
সেই স্বরধ্বনিকে-বিদায়!
পারিজাত ফুলের গন্ধভরা
এই যে মর্মরধ্বনি
তাকে জানাই বিদায় সম্ভাষণ।
খাবার থালা
আর আমার শয্যা
সন্ধ্যার আবছা আলোয়
যাদের শরীর জুড়ে

বিষণ্ণ বিদায়ের সুরে
আমার বসার চেয়ার
আর আমার চলার রাস্তায়
যে সুরে ছড়িয়ে দিয়েছে
শেষ বিদায়ের ধ্বনিটুকু।
কোনো প্রশ্ন না রেখেই
আমার জীবনকে
আমি চেয়েছি প্রসারিত করতে
যে জীবনটাকে পুরো পালটে দিয়ে
বদলে ফেলেছি চামড়ার রঙ
আলো আর ঘৃণাগুলিকে
কোনো আইন বা খেয়ালের বশে নয়
খানিকটা ধারাবাহিক প্রতিক্রিয়ার মতো।
প্রতিটি নতুন যাত্রাপথ
আমায় করেছে শৃঙ্খলিত
প্রতিটি নতুন শহর
গ্রাম আর গঞ্জে
আমি সংগ্রহ করেছি
আনন্দকে!
আমার জন্মের প্রত্যুষেই
আমি জানিয়েছি
বিদায়! চিরবিদায়
তখনও নবজাতকের কোমলতা ছিলো
আমার কণ্ঠস্বরে
ঠিক যেন
টাটকা রুটির মোড়কটি
তখনও খোলা হয়নি
হঠাৎ বিশ্বের টেবিল থেকে
সেটি উধাও হলো।
তাই তো আমি
সমস্ত ভাষা বর্জন করে
পুরোনো ভাঙা দরজার
ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দের মতো
বার বার জানিয়েছি—বিদায়! বিদায়!
আমি বদল করেছি
চিত্রগৃহ, যুক্তি আর সমাধি-মন্দির
সব কিছুকে ফেলে দিয়ে

কোনো কিছুর সন্ধান খুঁজেছে
আমার অস্তিত্ব
বা আধা-অস্তিত্ব
আধা-আনন্দে অপরিপূর্ণ
যেন বিষণ্ণতার সাম্রাজ্যে
একজন বিবাহের পাত্র।
জানি না কখন ফিরতে হবে
যদিও প্রস্তুত ফেরার জন্য
তবু ফেরেনি এখনও!
তোমরা তো জানো
যে ফিরে যায়
সে আর ফিরে আসে না।
তাই আমি
আমার জীবনের পদচিহ্নকে
বার বার অনুসরণ করে
গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে
গিয়েছি।
বদল করেছি
এই পোশাক আর সঙ্গীদের
সহ্য করেছি
নির্বাসিতের দ্রুত আবর্তন
তালে তালে নিনাদিত
নিঃসঙ্গ মৃত্যুর ঘণ্টাধ্বনি
বিদায়! চিরবিদায়!

From 'Adioses'
by PABLO NERUDA
From : Plenos Poderes [illegible]